বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প

বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প

হীরেন্দ্রনাথ মিত্র (বজ্রমিত্র)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

আমাদের গৃহে সুপ্রাচীন কাল থেকে আরাধিত গৃহদেবতা
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের চরণকমলে এই গ্রন্থখানি নিবেদিত।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র সাংবাদিকতার সূত্রে বাংলার লোকায়ত জীবনের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৬০-১৯৬২ পর্বে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প' শিরোনামে 'বজ্রমিত্র' ছদ্মনামে তাঁর এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'স্টাফ রিপোর্টার' হিসেবেও তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন। লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া লেখাগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হল। এর বাইরেও তাঁর বেশ কিছু লেখা থেকে গেল, যা অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা যায়নি। পরবর্তী সংস্করণে হয়তো সেগুলি সংযোজন করা সম্ভব হবে। লোক-উৎসব সংক্রান্ত চুয়াল্লিশটি লেখা প্রকাশের কালানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক চারটি লেখা রয়েছে শেষে। লেখার সঙ্গে প্রকাশিত মূল ছবিগুলির অধিকাংশই শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন বলে এখানে ব্যবহার করা সম্ভব হল। কিছু ছবি পুরনো পত্রিকার পাতা থেকে সরাসরি নিতে হয়েছে, তার মুদ্রণ-মান আশানুরূপ করা যায়নি। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে বিস্তৃত ক্ষেত্রানুসন্ধানের ভিত্তিতে লেখা এই সচিত্র প্রতিবেদনগুলি নিঃসন্দেহে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রামাণিক দলিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে গ্রন্থাকারে এগুলির প্রকাশ বাংলার লোকজীবন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে গণ্য হবে, আশা করা যায়।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক প্রকাশনা খাতে যে অনুদান দিয়েছেন, তা থেকে সূচনা হয়েছে পরিষদের 'চিত্রশালা প্রকাশনা'র। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হল 'বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প'। এই সহায়তার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভারত সরকারের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

সহৃদয়-পাঠক-সমীপে

এই গ্রন্থের লেখক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং বহুগুণান্বিত অগ্রজ বন্ধু। সাংবাদিকতার জীবিকায় দীর্ঘদিন তাঁর সহকর্মী হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু সাংবাদিক হলেও তাঁর আগ্রহ এবং অন্বেষণ শুধু সংবাদ সংগ্রহ বা তার বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও অধ্যয়ন ছিল লোকচিত্রকলা, লোকসংস্কৃতি এবং লোক-উৎসব বিষয়ে। সাংবাদিকতার তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের বৃত্তের বাইরে লোকজীবনের আনন্দবেদনা, বিশ্বাস ও তার সাংস্কৃতিক বিকাশের নান্দনিকতায় তাঁর অনুরাগ ও অভিনিবেশের পরিচয় আছে বর্তমান গ্রন্থের রচনাগুলিতে।

অপেক্ষাকৃত তরুণবয়সে সংবাদপত্রের রিপোর্টার বা প্রতিবেদক হিসেবে পশ্চিমবাংলার দূরতম এবং নিভৃততম গ্রামাঞ্চলে তিনি গেছেন সংবাদ সন্ধানে। কিন্তু সেই কর্তব্য করেই তিনি গ্রামের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলেননি। আজন্ম নগরলালিত প্রতিবেদক নিজের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করলেন আমাদের দেশের জনজীবনের আশ্চর্য প্রকাশ বিভিন্ন লোক-উৎসব ও মেলার বহুবর্ণময় বৈচিত্র্য। তা থেকেই বর্তমান গ্রন্থের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে ফিচার বা সংবাদ-আলেখ্য বলা হয় অনেকটা সে ধরনে নিয়মিতভাবে তিনি এই রচনাগুলি লেখেন। সেগুলো প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় (অধুনালুপ্ত) গত শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে। তাঁর আগ্রহ দেখে এই কাজের জন্যই তাঁকে বিশেষভাবে সুযোগ দেন 'যুগান্তর' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং বার্তাসম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই পত্রিকাতেই পঞ্চাশের দশকে সুবিখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের দুটি ফিচার বেরোত, কালপেঁচার নকশা এবং কালপেঁচার বঙ্গদর্শন। এই গ্রন্থের রচনাগুলির পরিসর আলাদা। লোক-উৎসবের পটভূমিতে লোকশিল্পকলার যে-অভিব্যক্তির প্রকাশ, এই রচনাগুলোতে তারই বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। প্রথাসিদ্ধ গবেষণা নয়, গ্রামীণ জীবনের আলেখ্য চিত্রণই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য।

আদর্শবাদী এবং আত্মপ্রচারবিমুখ লেখক সুদীর্ঘকাল এই রচনাগুলি প্রকাশ করার কথা ভাবেননি। আমাদের অনুরোধও তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন জীবন সায়াহ্নে তাঁকে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশে রাজি করানো সম্ভব হয়েছে। অনেক শারীরিক কষ্ট সহ্য করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে—লোক-উৎসবের তথ্য সংগ্রহ এবং তার ফটো তুলে বৃহত্তর পাঠকসমাজে তিনি তা পরিবেশন করেছেন। গ্রামীণ শিল্পীর হাতে তৈরি পুতুল, পটচিত্র, খেলনাসামগ্রী ও লোককথার অপরূপ জগতের নানা কাহিনীর সংগ্রহে ভরপুর তাঁর ঝুলি। তারই কিছুটা পরিচয় এই গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই লোক-উৎসব ও পালপার্বণ, মন্দিরস্থাপত্য ও বিগ্রহের নানা তথ্য সংগ্রহ করতে তাঁকে অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এখন যেমন লোকসাহিত্য ও লোকশিল্প নিয়ে বিপুল চর্চার ফলে লোকজীবনের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে তা ছিল না। আমাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে এক নিপুণ শিল্পীর তৈরি কালো কষ্টিপাথরের অপরূপ সুন্দর মহিষমর্দিনী-মূর্তির পুজো হয়। এই মূর্তি সারা বছর জলে ডোবানো থাকে। একমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তির দিন প্রত্যূষে দেবীমূর্তিকে জল থেকে তুলে এনে একটি ছোটো মন্দিরে স্থাপন করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই পুজো চলে। নারীরা এই পুজোর বিশেষ ব্রতিনী। তারা মহিষমর্দিনীমূর্তিকে সিঁদুরে সিঁদুরে রাঙা করে, হাতে শাঁখার পর শাঁখা পরায়। লেখকের সঙ্গী আলোকচিত্রী মূর্তির ছবি তুলতে গেলে ক্ষীরগাঁয়ের বেশ কিছু প্রবীণ মানুষ এর বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে দেবীমূর্তির ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হলে দেবীর অমর্যাদা হবে। কারণ কাগজ পড়ে ফেলে দিলে তা লোকের পদদলিত হবার আশঙ্কা। কথা

শুনে উত্তেজিত জনতা লেখক ও আলোকচিত্রীকে ঘেরাও করে। অবশ্য স্থানীয় কিছু যুবক এগিয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে এবং নিজেরা বেষ্টনী তৈরি করে দেবীমূর্তির ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দেয়।

তাঁর তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতিটিও ছিল লোকজীবন ভিত্তিক। গ্রামীণ মেলায় যাঁরা আসতেন নানা পসরা নিয়ে তাঁরা ছিলেন ভ্রাম্যমাণ কারবারী—মাটির পুতুল, কাঁচের চুড়ি, পাঁপড়ভাজা বিক্রেতা, কিংবা লোকশিল্পকলায় পারদর্শী গ্রামীণ শিল্পী। অস্থায়ী তাঁরা, সাজসরঞ্জাম দোকানপাট নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বিভিন্ন মেলা-উৎসবের খবর তাঁরা রাখতেন। লেখক তাঁদের কাছ থেকেই খবর নিয়ে পরবর্তী অন্য কোনো মেলায় গিয়ে হাজির হতেন। দূর গ্রামাঞ্চলে বহিরাগত প্রতিবেদককে গ্রামের এইসব দরিদ্র সাধারণ মানুষেরাই থাকবার আশ্রয় দিয়েছেন, নিজেদের খাবার ভাগ করে খেতে দিয়েছেন। তাঁদের সহায়তা ছাড়া তখনকার দিনে লেখকের পক্ষে এই মেলা-উৎসবের বিবরণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হত না। এই হল আমাদের লোকজীবন এবং লোকসভ্যতা।

পটচিত্রকর বলাই পাল বস্তুত এই গ্রন্থের লেখকেরই আবিষ্কার। দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত সহায়সম্বলহীন বলাই পালের এপারের আস্তানা হয় উল্টোডাঙার বস্তিতে। লেখক শ্যামবাজারের মোড়ে ফুটপাথের ওপর লক্ষ্মীসরার পসরা নিয়ে বসে থাকা বলাই পালের দেখা পান। লক্ষ্মীসরার ছবিতে তুলির টানের সংহত দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি বুঝতে পারেন যে এ একজন ব্যতিক্রমী পটচিত্রকর। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ ফুটপাথের আশ্রয়ে জীবনসংগ্রামে রত। সেই পরিচয় দুজনকে পরস্পরের গাঢ় সান্নিধ্যে টেনে আনে। লেখকের অনুরাগী কবি বিষ্ণু দে তার হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি লেখকের সঙ্গে উল্টোডাঙা বস্তির প্রায়ান্ধকার ঘরে শিল্পী বলাই পালের 'স্টুডিও' দেখতে যান। এ বিষয়ে তাঁর 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থে একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতা আছে।

এভাবেই তিনি লোকশিল্পী ও লোক-উৎসবের উৎসে পৌঁছে যান। বাংলার হিন্দুমুসলিম জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আমাদের এই লোকসংস্কৃতি। লেখকের বোধ ও অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লক্ষ্য করি—লোকায়ত সমন্বয় সাধনার দিকটি কীভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে উদার মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে—বহু শতাব্দীর চর্চা ও অনুশীলনে। তাঁর প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণের ভঙ্গিটিও প্রকৃত অর্থে লোকায়তিক। নিছক তথ্য সমাবেশ বা তাত্ত্বিক চর্চায় গুরুভার নয়। দীর্ঘদিন পার হয়ে যাবার ফলে পরবর্তীকালের পরিবর্তনের সামগ্রিক চেহারাটা হয়তো এই রচনাগুলিতে সংযোজিত করা গেল না। লেখকের বয়সের কথা বিবেচনা করে—তাঁর ওপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তবু এতে যা পাওয়া গেল তার মূল্য অপরিসীম। যখন এই রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন তা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষও এর মধ্যে নিজেদের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। প্রতিটি মেলায় গিয়ে তিনি নিজেকে শিক্ষিত করেছেন, লোকজীবনের গভীরতা ও তার মহিমা উপলব্ধি করেছেন। এভাবেই মেলায় মেলায় ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছেন লোকশিল্পের অপূর্ব সুন্দর সব নিদর্শন। শিল্পানুরাগী বিদগ্ধজন অনেকেই তাঁর এই সংগ্রহ দেখে প্রশংসা করেছেন। এই গ্রন্থের লোকশিল্প নিদর্শনের অনেক ছবিই তাঁর সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

লেখকের দীর্ঘকালের গ্রামযাত্রায় যাঁরা নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সহায়তা করেছেন, আলোকচিত্রী, লোকশিল্পী, মেলায় আগত সাধারণ মানুষ তাঁদের সকলকে লেখকের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। মেলার সময়ে আলোকচিত্রী রবি ঘোষ ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। লক্ষ্মীসরার অনেক ছবি তুলে দিয়েছেন সরিৎ ঘোষ, যুগান্তরের পুরনো ফাইল থেকে লেখা উদ্ধারে সহায়তা করেছেন সুবোধ বসু। নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন 'নন্দন' পত্রিকার সম্পাদক অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। লেখা সংগ্রহ ও অনুলিখনে লেখককে প্রভূতভাবে নিরলস সাহায্য করেছেন সত্যব্রত ভট্টাচার্য।

পরিণত বয়সে তাঁকে সযত্নে সবদিক দিয়ে সেবা করছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীদেবব্রত মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুমিতা মিত্র।

সর্বোপরি যাঁর সযত্ন সহায়তা ছাড়া এই বই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা থেকে কখনই এমন সুচারুভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থের আকারে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হত না তিনি হলেন বিদ্যানুরাগী গবেষক ও লেখক শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার কাছ থেকে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও ছবি সাগ্রহে সংগ্রহ না করলে এই গ্রন্থটি বিস্মৃতির আড়ালে বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের কৃতজ্ঞতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষের প্রতি যাঁদের অনুমোদনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হল।

কৃষ্ণ ধর

সূ চি

চিত্রসূচি

গোরাচাঁদের মেলা

৯৫. ফকিরকে মুরিদের প্রণাম। হাড়োয়া

৯৬. মেলায় চিত্রিত হাঁড়ি বিক্রি। হাড়োয়া

৯৭. ফকির-বাউলদের গানের আসর। হাড়োয়া

গোড়াই গাজির ইতিকথা

৯৮. ভক্তদের ভিড়। হাড়োয়া

৯৯. ভক্তদের 'সোন্দল' আনার দৃশ্য। হাড়োয়া

১০০. রাবণবধ পালার আসর। হাড়োয়া

ঘেঁটু যায় খোস পালায়

১০১ ঘেঁটুঠাকুর নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা। হাওড়া

১০২. 'ঘেঁটুরাজার বউ'। হাওড়া

১০৩. ঘন্টাকর্ণের পুজো। হাওড়া

সরস্বতী

১০৪. (ক) 'বাংলা' (খ) 'দোভাসী' (গ) 'মানষেবা' ঢঙের মুখ।

১০৫. নতুন রীতির প্রতিমা

১০৬. 'দোভাসী' মুখ, 'বাংলা' আভরণ।

১০৭ 'আর্টে'র প্রতিমা।

১০৮. 'প্রাচ্যভারতীয়' রীতির প্রতিমা।

১০৯. 'ছবিয়ানা' মূর্তি।

১১০. 'বাংলা' ঢঙের প্রতিমা।

১১১. 'বাংলা' মুখ, বিষ্ণু দে সংগ্রহ।

শোলা

১১২. প্রতিমার 'মুকুট' ও 'কিরীট'।

১১৩. 'চিক', 'মালা', 'বেণীমকর ও 'দুল'।

১১৪. সিংহাসনের নীচের অংশ।

১১৫. শিল্পী শিবপ্রসাদ প্রামাণিক ও ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।

১১৬. শাড়ির দু'দিকের কল্কাদার আঁচল।

১১৭. 'চেক' শাড়ি— প্রতিটি চেকের ভিতরে তারা।

১১৮. 'চালচিত্রে'র একাংশ।

লক্ষ্মীসরা

১১৯. আচার্য বা গণকি সরা।

১২০. গজলক্ষ্মী সরা।

১২১. লক্ষ্মী সরা—বলাই পাল

১২২. লক্ষ্মী সরা- বলাই পাল

১২৩. লক্ষ্মী সরা

১২৪ আট পূজারিণী সহ লক্ষ্মী

১২৫. আসনে বসানো সরা

১২৬. ফরিদপুরি সরা

১২৭. ঢাকাই সরা

১২৮. আচার্যি বা গণকি সরা

১২৯ কুমোরটুলির সরা

১৩০ ঢাকাই সরা

১৩১. কিষাণ-কিষাণী সরা বলাই পাল

১৩২. সুরেশ্বরী সরা

১৩৩. ফরিদপুরি সরা—বলাই পাল।

বলাই পাল

১৩৪. সরায় চাষির সংগ্রামের ছবি

১৩৫. যুগলমূর্তির সরা

১৩৬. সরা আঁকছেন বলাই পাল।

১৩৭. গণেশ—বলাই পাল

১৩৮. কাগজে আঁকা সরাচিত্র — বলাই পাল।

১৩৯. রাধাকৃষ্ণ—বলাই পাল।

১৪০ ধান তোলার দৃশ্য - বলাই পাল।

১৪১. চাষি ধান কাটছে—বলাই পাল।

১৪২. কাগজে আঁকা সরাচিত্র- বলাই পাল।

১৪৩. বিজয়ার অভিনন্দনলিপি —বলাই পাল।

১৪৪. চাষিবউ ঘরে ফিরছে।—বলাই পাল।

১৪৫. কাগজে আঁকা সরাচিত্র।- - বলাই পাল।

১৪৬. বিষ্ণু দে'র সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৪৭. যামিনী রায়ের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মিত্র

আলোকচিত্রী:
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, টি দাস (নবদ্বীপ), অনিলবরণ, মুরজ দে, শ্যামলকান্তি বসু।

২৭ ও ২৮ নং চিত্র *দ্য রিচুয়াল আর্ট অব দা ব্রতজ অব বেঙ্গল*, সুধাংশুকুমার রায় (১৯৬১) বই থেকে গৃহীত।

বাংলার লোক উৎসব ও লোকশিল্প ।। বজ্রমিত্র ।।

শিবের বিয়ে

শিব নিষ্কিঞ্চন, নিঃস্ব, শ্মশানবাসী ভিখারি হলে কী হবে, গিরিরাজ হিমালয় তাঁর হাতে গৌরীকে সম্প্রদানের সময় নিজের উঁচু বংশের মর্যাদা আর বিপুল বৈভব অনুযায়ী শিবকে অঢেল দানসামগ্রী দিতে কার্পণ্য করেননি। বিভিন্ন পুরাণে, কালিদাসের মহাকাব্য কুমারসম্ভবে এর উল্লেখটুকু মাত্র আছে। কিন্তু হিমালয় মেয়ে-জামাইকে কী কী দানসামগ্রী দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ ঐ সমস্ত বই-এ আমরা পাই না।

বাংলার প্রাচীন পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি লোকসাহিত্যের রচয়িতারা নানা বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে একটুও ক্লান্তি বোধ করেননি। তাঁদেরও অনেকে শিব-বিবাহের খুঁটিনাটি বিবরণ রেখে গেছেন, কিন্তু বিয়েতে শিব কী কী জিনিসপত্র শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক স্বরূপ পেয়েছিলেন তাঁরা যদি তার একটা ফিরিস্তি রেখে যেতেন, তবে সেকালের শিববিবাহের যৌতুক সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের হত।

একালে শিবের বিয়ে আমাদের চোখের সামনেই হচ্ছে নবদ্বীপে। সেখানে আবহমানকাল ধরে প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লা দশমীর শেষ রাত্রে স্থানীয় শিবঠাকুরের বিয়ে হয়ে আসছে, কোন বছরই বাদ যায় না। আর এই বিয়েতে যে সমস্ত দানসামগ্রী দেওয়া হয়, যেভাবে বিয়ের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, ভূ-ভারতে আর কোথাও তার জুড়ি মেলে না।

প্রতি বছর সেখানকার দুটি শিব—'বুড়োশিব' আর 'যোগনাথে'র বিয়েতে বাসর-ঘরে যে সমস্ত দানসামগ্রী সাজিয়ে দেওয়া হয় তার কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনলে শিবঠাকুরদের সৌভাগ্যের ওপর সত্যিই সকলেব হিংসে হবে। পোড়ামাতলাতে ঐ দুই শিবের একসঙ্গে বিয়ে হয় এবং একই বাসরঘরে দুজনের জন্যে দানসামগ্রী সাজিয়ে দেওয়া হয়। আমি যে বছরে ঐ বিয়ে দেখেছিলুম, তার কথা এখানে বলছি।

বিয়ের দানসামগ্রী

ঐ বাসরঘরে কনের জন্যে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল চুড়ি, বালা, কঙ্কণ, বাজু, হার, নেকলেস, কণ্ঠী, কানবালা, আংটি, চরণচক্র প্রভৃতি যাবতীয় সোনা, রুপো, জড়োয়ার গহনা।

শাড়ির সম্ভারের মধ্যে ছিল বেনারসি, কাঞ্জিভরম্, ঢাকাই, শান্তিপুরি, ধনেখালি, টাঙ্গাইল, জর্জেট, শিফন, মায় 'মানে-না-মানা', 'পথে-হল-দেরী', 'সাগরিকা' ইত্যাদি নানান নাম আর ঢং-এর বাহারে শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদি। শিবঠাকুরের জন্যে বর বরণের দামি আংটি, গরদের জোড় তো ছিলই, আর ছিল ফিনফিনে শান্তিপুরি ফরাসডাঙ্গার ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, কয়েকপ্রস্থ সামারকুল গেঞ্জি, ফ্যান্সি রুমাল, বাস্কস্কিনের জুতো, ছাতা, রিস্টওয়াচ্, বাইসিক্ল। সুদৃশ্য বিছানা সমেত ঝক্ঝকে পালিশকরা খাট, আল্না, আলমারি ইত্যাদির সঙ্গে ছিল রেডিও সেট, ইলেকট্রিক ফ্যান, স্টোভ। সেন্ট, স্নো, পাউডার, রুজ, ব্রাইডাল, লিপস্টিক, নেল্পলিশ ইত্যাদি প্রসাধনদ্রব্য স্তূপাকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাঁসার প্রচলিত দানসামগ্রীর সঙ্গে কয়েকপ্রস্থ রুপোর বাসন-কোসনও ঝকমক করছে। ট্রাঙ্কে, সুটকেশে, ট্রেতে, থালায়, হাঁড়িতে থরে থরে সাজানো ছিল এই বিপুল যৌতুকসম্ভার, আর সন্দেশ, রসগোল্লা, মণ্ডা, মেঠাই প্রভৃতি খাবার দাবার।

কন্যাপক্ষ শুধু এই যৌতুকসম্ভার দিয়েই তৃপ্ত হননি, 'বুড়ো-শিব' আর 'যোগনাথ'কে বরপণও দিয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের জন্যে রুপোর থালায় ১০০১ টাকা করে নগদ টাকার বরপণ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই বিচিত্র বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৩শে চৈত্র বুধবার শুক্লা দশমীর দিন গভীর রাত্রে। সেদিন সারা রাত্রি ধরে পোড়ামাতলায় এই বিয়ে দেখতে নবদ্বীপবাসীদের ভিড় ভেঙে পড়েছিল। সেদিন নবদ্বীপে শুধু 'বুড়োশিব' আর 'যোগনাথে'রই নয়, সেখানকার আর দুটি শিব, চারিচারাপাড়ার 'বালকনাথ' ও বৌবাজারের 'মালোদের শিবে'রও বিয়ে হয়েছে এবং তাঁদেরও জন্যে আলাদা আলাদা বাসরঘরে বিয়ের দানসামগ্রী সাজানো হয়েছে।

নবদ্বীপের এই শিবের বিয়ে এক লোকপ্রিয় উৎসব। খুব প্রাচীনকাল থেকে এখানে এ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বরযাত্রী, আলো, বাজনাবাদ্যি নিয়ে বর আসা, জলসওয়া, ছিরি, বরণডালা, কুলো, মঙ্গলভাঁড় নিয়ে বর বরণ করা, বরকে ঘিরে কনের চারপাশে সাতপাক ঘোরা, শুভদৃষ্টি, মালা বদল প্রভৃতি বাঙালি হিন্দু ঘরের বিয়ের স্ত্রী-আচারের সব অঙ্গই এই অনুষ্ঠানে মেনে চলা হয় আর নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা এই অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগ দেয়। নবদ্বীপের বাইরে, আশেপাশে নানান জায়গা থেকেও লোক আসে এই বিয়ে দেখতে।

বাসন্তী প্রতিমার সঙ্গে শিবের বিয়ে

নবদ্বীপের শিবঠাকুরদের জন্যে কিন্তু পাত্রী খুঁজে বেড়াবার দরকার হয় না। তাঁদের পাত্রী ঠিক করাই থাকে। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সিংহবাহিনী অসুরমর্দিনী দশভুজা বাসন্তী দুর্গাদেবীর পুজো হয়। দশমীর দিন সকালে বাসন্তী প্রতিমার ঘটে বিসর্জনের পর ঐদিন রাত্রে শিবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়, তারপর গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। 'বুড়োশিব', 'যোগনাথ', 'বালকনাথ' আর 'মালোদের শিব'—এই চারটি শিবের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে চার জায়গায় চারখানি বাসন্তী পুজো করা হয়।

শারদীয় দুর্গোৎসবের মতই বাসন্তী পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান চলে। প্রতিমাও ঠিক একই ধরনের। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক নিয়ে দশভুজা দুর্গার পুজো হয় তিনদিন। কিন্তু নবদ্বীপে শিবঠাকুরদের বিয়ের জন্যে যে কটি বাসন্তী প্রতিমার পুজো হয় তাতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকরা থাকেন না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়ের বিয়ে দৃষ্টিকটু ব্যাপার, স্বভাবতই ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়েই বাসন্তীকে পুজো নেবার জন্যে আসতে হয়।

বিয়ের খরচ তোলার জন্যে শিবের ভিক্ষা

এই বাসন্তী পুজো আর বিয়ের জন্যে কম টাকা খরচ হয় না। শিবঠাকুর ভিখারি হলে কি হবে, বিয়ে করতে আসবার সময় তিনি কিন্তু বড়লোকের বেটার মত চতুর্দোলায় চেপে আসেন। সঙ্গে বাজনা-বাদ্যি, সং, বাজি, আলোর এলাহি কাণ্ড। তাব ওপরে আছে কন্যাপক্ষের খরচ। তাঁরা তো রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। সুতরাং বিয়ের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শিবঠাকুরকে দরজায় দরজায় ঘুরে নিজের বিয়ের দায়োদ্ধার হবার জন্যে অর্থ ভিক্ষে করতে বেরোতে হয়। একে নবদ্বীপবাসীরা বলেন শিবের 'বৃত্তিসাধা'। কিন্তু এই 'বৃত্তি সাধতে' শিব যেমন তেমনভাবে বেরোন না—তিনি চতুর্দোলায় চেপে, ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে গৃহস্থের দরজায় দরজায় ঘোরেন। এই জন্যে নবদ্বীপে শিবঠাকুরদের প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা কাঠের চতুর্দোলা আছে।

বেহারারা ঐ চতুর্দোলাতে শিবকে বসিয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গে ঢুলিরা ঢোল-কাঁসি বাজায় আর থাকে খাতা বগলে আদায়কারীরা। গোটা নবদ্বীপ শহরটা আর তার আশে-পাশের শহরতলি সমস্ত অঞ্চলটা থেকে শিবঠাকুরদের জন্যে বৃত্তি আদায় করা হয়। গৃহস্থদের দেয় বৃত্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। আদায়কারীরা খাতা দেখে তা আদায় করেন। গৃহস্থবাড়ির সামনে গিয়ে সকলে ঢোল-কাঁসি

বাজাতে বাজাতে সমস্বরে হাঁক পাড়েন, 'বল ভাই দেবাদিদেব মহাদেব'। বাড়ির গিন্নি তখনই এক ঘটি জল এনে শিবের চতুর্দোলার সামনে মাটিতে ঢেলে দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করবেন আর তিনি একগাছি ফুলের মালা শিবঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলে গৃহস্থ তাঁর দেয় বৃত্তি শিবের ঝুলিতে দেবেন।

এইরকম বৃত্তি সংগ্রহের কাজ দশমীর দিন বিকেল পর্যন্ত চলে। দশমীর দিন সকালে পুজো শেষে ঘট বিসর্জনের পর কোনও কোনও শিবঠাকুরের নির্দিষ্ট বাসন্তী দেবীও তাঁর স্বামীর মত বৃত্তি সাধতে বার হন। কারও কারও বাড়িতে শিবের আর তাঁর কনে বাসন্তীর যুগলে এসে 'বৃত্তি সাধবার' রেওয়াজ আছে, যদিও তখনও তাঁদের বিয়ে হয়নি।

বিয়ের আগের দিন অর্থাৎ নবমীতে পাড়ার মেয়েরা শিবমন্দিরে গিয়ে গায়ে হলুদের কাজ সারেন। শোনা যায়, অনেককাল আগে 'পুণ্যব্রতা' রমণীরা গায়ে হলুদের দিন শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের গায়ে হলুদের পর গরিবদের মধ্যে তেল, হলুদ, নতুন গামছা বিলোতেন, আর নিজেদের বাড়িতে সধবাদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে মাছ-ভাত খাওয়াতেন।

বিয়ের সং

শিবের বিয়ে হোক আর গাজন হোক সং সাজা শিবোৎসবের একটা বড় রকমের চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। শিবের অনুচর ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানো। নবদ্বীপের শিবঠাকুররা যখন বিয়ে করতে শোভাযাত্রা করে বের হন তখন ভূত-প্রেতদের সং বেরোয়। মুখোশ পরা, কালি ঝুলি মাখা কিম্ভূতকিমাকার ভূত-প্রেত সাজা লোকেরা নাচতে নাচতে চলে। আবার বিয়ের দিন সকালেও আর এক ধরনের সং বের হয় তাদের বলে 'মেয়ে সং'। ছেলেরা মেয়েদের মত শাড়ি, কাঁচুলি, চুল, গয়না পরে বরণডালা, কুলো, ছিরি নিয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে 'জল সইতে' বেরোয়। শহরের সমস্ত মন্দির তারা পরিক্রমা করে আসে।

শুধু নারীবেশী পুরুষরা নয়, ছোট ছোট মেয়েরাও জল সইতে বেরোয়। এই জল সওয়ার সঙ্গে থাকে গানের দল। হার্মোনিয়াম, ক্ল্যারিওনেট, পাখোয়াজ বাজাতে বাজাতে গানের দল হরগৌরীর বিয়ের গান কোরাসে গাইতে থাকেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতি বছর নতুন নতুন গান বাঁধা, সুর সংযোগ করা হয়।

ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস ও কামনা

দশমীর দিন সকাল থেকেই বিয়ের বাসরঘর সাজাতে লোকে মেতে ওঠে। সুদৃশ্য প্যান্ডেলের ভেতরে বিয়ের দানসামগ্রী সাজানো হয়। শহরের ব্যবসায়ীরাই কন্যাপক্ষ অবলম্বন করে উল্লিখিত দানসামগ্রী আনেন। প্যান্ডেলের ভেতরে উঁচু মঞ্চ করে দানসামগ্রী থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়। বিয়ের শেষে এই সমস্ত দানসামগ্রী ব্যবসায়ীরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান, কেবল খাবার-দাবারগুলো বিলিয়ে দেওয়া হয়।

শিবের বিয়েতে এইভাবে দামি দামি জিনিসপত্র ব্যবসায়ীরা উৎসব উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা কেবলমাত্র উৎসবের রঙ্গরসের জন্যে নয়, তাঁদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হবে এই বিশ্বাস আর কামনা নিয়ে নাকি শিবের বিয়ের দানসামগ্রী জোগাবার ভার নেন।

বিয়ের মিছিল

দশমীর দিন রাত্রে মন্দির থেকে শিবঠাকুররা বিয়ে করতে বেরোন প্রকাণ্ড সুসজ্জিত চতুর্দোলাতে

চেপে। 'বুড়োশিব' আর 'যোগনাথে'রই শোভাযাত্রার জাঁকজমক বেশি। 'বুড়োশিবে'র মুখে রুপোর মুখোশ পরানো হয়। মাথায় সোনার মুকুট, রুপোর সাপ, পাশে রুপোর ত্রিশূল-ডমরু। 'যোগনাথ'ও ঐ রকম বেশ ধরেন। দুজনেই পরেন লালরঙের পট্টবস্ত্র। আলোর গেট নিয়ে, ব্যাগপাইপ, ঢোল-কাঁসি বাজাতে বাজাতে শিবের বিয়ের মিছিল বেরোয়। সঙ্গে চলে ভূত প্রেত সাজা সং, গরুর গাড়িতে মাটির পুতুলের সং। বোম, পটকা ফাটানো হয়, তুবড়ি, কদম-ঝাড় জ্বালিয়ে চারদিক আলো করে তোলা হয়। এই মিছিল গোটা শহরটা প্রদক্ষিণ করে আসতে আসতে রাত্তির তিনটে চারটে বেজে যায়। অবশেষে শিব বিয়ের আসরে এসে পৌঁছান। এই সময় বাসন্তীদেবীও লোকের কাঁধে চেপে ঢোলকাঁসি বাজাতে বাজাতে আর নিজের জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে আসেন। হাজার হাজার লোকের ভিড় জমে যায় কাতারে কাতারে। আলোতে, বাজনায়, শাঁখ আর হুলুধ্বনিতে বিয়ের জায়গাটি বিচিত্ররূপ ধারণ করে।

বাসন্তীর অভিমান, শিবের সাধাসাধি

যাঁরা বাসন্তী দেবীকে বয়ে আনছিলেন, বিয়ের আসরে এসে পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই তাঁরা বেশ ছুটে ছুটেই চলেন। ব্যাপারখানা যেন এই, অনেক আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে বরদর্শনাকাঙ্ক্ষিনী উমা ছুটে আসছেন বিয়ের বাসরঘরের দরজায়। কিন্তু বাসরঘরের দরজায় এসে পৌঁছলেই বাহকরা হঠাৎ বাসন্তীকে নিয়ে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন খানিকক্ষণের জন্যে, তারপর যে পথ দিয়ে এসেছেন, সে পথের দিকেই বাসন্তীর মুখ ফিরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে তারা ফিরে চলেন। এমন সোনার বরণা কিশোরী মেয়ের জন্যে পাষাণ বাপ কিনা শেষকালে এক বুড়ো গাঁজাখোর বর জোগাড় করলে! বাপের ওপর মেয়ের দুর্জয় অভিমান, বুড়ো বরের ওপর দারুণ বিদ্বেষ। এমন বরকে বাসন্তী কিছুতেই বিয়ে করবেন না, তিনি বরণের মালা নিয়ে ফিরেই যাচ্ছেন। বৃদ্ধ গুণহীন বরের হাতে কন্যাদায়গ্রস্ত নিরুপায় দরিদ্র বাঙালি পিতার কন্যা সম্প্রদানের অজস্র করুণ কাহিনীতে বাঙালির বিগত দিনের সমাজ ক্লিষ্ট ছিল। আজও আছে। সেই পুরাতন মর্মবেদনা বাংলার লোকমানস থেকে ছড়ায়, গানে, হরপার্বতীর বিয়ে, তাঁদের গার্হস্থ্য কলহকোন্দল, আগমনী-বিজয়া প্রভৃতির রূপ ধরে একদিন অজস্র ধারায় বেরিয়েছে। বুড়ো শিবকে দেখে বাসন্তীর এই মুখ ফেরানো সেই পুরাতন ইতিকথারই স্মরণ। বিয়ের আসর থেকে শিবও বেরিয়ে আসেন লোকের মাথায় চেপে, বাসন্তীকে যেন অনেক সাধছেন, কাকুতি-মিনতি করছেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাসন্তী আর শিবের রাগ, অভিমান আর সাধাসাধির পালা চলতে থাকে বাসরঘরের সামনে। অবশেষে বাসন্তীর বিমুখ মন টলে। তিনি শিবের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে এগিয়ে আসেন। আর না-আসা ছাড়া যে উপায় নেই, শিব আর শিবসীমন্তিনী যে জন্মে জন্মে এক বন্ধনে বাঁধা। শিব আর বাসন্তী বিয়ের আসরে ঢোকেন। সেখানে শিবের চারপাশে সাতপাক ঘুরে গাঁটছড়া বেঁধে বাসন্তী শিবের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করেন, তাঁদের মালা বদল হয়, বাসন্তীকে শিবের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু করে তুলে ধরে 'বর বড় না কনে বড়, কনে বড়' করা হয়। শাঁখের তুমুল আওয়াজের ভেতরে তাঁদের বিয়ে সমাপ্ত হয়। রাত্তিরের আকাশে তখন ভোরের আলোর ছোপ ধরেছে। বাসন্তী বাসরঘর থেকে চলে যান গঙ্গাগর্ভে আর শিব চলে যান নিজের মন্দিরে।

লৌকিক উৎসব

শিব-শিবানীর বিয়েকে উপজীব্য করে ভারতের দক্ষিণ দেশে তামা প্রভৃতি ধাতুতে অপরূপ 'কল্যাণসুন্দর' মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। ইলোরা প্রভৃতি গুহাতে তাঁদের বিয়ের নানান দৃশ্য খোদিত

হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে শিব-পার্বতীর বিবাহ অনুষ্ঠানও কয়েকটি ধর্মকৃত্যে অংশত স্থান পেয়েছে দেখা যায়। এ সমস্ত ব্যাপার বেশি মাত্রায় পৌরাণিক অনুশাসনে শাসিত এবং তাদের 'আধ্যাত্মিক' তাৎপর্য মোটেই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু নবদ্বীপের শিবের বিয়ে তাদের থেকে একেবারে আলাদা। এই অনুষ্ঠানের অধিকাংশটুকুই লৌকিক। এই উৎসবের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা যাই থাকুক না কেন, সামাজিক দুঃখকষ্ট, রঙ্গরস, কৌতুক-প্রীতিই এর মূল প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য হয়ে ফুটে ওঠে এবং সেদিক থেকে এটিকে আর ধর্মকৃত্য বলে মনে হয় না, মনে হয় একটি প্রীতিপদ সামাজিক এবং লৌকিক কৃত্য।

আর একটি দিক থেকেও এই অনুষ্ঠানের লৌকিক বৈশিষ্ট্য খুব লক্ষণীয়। সেটি হল, বাঙালি সমাজের বিয়েতে গায়ে হলুদ, জল সইতে যাওয়া, ছাঁদনাতলায় স্ত্রী আচার, 'বর বড় না কনে বড়' বলে কনেকে বরের চাইতে উঁচু করে তুলে ধরা ইত্যাদি যে লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলো আছে এই অনুষ্ঠানে একমাত্র সেগুলোই উপস্থিত। কিন্তু গোত্রপ্রবর ইত্যাদির নামোল্লেখে কন্যা সম্প্রদানের ক্রিয়া, বৈদিক মন্ত্রপাঠে যজ্ঞকর্মানুষ্ঠান এসমস্ত অনুপস্থিত। বিয়ের বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্য আনুষ্ঠানিক অঙ্গ অনুপস্থিত বলেই নবদ্বীপের শিবের বিয়েতে অব্রাহ্মণ বিশেষত তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষদের পক্ষে দলে দলে এসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে—যেমনটি হচ্ছে শিবের গাজনের সময়। অবশ্য ব্রাহ্মণরাও এই উৎসবে সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সকলের মিলিত আনন্দে এটি প্রকৃত লোক-উৎসবে পরিণত হয়েছে।

শিব, দুর্গা, মনসা, ধর্মঠাকুর, শীতলা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি বাংলার দেবদেবীরা উঁচু স্তরের 'আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও ঐশ্বর্য' নিয়ে নয়, একেবারে খাঁটি সামাজিক সুখদুঃখ, হাসিকান্না, প্রেমবিরহ, মানঅভিমান, রঙ্গবিদ্রূপ, হিংসাপ্রীতি, দোষগুণ নিয়ে বাংলার লোকমানসে হাজির হয়ে অজস্র ফসল ফলিয়েছেন। সে অজস্র ফসল নানান ব্রত উৎসব পাঁচালি ছড়া গান মঙ্গলকাব্যে রূপ ধরেছে। নবদ্বীপের শিবের বিয়ে সেই বিচিত্র ফসলেরই আর এক রূপ।

শিবের নাচ

শিব নটরাজ। তাঁর তাণ্ডব নিয়ে প্রাচীন ভারত ভাস্কর্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, স্তুতিতে, কাব্যকলায় রূপময় হয়ে উঠেছিল। বাংলার প্রাচীন লোককাব্যও শিবনৃত্যরঙ্গে উচ্ছল। শিবনৃত্যের মহিমময় ভাবকল্পনা একালের কবি রবীন্দ্রনাথকেও কম উচ্ছ্বসিত করে তোলেনি। বিস্মৃত সুদূর অতীত কাল থেকে মহাকাল নেচে আসছেন চৈত্র মাসে ভক্তদের মাথায় চড়ে বাংলাদেশের গাজনে গাজনে। নবদ্বীপের শিবের গাজন তাঁর এমনি একটি নৃত্যোৎসব।

এই গাজন রাঢ়দেশে কেবলমাত্র চৈত্র মাসেই শেষ হল না, বৈশাখেও চলছে, জ্যৈষ্ঠেও চলবে। বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে দেখা যাবে, শুকনো, ফুটিফাটা রাঢ়দেশের খর গ্রীষ্মে গাজনের দেবতা স্নানে বেরিয়েছেন, ঢাকের কড়াং কড়াং বোলের সঙ্গে। এ গাজনের দেবতা অবশ্য শুধু শিবঠাকুর নন, ধর্মদেবতাও।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে শিবঠাকুরকে নিয়ে সকলে গাজনে মাতে। নবদ্বীপের গাজনেও তেমনই মাতুনি। অন্যান্য জায়গার মত এখানকার গাজনেরও চেহারাটা মোটামুটি একই রকমের। এখানেও সমাজের উঁচু থাকের চাইতে বেশি করে তলার থাকের মানুষই সক্রিয় অংশ নেয়। গেরুয়াপরা, গলায় কুশের সঙ্গে পাটা অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছ ধারণ করা, হবিষ্যান্ন করা, শিবের পুজো করা, ফুলকাড়ানো, শরীরের নানা স্থানে বাণফোঁড়া, কাঁটাতে, বঁটিতে, আগুনে ঝাঁপ খাওয়া, এ সমস্ত পরিচিত আচার-অনুষ্ঠান তো আছেই। কিন্তু এখানকার গাজনে শিবঠাকুরদের মন্দির থেকে বার করে তাঁদের মাথায় করে নিয়ে যে নাচের মিছিল বার হয়, সেটিই এখানকার সবচেয়ে বেশি দর্শনীয়। বাংলাদেশের আরও কয়েকটি গাঁয়ে শিবের কিংবা ধর্মের গাজনে ঠাকুরদের তামার পাত্র, পিঁড়ি কিংবা পালকিতে চাপিয়ে ভক্তদের নিয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু নবদ্বীপে নিশীথ রাত্রে শিবকে যে রকম ধুম করে সুসজ্জিত চর্তুদোলায় চড়িয়ে চতুর্দোলাশুদ্ধ নাচানো হয় ঢাক, কাঁসি, ডগরের সাথসঙ্গতে, আর সেই নটরাজ শিবের নাচের তালে তাল মিলিয়ে ভক্তরা যেমনভাবে নাচে এমনটি আর কোথাও চোখে পড়েনি। নবদ্বীপের লোকে বলে, "এ-গাজন মানুষের নাচ নয়, শিবের নাচ। বাবা কৈলাসপতি বিশ্বম্ভরকে কি কেউ নাচাতে পারে? বাবা যে নিজেই নাটের সঙ্গে নাচছেন, আর সবাইকে নাচাচ্ছেন।" গাজনের এই শিবনাচ দেখবার জন্যে সেখানে পড়ে যায় লোকের হুড়োহুড়ি, রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে লোক জমে। ঐ নাচে কেবল গাজনের সন্ন্যাসীরা নয়, যারা সন্ন্যাস নেয়নি, এমন শত শত মানুষও এসে নাচে। গভীর বিশ্বাস নিয়ে, তাদের বলতে শুনেছি, "গাজনে সন্ন্যাস নাও না-নাও, তাঁর গাজনে তাঁর সঙ্গে যদি নাচ, তবে দেহান্তে শিবভক্তরূপে কৈলাসে তোমার নিশ্চয়ই অনন্তকাল স্থিতি।" কে জানে, অমন স্থিতি হয় কিনা।

প্রাচীন শিবলিঙ্গ

নবদ্বীপে একটি আধটি শিব নয়, অনেকগুলি আছেন। 'বুড়োশিব', 'যোগনাথ', 'পাড়ডাঙ্গার শিব', 'মালোদের শিব', 'দণ্ডপাণি', 'বালকনাথ', 'এলানে', 'পলকনাথ' প্রভৃতি। এই সমস্ত শিবের অধিকাংশেরই খুব প্রাচীনতার প্রসিদ্ধি। অনেক পুরনো কিংবদন্তী এঁদের সঙ্গে জড়ানো, এঁদের কারও আকৃতি লম্বা নোড়ার মত, কারও আকৃতি গোলাকার মসৃণ প্রস্তরস্তূপের মত, কারও বা এবড়ো-খেবড়ো চাঙ্গড়ের মত। লম্বা নোড়ার মত দেখতে যাঁদের, গালা দিয়ে তাঁদের চোখ, মুখ, গোঁফ তৈরি করা। এই রকম কোনও কোনও লিঙ্গকে খাঁজকাটা পাথরের থামের ভগ্নাবশেষের মত দেখতে। আমার অনুমান, নবদ্বীপের এই লিঙ্গমূর্তিগুলি প্রাচীন গৃহমন্দিরাদির ভগ্নাংশ। নবদ্বীপের

পশ্চিমাংশ পাড়ভাঙ্গা, দক্ষিণপূর্বে পানশিলা, ভালুকাবিল, নবদ্বীপ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত স্বরূপগঞ্জের পথে সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মসাধনার কেন্দ্র, স্তূপ, বিহার প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা অনুমান করে চিন্তা করা যায় এগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহার, মন্দির প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত অংশ। বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর এগুলি প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ 'ধর্মের' রূপ নিয়েছিল। সেন আমলে নবব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবনে সেই 'ধর্ম' শিবে পরিণত হয়েছেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে অনেক প্রাচীন লিঙ্গ সম্বন্ধে নবযুগের এমন আলোচনার কথা শোনা যায়। নবদ্বীপের ওপরে কালে কালে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মমতের যে উত্তাল তরঙ্গ বয়ে গেছে, তার কথা বিচার করলে এই রূপান্তরের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা শক্ত।

নবদ্বীপের গাজন চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক পাঁচ দিন আগে থেকে শুরু হয়। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান অনুসারে ঐ পাঁচটি দিন ক্রমান্বয়ে পাঁচটি নামে অভিহিত; যথা 'সাতগাজন', 'ফুল', 'ফল', 'নীল' ও 'চড়ক'।

সাতগাজন

'সাতগাজন' নবদ্বীপের সাতটি শিবের স্নানোৎসব। সাতটি শিবই নন, তাঁদের প্রত্যেকের মন্দিরে আর অন্যান্য যে সমস্ত লিঙ্গ এবং তাঁদের বাহন ষাঁড় আছেন তাঁরাও স্নান করতে যান। এই স্নানযাত্রা বিকেল বেলা হয়। গাজনের সন্ন্যাসীরা মাথায় নতুন গামছা পেতে তার ওপরে ঠাকুরদের নিয়ে মন্দিব থেকে নাচতে নাচতে বেরোন। আর স্নানশেষে নাচতে নাচতে ঠাকুরদের নিয়ে মন্দিরে ফেরেন। সঙ্গে ঢাক আর কাঁসি বাজে তালে তালে। এ নাচটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমে এক পা ফেলে সামনে এগুতে হবে, আবার আর এক পা ফেলে পিছনে যেতে হবে। এইভাবে সন্ন্যাসীরা সাতটি মন্দির থেকে শিবঠাকুবদের মাথায় করে নিয়ে পোড়ামাতলায় এসে হাজির হন। পথে একবারও নাচ থামবে না। পোড়ামাতলাতে এসেও তাঁরা চক্রাকারে ঘুরবেন। এখন সেখানে বহু দোকানপাট বসে গেছে বলে স্থান সঙ্কুলান হয় না। আগেকার মত বিরাট চক্রাকার নাচের রূপটি আর তেমন খুলছে না, সংকীর্ণ জায়গায় নাচের সময় সকলে যেন জোট পাকিয়ে যান।

এখান থেকে সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে গঙ্গার ঘাটে যাবেন, শিবঠাকুরদের গঙ্গায় ডুবিয়ে স্নান করাবেন, তারপর ঘাটের ওপরে স্থাপন করে তাঁদের আবার ডাবের জল, দুধ, গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করাবেন, পুজো করবেন।

যোগনাথ কেবলমাত্র সাতগাজনেই নয়, এর আগের দিনটিতে এবং গাজনের মধ্যে আরও কয়েকদিন এইভাবে স্নান করতে যান।

এই দিন রাত্তিরে প্রতি মন্দিরের সামনে আর এক দফা নাচ আর তার সঙ্গে লাঠি খেলা হয়। আগে বেশ ভাল ভাল লাঠিয়াল ছিলেন। কৈবর্ত, বাগদি প্রভৃতি বাংলার বিখ্যাত বীর সম্প্রদায়ের লাঠিয়ালরা এসে এতে নামতেন। শুধু তাঁরাই নন, নবদ্বীপের কুলশীলমর্যাদাসম্পন্ন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানও এসে এতে যোগ দিতেন। এখন এতে আগেকার দিনের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট আর নেই। পারস্পরিক রেষারেষি, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, লাঠিখেলা এখন কলঙ্ককর, ভীতিপ্রদ মারপিটের রূপ নিচ্ছে—প্রাচীনদের মুখে এই অভিযোগ আমি শুনেছি।

নিশীথরাত্রির নৃত্যোৎসব

'ফুলের' দিনেই নবদ্বীপের প্রধান গাজন। শিবের মাথায় ফুলকাড়ানো, কাঁটাঝাঁপ প্রভৃতি এ সমস্ত অনুষ্ঠান তো আছেই, নিশীথরাত্রির নৃত্যোৎসব, মশাল পোড়ানো, 'শ্মশান-নাচানোই' এই দিনের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।

'বুড়োশিব', 'যোগনাথ', 'এলানে' প্রভৃতি শিবকে রুপোর মুখ পরিয়ে অলঙ্কারে সাজিয়ে সুসজ্জিত আলাদা আলাদা চতুর্দোলায় তুলে নিশীথরাত্রির নৃত্যোৎসব শুরু হয়। সবচেয়ে উঁচু আর বাহারে দেখতে হয় যোগনাথের 'নবরত্ন চতুর্দোলাটি'। তার নটি চুড়ো। রাংতা, শোলা, রঙিন কাপড়, পটুয়াদের আঁকা পট দিয়ে সাজানো এই বিশাল বিচিত্র চতুর্দোলা গ্যাসের আলোর ঝাড়ে ঝলমল করে। বুনো বাউরির দল এসে চর্তুদোলাগুলি বয়ে নিয়ে যায়। ঢাকের তালে তালে তারা নাচে আর শিবশুদ্ধ চতুর্দোলাকে নাচিয়ে নাচিয়ে মিছিলে চলে। নবদ্বীপের বুড়োশিব প্রভৃতিকে এই গাজন আর শিবের বিয়ের সময় ছাড়া আর কোনও সময় অব্রাহ্মণে ছুঁতে পারে না। গাজনের সময় কিন্তু তিনি নাচবেন ছত্রিশজাতের সঙ্গে। তাই ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সমাজের একেবারে নিচু জাতেরও মানুষ এসে এই উৎসবে যোগ দেবে, চতুর্দোলা বইবে, লাঠি খেলবে, দেবতার জয়ধ্বনি দেবে। শিবের তখন সত্যিকারের গণদেবতার রূপ ফুটে ওঠে।

এই নৃত্যোৎসবে রাস্তার চারধারে জ্বালানো হয় বিরাট মশাল। দশবারো হাত লম্বা বাঁশের গায়ে আইরি কাঠ অর্থাৎ শুকনো অড়হর গাছের বিরাট স্তূপ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এই মশাল তৈরি করা হয়। এই মশাল আগুনে ধরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলের সঙ্গে। একজায়গায় থামিয়ে রেখে এই মশাল পোড়ানো নিয়মবিরুদ্ধ।

শ্মশান নাচ

আর এই সঙ্গে নাচবে 'শ্মশান' অর্থাৎ একটি মৃতদেহ। 'শ্মশানচণ্ডাল' শ্মশান থেকে আনবে সে মৃতদেহ। যদি আস্ত মৃতদেহ না মেলে তবে শ্মশান থেকে অন্তত একটি কঙ্কালও সে সংগ্রহ করে আনবে। এই বছরের গাজনে আনা হয়েছিল অর্ধগলিত একটি শব। এই শবকে পুজো ক'রে সিঁদুর মাখিয়ে, ধুনো জ্বালিয়ে আগে যোগনাথের মন্দিরের সামনে আনা হয়। শ্মশানচণ্ডাল এই শবদেহকে দুহাতে তুলে ধরে নাচায় ঢাকের তালে তালে। এই-ই 'শ্মশান'-নাচ। এই শ্মশান ছাড়া যোগনাথ 'পঞ্চরত্নে' উঠবেন না, নৃত্যোৎসবে যাবেন না।

নবদ্বীপের নিশীথরাত্রির এই নৃত্যোৎসবে মিছিল এগোয় পোড়ামাতলার দিকে, চারধারে নাচে বিশালকায় মশালের তপ্ত অগ্নিশিখা, নাচে শ্মশানচণ্ডালের হাতে বীভৎস শব। লাঠি হাতে লাঠিয়াল নাচে, ঢাক কাঁধে ঢাকি, কাঁসি হাতে কাঁসাই। আর এদের সঙ্গে বাহকদের কাঁধে নাচে শিবের চতুর্দোলা। ডগর আর ঢাকের গুরু গুরু আওয়াজ ওঠে—কখনও ধীরমন্থর গতিতে কখনও খুব জলদে। সবারই নাচের তাল যেন ঢাকের তালেরই সঙ্গে বাঁধা। শিবের জয়ধ্বনিতে, লাঠিয়ালদের কোলাহলে, বোমার বিস্ফোরণে এই মিছিল ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

কালার্করুদ্রের পুজো

নবদ্বীপে বুড়োশিবের নীল পুজোও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেখানকার রাধিকা চতুষ্পাঠীর আচার্য শ্রীরমাপ্রসাদ পঞ্চতীর্থ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনেছি, সেখানে গৃহস্থবাড়ি থেকে বুড়োশিবের মন্দিরে নীলপুজো পাঠানোর পর্ব দিনের বেলার মধ্যেই সেরে ফেলা হয় এবং পুরোহিত প্রচলিত সাধারণ শিবমন্ত্রেই সে আগে পুজো করেন। কিন্তু এইদিন রাত্রে বুড়োশিবের মন্দিরে যে আর একটা নীলপুজো হয়, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। গৃহস্থদের পুজোর কোনও সুযোগ তখন নেই। আভিচারিক ক্রিয়াকর্মে পটু ব্রাহ্মণেরই ওপর রাত্রির ঐ পুজোর ভার দেওয়া হয়। তখন শিবকে মন্দিরের ভেতরে নয়, বাইরে চাতালের ওপরে এনে পুজো করা হয়। কালার্করুদ্রদেবের ধ্যানে শিবের ভৈরবরূপের পুজো তখন চলবে। ঐ ধ্যানের মন্ত্র :

ওঁ উদ্যম্মার্তণ্ডকোটিপ্রতিমতনুরুচিং সোমসূর্যাগ্নিনেত্রম্।
ওঁ বিদ্যুজ্জ্বালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজূট বর্দ্ধেন্দুখণ্ডম্।।
ঘণ্টাঙ্কুশভয়েষ্টান্যপিনিজকভুজৈবিভ্রতং ভীষণাঙ্গম্।
শ্রীমৎ কালার্করুদ্রং প্রণতভয়হরং সাট্টহাসং ভজামঃ।।

বরাহপুরাণ থেকে এই ধ্যানমন্ত্র গৃহীত। এর অর্থ—

"উদীয়মান কোটি সূর্যের মত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেহ কালার্করুদ্রদেবের। তাঁর তিনটি নয়নে চাঁদ, সূর্য আর আগুন জ্বলছে। বিদ্যুৎশিখার মত দীপ্ত তাঁর বিরাট জটাভার, তাতে চন্দ্রকলা সংলগ্ন। তাঁর চার হাতে ঘণ্টা, অঙ্কুশ, বর আর অভয়মুদ্রা। তিনি অট্টহাস্য করছেন।"

যম, সূর্য, রুদ্র এই তিন ভীষণোজ্জ্বল দেবতার নাম আর ভাবকল্পনায় কালার্করুদ্রের অর্চনা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিকল্পিত। এই পুজোতে পশুবলিদানের বিধি, তাই বুড়োশিবের এই নীলপুজোতে আগে ছাগবলিদান হত। বছর ১৪/১৫ এই বলিদান বন্ধ আছে।

এই নীলপুজোর রাত্রে নবদ্বীপের বাজারের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় যাঁরা 'তুরো' নামে পরিচিত, তাঁদের তরফ থেকে বুড়োশিবের কাছে পুজো আসে। ফলমূল, মিষ্টান্ন, পুষ্পোপচার প্রভৃতি মাটির শরায় রেখে, শরাগুলি বাঁশের লম্বা মই-এর ওপরে থরে থরে সাজিয়ে তুরোরা ঢাক বাজাতে বাজাতে সেই মই কাঁধে ক'রে বুড়োশিবের মন্দিরে নিয়ে আসেন।

নিশীথরাত্রে শবের পুজো, শব ও শিব নিয়ে নৃত্যোৎসব, নীলপুজোর রাত্রে কালার্করুদ্রের আরাধনা—এ সমস্ত তন্ত্রাচারেরই লক্ষণ।

দক্ষিণ ভারতের গাজন

বাংলাদেশের গাজনের মত দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপ উৎসবের প্রচলন আছে। মাদ্রাজের (বর্তমানে অন্ধ্র রাজ্যের) নেল্লোর জেলার কাণ্ডুকুর তালুকের অন্তর্গত পোকুরুতে উসুরাম্মা নামে গ্রামদেবীকে নিয়ে গাজন করা হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস এই গ্রাম্যদেবী গ্রামকে রক্ষা করেন সমস্ত অশুভ থেকে, তাঁরই শুভদৃষ্টিপাতে শস্যক্ষেত্র শস্যে ভরে যায়। এই কল্যাণী দেবী তাই কৃষক সমাজের খুব প্রিয়। এঁর পূজারী জাতিতে মেষপালক। এঁর নিত্যনৈমিত্তিক পুজো ছাড়া তিন বৎসর অন্তর পাঁচদিনব্যাপী উৎসব হয়। এই উৎসবের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান হচ্ছে, বাংলাদেশের গাজনের মত সকলে ঢাক, শিঙা প্রভৃতি বাজাতে বাজাতে গ্রাম প্রদক্ষিণ ও উদ্দাম নৃত্য; বাংলাদেশের শিবের কাহিনী, গান, সং সাজার মত মেষপালকদের পুরাণকাহিনীর অভিনয়, গান, আবৃত্তি মেষবলিদান প্রভৃতি। বাংলাদেশের গাজনের সময় নীল পুজোর দিনে মেয়েরা যেমন সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে, এই অনুষ্ঠানেও মেয়েরা একদিন সন্ধ্যা অবধি উপবাস করে তারপর পুজো দেয়। বাংলাদেশের বাণফোঁড়ার মত সেখানে সুতোশুদ্ধ ছুঁচ ফোঁড়া হয় ভক্তদের দেহে। সেখানে আগে চড়ক গাছের ওপরে বঁড়শিতে জীবন্ত মানুষ ও ছাগলকে বেঁধে ঘোরানোর রেওয়াজ ছিল। বাংলাদেশের মত সেখানেও ইংরেজ আমল থেকে এই জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় এখন চড়ক গাছে মানুষ আর ছাগলকে শুধু বেঁধে রাখা হয়। এই সম্বন্ধে Wilber Theodore Elmore-এর 'Dravidian Gods in Modern Hinduism', Gustav Oppert-এর 'The Original Inhabitants of India' প্রভৃতি গ্রন্থে, Henry Whitehead-এর রচনায় এবং মাদ্রাজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুরনো গেজেটিয়ার প্রভৃতিতে বিস্তৃত তথ্য আছে।

জাত ও জাতারা

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে শিব, ধর্ম প্রভৃতি গ্রামদেবতাদের 'জাত' অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ

ভারতেও বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামের রোগশান্তির কামনায় সেখানকার শীতলা দেবী পোলেরাম্মাকে স্নান করিয়ে, মাথায় নিয়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেবীর পুজো সংগ্রহ করা হয়, শেষে মেষ, ছাগ প্রভৃতি বলি দিয়ে পুজো শেষ করা হয়। দ্রাবিড় ভাষায় এর নাম 'জাতারা'। বাংলাদেশের 'জাত' আর দ্রাবিড়ভাষীদের 'জাতারা'—কথা দুটির মধ্যে অনুষ্ঠান এবং নামে কত সাদৃশ্য!

বাংলাদেশেরই মত দ্রাবিড়ভাষী দেশের গ্রামের মাঠে ঘাটে, গাছতলায়, মন্দিরে অসংখ্য অনির্দিষ্ট আকৃতির এবড়ো-খেবড়ো পাথর গ্রামদেবতারূপে পুজো পায়। ওরা মাতৃপরতন্ত্রী জাতি বলে ঐ গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই দেবী অথবা শক্তি। আর সমাজের নিচু থাকের মানুষরাই ওদের পুজো করে, তবে ব্রাহ্মণরাও এই শক্তিদের রীতিমত ভয় ও শ্রদ্ধা করেন এবং কোনও কোনও স্থানে তাঁরাও ঐ সমস্ত দেবীকে নিয়ে লোকোৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু এই ধর্মচর্যায় নয়, সংস্কৃতির আরও অনেক অঙ্গেও বাংলা আর সুদূর দক্ষিণ ভারতেব মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। ভারতে নিগ্রোবটু, আদি অস্ত্রাল, ভূমধ্যসাগরীয় প্রভৃতি প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বিচরণপথের মধ্যে বাংলা ও দক্ষিণ ভারত অন্তর্ভুক্ত ছিল—নৃতত্ত্ববিদের এই বিচারে ঐ সাদৃশ্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

গাজনে আদিম কৃষিনির্ভর সমাজের সংস্কার

আদিম কৃষিনির্ভর সমাজের মানুষ জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধিসাধন, সুবর্ষণ প্রভৃতির কামনায় কত জাদু, মন্ত্রতন্ত্র, কৃচ্ছ্রতা সাধন, ব্রত-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। আজও তাদের সেই প্রাচীন রেশ কাটেনি। দক্ষিণ দেশের উসুরাম্মা, বাংলাদেশের শিবঠাকুর প্রভৃতিকে নিয়ে জাতারা, জাত, গাজনের অনুষ্ঠানে সেই দূরাগত আদিম কৃষিনির্ভর সমাজের সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপই যেন উঁকি মারছে। তাই বাংলাদেশে দারুণ গ্রীষ্মের দহনে জল যখন যায় শুকিয়ে, তৃণহীন দগ্ধ প্রান্তর ধু-ধু করে, তখনই হয় বাংলার গ্রামে গ্রামে গাজন। গাজনের ব্রতীরা তখন শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢালে, ছড়া পড়ে। সে কি বৃষ্টির কামনায় নয়? গাজনে মশাল জ্বেলে শিব আর শবদেহ নাচিয়ে শ্মশান-জাগানোর যে চেষ্টা চলে তাকে কি দগ্ধ তৃণহীন মৃত প্রান্তরের বুকে নবাঙ্কুরের প্রাণসঞ্জীবনের প্রাচীন চেষ্টা বললে ভুল হবে? যে প্রখর সূর্য পৃথিবীকে দগ্ধ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার তাপপ্রশমনের জন্যেই কালার্করুদ্ররূপে পুজোর প্রাচীন ব্যবস্থা—এই অনুমানের মূলে কি প্রবল যুক্তি নেই?

উলাইচণ্ডীর জাত

রাত থাকতে থাকতেই ওরা এসে হাজির হয়। বটগাছের তলায় মা উলাইচণ্ডীর থানে। বাঁধানো চাতালের ওপরে বেদী, তার ওপরে সিঁদুরমাখানো শিলাখণ্ড। বিশাল বটগাছ ডালপালার চাঁদোয়া খাটিয়ে রেখেছে মায়ের মাথার ওপরে। সেই চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে শুক্লপক্ষ রাত্রির খামচা খামচা জ্যোৎস্না এসে চাতালের ওপরে পড়ে থাকলেও চারপাশের ঝোপঝাড়ে আর ওপরে বটগাছের ডালপালায় রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। বটগাছের ডালে-ডালে পাখিদের বাসায় তখনও কারও ঘুম ভাঙেনি। এই আলো আঁধারি নিঝুম শেষরাতে ওরা নিঃশব্দেই আসে, বটগাছের তলায় উলাইচণ্ডীর বৈশাখী পূর্ণিমার জাত। সকাল হলেই সাতগাঁয়ের মানুষ আসবে আজ এখানে, মায়ের থানে পুজো দেবে, ছাগল, ভেড়া, পায়রা বলির মানত শোধ করবে। এই বটগাছের তলায় সারাদিন ধরে আজ চলবে ঢাক, ঢোল, ব্যাগপাইপ, ব্যান্ডের বাজনা।

ওরাও তো তখন আসতে পারত পুজো দিতে! কী দরকার ছিল রাত থাকতে থাকতে নিরিবিলিতে চুপিসাড়ে পুজো সারার! কিন্তু তখন যে উঁচু জাতের মানুষদের ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় আছে। ওরা যে জাতে 'হাড়ি', 'অস্পৃশ্য'! ছোঁয়াছুঁয়ির হাঙ্গামা এড়াবার জন্যেই তো ওদের রাত থাকতে থাকতে মা উলাইচণ্ডীর পুজো দিতে আসতে হয়। তখন দুদণ্ড মায়ের কাছে শান্তিতে নির্ভয়ে ওরা আসতে পারবে, মন খুলে মাকে ডাকতে পারবে!

হাড়ির ঝি চণ্ডী

আর মা উলাইচণ্ডী যে ওদের একান্ত আপনার জন, নাড়িছেঁড়া ধন—হোন না কেন উনি জগদীশ্বরী, জগজ্জননী। জগজ্জনে জানে—মা যে ওদেরই মেয়ে। ভূত-প্রেত-ডাইনি তাড়াতে, সাপের বিষ, বিছের বিষ ঝাড়াতে ওঝাগুণিনরা ধুলোপড়ায়, জলপড়ায়, মা মনসা, মা কামাখ্যা, মা চণ্ডীর দোহাই পাড়ে। "কার আজ্ঞে? হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে?"—মা চণ্ডীর দোহাই পাড়তে ওঝাগুণিনরা এ কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে না? ওদের বিশ্বাস আর গর্ব—মা হাড়িদেরই মেয়ে, হাড়িদেরই ঘরে মায়ের জন্ম; ওরাই মাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, মানুষ করেছে, আর দেবাদিদেব শিবঠাকুর তাঁকে বিয়ে করে ওদের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন; দীনদুঃখীর ঘরের মেয়ে দেবাদিদেবের ঘরণী; তিনি বিশ্বজনকে খাওয়াচ্ছেন, লালন করছেন বিশ্বজননী হয়ে! হাড়িদের ঘেন্না করলে কী হবে! হাড়িদেরই মেয়েকে সবাই মা বলে ডাকছে, ভয়ভক্তি ছেদ্দা করছে, বামুন-পুরুতে মন্ত্র পড়ছে, পুজো করছে! জাতের দিন ভক্তদের পুজোর উপচারে মা উলাইচণ্ডীর চাতাল ভরে, মানত শোধের বলির পাঁঠা, ভেড়া, পায়রার রক্তে মাটি ভাসে। হাড়ির ঝির এত আদর, হাড়িদের গরবে বুক ফুলবে না? মায়ের সঙ্গে হাড়িদের নাড়ির সম্পর্ক আছে বলেই না উঁচু জাতের মানুষরা ওদের এখানে এসে পুজো করবার অধিকার কেড়ে নিতে পারেনি।

শূকরবলির কিংবদন্তী

কী ওদের মন্ত্র, কী ওদের ধ্যান-স্তব, কী ওদের পুজোপদ্ধতি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেউ দেখতেও আসে না, ওরা কখন আসে, কখন পুজো সারে! নানান কাহিনী, কিংবদন্তী নানান লোকের মুখে ফেরে। কেউ বলে ওরা শুয়োর বলি দেয়, নারকেলের মালায় মদ রেখে মাকে উৎসর্গ করে। কেউ বলে ওরা পুরোহিত নিয়ে আসে—পতিত ব্রাহ্মণ। সেই পুরোহিতই ওদের পুজো নিবেদন

করে। সে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-নির্ধারিত মন্ত্রতন্ত্র, যথারীতি পুজোপদ্ধতি মেনে চলে, না, নিজেদের প্রাণের ভাষায়, ভক্তি শ্রদ্ধার সরল আবেগে নিজেদের ইচ্ছে আর রুচিমত অর্চনা করে যায়, কেউ তা বলতে পারে না। শুধু সকাল হলে দেখা যায় মা উলাইচণ্ডীর থানে বটগাছের তলায় পড়ে আছে পুজোর টাটকা ফুল, সিঁদুর, নিভে যাওয়া মাটির প্রদীপ, পুড়ে যাওয়া ধূপের ছাই। কখনও বা বাঁশের হাড়িকাঠ পোঁতা, মাটিতে রক্তের দাগ, শূকরবলির চিহ্ন হয়তো!

শ্রীমন্ত সওদাগরের পুজো

আর একদিক থেকে মা উলাইচণ্ডীর ওপর হাড়িদের মস্ত দাবি আছে বলে তারা মনে করে। তারা বলে তারাই নাকি মাকে উলুবন থেকে বার করেছে। সে কাহিনী বর্ণনা করতে তারা শোনাবে শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনী নিজেদের রংঢং, কল্পনা খানিকটা মিশিয়ে। উজানি নগর থেকে সপ্তডিঙা মধুকরে নবলক্ষ বাণিজ্যের বেসাত নিয়ে শ্রীমন্ত যাচ্ছিলেন দক্ষিণের পাটন সিংহলের দিকে। পথিমধ্যে মায়ের এই থানের সামনে গঙ্গা বেয়ে যাবার সময় তিনি নাকি তীরে নেমেছিলেন বিশ্রাম করতে। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা, সাধু-সওদাগরের উপাস্যা দেবী গন্ধেশ্বরীর পুজোর দিন। এমন সময় গঙ্গায় উঠল ভীষণ ঝড়তুফান। সপ্তডিঙার পাকা কাণ্ডারী বাণিজ্যের বেসাতভরা সপ্তডিঙা বুঝি সামলে রাখতে আর পারবে না! ঢেউ-এর বাড়িতে মাঝিমাল্লার হাতের কোরোয়াল বুঝি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে! ঝলকে ঝলকে গঙ্গার জল সপ্তডিঙার গলুই-এর ভেতর আছড়ে পড়ে তাদের পাতালে এই টেনে নিয়ে গেল বুঝি! তীরের ওপরে শ্রীমন্ত সাধু হাতজোড় করে মা চণ্ডীকে ডাকছেন। ডিঙির নোঙরের একটা পাথর খুলে নিয়ে তিনি তাতে মা চণ্ডীর পুজো করলেন। মায়ের দয়ায় ঝড় জল থেমে গেল। আবার শ্রীমন্ত সাধুর সপ্তডিঙা মধুকর রাজহংসের মত বুক ফুলিয়ে গঙ্গার ওপর দিয়ে তর তর করে বেয়ে গেল। সাধু চলে যাবার পর হাড়িরাই তো এখানে এসে উলুবনের ভেতর থেকে মায়ের এই শিলামূর্তি বার করেছে। উলুবন থেকে তিনি বেরোলেন, তাই তাঁর নাম হল উলাইচণ্ডী। অতএব মায়ের ওপর তাদের মস্ত দাবি তো থাকবেই। শ্রীমন্ত সওদাগরের পুজো থেকেই বৈশাখী পূর্ণিমাতে দেবী গন্ধেশ্বরীর পুজোর দিন মা উলাইচণ্ডীর জাত হয়। এই জাতের দিন সবার পুজোর আরম্ভ হবার আগে মা উলাইচণ্ডী আগে হাড়িদের হাত থেকে পুজো নেবেন, তারপরে অন্যদের পুজো, হাড়িরা গরব করে একথা বলে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্ত সদাগরের উলাতে চণ্ডী পুজোর কোনও কাহিনী না থাকলেও তিনি যে এখান দিয়ে বাণিজ্যতরী ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে। উলার পাশে ডাকাতের খাল, বারমেসে খাল নামে যে প্রাচীন গভীর জলাভূমি আছে, সেগুলি ভাগীরথীর প্রাচীন খাত বলে অনেকে মনে করেন।

ডাকাত ধরায় উলার নাম পরিবর্তন

আঠারো শতকের শেষভাগে এ অঞ্চলে ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব ছিল। ডাকাতের খাল নামটিতে তারই যেন ইঙ্গিত আছে। উলার অধিবাসীরা কয়েকজন ডাকসাইটে ডাকাত ধরে তখনকার ইংরেজ শাসকদের দারুণ মাথাব্যথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে তাঁরা উলাবাসীর বীরত্বের জন্যে 'উলা' নামটি পালটিয়ে 'বীরনগর' নাম রাখেন। নদীয়ার পুরনো ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত ১৮০০ সালে তদানীন্তন রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী জে লামস্‌ডেন সাহেবের লেখা একখানা লম্বা চিঠিতে এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

উলা-বীরনগরের গ্রামদেবী উলাইচণ্ডীর বৈশাখী পূর্ণিমার জাত বা যাত্রা ঐ অঞ্চলের খুব

পুরনো, প্রসিদ্ধ লোক উৎসব। কলকাতা থেকে রেলপথে ৫১ মাইল দূরে চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত নদীয়া জেলার এই প্রাচীন গ্রামটির এই উৎসবে আজও বিপুল জনসমাগম হয়।

নদীয়া জেলার তো বটেই, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ এসে হাজির হয় উলাইচণ্ডীতলায়। সারাদিন সেখানে উলাইচণ্ডীর শিলামূর্তির পুজো হয়। বহু পাঁঠাবলি পড়ে, দুলে-বাগদিরা পায়রাবলিও দেয়। মোষবলি এখন বন্ধ। শূকরবলিও প্রায়শ বন্ধ। ছাগল-ভেড়ার বলির সংখ্যাও অনেক কমছে। আগে যেখানে কমসে কম পাঁচ-ছশো ছাগল-ভেড়া বলি পড়ত সারাদিনে, এখন সেখানে তার সংখ্যা দেড়শোতে ওঠে কিনা সন্দেহ। মানুষের আর্থিক দুরবস্থাই এর মুখ্য কারণ নিশ্চয়ই, তার ওপর রুচি বদলেরও প্রশ্ন আছে।

উলার বারোয়ারি পুজো

উলাইচণ্ডীর এই জাত উপলক্ষে উলাতে দুটি প্রাচীন বারোয়ারি পুজোও হয় তিন দিন ধরে, উত্তরপাড়াতে হয় বিন্ধ্যবাসিনী আর দক্ষিণপাড়াতে হয় মহিষমর্দিনীর পুজো। বিশাল প্রতিমা—দশ বারো হাত উঁচু। বারোয়ারির পুরনো পাকা মণ্ডপে পুজো হয়। এতে বিপুল জনসমাগম হয়। যাত্রায়, থিয়েটারে, ঢপকীর্তনে, দোকানপাটে এই বার্ষিক উৎসব জমজমাট হয়ে ওঠে। উলার ঘরে ঘরে তখন আত্মীয়স্বজনের সমাগম হয়। যেমনটি হয় দুর্গা পুজোর সময়ে। আগেকার দিনে এই উৎসবে বাইরে থেকে যারা আসত তাদের নাকি উলাবাসীরা জোর করে নিজেদের বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে সাদরে খাওয়াতেন; কাউকে নিজেদের রাঁধতে বাড়তে দেখলে তাদের হাঁড়িকুড়ি নাকি ভেঙে দেওয়া হত—উলার অধিবাসীরা সগৌরবে একথা আজও স্মরণ করেন।

১৮৭৫ সালে হান্টার সাহেবের লেখা বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে উলার বৈশাখী পূর্ণিমার জাতের বিবরণ আছে। এই জাতে প্রায় ১০ হাজারের মত লোক সমাগম, মহা ধুমধামে বারোয়ারি পুজো দুটির অনুষ্ঠান, উলাবাসীর অতিথি সৎকারের কথা তিনি লিখে গেছেন।

উলার খ্যাতি খুব প্রাচীন কাল থেকেই। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে উলা থেকে বেশ আয়ের উল্লেখ আছে। এখানকার খুব পুরনো কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ, দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন কায়স্থ মিত্র-মুস্তৌফিদের বংশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও বিপুল ধন, সম্পত্তি, বিদ্যা, মান, দান, ধ্যান, প্রভাব, প্রতিপত্তির খ্যাতি ছিল। এঁদের সকলের ঐশ্বর্যে উলা প্রাচীন কাল থেকে সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ জনপদে পরিণত হয়েছিল। বিচিত্র গঠনের শিল্প-শোভাময় বহু মন্দির, প্রাসাদ, দীঘিতে, অধিকাংশ বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব-জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে উলা জমজমাট হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সাল থেকে ম্যালেরিয়া মহামারী, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ এই বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী জনপদকে যেন একেবারে নিংড়ে শুষে তার ছিবড়েটুকু মাত্র ফেলে রেখেছে।

জমিদারি শাসনব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিরাট মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কালক্রমে ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে এগোতে এগোতে একেবারে ধ্বংসের মুখে গিয়ে ঠেকেছে। আজ সেখানকার অগণ্য ভাঙা-মন্দিরে, বাড়ির ধ্বংসস্তূপে, পুরনো গড়ের খাতে, মজে যাওয়া, ভরাট হওয়া শুকনো দীঘিতে বিগত ঐশ্বর্যের স্মৃতি যেন ছড়ানো। এই ভাঙা হাটে এখনও প্রতি বছরে বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাইচণ্ডীর জাত হচ্ছে।

হাড়িদের পুজোর অগ্রাধিকার

উলাইচণ্ডীর জাতে আজও রাত থাকতে থাকতে হাড়িদের পুজো হয়। এই তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যদের পুজোর অগ্রাধিকারকে কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। নদীয়ার রাজাদের নামে পুজো হয়।

তারপর তিন মহলের পুজোর পর উলাইচণ্ডী সর্বসাধারণের পুজো নেবেন—এই-ই হচ্ছে এখানকার রেওয়াজ।

বর্ণাশ্রমধর্মশাসিত হিন্দুসমাজের মধ্যে যারা তথাকথিত অস্পৃশ্য অপাঙ্‌ক্তেয়, একেবারে নিচের থাকের জনগোষ্ঠী, তাদের অনেক দেবদেবী, ধর্মচর্যা, সংস্কৃতি কালক্রমে ওপরের থাকের জনগোষ্ঠীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজের স্বীকৃতি, সম্মান, পুজো পাচ্ছে। এ তথ্য নৃতাত্ত্বিক, সমাজ-বিজ্ঞানী গবেষকদের সন্ধানী চোখে ধরা পড়েছে। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ্য তথা আর্য আর অনার্য সংস্কৃতি অনেক সংঘাত, সমন্বয় এবং সমীকরণের পর হিন্দু ধর্মের বর্তমান বিশাল বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। হিন্দু সংস্কৃতির সেই বিচিত্র সংঘাত ও সমন্বয়ের রূপ বাংলাদেশেও সুস্পষ্ট। উলার উলাইচণ্ডীর জাত এমনই সংঘাত-সমন্বয়ে গড়া একটি উৎসব।

বাংলাদেশে আর্যীকরণ শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত আমলে। তার আগে এখানকার আদিম অধিবাসীরা—নিগ্রোবটু, আদি অস্ত্রাল, ভূমধ্যসাগরীয়, মোঙ্গলাকার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের মানবগোষ্ঠী নিজেদের আচার-আচরণ, সংস্কার, ধর্মচর্যাকে পারস্পরিক সংঘাত-সমন্বয়ের পথে গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে প্রবল শক্তিশালী আর্য তথা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। এবং তাকেও সংঘাত, সমন্বয়, সমীকরণের পথে এখানকার পুরনো সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এইভাবেই বাংলার পুরনো অনেক দেব-দেবী, ধর্ম-সংস্কার, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়েছে, যদিও তাদের সেই পুরনো লোকায়ত সহজ, সরল চেহারাকে ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শে পরিণত দার্শনিক চিন্তাধারায় আর উঁচু আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে নতুন অঙ্গরাগ করা হয়েছে। কিন্তু এই নতুন অঙ্গরাগ অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীনদের আদিম স্বরূপকে সম্পূর্ণ ঢাকা দিতে পারেনি, সে বেরিয়ে পড়ে নানান সূত্রে। এর স্পষ্ট উদাহরণ চণ্ডী দেবী। শাস্ত্রীয় ধ্যান-মন্ত্রে, পুজোপদ্ধতিতে এবং ব্রাহ্মণেরই পৌরোহিত্যে এঁর অর্চনা প্রচলিত।

চাণ্ডী ও চণ্ডীর সৌসাদৃশ্য

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকা পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, দেবী ভাগবত প্রভৃতি কয়েকখানি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণ ও উপপুরাণ ছাড়া না বেদে, না রামায়ণ, মহাভারতে, না বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণের কোথাও চণ্ডীদেবীর নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আর্য-পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কৃতি থেকে এঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। আরণ্য শবর বা ব্যাধ সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড়ভাষী ওরাওঁ জাতির উপাস্যা দেবী, এবড়ো-খেবড়ো আকৃতির শিলারূপময়ী চাণ্ডী দেবীর মধ্যে হিন্দু সমাজের চণ্ডী দেবীর উদ্ভবসূত্রের সন্ধান ঐ বিশেষজ্ঞরা পেয়েছেন বলে মনে করেন। চাণ্ডী আর চণ্ডী উভয়ের নাম আর আকৃতির মধ্যেই শুধু সৌসাদৃশ্য নয়, (বাংলার বহু গ্রামে পূজিত চণ্ডীদেবীর এবং বীরনগরের উলাইচণ্ডীরও আকৃতি এবড়ো-খেবড়ো শিলাখণ্ডের মত) উভয়ের সঙ্গে তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ব্যাধ জাতির নিকট সম্পর্কও তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। শিকারজীবী ওরাওঁদের বিশ্বাস চাণ্ডী দেবীর প্রসাদেই তাদের ভাল শিকার জুটবে। তাই আদিম প্রথায় তারা চাণ্ডীর পুজো আজও করে শিকারে বেরোবার আগে। আর চণ্ডী দেবীকে নিয়ে রচিত বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলেও দেখি ব্যাধ কালকেতু, বনের পশুসমাজই চণ্ডী দেবীর অন্যতম প্রধান পূজারী, এই দেবীরই প্রসাদে কালকেতু বিপুল ধনজন বিশাল রাজ্যের রাজা হয়েছে। শূকর বলি দিয়ে হাড়ি-ডোম প্রভৃতি জাতের লোকদের চণ্ডীপুজোতে দেবীর আদিম উদ্ভব স্তরেরই ইঙ্গিত যেন ব্যক্ত হচ্ছে। বীরনগরের উলাইচণ্ডীর জাতে সবার আগে হাড়িদের পুজো এবং তাদের শূকর বলিদানের প্রথা, ওঝা-গুনিনদের 'হাড়ির ঝি চণ্ডী' বলা প্রভৃতি থেকে তথাকথিত অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ জাতির সঙ্গে দেবীর আদিম সম্পর্কই যেন ব্যক্ত হচ্ছে।

গঙ্গা ও চণ্ডীর ঝগড়া

অমেধ্য শূকরমাংস যে চণ্ডীদেবীর খুব প্রিয় নৈবেদ্য তা স্বয়ং কবিকঙ্কণই গঙ্গা দেবী আর চণ্ডী দেবীর মধ্যে ঝগড়ার সময় গঙ্গা দেবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

"ছাগল মহিষ মেষ খেয়ে কৈলা অবশেষ
নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।"

শুধু তাই নয়, মহিষাসুর বধের সময় তাঁর 'মধুপানের' ব্যাপারটিরও ওপর গঙ্গা দেবী কটাক্ষ করতে ছাড়েননি :

স্ত্রী হয়ে করিলা রণ মারিলা অসুরগণ
সময়ে করিলা পান সুরা।।"

কালিকাপুরাণে শূকরবলির প্রশংসা

দেবীর শূকরপ্রীতির কথা কালিকাপুরাণেও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে চণ্ডিকার বিভিন্ন প্রিয় বলির বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ন-রকম পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে শূকরের নাম আছে। আর বলির শূকররক্ত দেবীকে উৎসর্গ করলে তাঁর বারো বৎসর যাবৎ তৃপ্তি হয় বলে এই গ্রন্থেরই বলিদান পদ্ধতিতে প্রশংসা করা হয়েছে।

তথাকথিত অস্পৃশ্য, অপাঙ্‌ক্তেয়, ব্রাত্যদের উপাসিত এই দেবীকে আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। তিনি সেখানে সনাতনী, ব্রহ্মময়ী, জন্মজরামৃত্যুহীনা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রসবিত্রী, বিশ্বজীবস্বরূপিণী, বিশ্বজননী, বিশ্বধাত্রী, আদ্যাশক্তি পরমা মায়াতে রূপান্তরিতা। প্রাচীন মাতৃপরতন্ত্র মানবগোষ্ঠীর তন্ত্রসাধনা, বিভিন্ন বৌদ্ধ যানের ভাবকল্পনা, যোগ ভক্তি ও অন্যান্য ধর্মাচার সে শক্তিসাধনাকে নানা মত, পথ, সংস্কৃতির সাধিত-সমন্বয়, সমীকৃত, বিচিত্র, চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে। দেবীর আদিম জনজীবনের স্তর থেকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্তরে উঠে আসার সময় আদিম স্তরের অনেক আচার-অনুষ্ঠানও তাঁব সঙ্গে এসেছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্তর দেবীর সঙ্গে তাদেরও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। ঐ স্বীকৃতি দানের সময় আদিম তাৎপর্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নতুন তাৎপর্যে যুক্ত করারও কম চেষ্টা চলেনি। কালিকাপুরাণে শূকরবলির প্রশংসা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

বল, বল, কে তুমি ছলনাময়ী?

আগুনের মত এক গা রূপ নিয়ে পদ্মভরা ধামাচে দীঘির স্নানের ঘাটে কালো জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে মেয়েটি। বিশাল দীঘির নির্জন ঘাটে সে একা স্নানার্থিনী। শাঁখার পশরা নিয়ে ভিনগাঁয়ের এক শাঁখারী যাচ্ছে ক্ষীরগাঁয়ের দিকে—ধামাচে দীঘির পাড় ধরে। শাঁখারীকে ডাকে সে অপরূপা মেয়ে। শাঁখার পশরা ঘেঁটে বেছে নেয় একজোড়া— কারুকর্মান্বিত মনোরম শাঁখা।

"নাম কী গো? এ শাঁখার নাম কি?"—মধুকণ্ঠে শুধালো মেয়ে।

এ শাঁখার নাম 'শ্রীরাম'। শাঁখার গুণও শাঁখারী ব্যাখ্যান করে। এ শাঁখা শ্রীরামের মত শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, গুণেও। শ্রীরামের বাণেরই মত বজ্রকঠোর অক্ষয় শাঁখা। এ শাঁখা যে রমণীর হাতে থাকে সে হয় চিরদিন পতিসোহাগিনী, চিরদিন সিন্দুরসীমন্তিনী, চিরদিন সৌভাগ্যবতী।

দরদস্তুর শেষে শাঁখা পরবার জন্যে মেয়ে শাঁখারীর সামনে বাড়িয়ে দেয় তার হাত—নরম, সুডৌল, মৃণালের মত শাদা।

> শঙ্খ পরাইতে বেণে ভাবে মনে মনে।
> নবনী কোমল হাতে পরাব কেমনে।।
> শঙ্খ পরিতে ও হাত যদি ব্যথা পাবে।
> মোর মর্মে শেল বিন্ধে কহন না যাবে।।

অনেক ভেবে চিন্তে মেয়ের 'স্নান তৈলের পাত্র' থেকে তেল খানিকটা চেয়ে নিলে শাঁখারী। মেয়ের হাতে তেল মাখিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাঁখা পরাবে সে। সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করে শাঁখারী মেয়ের সামনে বসে তার হাত দুটি নিজের মুঠিতে ধরতেই শিউরে ওঠে। এ কী? এ যে

> ......হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম গন্ধ গায়।
> হাতে তৈল শঙ্খবেণে ভয়ে চমকায়।।

পদ্মবনবিহারিণী পদ্মগন্ধা রাজরাজেশ্বরী? "বল, বল, মা, তুমি কোন ছলনাময়ী মায়াবিনী? এই সামান্য দীনদুঃখী শাঁখারীকে কেন তুমি ছলনা করছ?"

ত্রস্ত শাঁখারীর ব্যাকুল প্রশ্নে খিল খিল করে হেসে ওঠে পদ্মনয়না রঙ্গময়ী। সে হাসির শব্দ যেন বিশাল নিথর ধামাচে দীঘির বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দূর প্রান্তে চলে যাচ্ছে। শাঁখারীর বুকের ভেতরও গুরগুর করছে।

শাঁখারীকে অভয় দিতে রঙ্গময়ী মুখের ভাব পালটিয়ে নেয় এক নিমেষে। বিষণ্ণকরুণ মুখে আত্মপরিচয় দেয় : "না না, আমি রাজরাজেশ্বরী নই গো! আমি এক ছারকপালী দুঃখিনী। এই দীঘির পদ্মবনের কাছে অনেকক্ষণ বসে আছি কিনা, তাই আমার সর্ব অঙ্গে পদ্মের গন্ধ লেগেছে।"

> "শুন বাছা শাঁখারী পরিচয় দি।
> পূজারী বামুন আছে আমি তার ঝি।।
> ব্রাহ্মণের কন্যা আমি নাম ভগবতী।
> পাগল আমার স্বামী দ্বন্দ্ব দিবারাতি।
> দুই পুত্র লৈয়া আমি আছি বাপঘরে।
> দরিদ্র আমার স্বামী অন্ন দিতে নারে।।"

নামে ভগবতী, রূপেও ভগবতী! আহা এমন রূপবতী, আর এমন তার কপাল! ভগবতীর দুঃখে বিগলিত শাঁখারী। যত্ন করে ভগবতীর হাতে 'শ্রীরাম'-শাঁখা পরিয়ে দেয় সে।

মরি মরি কি মাধুরী অতি মনলোভা।
সোনার বরণ হাতে চন্দ্রকলা শোভা।।

মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকে শাঁখারী সেই হাত দুটির পানে।

"দাম? দাম দেবে তো ওগো ভগবতী?"

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভগবতী দাম দেবে বৈকি। কিন্তু সে এখন ঘাটে নাইতে এসেছে, সঙ্গে তো কড়ি আনেনি। ক্ষীরগাঁয়ের দেবী যোগাদ্যার মন্দিরের দিকে চাঁপার কলির মত আঙুল তুলে ভগবতী বলে, ঐ মন্দিরের পূজারীই তার বাবা। মন্দিরের ভেতরে কুলঙ্গীতে ঝাঁপির ভেতরে ভগবতীর নিজের জমানো টাকা আছে—দরিদ্র রমণীর 'তিলে তিলে সঞ্চয়ের দুঃখের কড়ি।' সেখানে গেলেই শাঁখারীর দাম মিলবে ভগবতী বলে।

"এই কথা বল মোর পিতার নিকটে।
তব কন্যা শঙ্খ পরে ধামাচের ঘাটে।।
গম্ভীরের কোলঙ্গীতে পাঁচ তঙ্কা আছে।
শঙ্খ পরাইয়া টাকা লবে পিতার কাছে।।"

এর পরের কাহিনী প্রায় তিনশত বছর আগে লেখা ক্ষীরগাঁয়ের বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য বিদ্যারত্নের 'যোগাদ্যা বন্দনা' থেকেই উদ্ধৃত করছি :—

শঙ্খ পরায়ে বেণে করিল গমন।
দ্বিজের নিকট গিয়া দিলা দরশন।।
কি করহে দ্বিজবর গৃহেতে বসিয়া।
তোমার কন্যাকে এলাম শঙ্খ পরাইয়া।।
টাকা দিয়ে বিদায় কর বসে কর কি।
ধামাচের ঘাটে শঙ্খ পরিলা তোমার ঝি।।
ব্রাহ্মণ বলিছে বেণে আমি তোরে কই।
কার কন্যা শঙ্খ পরে মোর কন্যা নাই।।
বণিক বলিল ঠাকুর ক্ষমা দেহ মোরে।
পাঁচ তঙ্কা দেখ গিয়া গম্ভীর ভিতরে।।
এত শুনি দ্বিজবর দেখিবারে যায়।
গম্ভীরের কোলঙ্গাতে পাঁচ তঙ্কা পায়।।
বণিকের কথা দ্বিজ মনে বিচারিয়া।
টাকা পেয়ে বণিকের পায়ে ধরে গিয়া।।
শাঁখারী বলিল ঠাকুর পা ছেড়ে দাও।
কে শঙ্খ পরিল দ্বিজ সত্য করে কও।।
দ্বিজ বলে ওরে বণিক কি বলিব আর।
শতেক পুরুষ তোর হইল উদ্ধার।।
তোমার ভাগ্যের কথা কিবা ছিল লেখা।
যুগের যোগাদ্যা মাকে পরাইলি শাঁখা।।
মাথার পশরা বেণে ফেলে টান দিয়া।
চলিল ধামাচের ঘাট মা মা ফুকারিয়া।।
ব্রাহ্মণ বণিক দোঁহে উর্ধ্বমুখে ধায়।

ঘাটে নাহি কাহারেও দেখিবারে পায়।।
জোড়হস্তে ব্রাহ্মণ দেবীকে করে স্তুতি।
কৃপা করি দরশন দেহ ভগবতী।।
যদি দরশন মাগো না দিবে আমারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমার উপরে।
ব্রাহ্মণের বাক্যে দেবী বড় ভয় পায়।
জল হৈতে দুই বাই শঙ্খ যে দেখায়।।
বণিক বলিল আমি যতকাল জীব।
মহাপূজার দিনে শঙ্খ দুই বাই দিব।।
কালেতে আমার বংশে যে কেহ রহিবে।
পূজার দিবস শাঁখা স্বয়ং জোগাবে।।"

কাহিনীটি অজানা নয়। তবুও গত বৈশাখী সংক্রান্তিতে দেবী যোগাদ্যার 'মহাপূজার দিনে' ঐ ধামাচে দীঘিরই পাড়ে বসে একজন কুশলী কথকঠাকুরের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে তিনি যখন ঐ কাহিনী আমাকে শোনাতে লাগলেন, তখন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কথকতার ঢং-এ কখনও মিষ্টি গলায় গান গেয়ে, কখনও পাঁচালী পড়ার সুরে 'যোগাদ্যা বন্দনা' থেকে আবৃত্তি করে, কখনও বা আবেগভরা নাটকীয় বাচনভঙ্গিতে পরিপাটি ঘটনাবিন্যাসে তিনি সমস্ত কাহিনীটি বিবৃত করলেন। মনে হল কাহিনীটি যেন নতুন শুনলুম।

বিশাল, ধামাচে দীঘি

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার ভেতরে ক্ষীরগাঁ বা ক্ষীরগ্রামে দেবী যোগাদ্যার পীঠস্থান। এই গাঁয়েরই ক্ষীরদীঘির অল্প দূরে প্রাচীন বিশাল ধামাচে দীঘি। মানুষের অবহেলায় এই বিশাল দীঘি ক্রমশ ভরাট হয়ে আসছে, তবুও এখনও উত্তর দক্ষিণে লম্বায় প্রায় এক হাজার বিঘা। চওড়াতেও কম নয়। চারপাশের পাড় বেশ উঁচু। এখনও দীঘির যে বিশাল বিস্তৃতি, কালো টলটলে জলের যে শ্রী রয়েছে তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এই দীঘির পশ্চিম পাড়ের মাঝখানটা সবচেয়ে বেশি উঁচু, স্তূপাকৃতি—শাঁখারী ঘাট নামে পরিচিত। লোকে বলে এই ঘাটেই বসে নাকি দেবী যোগাদ্যা মানবীর বেশে শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পরেছিলেন, আর এই ঘাটেই দাঁড়ানো পূজারী আর শাঁখারীকে দেবী তাঁর শাঁখা পরা হাত দুটি দীঘির জল থেকে তুলে দেখিয়েছিলেন। এখানে নাকি তখন এক চমৎকার চাঁদনী ছিল। কালক্রমে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

জলমগ্ন মহিষমর্দিনী মূর্তির উত্থান

ক্ষীরগাঁয়ে দেবী যোগাদ্যার বৈশাখী সংক্রান্তির মেলা বর্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন উৎসব। কালো পাথরে তৈরি দেবীর একটি চমৎকার মহিষমর্দিনী মূর্তি সারা বছর ক্ষীরগাঁয়ের ক্ষীরদীঘির জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। বছরে আরও কয়েকদিন অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে হলেও একমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তির দিনেই পূর্ণ ২৪ ঘণ্টার জন্যে দেবীকে জল থেকে তুলে একটি মন্দিরে রাখা হয়। এর নাম 'উত্থান মন্দির'। বৈশাখী সংক্রান্তির দিনে সূর্যোদয়ের আগে ব্রাহ্মমুহূর্তেই আবার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই ২৪ ঘণ্টা ধরে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের নরনারী 'উত্থান মন্দিরে' গিয়ে দেবীর পাদস্পর্শ করে এবং সিঁদুর, লোহা ইত্যাদি পরিয়ে পুজো করার অধিকার পায়। সমবেত পুণ্যার্থীদের সিঁদুরে মহিষমর্দিনীর কালো পাথরের মূর্তি লাল হয়ে যায় আর তাঁর হাত লোহার বালায় ঢাকা পড়ে যায়।

শুধু বর্ধমান জেলা থেকে নয়, অন্যান্য জেলা থেকেও আসে হাজার হাজার পুণ্যার্থী, দেবীর উদ্দেশে শত শত পাঁঠা-ভেড়ার বলি চলতে থাকে, বিশাল ক্ষীরদীঘির পাড় গমগম করতে থাকে। ক্ষীরদীঘিরই পাড়ে ঘট স্থাপনা করে পুরোহিতদের দল দেবীর পুজো করেন এবং সেখানেই হাড়িকাঠ পুঁতে বলি দেওয়া হয়। 'উত্থান মন্দিরের' সামনে মোষবলিও পড়ে এবং তা দেখতে সেখানে দারুণ ভিড় জমে।

এই পুজো উপলক্ষে দোকানপাট বসে। নবদ্বীপ, কাটোয়া, কালনা, বর্ধমান, আসানসোল, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জায়গা থেকেও দোকানদাররা আসে খেলনা, পুতুল, ঘর-গেরস্থির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পশরা নিয়ে। তাঁবুর ভেতরে 'ডাইনামো'র সাহায্যে সিনেমা দেখানো হয়। নাগরদোলা ঘোরে, ম্যাজিকওলা ম্যাজিক দেখায়। বৈশাখী সংক্রান্তির একটি দিনের উৎসবে বর্ধমান জেলাব সুদূর উত্তর-পূর্ব প্রান্তবর্তী এই গণ্ডগ্রামটি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

বিচিত্র অনুষ্ঠান

দেবী যোগাদ্যার এই বার্ষিক মহাপূজা উপলক্ষে 'ক্ষীরকলস', 'হাললাঙ্গল', 'ময়ূর নাচ', 'ডোমচোয়াড়ি', 'মাসিপিসির ঝাঁপি পাঠানো' প্রভৃতি নানান বিচিত্র অনুষ্ঠানের কথা শুনেছি এবং দেখেছিও। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ বিভিন্ন জাতের মানুষের মিলিত সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানগুলির লৌকিকচরিত্র দেবী যোগাদ্যার বার্ষিক মহাপূজাকে একটি বিচিত্র লোক-উৎসবেরই রূপ দিয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এগুলি নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মাসিপিসির ঝাঁপি

"কালেতে আমার বংশে যে কেহ রহিবে। পূজার দিবস শাঁখা স্বয়ং যোগাবে।" দেবী যোগাদ্যার কাছে শাঁখারীর এই প্রতিজ্ঞাই 'মাসিপিসির ঝাঁপি পাঠানোর' বিচিত্র অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেছে। বৈশাখী সংক্রান্তির দিন বিকেল বেলায় ক্ষীরগাঁয়ের পাশের গাঁ গোবর্ধনপুর থেকে দেবীর কাছে তত্ত্ব আসে একটি ঝাঁপিতে ভরে। তারই নাম 'মাসিপিসির ঝাঁপি'। ঐ ঝাঁপির ভেতরে থাকে শাঁখা, সিঁদুর, আলতা, লোহা, শাড়ি। পারিষদের সঙ্গে একজন আচার্য আসেন এই ঝাঁপি নিয়ে। দেবীর জন্যে শাঁখা নিয়ে আচার্য আসছেন, অতএব তাঁর কি কম সম্মান! তাঁকে এবং তাঁর পারিষদকে পাইকের কাঁধে করে বয়ে আনা হয় ক্ষীরগ্রামের মন্দিরে। ঝাঁপি বাঁধা থাকে আচার্যের কাঁধে। তাঁর হাতে থাকে একখানি পাখা। তিনি বাতাস খেতে খেতে আসেন, গরমের দিনে পথশ্রম অপনোদন করতে। ঢাক বাজনার সঙ্গে বহু লোক নাচতে নাচতে আসে তাঁদের নিয়ে। ক্ষীরগ্রামে তাঁরা এসে পৌঁছলেই নারীরা হুলুধ্বনি দিয়ে তাঁদের সম্বর্ধনা করেন, মন্দিরের প্রধান সেবাইত এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন। আচার্য মন্দিরে ঢুকে মহিষমর্দিনীর হাতে শাঁখা পরিয়ে শাঁখারীর প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

এইদিন সকাল বেলায় কড়ুইগ্রাম থেকে পরলোকগত প্রসন্ন শাঁখারীর বংশধররাও এসে দেবীকে শাঁখা পরিয়ে যান। এঁরা বলেন, এঁরাই নাকি 'যোগাদ্যার বন্দনা' বর্ণিত আদি শঙ্খকার ভানু দত্তের বংশধর। ক্ষীরগ্রামের অধিবাসী নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, তিনি গোবর্ধনপুরে খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন—কোনও শাঁখারী এখন সেখানে বাস করেন না এবং আগেও কোন শাঁখারী সেখানে বাস করতেন কিনা, কেউ তা বলতে পারে না।

মেলায় 'বন্দনা' বিক্রি

যোগাদ্যার মানবীর রূপ ধরে ধামাচে দীঘির পাড়ে বসে শাঁখা পরার কাহিনী ক্ষীরগাঁয়ের মানুষ আজও স্মরণ করে খুব ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, আদরে। যোগাদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যে সমস্ত 'বন্দনা'

পয়ার ছন্দে রচিত হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত, সেগুলিতে দেবীর শাঁখা পরার বিস্তৃত কাহিনী বিবৃত আছে। ক্ষীরগ্রামে বৈশাখী সংক্রান্তির মেলায় আজও কয়েকটি 'বন্দনা' বিক্রি হয়। লোকে আগ্রহের সঙ্গে কিনে নিয়ে যায় সেগুলি—মেলার অন্যতম স্মারকচিহ্ন হিসেবে।

এই সমস্ত 'বন্দনা'র মধ্যে একটি ক্ষীরগ্রামের অধিবাসী বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য বিদ্যারত্নের বিরচিত বলে অভিহিত। অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হিসাব মতে, সেটি কিছু কম শ-তিনেক বছরের পুরনো। অবশ্য এর বর্তমান 'সংস্কৃত ও পরিবর্ধিত' রূপের জন্যে এর ভাষার প্রাচীনতা অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি ছাড়া শতাধিক বছরের পুরনো আরও কয়েকটা 'বন্দনার' কথা তাঁর কাছ থেকে জানা গেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের কোনও কোনও পুঁথিতে 'যোগাদ্যার বন্দনা' পাওয়া গেছে।

কেবলমাত্র গ্রামীণ গাথারচয়িতা কিংবা পল্লীগীতিকারদেরই নয়, এই কাহিনী আধুনিক যুগেও সুদূর ফ্রান্সে বিদুষী বাঙালী মহিলা কবি তরু দত্তের হৃদয়েও যে খুব সাড়া তুলেছিল, তার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন 'যোগাদ্যা উমা' নামে তাঁর মর্মস্পর্শী ইংরেজী কবিতাটিতে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সার্থক অনুবাদে সে কবিতা বাঙালি পাঠকসমাজের কাছে সুপরিচিত।

৬টি গ্রামে দেবীর শাঁখা পরার কাহিনী

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, পুরোহিত কিংবা সেবাইতের মেয়ের রূপ ধরে শাঁখারীর হাত থেকে দেবীর শাঁখা পরা আর তারপর সন্দেহভঞ্জনের জন্যে পুকুর থেকে তাঁব শাঁখাপরা হাত তুলে দেখানোর কাহিনী একমাত্র বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের অন্তত আরও পাঁচটি গ্রামে সেখানকার গ্রামদেবী ও একটি বিশেষ পুকুরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলার কল্যাণেশ্বরী দেবী, হুগলি জেলার সেনহাটিতে পুরনো পুকুর এবং বায়ড়াতে রঞ্জিত রায়ের দীঘি, এই দুটিতেই বিশালাক্ষী দেবী, বাঁকুড়া ছাতনায় বেলপুকুরে বাশুলী দেবী আর রায়পুর গ্রামের শাঁখারিয়া পুকুরে মহামায়া দেবী—এঁরা সকলেই ক্ষীরগাঁয়ের যোগাদ্যা দেবীর কিংবদন্তীরই মত জড়িত। একই কাহিনী কেন এতগুলি জায়গায় প্রচলিত, এদের মূল উৎসভূমি একটি না অনেকগুলি, এসব আজ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার।

অনুষ্ঠানের লৌকিক ভিত্তি

কিন্তু দেবীকে কেন্দ্র করে ঐ কাহিনী প্রচলিত হলেও এর উৎসভূমি বাস্তব, নিছক লৌকিক—এই অনুমানটিই যেন সহজে মনে আসে। হয়তো সুদূর অতীতে দীঘিতে স্নানার্থিনী গরিবের ঘরের এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে কোনও করুণার্দ্রহৃদয় শাঁখারী বিনামূল্যে শাঁখা পরিয়ে তৃপ্ত করেছিল। উত্তরকালে আশাতীত সুখসম্পদের অধিকারী হয়ে শাঁখারীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল—এ তার ঐ সুকৃতিরই ফল। কালক্রমে এই কাহিনী লোকপরম্পরায় প্রচারিত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। পরিণতিতে দেখা গেল : ঐ মেয়েটি অন্তর্ধান করেছে, তার স্থান দেবী এসে অধিকার করেছেন। সেযুগে এবং সেই পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থায় মানুষের মনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা সর্বদা বজায় রাখার সমস্যা ছিল না। আর একথাও মনে রাখতে হয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সংঘাতের যুগে নানান দিক থেকে বঞ্চিত, পীড়িত, শোষিত, ব্যর্থ মানুষ জীবনের কামনা পূরণের বাঁকা পথ খুঁজেছে অলৌকিক ভাবনায়, দৈবকেন্দ্রিক কল্পনায়, তদুপযুক্ত অনুষ্ঠানে। অবশ্য এদের ওপরে পরিণত দার্শনিক চিন্তাধারা, উন্নতস্তরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও কালক্রমে এসে পড়েছে অনেকখানি। তবুও সমাজবিজ্ঞানের সন্ধানী চোখের বিচারে এদের লৌকিক মূল ভিত্তিভূমিকে অনেকখানি ধরতে পারা যায়।

একটি লাবণ্যের ফুল

চমকে উঠতে হয়, মন্দিরের সামনে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে, মানুষের মাথাগুলো ডিঙিয়ে দৃষ্টি যখন গিয়ে পৌঁছয় সেই কালো পাষাণ-প্রতিমার ওপরে। এ তো মামুলি দেবীমূর্তি নয়! এ যে লাবণ্যের ফুল। অপরূপকান্তিময়ী! কালো কষ্টিপাথরের বুকে হাতুড়ির ঘায়ে ছেনির মুখে অসামান্য শিল্পীর হাতে ফোটানো রূপসরোবরের শতদল—সজীব, কোমল, কমনীয়। পাথরের কর্কশ কাঠিন্য লাবণ্যের স্রোতে গলে রূপময়ী মহিষমর্দিনীর মূর্তি ধরেছে।

সেই অপরূপা দশভুজা মহিষমর্দিনীর সুদীর্ঘ দেহ সুডৌল, অতি সুকুমার কিন্তু কী শক্তিগর্ভ! আলীঢ় ভঙ্গিতে অর্থাৎ দক্ষিণ চরণ প্রসারিত করে দেবী দাঁড়িয়ে আছেন—প্রসারিত দক্ষিণ চরণ সিংহের পিঠে ন্যস্ত; বাম চরণ সঙ্কুচিত, ছিন্নশির মহিষের পিঠে স্থাপিত। উঁচুতে উঠে গেছে দক্ষিণের একটি হাত, তাতে উদ্যত ভীমখড়গ। আর ঠিক সেই ছন্দেই নিচে নেমে এসেছে একখানি বাম হাত, তার বজ্রমুষ্টিতে অসুরের ঝুঁটি ধরা। দেহকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়েছে, দীপ্ত গতিবিভঙ্গে প্রাণময় করে তুলেছে—ত্রিভঙ্গ অঙ্গসংস্থান, দশটি হাতের ললিত বিন্যাস, লীলায়িত করাঙ্গুলি, দক্ষিণে ঈষৎ বিনত জটামুকুটিত শ্রীময় সুডৌল মুখখানি। ধনুকের মত বাঁকানো ভুরুর তলায় মণি আঁকা দীর্ঘ চোখে দেবী কী অপরূপ রূপময়ী, সুনয়না, মনোরমা। দৃষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়। কোমল স্নিগ্ধ আবেশময়। আর আলোছায়া খেলানো ঠোঁটের বিচিত্র বাঁকে উজ্জ্বল হাসির একটি রেখা। কারুকর্মান্বিত কুচবন্ধনীতে ঢাকা মণিমালায় অলঙ্কৃত যৌবনশ্রীময় বুক আর সেই উজ্জ্বল স্মিত মুখের মাঝখানে সৌন্দর্যের সেতুবন্ধ রচনা করেছে শাঁখের মত ত্রিবলিসুন্দর সুগঠিত কণ্ঠ। জটামুকুটে বাঁধা চন্দ্রকলা। কানে, বাহুতে, মণিবন্ধে, বুকে, ক্ষীণ কটিতটে, চরণে আভরণের সূক্ষ্ম পারিপাট্যে রমণীয় মূর্তিখানি।

ছিন্নমুণ্ড মহিষের গলা থেকে বেরিয়ে আসা অসুর কী প্রাণপণেই না চেষ্টা করছে লড়াই করতে। তার একটি পা মহিষের গলা থেকে তখনও সম্পূর্ণ বেরোয়নি, আর একটি পা কিন্তু দেবীর বাহন সিংহ কামড়ে ধরেছে। দেবীর বজ্রমুষ্টিতে ধরা পড়েছে তার মাথা আর ভয়ঙ্কর শূল এসে বিঁধেছে বুকে। হেলে পড়েছে ত্রিলোকবিজয়ী মহাদম্ভী অসুরের মাথা অসহায় শিশুর মত। কোষ থেকে অসি টেনে বার করার প্রয়াস তার সফল হল না! আর কত ছোট তাকে দেখাচ্ছে সেই বিশালগঠনা মহিমময়ী বিজয়িনীর কাছে![১]

সাতটি পলতোলা সপ্তরথ-পীঠ, তার ওপরে মহাপদ্ম।[২] এই মহাপদ্মের ওপরে এই চমৎকার মহিষমর্দিনী মূর্তি উৎকীর্ণ। পিছনে পৃষ্ঠপটের ঊর্ধ্বে কীর্তিমুখ, আকাশচারী মাল্যবাহী বিদ্যাধরদের অলঙ্করণ, নিচে দেবীর দুপাশে অসিচর্মধারিণী দুটি মূর্তি সম্ভবত দেবীর সঙ্গিনী জয়া ও বিজয়া।

এই-ই বর্ধমান জেলার ক্ষীরগাঁয়ের দেবী যোগাদ্যার মূর্তি। এই মূর্তি সারা বৎসর ক্ষীরগাঁয়ের ক্ষীরদীঘির কালো জলের তলায় ডোবানো থাকে। বছরে কেবলমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তির দিন 'মহাপূজা' উপলক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য এবং আর, কয়েকদিন দু-চার ঘণ্টার জন্যে এই দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। একমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তির দিনই সর্বসাধারণ এঁর দর্শন, স্পর্শ ও পুজো করার অধিকার পায়। অন্য আর যে কটি দিন তোলা হয়, সে কটি দিন পুরোহিত আর নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া এ মূর্তি দেখার অধিকার আর কারও নেই।

একাদশ-দ্বাদশ শতকের রচনা

এই মূর্তিটি নিঃসন্দেহে খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের শিল্পকল্পে রচিত। অনেক কঠিন পরীক্ষা-

নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে অনেক সমস্যা পার হয়ে এসে বাংলার শিলা-শিল্পীদের হাতে মূর্তি-নির্মাণকলা একটি পরিণত চেহারা নিয়ে সুস্থির ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিল পাল যুগে। একাদশ-দ্বাদশ শতকে সে-শিল্প সাফল্যের তুঙ্গশিখরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যোগাদ্যার মূর্তিটিতেও সেই সাফল্যের সমস্ত যুগচিহ্ন রয়েছে।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গুপ্তযুগের মহৎ ভাবৈশ্বর্যের প্রেরণা নিয়ে একদিন বাংলাদেশের ভাস্কর্যকলা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে সাহিত্যের মত পাষাণতক্ষণ-শিল্পেও নিজস্ব রুচিতে ও রসবোধে, অলঙ্করণে ও গঠন পারিপাট্যে রূপকলাময় ভারতে স্বাতন্ত্র্যের গৌরব নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল গৌড়ী-রীতি। রাজা ধর্মপালের আমলে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে ধীমান আর তাঁর ছেলে বীতপাল ছিলেন বরেন্দ্রভূমির দুজন গৌড়ী-রীতিতে সিদ্ধহস্ত-শিল্পী। তিব্বতী লামা তারনাথ তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তাঁদের নামোল্লেখ করেছেন। বিজয় সেনের দেওপাড়ার তাম্রশাসনেও বরেন্দ্র শিল্পীদের চূড়ামণি বাণক শূলপাণির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু শুধু বরেন্দ্রভূমিতে নয়, শুধু পূর্ববঙ্গে নয়, বাংলার অন্যান্য অংশের মত রাঢ়দেশেও মধ্যযুগের বাংলার রুচিস্নিগ্ধ অপূর্ব ভাস্কর্যসাধনা যে সমানতালে অগ্রসর হয়েছিল, তার পরিচয় রয়েছে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ছড়ানো গাছতলায় স্তূপীকৃত মন্দিরে পূজিত অসংখ্য ভাঙা-আভাঙা, অসমাপ্ত-অর্ধসমাপ্ত বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তিতে।[৩]

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রামের মহিষমর্দিনী মূর্তিটিও রাঢ়দেশের ভাস্কর্যসাধনার পরিচয় বহন করছে। বর্ধমান জেলার শুধু ক্ষীরগ্রামে নয়, মঙ্গলকোটে, পাতুনে, মালডাঙায়, শুশুনায়, মাঝিগ্রামে এমন অনেক নিপুণ শিলা-শিল্প রচনার চিহ্ন দেখেছি।

বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে পাথরের এই মূর্তিনির্মাণ-কলার জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল, মুসলমান আর তৎপরবর্তী যুগে সে পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তনে সে শিল্পসাধনারও যেন কার্যত অবসান ঘটেছিল। তাই বাংলাদেশে পরবর্তী যুগের প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী এইরকম রচনার নিদর্শন দুর্লভদর্শন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে সে সাধনার একেবারে মৃত্যু ঘটেনি। অন্তত শ-খানেক বছর আগেও যে ঐতিহ্যসূত্রে বংশপরম্পরাক্রমে সে ধারা এখানে বয়ে এসেছে নিপুণ ভাস্করের হাতে তার প্রমাণ ক্ষীরগাঁয়ের এই মহিষমর্দিনী মূর্তিটি।

দাঁইহাটের নবীন ভাস্করের কীর্তি

ক্লাসিক্যাল শিলা শিল্পের পূর্ণ সৌন্দর্যের এই রচনাটি বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের নবীন ভাস্করের কীর্তি। এই মূর্তিটির বয়স একশো বছরের বেশি হবে না। দেবী যোগাদ্যার অনেক প্রাচীন একটি পাষাণমূর্তি ছিল। সেটি ক্ষীরগাঁয়ের অদূরে ধামাচে দীঘিতে ডোবানো থাকত। প্রায় ৮০/৯০ বছর আগে একবার ক্ষীরগাঁয়ে বার্ষিক মহাপুজোর সময় সেটির অঙ্গহানি হয়। ভাঙা মূর্তি অর্চনার উপযুক্ত নয় বিবেচনা করে এই নতুন মূর্তি তখন তৈরি করানো হয়। ভাঙা প্রাচীন মূর্তিটিকে দেখে নবীন ভাস্কর এই মূর্তিটি রচনা করেছিলেন। তারপর সেই ভাঙা মূর্তিটি আবার ক্ষীরদীঘির জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্ষীরগাঁয়ে শুনেছি, এই নতুন মহিষমর্দিনী মূর্তিটি তৈরি করতে নবীন নামে এক ভাস্করকে কম কষ্ট করতে হয়নি। কখনও কখনও সারা দিনরাত তিনি হাতুড়ি-ছেনি-বাটালি নিয়ে কাজ করেছেন, এত তীব্র অনুরাগ ছিল তাঁর এ কাজে। সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে কাজ, তবু সামান্য কিছু অংশ মনঃপূত হয়নি বলেই শিল্পী নিজের সৃষ্টি নিজেই কয়েকবার পরিত্যাগ করে আবার নতুন পাষাণখণ্ডে নতুন

মূর্তি উৎকীর্ণ করতে লাগলেন। এমনই পরিত্যক্ত একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি ক্ষীরগাঁ যোগাদ্যা দেবীর বারোমেসে পুজোর মন্দিরের কাছারি বাড়ির পিছনের জঙ্গলের মাটিতে উল্টোভাবে পড়ে আছে দেখে এসেছি। শুনেছি, এই মূর্তিতে মহিষাসুরের মুখটি তাঁর নিজের মনোমত হয়নি বলে তিনি মূর্তিটি পরিত্যাগ করেছিলেন।

ক্ল্যাসিক্যাল পর্বের উৎকৃষ্ট রচনা

কালো কঠিন কষ্টিপাথরে এমন সুডৌল, সুকুমার, লাবণ্যময় মূর্তি খুদে বার করা সহজ নয়। মূর্তিটির দশটি হাতের মধ্যে চারটি হাত, মুখমণ্ডল, জটামুকুট প্রভৃতি পৃষ্ঠপট থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। পাথরের জোড়ের সমস্ত চিহ্ন অবলুপ্ত করে দুঃসাহসী শিল্পী নিপুণ হাতে এই কঠিন কাজ সমাপ্ত করেছেন। কালো পাথরে আলোছায়ার সমস্যাকে বুঝে নিয়ে, বিচিত্র দেহবিভঙ্গ, ব্যঞ্জনাময় মুখসৃষ্টিতে অসামান্য রুচি, রসবোধ আর নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন নবীন ভাস্কর। হয়তো হাতের খড়্গের গড়নে এবং এমনই আর কয়েকটি অংশে নবীনতার সামান্য স্পর্শ আছে। কিন্তু সমগ্রত মূর্তিটিকে বিচার করলে এটিকে একটি অতি উৎকৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল পর্বের রচনা বলে মনে হয়। অপরূপ রুচি আর নৈপুণ্যের বিচারে এ-রচনাকে একটি প্রাচীন রচনার অনুকৃতি বলতে ইচ্ছে হয় না, প্রতিভাবান শিল্পীর এ এক আশ্চর্য সৃষ্টি! শুধু এই মূর্তিটি নয়, নবীন ভাস্করের রমণীয় রচনাবলী ছড়িয়ে রয়েছে বর্ধমান জেলার অনেক গ্রামে। কে জানে, তাঁর শিল্পকীর্তি রাঢ়দেশ ডিঙিয়ে অন্যত্র গেছে কিনা, রাঢ়দেশের পুকুর, শুকনো নদীর গর্ভ থেকে উত্তোলিত এমন অনেক মূর্তি হয়তো তাঁরই নিজের হাতের রচনা। স্রষ্টাকে মুছে দিয়ে সে সব মৃত্যুঞ্জয় সৃষ্টি অম্লান গৌরবে বেঁচে আছে আজও।

শুধু নবীন ভাস্কর নয়, বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের অন্য ভাস্করদেরও পাষাণ মূর্তি নৈপুণ্যের রচনা কিছুকাল আগে পর্যন্ত প্রদীপ্ত ছিল। এঁদেরই নিপুণ হাতে কালো কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ বিচিত্র ত্রিভঙ্গ ঠাম দ্বিভুজ কৃষ্ণ আর বালগোপালের মূর্তি আজও বাংলাদেশের মন্দিরে মন্দিরে, পুরনো বনেদি বাড়িতে গৃহদেবতারূপে পুজো পাচ্ছেন। দাঁইহাট রাঢ় বাংলার পাষাণ-শিল্প-সাধনার প্রসিদ্ধ পীঠভূমি বলে সম্মানিত হয়েছে।

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন বার্ষিক মহাপুজো উপলক্ষে এই মহিষমর্দিনী মূর্তিকে ক্ষীরদীঘির জল থেকে তুলে 'উত্থান মন্দির' নামে একটি ছোট মন্দিরে ২৬ ঘণ্টার জন্যে রাখা হয়। তখন দূর-দূরান্ত থেকে শত শত নর-নারী আসে, দেবীকে পুজো করে, দেবীর পাদস্পর্শ করে, নোয়া পরায় দেবীর হাতে। সিঁদুরে দেবীর কালো কষ্টিপাথরের মূর্তি লাল হয়ে যায়। শত শত ভক্তের পরানো নোয়াতে দেবীর বাম হাত একেবারে ঢেকে যায়। এই লৌহবলয়িত দেবীর কোমরে মোটা কাছি বেঁধে রাখা হয়, ভক্তির আতিশয্যে সকলের পাদস্পর্শ করার ধুমে মূর্তিটি যাতে কুলুঙ্গি থেকে গড়িয়ে না পড়ে যায়। এই রজ্জুবদ্ধ, লৌহবলয়িত দেবী যোগাদ্যার ফটো তুলেছেন আমার বন্ধু শ্রীরবি ঘোষ। আজ পর্যন্ত এই মূর্তির ফটো কখনও কেউ তোলেননি, কাউকে তুলতেও দেওয়া হয়নি। এই ছবি তুলতে ক্ষীরগাঁয়ের প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্নদের কাছ থেকে কম বাধা আমাদের পেতে হয়নি। কিন্তু সেখানকার কিছু সংখ্যক উদারভাবাপন্ন ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে আমরা সেই অপরূপ মূর্তির ফটো নিতে পেরেছি।

ক্ষীরগাঁয়ের দেবী এই যোগাদ্যাকে নিয়ে কত লোকশ্রুতি, কত লোক-কাহিনীই না আছে। শুধু ব্রাহ্মণ্য সংস্কার নয়, অনেক অব্রাহ্মণ্য সংস্কারও তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। দেবীকে কেন্দ্র করে সারা বছর বিশেষত বৈশাখী সংক্রান্তির দিন 'মহাপুজো' উপলক্ষে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়, তাতে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও জড়ানো আছে এবং সেগুলি বহু প্রাচীনকাল

থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 'মন্দিরে গুয়া ডাকা', 'ক্ষীর-কলস', 'হাল-লাঙ্গল', 'ময়ূর নাচ', 'ডোম চোয়াড়ি ও উগল পুজো', 'চ্যাং ব্যাং' প্রভৃতি অনুষ্ঠান অব্রাহ্মণ ডোমের অংশগ্রহণে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক দিক থেকেও এই অনুষ্ঠানগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার এ সংক্রান্ত পরবর্তী প্রবন্ধে সেগুলি সম্বন্ধে সংগৃহীত বিবরণ উপস্থাপিত করব।

'মহাপুজো'র লৌকিক চরিত্র

দেবী যোগাদ্যার উদ্দেশ্যে বারোমাস পুজো হয় যে মন্দিরে তাকে বলে 'পুরনো মাঝ'। 'মাঝ' কথাটি মনে হয় 'মঞ্চ' কথাটি থেকে এসেছে। 'মঞ্চ' থেকে 'মাচ' বা 'মাঝ'। কোথাও কোথাও 'মাইচ'ও বলতে শুনেছি। ক্ষীরগাঁয়ে মহিষমর্দিনী মূর্তিকে জল থেকে তুলে যে ছোট মন্দিরে রাখা হয় তার নাম উত্থান মন্দির বা 'নতুন মাচ'। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে যেখানে গ্রামদেবীদের এইরকম বার্ষিক 'মহাপুজো' হয়, সেখানেই ঐ উপলক্ষে দেবীদের একটা করে এই রকম 'উত্থান মন্দিরে', 'মাঝতলা'য় অথবা 'মাইচতলা'য় নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হয় এবং সেখানে চলে সর্বসাধারণের পুজো, বলি প্রভৃতি অনুষ্ঠান। তখন স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার করা হয় না। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ তখন সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষে দেবীকে আবার পুরনো মন্দিরে এনে স্পর্শদোষ দূর করার জন্যে অভিষেক করা হয়।

বৎসরে একটি দিন এইভাবে সর্বসাধারণের পুজোর ঢালাও অধিকার দেখে মনে হয় এই সমস্ত গ্রাম্যদেবী আদিতে অব্রাহ্মণ জনসমাজেরই উপাস্যা ছিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যান্তরে তাঁরা উন্নীত হয়েছেন এবং আপোসরফা হিসাবে অব্রাহ্মণ্য বিপুল জনগোষ্ঠীকে বৎসরে অন্তত একটি দিন পুজো করবার অধিকার দিয়ে খুশি করার চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবীর মহাপুজোর সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাপুজোগুলো তাই রাঢ়দেশের প্রকৃত লোক-উৎসবে পরিণত হয়েছে। সেগুলিতে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের চাইতে সমাজের আপামর জনসাধারণের রুচি, মেজাজ ও চরিত্রই বেশি প্রতিফলিত।

পুরনো মাঝটি বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আমলে তৈরি অষ্টাদশ শতকে। কিন্তু মন্দিরটির গর্ভগৃহটি খুবই নিচু এবং ছোট। খুব প্রাচীন বলে মনে হয়। এই গর্ভমন্দিরের ওপরে রথের আকৃতি তিন থাকের মন্দির। এই মন্দিরের সামনে সংলগ্ন গোলাকৃতি আরও একটি মন্দির আছে—আকৃতিতে অন্যরকম হলেও এটি যেন উড়িষ্যার মন্দিরের জগমোহন অংশ। এর সামনে নাটমন্দির। গোলাকৃতি মন্দিরে প্রবেশদ্বারে এবং গর্ভমন্দিরের পিছনের গায়ে কয়েকখানি কালো পাথর গাঁথা আছে। ইট-সুরকির মন্দিরে এই কটি পাথর দেখে মনে হয়, কোনও পাথরের পুরনো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ নিয়ে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে।

যোগাদ্যা দেবীর উদ্ভব কাহিনী

অন্ধকার গর্ভমন্দিরের ভেতরে একটি বেদী—তার মাঝখানে একটি সুড়ঙ্গ, সেটি নাকি পাতাল পর্যন্ত চলে গেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মহীরাবণের কাহিনী শুনিয়ে লোকে এ সম্বন্ধে বলে দেবী যোগাদ্যা উগ্রচণ্ডা বা ভদ্রকালীরূপে পাতালে রাবণের পুত্র মহীরাবণের ঘরে পুজো পেতেন। রামরাবণের যুদ্ধের সময় মহীরাবণ বাবার আজ্ঞায় রামলক্ষ্মণকে মায়াবলে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল সেই দেবীর কাছে বলি দেবার জন্যে। হনুমান কৌশলে পাতালে গিয়ে দেবীর কাছে মহীরাবণ আর তার ছেলে অহিরাবণকে বলি দিয়ে রামলক্ষ্মণকে উদ্ধার করে পাতাল থেকে তুলে নিয়ে আসেন এই সুড়ঙ্গের পথে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেবীকেও ওপরে তুলে আনেন।

এর পরের কাহিনী এইরকম : ক্ষীরগাঁয়ের রাজা হরি দত্ত স্বপ্নে দেবীর আজ্ঞা পেয়ে নিজের সাতটি ছেলে বলি দেন দেবীর কাছে এবং দেবীর নরবলির জন্যে প্রত্যেক প্রজার পালা বেঁধে দেন প্রত্যহ একটি করে নরবলি পাঠাবার জন্যে। কালক্রমে পূজারী ব্রাহ্মণের পালার দিন এলে তিনি তার আগের দিন রাত্রেই সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে পালান। পথে বৃদ্ধার বেশ ধরে যোগাদ্যা দেবীর আবির্ভাব। বললেন তিনি "যে ভয়ে পালাও তুমি আমি সে যোগাদ্যা।" পূজারী বল্লেন, তিনি দশভূজা মূর্তি দেখলে সে কথা বিশ্বাস করবেন! দেবী দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি দেখিয়ে বললেন, "তোমার ছেলেকে বলি দিতে হবে না আর, আমার নরবলি কাল থেকে নিজেই আসবে, তাকেই বলি দিও।"

"নে মা, নররক্ত খা!"

নরবলির এই কাহিনীটি স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে এখানে একদিন কী দারুণ তন্ত্রাচার চলত। এই নরবলিই এখনও বিকল্প পদ্ধতিতে চলছে। দেবী যোগাদ্যার বৈশাখী সংক্রান্তির দিন শত শত পাঁঠা বলি, ভেড়া বলি, মোষ বলি পড়ে।—হাড়ি, কোটাল প্রভৃতি জাতের লোকেদের শুয়োর বলিও বাদ যায় না। দেবীকে জল থেকে তোলা মাত্র পাঁঠা বলি দিয়ে বলির রক্ত দেবীর মুখে দেওয়া হয়। পরদিন আবার দেবীকে জলে ডুবিয়ে দেবার সময় একজন ডোম একটি পাঁঠা বলি দিয়ে তার রক্ত দেবীমূর্তির মুখে লাগিয়ে বলে "নে মা, নররক্ত খা।"

মন্ত্র নেই, পুজো নেই—এই বলির পদ্ধতি নিছক লৌকিক। মনে হয় ক্ষীরগাঁয়ের এই লৌকিক আচারের মূলে যেন আছে প্রাচীন আদিম কৌম সমাজের সংস্কার—যখন ভূমির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির কামনায়, মহামারী নিবারণে কল্পিত রক্তপিপাসাময়ী শক্তির ক্রোধ উপশমের চেষ্টায় মানুষ নরবলির অনুষ্ঠান করেছে। শুধু নরবলি নয়, অন্যান্য জীবজন্তুকেও বলি দিয়েছে। সেই সংস্কার-আচার কালক্রমে শাক্তাচারে এবং অনেক ঘাত-প্রতিঘাত-সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ্যস্তরেও উঠে এসেছে। কালিকা পুরাণ প্রভৃতিতে তাই নরবলির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হয়েছে। কালক্রমে নরবলির বদলে অন্যান্য জীববলি এবং শেষে অহিংস বৈষ্ণব ভাবপ্রেরণাতে তাদেরও বদলে চালকুমড়ো, আখ প্রভৃতির বলি শক্তিপূজাতে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সেই আদিম সংস্কার আজও যায়নি। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, নেগ্রিটো, মঙ্গোলয়েড, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জাতির কোন্ গোষ্ঠীর মানুষ এই সংস্কার ভারতে তথা বাংলাদেশে এনেছে এ সম্বন্ধে এখন প্রাচ্যপ্রতীচ্য দেশে নানা মুনির নানা মত। নৃতত্ত্ব এবং ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় রাঢ়দেশ অনেকখানি প্রাগার্য জাতিগোষ্ঠীভুক্তদের নিকটসম্পর্কযুক্ত। সেই সম্পর্কেই রাঢ়দেশে শাক্তাচারের প্রাবল্যের কারণ নির্ধার্য।

এই দেবী যোগাদ্যাই আবার সারা ভারতের ৫১ (মতান্তরে ৫২) পীঠের অন্তর্গত এক পীঠদেবী। এই ক্ষীরগ্রামে নাকি সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ, মতান্তরে পৃষ্ঠদেশ পড়েছিল। ফলে ক্ষীরগ্রাম অন্যতম পীঠস্থান বলে পূজিত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত 'কুব্জিকাতন্ত্র'[৪] থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ পর্বে রচিত পীঠনির্ণয়ের 'মহাপীঠনিরূপণে', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতিতে এই পীঠস্থানের উল্লেখ আছে। বেশ প্রাচীনকাল থেকেই এই শাক্ত সাধনাভূমির যে খ্যাতি আছে, ঐ গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ।

প্রত্যেক পীঠস্থানে একটি করে অধিষ্ঠাত্রী দেবী শক্তি আর একটা করে ভৈরব বা শিবলিঙ্গের মূর্তি আছে। এখানে দেবী যোগাদ্যাই সেই শক্তি, পুরনো মাঝে ঐ বেদীতেই সেই পীঠদেবীর পুজো হয় যথারীতি শাস্ত্রীয় আচারে!

স্তূপের ওপরে শিবমন্দির ও যজ্ঞকুণ্ড

আর ভৈরবের নাম 'পীঠনির্ণয়ের' বিভিন্ন পুঁথিতে, অন্য গ্রন্থে তার উদ্ধৃতিতে বিভিন্ন ধরনের। কোথাও 'ক্ষীবখণ্ডক', কোথাও 'ক্ষীরখণ্ডজ', কোথাও 'ক্ষীরকণ্ঠ'। এই শিবের মন্দির পুরনো মাঝ থেকে কিছু দূরে ১২/১৪ ফুট উঁচু একটা টিলার ওপরে তৈরি। শিবলিঙ্গটি প্রায় আধ হাত মাটি থেকে বেরিয়ে আছে। মন্দিরটি অবশ্য বেশি দিনের তৈরি নয়। কিন্তু ঐ টিলাটি বেশ পুরনো এবং আগে এটির আকৃতি স্তূপাকৃতি ছিল বলে মনে হয়, যদিও পিছনে নতুন ইঁটের গাঁথনিতে আর সামনে সিঁড়িতে এর চেহারার অনেকখানি বদল হয়ে গেছে।

দেবীর নিয়মিত হোমকর্ম পুরনো মাঝের ভেতরে হয় না। সেটি হয় এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে---'ময়ূরগড়' নামে একটি পুকুরের ধারে। সেখানেও একটি উঁচু স্তূপাকৃতি টিলার মাথায় বাঁধানো যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত। যজ্ঞকুণ্ডটি এখন সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ছে। উঁচু স্তূপাকৃতি ভূখণ্ডের ওপরে ভৈরবের মন্দির আর যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত দেখে মনে হয়, এ-দুটি প্রাচীনকালে কোনও বৌদ্ধস্তূপই ছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অভ্যুদয়ে এ-দুটি তার কুক্ষিভূত হয়ে গেছে। ক্ষীরগ্রাম থেকে প্রায় মাইল সাতেক পশ্চিমে মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত মাঝিগ্রামে দেউলেশ্বর শিবও খুব উঁচু স্তূপের ওপরে স্থাপিত দেখেছি। এটিও বৌদ্ধস্তূপ বলে অনুমান করা যায়। একদিন সারা বাংলাদেশব্যাপী বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের কথা মনে রাখলে বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামে বা মাঝিগ্রামের এই স্তূপের অস্তিত্বের কথা বিচিত্র মনে হবে না।

তথ্যসূত্র :

১. নবদ্বীপে রাসযাত্রা উপলক্ষে এইরকমের বিরাট মূর্তির পুজো হয়। আমার লেখা 'নবদ্বীপের রাসযাত্রা' নামে রচনায় এর সচিত্র বিস্তৃত বিবরণ আছে।

২. ভারতীয় দেবদেবীদের মূর্তির একেবারে নিচে যে অংশটি থাকে সমস্ত মূর্তির ভিত্তিভূমি যেটি, প্রাচীন মূর্তিকলায় তার নাম রথ। এই রথ একটি থেকে দুই, তিন, চার-পাঁচ বা তারও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ এই পাদপীঠটা যেন ভাঁজে ভাঁজে ভাগ করা। এই ভিত্তিভূমির ভাঁজ একটির বেশি হলেই, তবে তাকে রথ বলা হয়। এই রথের ওপরে থাকে পদ্মের আসন। এই পদ্ম একদল, দ্বিদল, ত্রিদল পর্যন্ত হতে পারে। তারই ওপরে দেবদেবীদের দাঁড়ানো কিংবা বসা অবস্থায় দেখানো হয়। প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিকলায় দেবদেবীদের এই আসনকে 'মহাপদ্ম' বলে।

৩. ...তিব্বতী লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে [১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত] ধীমান ও বীটপাল নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ...তারনাথ কথিত শিল্পী ধীমান ও বীটপালের কথা, শিল্পী মহীধর, শিল্পী শশিদেব, শিল্পী কর্ণভদ্র, শিল্পী তথাগতসর, সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র এবং আরও অগণিত শিল্পী যাঁহারা পাল লিপিমালা ও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা। ---বাঙালীর ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১৫৯; ৩৪১।

৪. কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরে 'কুব্জিকাতন্ত্রে'র তুলটকাগজে হাতে লেখা পুঁথি আছে।

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাল মৃদং ঘাঘর বাজে।।

মুখে মুখে ঘোরা, বাংলার নানা অঞ্চলের উপভাষায় নানান চেহারা ধরা অর্থহীন, ছেলেভুলানো ছড়া শুধু এ নয়। পণ্ডিতের মতে 'ডুম' শব্দটি 'ডোম' শব্দের বিকৃত রূপ, আর ছড়াটি প্রাচীন কালের বীর ডোম সৈন্যদের যুদ্ধসজ্জার ছবি : আগাডোম বাঘাডোম ঘোড়াডোম সাজে। বাঘের মত দুর্ধর্ষ পাইক, পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ডোম ফৌজ। তাদের ঢাল-তলোয়ারের ঘর্ষণে, ঘোড়ার গলায় জিনে বাঁধা ঘুঙুর-ঘণ্টার ঝমঝম শব্দে, মৃদঙ্গ আর ঝাঁঝের রণরোলে রণসজ্জার ঝঙ্কারময় একটি কথাচিত্র।

এই ডোম জাতই রাঢ় অঞ্চলের সেই সমস্ত তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর শরিক, যারা একদিন নির্ভীক হাতে ঢাল-তলোয়ালের ঝঞ্ঝনা তুলে বীরদাপে মাটি কাঁপিয়ে যুদ্ধযাত্রায় যেত— সমাজের তথাকথিত উঁচুস্তরের মানুষদের রাজার ধন, প্রাণ, মান রক্ষা করতে। তারা প্রভুর নিমক খেয়ে প্রভুর জন্যে শত্রুর হাতে সম্মুখসমরে বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হত না। তাদেরই শত্রুত্রাসকর বাহুবলের আড়ালে সিংহাসনে নিরাপদ থাকতেন, 'অরি-বিমর্দন', 'ধ্বজাছত্রচামরশোভিত', 'সসাগরা ধরণীর পতি'রা! রাজারাজড়া, সামন্ত-মহাসামন্তদের দান, ধ্যান, বীরত্ব, রাজ্যজয়ের সত্য মিথ্যা কীর্তিকলাপ নিয়ে কাব্য সৃষ্টিতে—তাম্রলেখে, শিলালিপিতে অতিরঞ্জিত প্রশস্তি রচনায় চাটুবাদী রাজপাদোপজীবীদের, শ্লোককারদের অভাব ঘটেনি। কিন্তু ঐ তথাকথিত অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের বীরত্ব, মহত্ত্ব, ঔদার্য, কর্তব্যজ্ঞান, আত্মদানের গৌরবময় কাহিনীর কোনও সুস্পষ্ট সাক্ষী নেই—নেই কোনও মিষ্টি শ্লোকে লেখা পুঁথি, নেই কোনও পাথুরে প্রমাণ বা তাম্রপটে উৎকীর্ণ বাণী!

সমাজের উচ্চস্তর উপেক্ষায় আর অবজ্ঞায় তাদের ভুললেও লোকায়ত মানস তাদের ভুলতে পারেনি। দূরবিস্তৃত সেইসব কাহিনী লোকমুখে বয়ে এসেছে নানান গল্পে, ছড়ায়, লোকসঙ্গীতে, লোকগাথায়, লোককাব্যে। তাই রাঢ়বাংলার বীর ডোম জাতির গৌরবময় ছবি পাই বাংলার মধ্যযুগীয় কাব্য ধর্মমঙ্গল প্রভৃতিতে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে দেখি, ময়নানগরের রাজা লাউসেন চলেছেন নব লক্ষ সৈন্য নিয়ে ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর তেরজন দলুই বা দলপতি ডোম সর্দার, আর কালু ডোম তাদের মধ্যমণি। ঘনরাম সেই বীর বাহিনীর রণদৃপ্ত ছবি এঁকেছেন :

যমদূত দোসর দলুই সব সনে।
সমরের সিংহ সবার কটি আঁটা।
বীরধটি সাপটি সবার কটি আঁটা।
উরু চারু চলনে চলিতে বাজে ঘাটা।।
মাথায় পাগড়ি টেড়ি টৈয়া বান্ধা তায়।
বীরধূলি রাঙ্গা মাটি সবাকার গায়।।
জোড়া খাঁড়া খঞ্জর যুগল যমধার।
কাঁকালে যুগল টাঙ্গি পৃষ্ঠে ধনুঃশর।।
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে।।
ঘন বাজে শঙ্খ কাড়া টমক টেমাই।
ডোমগণ চৌদিকে চলিল ধাওয়া ধাই।।

শুধু বীরত্বে নয়, রাজা লাউসেনের জন্যে সম্মুখযুদ্ধে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণ বিসর্জনে কালু ডোম ধর্মমঙ্গলের মহিমময় চরিত্র।

সমরে সিংহিনী যেন আগুনের ফুল

কিন্তু শুধু কালু ডোম কেন, তার স্ত্রী লখাই ডোমনী, পুত্রবধূ ময়ূরাও কম কী। তারাও "সমরে সিংহিনী যেন আগুনের ফুল।" দেশের রাজা অনুপস্থিত, বীর কালু ডোম দৈব ছলনায় মায়ানিদ্রায় মগ্ন, শত্রু ময়নানগরের সীমান্তে হানা দিয়েছে। বীরের ইজ্জত আর রাজার নিমক খাওয়ার কথা স্মরণ করে লখাই ডোমনী ঘরে খিল এঁটে বসে থাকতে পারেনি। লাফ দিয়ে উঠেছে বীরাঙ্গনা—বীরের মত কোমরে কাপড় এঁটে পরেছে, হাতে তুলে নিয়েছে—'জোড়া খাঁড়া যমধার খঞ্জর যুগল'। শুধু তাই নয়—

ছোরা ছুরি কাটারি কুটিল হীরাধার।
তরকোচে তীরগুলি তেত্রিশ হাজার।।
বাম করে ধরে ঢাল কালমুখী ফলা।
টঙ্কারি ধনুক নিতে কাঁপিল অচলায়।।
কষে বাঁধে কাঁকলি কালিকা করে জপ।
মুখে যেন আগুন উগরে দপ দপ।।

অগ্নিমুখী রণরঙ্গিনী প্রথম দিন একা যুদ্ধ করে প্রাণপণে ঠেকিয়েছে শত্রুবাহিনীকে। গড় পার হয়ে আসতে দেয়নি তাদের। শত্রুবাহিনীকে অপসৃয়মান দেখে লখাই ঘরে ফিরে এসে ছেলে শাকা ডোমকে যেতে বলছে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে নির্মূল করতে। ছেলে নারাজ। সিংহিনী ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে ওঠে :

মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি।।

স্ত্রী ময়ূরা এসে শাকা ডোমকে যুদ্ধে যেতে প্রণোদিত করছে :

দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই
শাশুড়ী বিকল কাঁদে শত্রু দেশ নেই।।
মহাগুরু বচন রাজার লূণ খেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে।।

চেতনা পেয়ে শাকা ডোম যুদ্ধক্ষেত্রে যায় কর্তব্য পালনে। সম্মুখযুদ্ধে নিহত হয় বীর। পুত্রশোকাতুরা লখাই চোখে জল আর হাতে কর্তব্যের গুরুভার নিয়ে ছোট ছেলে শুকাকে ডাকছে যুদ্ধে যেতে।

শোয়ায়ে সোনার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর।।

সবকটি ছেলেকে যুদ্ধের আগুনে আহুতি দিয়ে শত্রুর রক্তে নিজের বুকের আগুন নিভাতে মহিমময়ী লখাই ডোমনী নিজে চলে গেল রণাঙ্গনে।

ক্ষীরগাঁয়ে 'ডোম চোয়াড়ি' অনুষ্ঠান

ডোম প্রভৃতি জাতের বীর-বীরাঙ্গনাদের এ কাহিনী শুধু কবিকল্পনার অতিরঞ্জিত সৃষ্টি নয়, এর মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে। রাঢ়বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায় লোকমুখে। ঝাপসা স্মৃতির মত সে কাহিনী রাঢ়দেশে শুধু ছড়ায়, লোকগাথায়, লোককাব্যে নয়, লোক-উৎসবেও যে বয়ে আসছে, তার উদাহরণ দেখেছি বর্ধমান জেলায় ক্ষীরগাঁয়ে যোগাদ্যা

দেবীর বার্ষিক মহাপুজোর 'ডোম চোয়াড়ি' অনুষ্ঠানটিতে।

এই বিচিত্র অনুষ্ঠানটি হয় বৈশাখী সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে দেবী যোগাদ্যার মহিষমর্দিনী মূর্তিটিকে জল থেকে তুলে উত্থান মন্দিরে স্থাপনের পর। অনুষ্ঠানটি উত্থান মন্দিরের সামনে নয়, দেবীর বারোমেসে পুজোর মন্দিরের অঙ্গনে হয়।

ডোমের সঙ্গে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ। দেবীর ব্রাহ্মণ সেবাইত হেরম্বনাথ চক্রবর্তী অনেক দিনের অব্যবহারে মরচে পড়া একখানা তরোয়াল নিয়ে বহুবল্লভ ডোমের সামনে এসে হাঁক পাড়লেন- "প্রস্তুত হও!" বাঁশের দুটো খেঁটে হাতে নিয়ে বহুবল্লভ ডোম প্রস্তুত হয়েই ছিল। দু'পক্ষের লড়াই চলল। হেরম্বনাথ চক্রবর্তী পরাজিত হলেন। পরাজিত হলেও হেরম্বনাথ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, বর্ণগুরু। আর বিজয়ী হলেও বহুবল্লভ তথাকথিত অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ। তাই বহুবল্লভকে রণশ্রান্ত হেরম্ব চক্রবর্তীকে প্রণাম করতে হল আর তাঁর হাতে তুলে দিতে হল একখানা পাখা, বাতাস খেয়ে ভীষণ রণশ্রম দূর করার জন্যে। এবার বহুবল্লভের সঙ্গে লড়াই করার পালা বসন্ত দণ্ডের আর তারপর অতুলকৃষ্ণ সামন্তের। এঁরা উগ্রক্ষত্রিয়সম্প্রদায়ভুক্ত—ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার। এদেরও হাতে বাঁশের খেটে। এঁরাও পরাস্ত হলেন বহুবল্লভের বাহুবিক্রমে। কিন্তু বহুবল্লভকে এঁদেরও প্রণাম করে হাতে তুলে দিতে হল পাখা—বাতাস খাবার জন্যে। এই বিচিত্র যুদ্ধাভিনয়ের সঙ্গে বাজতে লাগল মাদল।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের এই পরাজয়বরণ আর ডোমের জয়লাভ—রণবীর দুর্মদ প্রাচীন ডোম জাতির সেই সুদূর অতীতের গৌরবময় স্মৃতি বহন করে আনছে।

দুই বিরোধী শক্তির পাঞ্জা কষাকষি

সাংস্কৃতিক আর সামাজিক দিক থেকেও এই অনুষ্ঠানটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। সেটি হচ্ছে—দেবী যোগাদ্যা যেন আদিতে সুদূর বিস্মৃত যুগে এই ডোম, চুয়াড় বা চোয়াড় প্রভৃতি রাঢ়দেশের তথাকথিত অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, জাতি-উপজাতির ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতির বিজয় অভিযান উত্তর ভারতের অন্য সমস্ত অঞ্চল পার হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন কৌমের জনগোষ্ঠী নিজের নিজের যে বিচিত্র ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যোগাদ্যা উপাসনাও ছিল সেই প্রাগার্য সংস্কৃতিধারারই অন্তর্ভুক্ত। যুগ যুগ ধরে অনেক সংঘর্ষ আর সমন্বয়, অনেক বিরোধ আর মিলন, অনেক অসিঝঙ্কার, রক্তপাত আর বিনা আয়াসে আত্মসমর্পণ—এই বিচিত্র পথ ধরে আর্য সংস্কৃতি এদেশে কায়েম হয়েছে। বাংলার আদিম কৌম সমাজের অনেক সংস্কার-সংস্কৃতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্তরেও পেয়েছে স্বীকৃতি, পেয়েছে স্থান—যদিও তাদের আদিম চেহারা অনেকখানি পালটিয়ে গেছে এক স্তর থেকে স্তরান্তরে প্রবেশের সময়। দেবী যোগাদ্যাও ঐ পথেই আদিম কৌমসমাজভুক্ত জনগোষ্ঠীর হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ্য স্তরের অধিকারভুক্ত হয়েছেন। ঐ অধিকার পরিবর্তনের সময় এক দিকে প্রাচীন প্রাগার্য ঐ জনগোষ্ঠী আর অন্য দিকে আর্য সংস্কৃতি, ভাব-আদর্শকে বরণকারী, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সামাজিক বর্ণবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জনগোষ্ঠী—এই দুই প্রবল বিরোধী শক্তির মধ্যে কম পাঞ্জা কষাকষি হয়নি। সেই শক্তিপরীক্ষার ইতিহাসটি যেন দেবী যোগাদ্যার বার্ষিক মহাপুজোর 'ডোম চোয়াড়ি' যুদ্ধাভিনয়ে লুকিয়ে আছে।

ডোমের উপস্থিতি অপরিহার্য

ক্ষীরগাঁয়ের দেবী যোগাদ্যার পুজো-অর্চনার সঙ্গে যাঁদের নিবিড় সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ সেবাইত, পুরোহিত প্রভৃতি তো আছেনই আর আছেন উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দণ্ড, সামন্ত, চৌধুরী, মল্ল, যশ প্রভৃতি বিশিষ্ট বংশের ব্যক্তিরা। এঁদের সঙ্গে ডোমের উপস্থিতিও অপরিহার্য।

মহিষমর্দিনী মূর্তিকে জল থেকে তোলার সময় ব্রাহ্মণ সেবাইত, পুরোহিত এবং উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দণ্ড, সামন্ত, চৌধুরী প্রভৃতিদের সঙ্গে ডোমও থাকবে। মূর্তি জল থেকে তোলার ঢাকি বারোমেসে পুজোর মন্দিরের আলসের ওপরে বসে ঢাক বাজিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দেবে—দেবী উঠছেন। বাজনা থামাবার পর "দণ্ড, সামন্ত, ডোমেরা গো"—বলে পাইক হাঁক পাড়বে। ডোম এসে মশাল জ্বালাবে, তবে দেবীকে জল থেকে তোলা হবে, অন্ধকারে দেবীমুখ দর্শন হবে। বৈশাখী সংক্রান্তির পরের দিন দেবীকে আবার জলে ডুবিয়ে দেবার সময় ডোম একটি ছাগলকে নিজের হাতে বলি দিয়ে সেই রক্ত দেবীর মুখে দিয়ে বলবে 'নে মা নররক্ত নে।' যোগাদ্যার বার্ষিক মহাপুজোতে এক সময় নরবলি হত। এর বিকল্পে ডোম এখন ছাগল কেটে তার রক্ত দেবীমুখে দেয়। এর নাম 'মেরেয় কাটা' অর্থাৎ নরবলি-বিকল্পিত পশু-ঘাতন।

বৈশাখী সংক্রান্তি ছাড়া, বছরে আর পাঁচবার নিশীথ রাত্রে খুব অল্পক্ষণের জন্যে মহিষমর্দিনী মূর্তিকে ক্ষীরদীঘির জল থেকে তুলে পুজো, বলি ইত্যাদি যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়, সেগুলিতেও একমাত্র সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ সেবাইত, দণ্ড, সামন্ত, ডোম ছাড়া আর কারও যোগদান ও দেবীদর্শন নিষিদ্ধ।

যোগাদ্যার পুজোতে ডোমের এই সমস্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্কে ডোমদের শক্তি পুজো তথা তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে নিবিড় যোগের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে ডোমাচার্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা সুবিদিত। এই তান্ত্রিক পন্থানুসরণে ডোমপণ্ডিতদের হাতে কালক্রমে অনেক জায়গায় শুধু ধর্মঠাকুর নন, শীতলা, মনসা, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি শক্তি পুজোর ভার অর্পিত হয়েছে।

উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের নিবিড় সম্পর্ক

ক্ষীরগাঁয়ের যোগাদ্যা দেবীর উপাসনার সঙ্গে আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোকদেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই বলিষ্ঠ বীর জাতি শৌযবীর্যের কাহিনীতে বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে বিশিষ্ট হয়ে আছে। শুধু বাহুবলে নয়, প্রাচীন বাংলায় এই জাতি যে রাজ্যবিস্তারেও সফলকাম হয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যেও এই সম্প্রদায়ের লোকদের বিশিষ্ট পরিচয় মেলে। রাঢ়বাংলার এই বীর জাতি স্বভাবতই তাই শক্তিপূজক হয়েছে। ক্ষীরগাঁয়ের যোগাদ্যা দেবীর পুজোতেও এদের তাই নিবিড় সম্পর্ক।

সুবিস্তৃত এলাকায় যোগাদ্যা-কাল্ট

শুধু ক্ষীরগাঁয়ে নয়, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় যেখানেই এ জাতির প্রাধান্য ও আধিপত্য আছে, সেখানেই একটি যোগাদ্যাতলার দেখা মিলবে। সেসব জায়গায় সর্বক্ষেত্রে যোগাদ্যার যে মূর্তি আছে, তা নয়। সেসব জায়গায় কোথাও গাছতলায় পাথরের নোড়ানুড়ির স্তূপ, কোথাও অপরিণত গঠনের একটি শিলাখণ্ড মাত্র, কোথাও বা সিঁদুর-চন্দন মাখানো অশ্বত্থ, পাকুড় কিম্বা শেওড়া গাছ যোগাদ্যারূপে পুজো পায়। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মধ্যে ক্ষীরগাঁ ছাড়া, ইটে, গোবর্ধনপুর, কোঁয়ারপুর, ভাতাড় থানাব নাসিগ্রাম, বর্ধমান থানার কুড়মুন, কলিগ্রাম, গলসী থানার মল্লসারুল, রায়না থানার আনগুনা, দেরিয়াপুর, সাঁকাটে, বোকড়া, পাঁইটা, শেরপুর, কাটনাবিল, উচালন, খণ্ডঘোষ থানার সড়ঙ্গা, কেঁদুড়—এই সমস্ত গ্রামে যোগাদ্যা দেবীর পুজো প্রচলিত আছে। বাঁকুড়া জেলার কোটালপুর, ঈশ্বরপুর, রাদড়া, ছাতারকানালী, শুঁড়িপুকুর প্রভৃতি গ্রামেও এই পুজো যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। হুগলি, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এ পুজো প্রচলিত। এই সমস্ত পুজো উপলক্ষে নানান স্থানে ছোটখাট মেলাও বসে। তবে তাদের সকলের মধ্যে ক্ষীরগাঁয়ের পুজোপদ্ধতিই বিস্তৃততর,

নানান বিচিত্র অনুষ্ঠানে পূর্ণ। তাই মনে হয়, খুব প্রাচীন কালেই ক্ষীরগাঁকে কেন্দ্র করে যোগাদ্যা কাল্ট যেন রাঢ়বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে এবং এই দেবীর পুজো উপলক্ষে একটি বিখ্যাত বার্ষিক লোক-উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে; আর দেবীর এ পুজো ও উৎসব বিস্তৃত এলাকায় বহন করে নিয়ে গেছে তাঁর অন্যতম উপাসকমণ্ডলী ঐ উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ই।

মন্দিরে 'গুয়াডাকা'র অনুষ্ঠান

আজও ক্ষীরগাঁয়ে প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে যোগাদ্যার বারোমেসে মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর 'গুয়াডাকা' নামে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ছোট বেদীর ওপরে ঘট স্থাপন করে মন্দিরের পুরোহিত আর মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 'দারোগা'র সামনে মালাকর হাতে পান আর সুপারি নিয়ে ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে : "ভরত দত্তের ষষ্ মল্লের গুয়ো, ফোপল মশাই-এর গুয়ো, কোলগাঁয়ের আগুরি কেউ আছ? কুসুমগ্রামের আগুরি কেউ আছ?" এমনিভাবে কুড়মুন, এড়ুরিগ্রাম, নাসিগ্রামের আগুরিদের খোঁজ করার পর মালাকর যেই মাজিগ্রামের নামটি উচ্চারণ করে, তখনই ঢাকি এমন জোরে ঢাক বাজিয়ে দেয় যে মালাকরের "আগুরি কেউ আছ"—এই কথাটি ঢাকের বাজনায় আর শোনা যায় না।

এই অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যায় নানা রকম কাহিনী শোনা যায়। কেউ বলেন—রাজা হরি দত্ত, যাঁকে স্বপ্ন দিয়ে দেবী যোগাদ্যা নিজের পুজো প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ক্ষীরগাঁয়ে, তাঁরই বড় ছেলে ভরত দত্ত পরবর্তীকালে ক্ষীরগাঁয়ের রাজা হন। তাঁর আর অন্য ছ-ভাই উল্লিখিত গ্রামগুলির রাজা হন। তাঁরা 'মল্ল' বা বীর আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। রাজা ভরত দত্ত দেবী যোগাদ্যার পূজার্চনা ভালভাবে চালাবার জন্যে অন্য সব ভাইকে নিয়ে এক পরিচালকমণ্ডলী গড়েছিলেন এবং তাঁদের সম্মানের জন্যে সেকালের প্রথামত পান-সুপারি দিয়ে বরণ ও মর্যাদা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই মালাকর প্রথমেই হাঁকে : ভরত দত্তের ষষ্ (ষট্) মল্লের গুয়ো অর্থাৎ ভরত দত্তের প্রবর্তিত ছয় মল্ল বা বীরের সুপুরি। কালক্রমে ঐ রাজারা অন্তর্হিত হয়েছেন। কিন্তু পূর্ব প্রথাটি বজায় আছে। এখন তাঁদের বদলে তাঁদের রাজ্যের উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিদের ডাকা হয়। 'ফোঁপল মশাই-এর গুয়ো' কথাটিও অস্পষ্ট। নবদ্বীপ কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন—'ফোপল-মশাই' কথাটি 'ফোপল-মশান' কথার বিকৃত রূপ এবং এর প্রকৃত অর্থ ফোপল নামধারী কোনও ডোম দেবী যোগাদ্যার পুজোতে ডোমের যথানির্দিষ্ট অংশ গ্রহণে মর্যাদাস্বরূপ তাকেও পান-সুপারি দিয়ে বরণের এই ব্যবস্থা।

কিন্তু এই অনুষ্ঠানে মাজিগ্রাম কথাটির উচ্চারণমাত্রই মাঝখানে ঢাক বাজিয়ে দিয়ে মালাকরের কথা চাপা দিয়ে দেওয়া হয় কেন? তার ব্যাখ্যাও নানান জনে নানান রকম অনুমান করেন। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলতে চান, মাজিগ্রামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হয়তো ঐ প্রতিনিধিমণ্ডলীর অন্য সব সদস্যের কোনও কালে মতবিরোধ ও কলহ হয়েছিল এবং তার পরিণতিতে মাজিগ্রামের প্রতিনিধি হয়তো ঐ মণ্ডলী থেকে অপসারিতও হয়েছিলেন, ঐ ইঙ্গিতটাই ঢাক বাজিয়ে মালাকরের কথা চাপা দেওয়ার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে। বহু প্রাচীন পদ্ধতি কালক্রমে প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে কী রকম জটিলতার সৃষ্টি করে এ তার এক প্রমাণ এবং এ থেকে দেবী যোগাদ্যারও খুব প্রাচীনতা প্রমাণিত হচ্ছে।

উল্লিখিত অনুষ্ঠানগুলি ছাড়া আরও অনেক বিচিত্র অনুষ্ঠান যোগাদ্যা দেবীর পুজোপদ্ধতি ও বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে জড়িত আছে। তাদেরও নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়।

বৃষ্টি দাও, ধান দাও, সুখ দাও

মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক দু-জনের মধ্যে থাকা চাই—অন্য কোনও সম্পর্ক থাকলে চলবে না। এই মামা-ভাগ্নের কপালে দেওয়া হয় তেল, হলুদ, সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা। বেলকাঠের তৈরি আনকোরা নতুন লাঙল। তাতেও পড়ে সিঁদুরচন্দনের ফোঁটা। এই নতুন লাঙল মামা-ভাগ্নের কাঁধে চাপিয়ে বোশেখ মাসের সংক্রান্তির আগেরদিন বিকেল বেলায় ক্ষীরগাঁয়ের মাঠে মাঠে চাষ দিয়ে বেড়ানো হয়। ঢাক বাজে, পুরনারীরা হুলুধ্বনি দেয়। বোশেখ মাসের ফুটিফাটা মাঠে সাড়া পড়ে যায়। লোকের ভিড় জমে এই চাষ দেখতে। রাত পোহালেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেবী যোগাদ্যা মহিষমর্দিনী উঠবেন ক্ষীরদীঘির জল থেকে। তাঁর বার্ষিক মহাপুজোয় ক্ষীরগাঁ মেতে উঠবে। দূরদুরান্ত থেকে হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো এসে মাতবে সে উৎসবে। মামা-ভাগ্নের মাঠে মাঠে লাঙল টানা সে-উৎসবের সূচনা করে দেয়।

বলা বাহুল্য, এই মামা ভাগ্নে দুটি ষাঁড়। অনুষ্ঠানটির নাম 'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙল'। কখনও লাঙল টানেনি, একেবারে আনকোরা নতুন ষাঁড় দিয়েই এই অনুষ্ঠানটি করণীয়।

বর্ধমান জেলার ক্ষীরগাঁয়ে বৈশাখী সংক্রান্তির দিন যোগাদ্যা দেবীর বার্ষিক মহাপুজো উপলক্ষে যে সমস্ত অনুষ্ঠান-আচার পালন করা হয় এটি তাদের অন্যতম। এই 'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙল' না হওয়া মাসে চাষ দেওয়া নিষিদ্ধ। সংক্রান্তির আগের দিনে এই অনুষ্ঠান আর সংক্রান্তির দিনে মহাপুজো সম্পন্ন হবার পর ক্ষীরগাঁয়ের লোকে মাঠে চাষ দিতে শুরু করে। দেবী যোগাদ্যার উৎসবের মধ্যে এই হলকর্ষণোৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলেছি, ক্ষীরগাঁকে কেন্দ্র করে বর্ধমান জেলার একটা বিরাট অংশ ধরে যোগাদ্যার অর্চনা একটি কাল্টের মত ছড়িয়ে পড়েছে—সুদূর অতীতকালে। ঐ বিরাট অঞ্চলের যে যে গ্রামে যোগাদ্যার পুজো হয় সে-সমস্ত গ্রামেও বৈশাখী সংক্রান্তির দিনে মাঠে লাঙল দেওয়ার কাজ বন্ধ থাকে। কোনও কোনও গ্রামে বোশেখ মাসের আরও কটি দিন এই নিষেধাজ্ঞা পালন করা হয়।

'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙলের' অব্যবহিত পূর্বে ক্ষীরগাঁয়ে আর একটি অনুষ্ঠান হয়—তার নাম 'ক্ষীরকলস'। প্রকৃতপক্ষে এই 'ক্ষীরকলসে'ই ক্ষীরগাঁয়ের বার্ষিক উৎসবের সূচনা হয়, আর তার অনুষ্ঠান শুরু হয় বৈশাখী সংক্রান্তির মহাপুজোর ঠিক এক মাস আগে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে। এই 'ক্ষীরকলস'কেই কেন্দ্র করে যেন বার্ষিক উৎসবের মাসব্যাপী প্রস্তুতিপর্ব চলে।

যে ক্ষীরদীঘিতে দেবী যোগাদ্যা জলতলশায়িনী হয়ে থাকেন, চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকেলবেলায় দেবীর মালাকর বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে সেই দীঘি থেকে একটা ছোট কলসে জল ভরে নিয়ে আসেন 'ময়ূরগড়' নামে এক পুকুরের পাড়ে—যজ্ঞকুণ্ডের জায়গায়। স্তূপাকৃতি উঁচু জমির মাথার স্থাপিত এই যজ্ঞকুণ্ড। বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষের ওপরে এই যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত বলে আমার মনে হয়। এই সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

এই যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ এবং স্তূপের নিচে পাঁঠাবলি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর কলসটি দেবীর বারোমেসে পুজোর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের পূর্বদিকে মাটিতে পোঁতা একটি পাথরের ওপরে রাখা হয়। এর নাম 'গণেশমুণ্ড'। এটি একটি বেলেপাথরের ভাঙা টুকরো—বোধ হয় কোনও কারুকার্যমণ্ডিত পাথরের থামের ভগ্নাবশেষ। খোদাই করা আবর্তন অলঙ্করণের খানিকটা তাতে এখনও রয়েছে—বহুদিনের ক্ষয়ে সেটি এখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আবর্তন অলঙ্করণটিকে দেখে লোকে এটিকে গণেশের মাথা বলে ধরে নিয়েছে, নামও হয়েছে তাই 'গণেশমুণ্ড'। গণেশ বিঘ্ন-হরণ দেবতা। তাই গণেশের মাথায় কলসটা রেখে উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়।

পরামর্শ সভা

সভাপণ্ডিত মহাশয় এসে এই কলসের সামনে দাঁড়ান। উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরোহিত, দত্ত, সামন্ত, চৌধুরী প্রভৃতি গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনরাও এসে সেখানে মিলিত হন। আসন্ন উৎসবের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন সভাপণ্ডিত মহাশয়। প্রথা অনুসারে সকলে যাতে নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হন, অনুষ্ঠানের সমস্ত কৃত্য যাতে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নে যাতে কোনও ত্রুটি না হয়, তার জন্যে তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'পরামর্শ সভা'। এই পরামর্শ শুধু এই চৈত্রসংক্রান্তির দিনটিতেই নয়, বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাপুজোর আগে বৈশাখ মাসের মধ্যে কয়েকবার চলে। আধুনিক বারোয়ারি বা সর্বজনীন পুজোর পুজো কমিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের অনুকরণে অথবা অনুপ্রেরণায় ক্ষীরগাঁয়ে এই প্রথা চালু হয়নি। মান্ধাতার আমল থেকে যোগাদ্যার পুজোয় নানান অনুষ্ঠানের মত এটিও অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানরূপে প্রচলিত আছে। রাঢ়বাংলার সুদূর গণ্ডগ্রামে গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই লোকোৎসব সকলের মিলিত সহযোগিতায় প্রথানির্দিষ্ট কৃত্যানুষ্ঠানে প্রাচীন কৌমসমাজের শৃঙ্খলাশাসিত যৌথ ধর্মাচরণের ইঙ্গিতই যেন বহন করে আনছে।

মাঠে ক্ষীরকলসের জলসিঞ্চন

'গণেশমুণ্ডে' রাখা ছোট কলসের সামনে সভাপণ্ডিতের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠানের পর পুরোহিত ফুল পল্লব-সমেত ঐ ছোট কলস এবং আরও একটি কলসে আনা জল আর একটি তামার বড় কলসে ঢেলে দেবীর বেদীর ওপরে রেখে দেন। এই কলসটিই 'ক্ষীরকলস'। সেটি ঠিক এক মাস সেখানে থাকে। বৈশাখী সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন বিকেলবেলায় এই কলস মাথায় নিয়ে বেরোবেন দত্তমশাই। এই দত্তমশাইরা নিজেদের রাজা হরি দত্তের বংশধর বলে দাবি করেন—যে রাজাকে দেবী যোগাদ্যা স্বপ্ন দিয়ে ক্ষীরগাঁয়ে নিজের পুজো প্রকাশ করেছেন বলে লোকশ্রুতি। হলুদমাখা নতুন গামছা পরে দত্তমশাই ক্ষীরকলস মাথায় নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে কলসের জল ছিটিয়ে বেড়ান মাঠে মাঠে আর সকলের মাথায়। এই ক্ষীরকলসে থাকে ক্ষীরদীঘির জল—যে দীঘির তলায় দেবী যোগাদ্যা সারা বছর থাকেন। এ জল মহা পবিত্র মনে করে মাথায় দেবার জন্যে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটে আসে। যে ভূমিতে এই জলের ফোঁটা পড়ে, মহোর্বরা হয় সে ভূমি, এই কলসের জলে বন্ধ্যা নারী স্নান করলে সে সন্তানবতী হয়—এই বিশ্বাসে ক্ষীরকলসের জলের ভয়ানক আদর। ভূমি ও নারীর প্রজননশক্তির কামনায় আদিম কৃষিজীবী সংস্কারের একটি বিচিত্র প্রকাশ এই ক্ষীরকলস। ক্ষীরকলস থেকে সিঞ্চিত জল যেন আকাশ থেকে নামা অমৃতপ্রবাহিনী বৃষ্টি। বৈশাখের খরদাহনে তপ্ত, তৃণহীন প্রান্তরে সুবৃষ্টির কামনাতে ক্ষীরকলসের জল তাই ছিটিয়ে বেড়ান হয়, আর মনে করা হয় যেন অমৃতরসে সিঞ্চিত ভূমি শস্যভারোৎপাদনের ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তখনই শুরু হয় হলকর্ষণোৎসব। নতুন ষাঁড়, নতুন লাঙল নিয়ে মাঠে মাঠে নতুন চাষের আনন্দে 'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙলের' অনুষ্ঠানে সবাই মেতে যায়। কৃষিকেন্দ্রিক আদিম কৌমসমাজের শস্যোৎপাদনের কামনা, কামনাপূরণের জন্যে পরিকল্পিত বিচিত্র অনুষ্ঠান তুকতাক জাদু এই উৎসবের মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে।

'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙলে' বাপ, জ্যাঠা, খুড়ো কিংবা জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাই—এ রকম বাপের সম্পর্কের বদলে মায়ের দিক থেকে টানা মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক কেন ষাঁড় দুটির মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যায় কেউ যদি এটিকে বাংলাদেশের আদিম নরগোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার বলে মনে করেন তবে তাকে নেহাৎ সুদূরপরিকল্পিত ব্যাখ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'চ্যাঙ-ব্যাঙ' ও মালাকরের বিয়ে

ক্ষীরগাঁয়ে 'ক্ষীরকলস' আর 'মামা-ভাগ্নের হাল লাঙলের' আগে যেমন সারা বৈশাখ মাসে মাঠে চাষ দেওয়া নিষিদ্ধ তেমনই সেখানে মাকরী সপ্তমীতে (মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী) 'চ্যাঙ-ব্যাঙে'র অনুষ্ঠানের আগে মাঠে চাষ দেওয়া আর বিয়ে প্রভৃতি শুভানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। মাকরী সপ্তমীর দিন রাতে যোগাদ্যার মহিষমর্দিনী মূর্তিকে জল থেকে তুলে ক্ষীরদীঘির পাড়ে পুজো, বলি ইত্যাদি দেওয়া হয়। এইদিন সকালে দেবীর বারমেসে মন্দিরের বায়ুকোণে একটি বাঁধানো কুণ্ডের ভিতরে সূর্যের পুজো হয়। এই পুজোর পর ঐ কুণ্ডের দক্ষিণ দিকে ছাই দিয়ে একটি চতুষ্কোণ ভূমণ্ডল রচনা করে তাতে মালাকর লাঙলের ফাল দিয়ে চাষ করে আর ধান ছিটিয়ে দেয়। পুরোহিত ভূমিমণ্ডলেও সূর্যের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করেন। এর পর কতকগুলি চ্যাং মাছ আর ব্যাঙ এই চষাক্ষেতের ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা এই চ্যাঙ-ব্যাঙ ও ছাই-এর কিছু অংশ নিয়ে গিয়ে নিজের নিজের সারগাদায় রাখে—তাদের সারগাদার উর্বরাশক্তির বৃদ্ধির কামনায়। মালাকর গ্রামের উত্তর দিকের জমির চারকোণে কিছু ধান আর মুড়কি পুঁতে রেখে আসে। এই অনুষ্ঠানের পর মালাকর আর তার বৌকে চেলি, চন্দন, টোপর, মুকুট, ফুলের মালা প্রভৃতিতে খাঁটি বরকনে সাজিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করান হয়। ভট্টাচার্যের বাড়ির মেয়েরা এসে বরণ করেন এই বরকনেকে। এই অনুষ্ঠানের পর মাঘ মাসে মাঠে চাষ আর বিয়ের অনুষ্ঠান হতে পারবে।

এই অনুষ্ঠানটিতেও সেই প্রাচীন কৃষিজীবী কৌমসমাজের ভূমির প্রজননশক্তি বৃদ্ধির কামনায় পরিকল্পিত নানান জাদু, বিচিত্র অনুষ্ঠানের রেশ যেন পাচ্ছি। চ্যাঙ-ব্যাঙ ছাড়ার ভেতরে সুবর্ষণের কামনা রয়েছে—মালাকর আর তার বৌ-এর বিয়ের অভিনয় অনুষ্ঠানে কৃষিভূমিতে প্রজননশক্তি আধানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত যেন রয়েছে। আদিম কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ থেকে বিবর্তিত রাঢ়বাংলার গ্রামীণ লোক-উৎসবের এই সমস্ত প্রতীক-অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হচ্ছে নিছক মাটির জগতের কামনা : জল দাও, ধান দাও, সুখ দাও, সন্ততি দাও। এদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক নেই। নেই এ-সমস্ততে মাটির পৃথিবীকে নিচে ফেলে আধ্যাত্মিক উঁচু মার্গে চলে যাওয়া। সম্পূর্ণ লৌকিক চেহারা আর চরিত্র ফুটে উঠেছে এই লোকায়ত সংস্কারে আর সংস্কৃতিতে। এরা আমাদের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর আদিম সংস্কৃতির পরিচয় ব্যক্ত করছে, যে সংস্কৃতির ওপরে জমে উঠেছে যুগযুগান্তের বিভিন্ন বিচিত্র আরও অনেক সংস্কৃতির স্তর। রাঢ়বাংলার এ-সমস্ত লোক-উৎসব বয়ে আনছে ঐতিহাসিক, সামাজিক, নানা বিচিত্র ঘটনার দূরাগত স্মৃতি। সমাজের সর্বস্তরের লোকের নির্বিচারে অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানগুলি প্রকৃত লোকোৎসবেই পরিণত হয়েছে। অবশ্য এদের পূর্ণ তাৎপর্য আজ হারিয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু প্রাচীন প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠানের ভঙ্গিতে তারা গতানুগতিক ধারায় বংশপরম্পরায় আজও বয়ে আসছে।

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় প্রভাব থেকে মুক্ত এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে 'ডোম চোয়াড়ি', 'গুয়াডাকা' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কথা আমার পূর্ববর্তী বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে 'ক্ষীরকলস' ও 'মামা-ভাগ্নের হাল-লাঙলের' কথাও আলোচনা করেছি। নিচে আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি।

গ্রহাচার্যের বর্ষফল ঘোষণা

বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখে 'লগ্ন' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। এই ১৫ তারিখ থেকে যোগাদ্যা দেবীর উৎসবের সমস্ত অনুষ্ঠানে ঢাকবাজনা বন্ধ হয়ে যায়, তার বদলে মাদলবাজনা শুরু হয়। এইদিন গ্রহাচার্য তালপাতায় লালকালিতে লেখা নববর্ষের ফলাফল সকলের সামনে ঘোষণা করেন।

যে বৎসর আচার্যঠাকুরের ঘোষণায় কুগ্রহ মন্ত্রী থাকেন, সে বৎসরে সমবেত জনতা তাঁর হাত থেকে সে পাঁজি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, আর যে বৎসর সুগ্রহ মন্ত্রী হন, সে বৎসরে সকলে তাঁকে কাঁধে নিয়ে নাচে। নানারকম তুকতাক জাদু-অনুষ্ঠানে ভবিষ্যৎ নিরূপণের প্রথা আদিম সমাজের নরগোষ্ঠীর মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। ক্ষীরগাঁয়ের নববর্ষের ফলাফল ঘোষণা তারই এক আধুনিক পরিবর্তিত রূপ বলে মনে হয়। এই 'লগ্ন'—অনুষ্ঠানের আগে সাধভক্ষণ, উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত শুভ সামাজিক কাজ নিষিদ্ধ।

দত্তমশাই-এর কাজ ও ময়ূর নাচ

মহাপুজোর মধ্যে 'ময়ূর নাচ' আর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। বৈশাখী সংক্রান্তির পাঁচ দিন আগে থেকে মহাপুজোর দিন পর্যন্ত পাঁচ-ছবার অনুষ্ঠিত হয় এই নাচ। প্রথম দিন নাচটি চলে 'ময়ূরগড়ে'র যজ্ঞকুণ্ড থেকে পুরনো মন্দির পর্যন্ত সমস্ত পথটি ধরে, আর বাদবাকি দিন পুরনো মন্দিরের প্রাঙ্গণে।

এই অনুষ্ঠানে দত্তমশাই মাথায় পরেন উষ্ণীষ, তাতে জড়ানো থাকে শোলার মুকুট, ফুলের স্তবক, মুকুটের ঝুমকো কানের কাছে দলমল করে। তিনি উষ্ণীষের ওপরে দুহাতে ধরে থাকেন একটি ঝাঁপি—তার মধ্যে থাকে দেবীর জন্যে শাঁখা, সিঁদুর, চেলি, মুড়কি, নাড়ু, পাটালি ইত্যাদি উৎসবের উপাযন। মালাকরও মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে সপল্লব ঘট নিয়ে দত্তমশাই-এর সঙ্গে থাকেন। দত্তমশাই নাচতে নাচতে চলেন, সঙ্গে বাজে মাদল তালে তালে। আর সভাপণ্ডিত, পুরোহিত এবং দত্ত, সামন্ত, চৌধুরী প্রভৃতি ক্ষীরগাঁয়ের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পরস্পরের কাঁধ ধরাধরি করে একটি বেষ্টনী রচনা করে দত্তমশাই ও মালাকরের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। দত্তমশাই যখন নাচতে নাচতে চলেন, তখন কুশমেটে বাগদি সম্প্রদায়ের ৭ জন 'পতাকী' ৭টি পতাকা নিয়ে মাঝে মাঝে দত্তমশাই-এর মাথার ঝাঁপিতে ঠুক ঠুক করে ঠেকায়। ময়ূর নাচ কথাটি বোধ হয় মৌলি নৃত্যের অপভ্রংশরূপ। মৌলি অর্থাৎ শিরোভূষণ পরে যে নাচ হয়, তার নাম মৌলি নৃত্য। মৌলি থেকে মৌরি, মৌর বা ময়ূর কথাটি এসেছে।

হরি দত্ত নামে ক্ষীরগাঁয়ের যে রাজাকে দিয়ে দেবী যোগাদ্যা তাঁর পুজো প্রবর্তন করেছেন বলে কিংবদন্তী প্রচলিত, দত্তমশাইরা তাঁরই বংশধর বলে দাবি করেন। প্রাচীন কৌম সমাজের অধিপতিই ধর্মাচারের কেন্দ্রে থেকে সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিচালনা করত। এই নৃত্যানুষ্ঠানে মালা-মুকুট-উষ্ণীষধারী দত্তমশাই সমাজের সকলের মিলিত বেষ্টনীর কেন্দ্রে এইভাবে নেচে প্রাচীন কৌম সমাজের যৌথ নৃত্যোৎসবে মণ্ডলাধিপতির প্রাধান্যকেই যেন ব্যক্ত করছেন। ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, মালাকর, কুশমেটে (বাগদি), ঢাকি প্রভৃতি সমস্ত জাতের মানুষের একসঙ্গে নৃত্যোৎসবে যোগদানে এটি একটি লোক-উৎসবের চমৎকার নিদর্শন।

বীরদাপে মাটি কাঁপা নাচ

বার্ষিক মহাপুজোয় যোগাদ্যার পুজো দিতে দূরদূরান্ত থেকে যারা আসে ক্ষীরগাঁয়ে, তারাও মাতে অন্য আর এক রকম নৃত্যোৎসবে। সে নাচ 'ময়ূর নাচের' মত ললিতদর্শন নয়। সে নাচ বীরত্বব্যঞ্জক, শক্তিসাধকের ভীমশক্তিপ্রকাশক, অনেক সময় উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খলও বটে। তাদের হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, নগ্ন গা, মাথায় বাঁধা গামছা অথবা লাল ফেটি। তাদের মধ্যে যারা বলিহন্তারক তারা হাতে উঁচিয়ে ধরে প্রকাণ্ড খাঁড়া, বগি, চন্দ্রহাস প্রভৃতি ভীমদর্শন অস্ত্র। অন্য সকলের হাতে থাকে বাঁশের লাঠি, পাতাশুদ্ধ গাছের ডাল। উদ্দাম ঢাক বাজনার সঙ্গে তারা আসে দলবদ্ধভাবে ছুটে, নাচতে নাচতে। মুখে কখনও 'আবা আবা' ধ্বনি তুলে একসঙ্গে সকলে মিলে

উঁচুতে লাফ মেরে পাঁচ সাত হাত দূরে গিয়ে মাটিতে পড়ে, আবার নাচতে নাচতে চলে। এমনি একের পর একদল আসে—তাদের নাচের দাপে মাটি কাঁপতে থাকে। ঘোরতর শাক্তাচারী সব। প্রত্যেকেই আসে সঙ্গে বলির পশু নিয়ে। শুধু বলি নিয়ে নয়, অনেকে আকণ্ঠ মদ খেয়েও আসে উন্মত্ত হয়ে।

মাঝ নেওয়া

ক্ষীরগাঁয়ের পাশাপাশি ইটে, কাঁটা প্রভৃতি গ্রামের দল যখন যোগাদ্যার উত্থান মন্দিরের সামনে এসে হাজির হয়, তখন মহাহুলুস্থুল বেধে যায়। একদল মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেবী যোগাদ্যার মহিষমর্দিনী মূর্তিকে রাখে আগলে। আর একদল জোর করে এসে ঐ মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পূর্ববর্তী দলকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মন্দির দখল করে দেবীকে আগলায়। এইভাবে শক্তিপরীক্ষায় মাথা ফাটাফাটি, হাত-পা জখমও কম হয় না। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'মাঝ আগলানো' অর্থাৎ মন্দির দখল করে দেবীকে আগলানো। লোকে বলে 'জোর যার, যোগাদ্যা তার।' যার গায়ের জোর আছে, সেই যোগাদ্যার সেবাপুজোর অধিকারী। প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দল দেবীকে নিজেদের হাতে ছিনিয়ে আনার যে যুদ্ধে মাতত এই 'মাঝ আগলানো' যেন সেই সংঘাত-সংঘর্ষেরই পুরানো রেশ।

উগল পুজো

শুধু বৈশাখী সংক্রান্তির দিনে নয়, যোগাদ্যার মহিষমর্দিনী মূর্তিটিকে ক্ষীরদীঘির জল থেকে বছরে আরও পাঁচ দিন তোলা হয়—গভীর রাত্রে অল্পক্ষণের জন্যে। ক্ষীরদীঘির পাড়ে চলে তখন দেবীর পুজো-বলি। এ অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া আর কেউ দেবীর দর্শনাধিকার পায় না। বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাপুজোর সময় 'আচণ্ডাল' সর্বজনের স্পর্শদোষ থেকে মুক্ত করার জন্যে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ দেবীকে তোলা হয় অভিষেকের জন্যে। তারপর তোলা হয় পর্যায়ক্রমে আষাঢ়ী নবমী, বিজয়া দশমী, পৌষ মাসের ১৫ই তারিখে আর মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমীতে। এই শেষোক্ত চারটি দিনের পুজো 'উগল পুজো' নামে পরিচিত। 'উগল পুজোর' প্রকৃত অর্থ কী তা নিয়ে নানাজনে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করেন। কেউ কেউ বলেন, ক্ষীরগাঁয়ে নানা সময়ে রাঢ়দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সামন্ত রাজারা এসে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছিলেন, ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে আসা উগলষণ্ডদেবরা তাঁদের অন্যতম। তাঁদের প্রবর্তিত পুজো উগল পুজো নামে পরিচিত হয়েছে। ক্ষীরগাঁয়ের উগলের মাঠ, দেবীর এই উগল পুজোয় তাঁদের এখানে কিছু আধিপত্য কায়েম করার সম্ভাব্য প্রমাণ। কেউ কেউ বলেন, উগল কথাটি আগলা বা আগলানো কথা থেকে এসেছে। দেবীকে সারা বছর জলে ডুবিয়ে রাখা হয়, (সম্ভবত অতীতে কালাপাহাড়ের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল এবং সেই থেকে ঐ প্রথা চলে আসছে) তিনি জলে আছেন, না, অন্তর্ধান করেছেন মাঝে মাঝে তা দেখবার জন্যে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। একেই বলে দেবীকে আগলানো। ঐ সময়ে দেবীর যে পুজো হয়, তার নাম হয়েছে আগলানো বা আগলা পুজো এবং তারই পরিবর্তিত রূপ উগল পুজো।

ক্ষীরগাঁয়ের 'ট্যাবুর' লিস্ট

সারা বৈশাখ মাসটায় ক্ষীরগাঁয়ে নানান কাজ নিষিদ্ধ। মাটিতে চাষ দেওয়া, ধান ভানা, সলতে পাকানো, তাতে কাঠি দেওয়া, স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে শয়ন, পূর্ণগর্ভা নারীর ক্ষীরগাঁয়ে অবস্থান, মাথায় ছাতা দেওয়া—এ সমস্ত বৈশাখ মাসের নিষিদ্ধ কাজের তালিকার মধ্যে প্রধান। তার ওপরে আছে,

ক্ষীরগাঁয়ে কোনও সময়েই কুমোর থাকতে পারবে না। উত্তরদুয়ারী ঘরে কেউ থাকবে না, কেউ দোতলায় পাকা কোঠা তুলতে পারবে না। বৈশাখ মাসের মাসের প্রথম, আর শেষ পাঁচ দিন আর ১৫ তারিখে লগ্নের দিন লেখা নিষিদ্ধ এবং এর আগে বিয়েও নিষিদ্ধ। ঐ কটি দিন বাদ দিয়ে বৈশাখ মাসে লালকালিতে লিখতে হবে। আদিম সমাজের নানান নিষেধাজ্ঞা বা 'ট্যাবুর' কথা আমরা জানি। ক্ষীরগাঁয়ের এ সমস্ত 'ট্যাবু' সেই আদিম সমাজেরই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া— স্বতঃই এই কারণ মনে উঁকি দেয়।

পাদটীকা

রবীন্দ্রনাথ শুধু মানবপ্রেমিক নন, তিনি প্রকৃতিপ্রেমিকও। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস, বায়রন প্রভৃতি রোম্যান্টিক যুগের ইংরেজ গীতিকাব্যকার কবিদের মত তিনিও গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নাটকে, গানে- যেখানেই হাত রেখেছেন, সেখানেই প্রকৃতির রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে নিয়ে মুগ্ধ প্রেমিকের মত উত্তাল হয়ে উঠেছেন। "আকাশভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে পেয়েছি মোর স্থান - বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ," "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো', "ধীরে ধীরে বও উতল হাওয়া, নিশীথরাতের বাঁশি বাজে—শান্ত হও, শান্ত হও," "তুমি সন্ধ্যার তারা, তুমি আমার সাধনা, মম শূন্যগগন বিহারী", "দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা কাঁপাও ঝড়ের বুকে একী ব্যাকুলতা! গগনে সে ঘুরে খোঁজে কাছে দূরে, সহসা কী হাসি হাস, নাহি কহ কথা। আঁধার ঘনায় শূন্যে নাহি জানে নাম, কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম," "ওরে ঝড় নেমে আয় আয়রে, শুকনো পাতার ডালে, এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।" এই রকম অজস্র গানের ডালি নিয়ে মহাকবি ঘুরে ফিরেছেন। উষা, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি, তারার মালা গাঁথা নিশীথ-আকাশ, পূর্ণ চাঁদের মায়ার ভরা নিস্তব্ধ নিশীথিনী, ছটি ঋতু নিয়ে তাঁর গানের ভাণ্ডারকে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীরা নিজেদের কণ্ঠে বরণ করে নিয়েছেন।

উত্তরায়ণে তাঁর পরিকল্পিত হলকর্ষণ উৎসবটি আজও আসন্ন বর্ষার মুখে অনুষ্ঠিত হয়। মাঠে লাঙল দেওয়া, লাঙল দিয়ে চষা মাঠে শস্যবীজ ছড়ানোর প্রারম্ভিক সূচনা এটি। উত্তরায়ণের একটি পরিচ্ছন্ন জমিতে পঞ্চশস্য অর্থাৎ ধান, মাষকলাই, মুগ, যব, আর, তিল দিয়ে সাজিয়ে বৃত্তাকার একটি সুন্দর শস্য-আলপনা তৈরি করা হয়। তারপর একটি অল্পবয়স্ক শাদা রং এর বৃষকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে, শান্তিনিকেতনী শিল্পকলামণ্ডিত বিচিত্র বস্ত্র দিয়ে তার পিঠটি ঢেকে দেওয়া হয়। শিংদুটিতে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, শাদা রঙ লাগিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এক তরুণ কৃষকবন্ধু ঐ শস্য আলপনার উপর দিয়ে হাল-লাঙল বাঁধা বৃষটিকে চালিয়ে নিয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের সূচনা হয় শঙ্খধ্বনিতে। উৎসবের প্রধান পরিচালককে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের বৈদিক শ্লোক সুর করে আবৃত্তি করতে থাকেন। পঞ্চভূতের মনুষ্যপ্রতীকস্বরূপ পাঁচটি বালককে চন্দনচর্চিত করে ফুলের গহনা দিয়ে সাজিয়ে আনা হয়। নানান রং-এর কাগজ রাংতা দিয়ে তৈরি দোলাতে মাটির তৈরি একটি বিচিত্র আধারে একটি ছোট কচি গাছকে বসিয়ে, তাকে ফুলের মালায় সাজিয়ে আনতে আনতে সমস্বরে গাইতে থাকে রবীন্দ্রনাথের গান : "আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল, মানবের স্নেহ সঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্......ইত্যাদি। এই গানটি শেষ হলে আর একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে থাকে : "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ। ধূলিরে ধন্য কর করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ....।"

আহা রে নয়নসুখ কী বিচিত্র শোভা!

আহারে নয়নসুখ কি বিচিত্র শোভা।
বিশাই রচিল ঘট বর্ণিবে গো কেবা।।

হাতে চামর নিয়ে, পায়ে নূপুর পরে মূল গায়েন গান করে মনসার ভাসান। খোল করতাল, মন্দিরা বাজিয়ে দোহাররা তার গানের পিছনে গলা দেয়। মনসা, চাঁদবেনে, বেহুলা, লখিন্দরের কাহিনী, নানান বিচিত্র ঘটনার স্রোত। দেবতা আর মানুষের পাঞ্জা কষাকষি, পরস্পরের শক্তির পরীক্ষা। মর্ত্যলোকে পুজো কায়েম করার জন্যে একদিকে মনসার প্রাণপণ চেষ্টা, তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর দারুণ আক্রোশে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার উদগ্র কামনাতে নিষ্ঠুর নিয়তির মত অমোঘ চক্রান্তজাল বিস্তার আর অন্যদিকে 'চ্যাংমুড়ি কাণীর' পুজো না করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চাঁদবেনের দারুণ ঘৃণা, ক্রোধ, তেজ বারবার মনসাকে প্রত্যাখ্যান। তাতে কুপিত মনসার ষড়যন্ত্রে পদে পদে চাঁদবেনের কি কম দুর্গতি? তার বাণিজ্যের নব-লক্ষ বেসাতভরা চৌদ্দ ডিঙা কালিদহের জলে ডুবেছে। ছটি ছেলের প্রাণনাশ ঘটেছে। ঘরে শোকাতুরা স্ত্রী সনকার অহর্নিশ বিলাপে ধনঞ্জয়-পুত্রহারা চাঁদের বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু দুর্জয় সে—মনসার পায়ে মাথা নত করবে না। আর সেই সূত্রে ঘটনাপরম্পরায় এগিয়ে এল অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণাময় সকরুণ পরিণতি। লোহার বাসরঘরে বিয়ের রাত্রেই নবোঢ়া বেহুলার বৈধব্য, মরা স্বামী লখিন্দরকে বাঁচাবার জন্যে গাঙ্গুড়ের জলে কলার মান্দাসে ভেসে তার নিরুদ্দেশ নিঃসঙ্গ শবযাত্রা, সে-দুশ্চর্য ব্রতের সাফল্য, অবশেষে পরাজিত আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়া চাঁদবেনের মনসার পুজো অনুষ্ঠান। পালায় পালায় ভাগ করা, ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা ঘটনার ঢেউ-এ উত্তাল মনের বহু বিচিত্র ভাবাবেগের রঙে রঙিন নক্সাখচিত এক বিশাল কাহিনী।

মন্ত্রমুগ্ধ নরনারীর দল শোনে এই উপাখ্যান। এই উপাখ্যান নিয়ে বাংলাদেশে কত মনসামঙ্গল, মনসার ভাসান, মনসার গান, মনসার পুঁথি-পাঁচালি তৈরি হয়েছে। শুধু বাংলার নয়, বিহার আর আসাম রাজ্যও এই কাহিনীকে নিয়েছে, কথা-কাব্য রচনা করেছে। গ্রামে গ্রামে লোক-কবিদের এই সমস্ত রচনার কত আদর। শুধু পুরনো কবিদের রচনা নিয়ে নয়, গায়কের দল নিজেরাও গান বেঁধে সেগুলি গান করে। নিরক্ষর সাপের ওঝা, গুণিন বিষবেদে মেয়ে-পুরুষের দল বংশপরম্পরাক্রমে নিজেদেরই তৈরি গান গেয়ে চলেছে। এই সমস্ত গানের আসরে ভিড় কম হয় না আজও। নিছক ভক্তিরসের টানেই কি এ-গান সবাই শুনতে আসে? সংসার রণাঙ্গনে দুঃখ, দুর্গতি, দারিদ্র্য, অভাব, রোগ, শোক, শোষণ, লাঞ্ছনার সঙ্গে নিয়ত লড়াই এ পীড়িত, আর্ত নরনারীরা এই উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি—চাঁদবেনে, সনকা, বেহুলা, লখিন্দরের মধ্যে আত্মজীবনের ছায়া কি খুঁজে পায়? মনে হয়, মনসার গানের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে এই একাত্মতার অনুভূতির জন্যেই যেন এ-গানের আবেদন লোকসমাজের কাছে আজও ফুরিয়ে যায়নি।

জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত মনসা পুজো

বাংলাদেশে—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব অঞ্চলেই মনসার এই গান হয়। সারা শ্রাবণ মাসটা পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে মনসার ঘট পেতে পুজো আর পুঁথিপাঠ চলে। তা ছাড়া মনসামঙ্গলের গায়কের দল এসে পালা গান করে, ক্রমান্বয়ে কয়েক দিন ধরে। কলকাতার আশেপাশে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের কলোনিগুলি ঘুরলে মনসা পুজোর ধুম চোখে পড়ে। পূর্ববঙ্গবাসীদের ঘরে সাধারণত শ্রাবণসংক্রান্তিতেই এই পুজোর পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে বরিশাল অঞ্চলে কারও কারও ঘরে রয়ানিগানের পালা বসে ভাদ্র মাসে এবং বছরের অন্য সময়েও নানা উপলক্ষে। এত লোকপ্রিয় এ গান।

পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু মনসার পুজো চলে অনেক দিন ধরে। রাঢ় অঞ্চলে এ পুজো শুরু হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরার দিন, আর একের পর এক গ্রাম হতে হতে এ শেষ হয় কার্তিক মাসে বকপঞ্চকের সময়ে। এই কমাস ধরে রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে মনসার মন্দিরে বা 'থানে' চলে বার্ষিক মহাপুজো। নানান জায়গা থেকে আসে সাপের ওঝা-গুনিন, বিষবেদের দল। তাদের ঝাঁপান-খেলা হয়, মেয়েপুরুষে বিষমঢাকি, খঞ্জনি, ধামসা, ঢোল, মন্দিরা বাজিয়ে মনসার গান গায়। এই উপলক্ষে মেলা বসে, লোকজনের ভিড় জমে। রাঢ়দেশের গ্রামাঞ্চল সারা বর্ষাকালটা এই লোকোৎসবে মেতে ওঠে।

মনসার ঘট তৈরির ইতিকথা

মনসার গানের কথাতেই ফিরে আসি। আসরে গায়েন গান করে চলেছেন—প্রবল-প্রতাপান্বিতা মহামহিমময়ী দেবী মনসার কাহিনী। ঊনকোটি নাগ তাঁর রাজ্যের অনুগত প্রজা, সন্তান-সন্ততি। তিনি নাগেশ্বরী, বিষম্ভরা, বিষহরী।

অমৃতনয়না দেবী বিষনয়নে চায়।
চক্ষের পলকে জীব ভূমিতে লুটায়।।

আবার তাঁরই অমৃতনয়নের দৃষ্টিপাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, বিষজর্জর মানুষ প্রাণ ফিরে পায়, বিষমুক্ত হয়। এত প্রতাপ! এত মহিমা! হায়! তবু মনসার মনে বড় খেদ :

সামান্য দেবতা বলি সবে উপহাসে।
মর্ত্যে যদি না পূজিল বাঁচিব কি আশে।

জন্মদাতা পিতা শিবের কাছে ছোটেন মনসা। বলেন : 'জন্ম যখন দিয়েছ, তখন মর্ত্যে পুজোর ব্যবস্থা করে দাও।'

সত্যি তো শিব সে দায়িত্ব এড়াবেন কী করে! তাঁরই তো কামবিহ্বলতায় পুষ্পবনে গোপনে মনসার জন্ম হয়েছে। জন্মকাহিনীর কলঙ্ক গায়ে মেখে মনসা শিবের ঘরে এসে শান্তিতে নেই—সৎমা চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর দিনরাত বাদ-বিসংবাদ, কলহ-কোলাহল লেগে আছে। চণ্ডীর হাতে দৈহিক লাঞ্ছনা, আক্রমণ থেকেও মনসা রেহাই পাননি। ক্রুদ্ধা চণ্ডী মনসার একটি চোখ গেলে দিয়ে 'চ্যাংমুড়ি কাণী' বানিয়েছেন। তবু মর্ত্যের লোক যদি তাঁর পুজো করত তিনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু তারই বা উপায় কী? কে তাঁর পুজো প্রচার করবে, কী ভাবে তাঁর মহিমা ছড়াবে? তাই শিবের কাছে গেছেন ক্ষুব্ধ কন্যা।

শিব উপায় বাতলান। বিশাই বা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠালেন, মনসার পুজোর জন্য একটি দিব্যঘট তৈরি করে দেবার জন্যে তাঁকে ফরমাস দিলেন। এই ঘট নিয়ে শিব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মর্ত্যে যাবেন, প্রথমে রাখাল ছেলে, তারপর জেলেদের ঝালু, মালু দুই ভাইকে মনসার মাহাত্ম্য বুঝিয়ে তাদের দিয়ে মনসার পুজো করাবেন। তাদের তিনি বললেন : ধন চাও? জন চাও? সুখ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি চাও? তবে দেবী মনসার এই ঘট পুজো কর। তিনি সন্তুষ্ট হলে যা চাইবে, তাই মিলবে। আর মানুষের চরম শত্রু সাপ থেকে তোমাদের কোনও ভয় থাকবে না। আর যদি না পুজো কর, তবে সবংশে নিধন!

ঐ সব কামনা পূর্ণ হোক—এ কে না চায়! ঝালু, মালু, রাখাল ছেলের দল প্রথমে পুজো আরম্ভ করল। মনসার বরে তাদের ধন, জন, সুখ, সম্পদ উথলে উঠল। তারপর ঘটনাক্রমে মনসার ঘট কেমন করে গিয়ে উঠল মনসার চরম শত্রু চাঁদবেনেরই ঘরে তাঁর স্ত্রী সনকার মারফৎ, গোপনে অবশ্য—গায়েন তা বর্ণনা করতে থাকেন।

শিবের ফরমাসমত মনসার যে ঘটটি গড়ে আনলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, মূল গায়েন পায়ের

নূপুর বাজিয়ে, হাতের চামর দুলিয়ে গান করে তা বর্ণনা করে যায় :

আহা রে নয়নসুখ কি বিচিত্র শোভা।
বিশাই রচিলা ঘট বর্ণিবে গো কেবা।
অতি সুগঠন ঘট কৈল বিচক্ষণ।
মনসার রূপ লিখে চিত্তবিমোহন।।
নাগসিংহাসন মাঝে নাগেশ্বরী বসে।
নাগবেণী এলাইয়া পদ্মমুখী হাসে।
নাগের তাড়ঙ্ক বাজু শতেশ্বরী হার।
কঙ্কণ মুকুট নূপুর যত অলঙ্কার।।
একে একে সুরঙ্গে সব লিখিলা কৌশলে।
নাগগণে চৌদিকে লিখে দলে দলে।।
পদ্মহাতে বিষমুখা নাগ থুইলা লিখে।
জননী সোহাগে তারে চুম্বয়ে মুখে।।

বাংলার লোকশিল্পীরা আজও এই নয়নসুখ মনসার ঘট তৈরি করছে। শুধু মনসার ঘট নয়, মনসার পুজোর জন্যে মাটিতে, শোলাতে, পটে কত বিচিত্রদর্শন মনসামূর্তি তারা রচনা করছে। লোকশিল্পের সহজ সারল্য আব মাধুরীতে অভিষিক্ত সেইসব বিচিত্রদর্শন রচনা আশ্চর্য গড়নে, নক্সায়, রূপপরিকল্পনায় আজও অতুলনীয় হয়ে আছে।

একটি পুরনো কাল্ট

ঘটে মনসার পুজো—শুধু মনসা কেন, সব দেব-দেবীর পুজো খুব পুরনো একটি 'কাল্ট' বলে মনে হয়। তবে মনসার সঙ্গে বিষ আর অমৃত, মৃত্যু আর জীবন—এই দুটি ভাবনাই বেশি করে জড়ানো। সেইজন্যেই মনসার ঘট যেন মনসার অমৃতঘট—অমৃতনয়না, অমৃতময়ী দেবীর আবির্ভাবে ঘট অমৃতে পূর্ণ। এই ঘটের অমৃতসিঞ্চনে সর্পাহত, মৃত প্রাণ ফিরে পাবে—এই ভাবনাই যেন প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের ভিত্তির ওপরে গড়ে উঠেছে। বিজয়গুপ্ত এবং বাংলার অন্যান্য প্রাচীন মনসামঙ্গল রচয়িতাদের গানে মনসার ঘট-পুজোর কথা যত বেশি বলা হয়েছে, মূর্তি বা পটে পুজোর কথা তত নেই। বিজয়গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গলে মনসাকে আহ্বান করছেন : "ঘটে আসি লও ফুল পানি।" বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলেও এই ঘট-কাল্ট প্রচলিত। ঐ সমস্ত অঞ্চলে মনসার ঘটকে বলে বার বা বারি। বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ে আছে : "একচিত্তে ধ্যান করি পূজিল সুবর্ণবারি পদ্মা-পদ পূজে একমনে।" কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের গানে আছে : "সিংহাসনে দুটি বারা গলায় পুষ্পের ঝারা সুরঙ্গ সিন্দুর কেয়াপাতে।" বারি-কথাটি এসেছে বারক থেকে। বারি আর বারকের অর্থ যথাক্রমে ছোট আর বড় ঘট। শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যেই নয়, বাংলার ক্লাসিক্যাল রীতিতে গঠিত পাথরের প্রাচীন মনসা মূর্তিতেও দেবীর চরণের কাছে ঘট উৎকীর্ণ আছে—তার মুখে কোথাও প্রস্ফুটিত পদ্ম, কোথাও সিজগাছের পল্লব, কোথাও বা উদ্যতফণা সাপ দেখা যায়। ময়ূরভঞ্জের খিচিং প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত কুম্ভধারী নাগ-নাগিনীর মূর্তির কয়েকটি নিদর্শন আছে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। নগেন্দ্রনাথ বসুর রচিত 'Archaeological Survey of Mayurbhanj Vol. I'-এ ঘটধারিণী মনসার বিবরণ ও ছবি আছে। মনসার অর্চনার সঙ্গে এই ঘট-কাল্ট যে বিশেষভাবে জড়িত—এ সমস্ত তারই নিদর্শন।

ঘট-কাল্ট যে বৈদিক যুগেও ছিল, ঋগ্বেদের 'সোম-কলস' সম্পর্কিত উল্লেখে তার পরিচয়

রয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন তার হদিশ দিয়েছেন তাঁর সংকলিত উপক্রমণিকাটিতে (এশিয়াটিক সোসাইটির 'বিবলিওথেকা ইন্ডিকা' পর্যায়ের গ্রন্থে)।

বহুস্তরের সংস্কার

মনসাকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন বিচিত্র লোকশিল্পের সম্বন্ধে আলোচনার আগে এই কথাটি বলে নিই—অনেক দেবদেবীর মত মনসা দেবীও আদিম কৌম সমাজের মনোভূমিতে জন্মেছিলেন। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের আলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষকমণ্ডলীর সন্ধানী চোখই তাঁর এই কুলপঞ্জি ও জন্মকাহিনী আবিষ্কার করেছে। অবশ্য মনসা নামটি আর্যপূর্ব দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের কাছ থেকে ধার করা, না, এটি ভারতের আর্যদেরই কাছ থেকে পাওয়া সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। নাম যাইহোক, মনসার অর্চনার ওপরে স্তরে স্তরে ভারতের আর্যপূর্ব আদিম জনগোষ্ঠীর এবং বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সমাজের চিন্তাধারা সংস্কার ও ধর্মচর্যার অনেক পলিমাটি সঞ্চিত হয়েছে। সেই স্তরভেদগুলি আজও সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়নি দেখা যাচ্ছে। উঁচুতে আর্য-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য স্তরের চিহ্ন দেখি তার শাস্ত্রীয় ধ্যান তৈরিতে, তিনি বীজ, ন্যাস, পুজোপদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়মও লাভ করেছেন। ঐ ধ্যানের অনুসরণে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পকলায় তাঁর পাষাণমূর্তিও তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের দশম-একাদশ শতকের পাথরের মনসা মূর্তিগুলি তার নিদর্শন। হাল আমলে চিত্রিত সজ্জিত মাটির প্রতিমারও পুজো প্রচলিত। আবার প্রাগার্য আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক মুহী, সিজ অর্থাৎ তেশিরে গাছের পুজোতে ব্যক্ত হচ্ছে। সাপের মূর্তি গড়ে, কিংবা মাটিতে অথবা কাঠের পিঁড়িতে আলপনায় সাপের ছবি এঁকে মাটির সরায় দুধ-কলা দিয়ে পুজো- -এসবও সেই আদিম অনুষ্ঠানেরই স্মৃতিবহ। এ ছাড়া বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে মনসার থানে বা স্থানে এবড়ো-খেবড়ো নুড়ি, পাথর, মাটির হাতি, ঘোড়া, কলস প্রভৃতি মনসার নামে ঘটা করে পুজো পায়। নৃতাত্ত্বিকদের ভাষায় এ সমস্তই আদিম সমাজের 'কাল্ট' বা ধর্মচর্যার সহায়ক উপজীব্য বস্তু।

নানা কৌমে বিভক্ত আদিম জন-গোষ্ঠীর মধ্যে মনসার পুজো স্বতন্ত্রভাবেই প্রচলিত হয়ে থাকুক কিংবা এদের প্রভাবে অন্য কৌমে তা সঞ্চারিত হয়ে থাকুক, ঐ সমস্ত বিভিন্ন কৌমের নিজের সংস্কার, কল্পনা ও পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যকে তারা ছাড়েনি। অতীতের সেই বিভিন্ন কৌমসমাজের স্বাতন্ত্র্যই আজ বাংলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—সব অঞ্চলেই মনসা পুজোর মধ্যে শুধু আচার-অনুষ্ঠানে নয়, মনসার ঘট, পট, মূর্তি প্রভৃতি তৈরির ব্যাপারে বিভিন্ন রুচি, রীতি, রূপ-পরিকল্পনা, বিপুল বৈচিত্র্যের ঐতিহ্য বহন করে এনেছে। লোকশিল্পীদের হাতে লোককলার মাধুরীমাখানো সেই সমস্ত যে বিপুল বিচিত্র সৃষ্টি আজও হচ্ছে, তাদের কিছু বিবরণ আমার পরবর্তী প্রবন্ধে উপস্থাপিত করব।

কত বিচিত্ররূপিণী!

লোককলার রূপ, গড়ন, নক্সা, রঙের কত না বিচিত্র ঐশ্বর্য সারা বাংলায় ছড়ানো! সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দললিত ভঙ্গি এই কলার। কিন্তু কী দুর্বার, নিরঙ্কুশ তার আবেগ! যেখানে এ কলা ধর্মাশ্রয়ী সেখানেও শাস্ত্রের কড়া অনুশাসন তার নির্ভীক বলিষ্ঠ প্রকাশকে পঙ্গু করে রাখতে পারেনি। একই বিষয়বস্তু নিয়ে সৃষ্টি—কিন্তু অঞ্চলে অঞ্চলে কত বিভিন্ন, কত স্বতন্ত্র সুন্দর তাদের প্রকাশভঙ্গিমা। অনেক বিচিত্র প্রাচীন জনগোষ্ঠী বিরোধ, সংঘর্ষ, সমন্বয় ও মিলনের পথে বাঙালির জাতিগত, সংস্কৃতিগত উদ্ভব, বিকাশ, পরিণতি ঘটিয়েছে। সেই আদিম রুচি, সংস্কার, প্রবণতা, কল্পনার বৈচিত্র্যই আদিম স্তর থেকে লোককলার পরিণতিতে পৌঁছেও একেবারে হারিয়ে যায়নি। তাই বাংলার অঞ্চলে অঞ্চলে বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত লোককলার এত বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্য, বহুরূপ। বাংলার লোককলার এই বৈশিষ্ট্য মনসার পুজো উপলক্ষে রচিত ঘট, বারি, মেড়, মূর্তি, করণ্ডী প্রভৃতি শিল্পবস্তুতে কেমন প্রকাশিত হয়েছে নিচে তার কিছু বিবরণ উপস্থাপিত করছি।

বরিশালের মনসার ঘট

বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা গায়ে মনসার ছবি আঁকা মাটির ঘটই সাধারণত পুজো করে। বরিশালের লোকশিল্পীরাই ঐ মনসা ঘট তৈরি করে আর ছবি আঁকে। দেশ বিভাগের পর এরা যাদবপুর, সোদপুর, নৈহাটি, হাবড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কলোনিতে এসে উঠেছে। কলকাতায় উল্টোডিঙি অঞ্চলেও এদের কয়েক ঘর আছে।

এই ঘটের ডৌল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর তলার দিকটা খুবই মোটা। আর সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে সরু মোটা হয়ে উঁচুতে উঠে গেছে সে ডৌল—সাপের মত এঁকে বেঁকে; একেবারে উঁচুতে গিয়ে সংযোজিত হয়েছে চ্যাপটা ধরনের বড় খুরির মত গড়নের কানার সঙ্গে। এই ধরনের ডৌলে কানাশুদ্ধ ঘটটা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে বসা ফণা প্রসারিত সাপের চেহারা নিয়েছে। আর এক ধরনের ঘটও দেখা যায় যাদের ডৌল মোটা থেকে উঁচুতে একেবারে সরু হয়ে গেছে। আবার গ্রীক এবং রোমান ভাসের গড়নেরও আদল চোখে পড়ে, এমন ঘটও দেখেছি। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে এমনি একটি ঘটের নিদর্শন আছে। বাংলাদেশের এক এক পুজোয় কত বিচিত্র ডৌলের ঘটই না ব্যবহৃত হয়। দুর্গাপুজোর সময় ব্যবহৃত দেবীঘটেরও গড়ন কম বৈচিত্র্যমণ্ডিত নয়। এসব গড়নে খুব পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এদের তাৎপর্যও কম নয়।

মনসার ঘটের ছন্দময় ডৌলের সঙ্গে তাল রেখে শিল্পী ঘটের সামনের দিকটাতে সমস্ত গাটা জুড়ে নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত মনসার ছবি এমনভাবে আঁকে যে, ঘটের আশেপাশে কোথাও একটুও খালি জায়গা আর নজরে পড়ে না; তখন মনে হয়, মনসার ছবি নয়, হাঁটু মুড়ে বসা মনসার একটি অখণ্ড মূর্তিই যেন দেখছি। এমনকি ওপরের কানাটি পর্যন্ত মনসার শিরোভূষণের অংশ কিংবা নাগছত্রের আভাস দেয়। দ্বিমাত্রিক ছবি ত্রিমাত্রিক মূর্তিতে পরিণত। বংশপরম্পরাক্রমে বয়ে আসা কত পাকা শিল্পজ্ঞান আর নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে লোকশিল্পীর এই সৃষ্টিতে!

ঘটের গায়ে মনসার যে ছবিটি আঁকা হয় তারও বৈশিষ্ট্য কম নয়। দুপাশে এলানো ঘন কালো চুলের রাশির মাঝখানে জ্বল জ্বল করছে হলদে মুখখানি। পরনে টকটকে লাল শাড়ি। মাথায় নাগমুকুট, কানে নাগকুণ্ডল, গলায় নাগহার আর চার হাতের মুষ্টিবন্ধনে চার নাগ। শাড়ির ভাঁজগুলোও যেন নাগমণ্ডলীর মত দেবীর সারা অঙ্গে জড়ানো। দীর্ঘ বিস্ফারিত চোখ, দৃঢ় বন্ধন, সরু ঠোঁটের রেখা। আর বুকের মাঝখানে ধরা হাতদুটোর দৃঢ় মুষ্টিবন্ধনে দুটি নাগ। এসব মিলিয়ে

সমস্ত চেহারাখানিতে একটা খুব শক্ত আর দৃঢ়প্রত্যয়ী আত্মসচেতন ভাব এনে দিয়েছে। যে দেবীকে অনেক ছলে, বলে, কৌশলে পৃথিবীতে চাঁদবেনের হাত দিয়ে পুজো প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে, তার এমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ীর রূপ ছাড়া আর কোন রূপে মানায়! ঘটের গড়নের ছাঁদে, মনসার চিত্ররূপে আদিম কৌম সমাজের রহস্যময় প্রাচীন দূরাগত ধর্মচর্যার স্মৃতিরেশের সঙ্গে বাংলার লোকশিল্পের সহজ স্বচ্ছন্দ লাবণ্যময় সংযোজন ঘটেছে।

ঢাকা অঞ্চলের নাগমণ্ডলী

পূর্ববঙ্গে ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন মাটির নাগ গড়ে পুজোর রেওয়াজ আছে। ঐ সমস্ত অঞ্চলের শিল্পীরা গড়েন মাটির নাগ। কেউ গড়েন অষ্টনাগ, কেউ নবনাগ, কেউ বা বাইশ, বত্রিশ, বিয়াল্লিশ, একশ-আট নাগ। নানা বর্ণে চিত্রিত প্রসারিতফণা এই নাগপুঞ্জ গ্রামীণ শিল্পীদের অপরূপ সৃষ্টি।

রাঢ়দেশের বারি ও মেড়

আগেই বলেছি বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলে মনসার ঘটকে বলে মনসার বারি। এই অঞ্চলে মনসা, বেহুলা, লখিন্দর, নেতা ধোপানি, চাঁদসদাগর প্রভৃতির মূর্তি গড়ে সাপের চালচিত্রবেষ্টনীর মাঝখানে সারি সারি বিন্যস্ত করে ছোট, বড়, মাঝারি নানান আকারের আর এক ধরনের জিনিস গড়া হয়। তার নাম মেড়। কথাটি বোধ হয় মণ্ডপ কথা থেকে এসেছে। চালচিত্রটি তো মণ্ডপেরও এক সংক্ষিপ্ত শিল্পময় রূপ। রাঢ় অঞ্চলের এই বারি আর মেড় এক আশ্চর্য লোকশিল্প। বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার তালডাংরা থানার অন্তর্গত পাঁচমুড়ো গ্রামের শিল্পীরাই মুখ্যত এই শিল্পকর্মের স্রষ্টা। সেখানে দেখেছি, প্রায় ২০/২৫ ঘর কুম্ভকার এই বারি, মেড় আর বড়ম, ভৈরব, রুদ্রাসিনি, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি অভিধেয় হাতি, ঘোড়া তৈরি করছে বংশপরম্পরাক্রমে। এই দেবতাগুলির নামই সাক্ষ্য দিচ্ছে—আদিম কৌম সমাজের স্তর থেকে এরা সুদূরকাল ধরে চলে আসছে।

মনসার বারিগুলোর চেহারা কিন্তু সাধারণ ঘটের মত গড়ন হয়—কখনও লম্বাটে, কখনও গোলাকার কখনও বা চ্যাপ্টা হাঁড়ির ধরনের। আবার কোনও কোনওটিতে গ্রীক এ্যামফোয়ার আদলও চোখে পড়ে। এই সমস্ত বারির চারধারে থাকে সাপের অলঙ্করণ—ফণা তোলা সাপের সারি। কখনও কখনও বারির কানার কাছে মনসার মুখটি মাত্র, কখনও বা পূর্ণাবয়ব মূর্তিও সংযোজিত হয়। মনসার মূর্তির পাশে নেতা ধোপানির আর বেহুলার মূর্তিও কখনও কখনও দেখা যায়। মনসা পুজোর সময় এই বারি মাথায় নিয়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউরি, গোয়ালা প্রভৃতি জাতের মেয়ে-পুরুষেরা মনসার গান গাইতে গাইতে জল ভরতে যায়। মনসার থানে সিঁদুরমাখানো এই সমস্ত বারির পাশে থাকে ছোট বড় নানান সাইজের হাতি, ঘোড়া। তারাও কেউ মনসা, কেউ মনসার বোন বলে পুজো পায়।

বাঁকুড়ার শিল্পীরা মনসার যে মেড় তৈরি করে তার শিল্পসৌন্দর্য আর রচনাকৌশল অসাধারণ। এই মেড়গুলো উঁচুতে এক ফুট থেকে আট-দশ ফুট পর্যন্ত, চওড়াতেও প্রায় ছ-সাত ফুট পর্যন্ত হয়। একটি ঘটকে কেন্দ্র করেই এই মেড় তৈরি হয়। কিন্তু সেটি এমনভাবে তৈরি হয় যে, মূল ঘটটি আর চোখে পড়ে না, পেছনেই থেকে যায়। সবার নিচে থাকে নৌকার মত ভিত্তি,—বৈঠক বা বৈঠা তার নাম। এই বৈঠক কোথাও একটা, কোথাও দুটো, কোথাও তিনটে, চারটে, পাঁচটাও দেখেছি। এই বৈঠকের ওপরে নিচু থেকে উঁচুতে থাকে, তলায় তলায় থাম, ফুল, পুতুল, অলঙ্কৃত আলসে, কার্নিস, খিলান প্রভৃতি গড়ে তোলা হয়—ঠিক স্থাপত্যশিল্পের ভঙ্গিতে। আর সেই প্রতিটি থাকে বা

তলায় মূর্তির সমারোহ। নিচে থেকে গেঁথে তোলা এই প্রকাণ্ড উঁচু গড়নগুলোকে একসঙ্গে অদ্ভুত কৌশলে জুড়ে দিলে সেটা একটা যেন অখণ্ড স্থাপত্যশিল্পকলাময় বিচিত্র ইমারতের রূপ নেয়। এই বিরাট মেড় বা ঝাড়গুলোতে (এগুলো ঝড় নামেও অভিহিত হয়) কোনও রকম তার, কাঠি, অথবা খড়-কাঠের কাঠামো ব্যবহার করা হয় না, অথচ কী স্বচ্ছন্দে এই বিরাট মেড়গুলো গড়ে তোলা হয়।

মেড়ের সবচেয়ে নিচু থাক বা তলাতেই মূর্তির প্রাচুর্য বেশি। সেখানে নৌকার ওপরে যে বৈঠক গড়া হয়, তা নাগেশ্বরী দেবী মনসার উপযুক্ত বৈঠকখানাই বটে। কেন্দ্রস্থলে বসে থাকেন মনসা—মনসামঙ্গলের মহামহিমময়ী নায়িকা, তাঁর এক হাতে সাপ আর এক হাতে অভয়। আর তাঁর দু'পাশে বেহুলা, নেতা ধোপানি, লখিন্দর, বেহুলা, চাঁদসদাগর, ধন্বন্তরি, পুরোহিত, মাঝিমাল্লা প্রভৃতির দল—যাদের নিয়ে মনসামঙ্গলের রঙ্গভূমিতে তাঁর লীলারঙ্গ। দোতলায় রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, খোলকরতাল হাতে টিকিওলা বৈষ্ণব, গরুড়, হনুমান প্রভৃতি। সবার ওপরের তলাতে কখনও কখনও দেখা যায় কার্তিককে ময়ূরের পিঠে। সমস্ত থাকগুলোকে বাইরে থেকে ঘিরে ওঠে ফণাতোলা সাপের মণ্ডন— কখনও গোলাকারে, কখনও বা সোজা, কখনও বা সমান্তরাল অথবা কোণাকুণিভাবে। এইভাবে সমস্ত মণ্ডনটা একটা অপরূপ নাগময় চালচিত্তিরের চেহারা নেয়।

মেড়গুলি শুকিয়ে গেলে বর্ণক মাটির লেপ দিয়ে পোনের ভেতরে ঘুঁটে, ধানের তুষের আগুনে এদের এমনভাবে পোড়ানো হয় যে, ধোঁয়া বাইরে যেতে পারে না। ফলে মেড়গুলো পুড়ে ঝামার মত ঝনঝনে শক্ত আর ঘোর কালো তেলচকচকে রঙ ধরে।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর মূর্তিগুলোর ছন্দময় গঠন পরিকল্পনা। খুব কড়া, সবল সে গঠন, আদিম প্রাণশক্তির তীব্র নিরঙ্কুশ প্রকাশে তারা বেগবান। দেহের তুলনায় মুখটাই খুব বড় আর বাঁশের চিয়াড়ি দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে চোখ, মুখ, ঠোঁট, কাপড়ের অলঙ্করণ উৎকীর্ণ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ক্ষুদ্রাকার—কোথাও খুঁটিনাটি দেখাবার চেষ্টা নেই। হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় গোলভাবে পাকানো, নয়তো উঁচু থেকে সোজা নেমে এসেছে নিচে, কোনও দিক না ভেঙে, না তীক্ষ্ণকোণ তৈরি করে।

বাঁকুড়ার কাঁকুরে মাটিই শিল্পীর হাতে এই ধরনের গড়ন এনে দিয়েছে। এইরকম মাটিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটি নাটি সুস্পষ্ট সুডৌল কিংবা কৌণিক গড়ন তোলা সম্ভব নয়। শিল্পীর হাত তাই হয়েছে খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাই বলে সে কারও মূল বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দেয়নি। চাঁদসদাগরের চুলের টেড়ি কিংবা কোমর থেকে দোদুল্যমান কোঁচা, কৃষ্ণের ধড়াচূড়া, খোল করতাল বাজানো বৈষ্ণবের মাথার টিকি, মাঝি-মাল্লার মালকোঁচা মেরে কাপড় পরার ভঙ্গি, বেহুলা কিংবা রাধার মাথার ঘোমটাখানি—এসব আশ্চর্য সূক্ষ্ম রসবোধ আর নিপুণতার সঙ্গে রূপ পেয়েছে। কিন্তু অবান্তরকে বাদ দিয়ে মূল সংক্ষিপ্ত সারবস্তু গ্রহণে, উপজীব্য বিষয়ের গড়নের এই বিশুদ্ধতার দিকে হাত বাড়ানোতে পাঁচমুড়োর গ্রামীণ শিল্পীর এই রচনাকে মনে হয় ইঙ্গিতধর্মী, এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সমগোত্রীয়।

আর, মূর্তিগুলো গঠন-পরিকল্পনায় বিন্যাস-কৌশলে স্বয়ংসম্পূর্ণ; বিচিত্র বর্ণ-প্রলেপের কোনও দরকারই হয় না। যখন রাঢ়দেশের গ্রামাঞ্চলের নিভৃত মনসার থানে আলো-আঁধারি কুঁড়েঘরের ভেতরে এই সমস্ত মেড়ের সামনে দিনের বেলায় একফালি রোদ্দুর এসে পড়ে, কিংবা সন্ধ্যেবেলায় একটি মিটমিটে পিদ্দিম জ্বলে ওঠে, তখন তেল-কুচকুচে কালো, সিঁদুর মাখানো এই সমস্ত মেড়ের ওপরে আলো যেন পিছলে পড়ে। এতে উজলে ওঠে তার সমস্ত কুলুঙ্গি, কার্নিস, আলসে, খিলানের অলঙ্করণ, মূর্তিগুলোর গোল গড়ানো বাহুবিভঙ্গ, দেহের সঙ্গে চ্যাপটাভাবে সংযোজিত বস্ত্রাভরণ,

মুখ-চোখের রহস্যময় ভাব। কোন্ বিস্মৃত সুদূর অন্যকালের আদিম জগতের স্বপ্ন-রহস্য নিয়ে তারা একালের মানুষের কাছে এসে হাজির হয়েছে—এ-কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

মনসার করণ্ডী ও শোলার মূর্তি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শোলার পাতে তৈরি করণ্ডীতে মনসার পুজো হয়। করণ্ডী শব্দের অর্থ ফুলের সাজি। মনসামঙ্গলে আছে, সৎমা চণ্ডীর কোপ থেকে নবজাত কন্যা মনসাকে বাঁচাবার জন্যে শিবঠাকুর করণ্ডী বা ফুলের সাজির ভেতরে লুকিয়ে নিজের ঘরে এনেছিলেন। উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা তাই শোলার পাতা আর কাঠি দিয়ে চারিদিক থেকে চারখানি দেওয়াল তৈরি করে কলার থোড়ের ওপরে সেগুলো পুঁতে একটি করণ্ডী তৈরি করেন। ঐ করণ্ডীর সামনের দিকে লোক-শিল্পীরা মনসা, চাঁদবেণে, লখিন্দর, বেহুলা প্রভৃতির ছবি উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত প্যানেলে প্যানেলে আঁকে। বলিষ্ঠ রেখায় ড্রইং-এ, উজ্জ্বল বর্ণলেপে আর সহজ সরল মণ্ডন-কল্পনায় এই করণ্ডীগুলোও বাংলার লোকশিল্পের চমৎকার নিদর্শন।

আসামের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মোটা গোল শোলা কেটে আর তাতে শোলার পাত জড়িয়ে মনসা, বেহুলা, নেতা ধোপানি প্রভৃতির যে সমস্ত চালচিত্রওলা রঙিন চিত্রিত মূর্তি তৈরি হয় সেগুলিতেও লোকশিল্পীদের চমৎকার তক্ষণশক্তি, চিত্রনৈপুণ্য আর বলিষ্ঠ ঋজু গড়নের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধে ও পূর্ববর্তী প্রবন্ধের সঙ্গে যে শিল্পনিদর্শনগুলির আলোকচিত্র প্রকাশিত হল, তাদের মধ্যে গোয়ালপাড়া অঞ্চলের শোলার মূর্তিখানি ছাড়া বাদবাকি সবগুলিই লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের শোলার মূর্তিখানি কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি'র সংগ্রহশালার শিল্পনিদর্শন। তাঁদের সৌজন্যে ঐ শিল্পনিদর্শনের আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে প্রকাশিত মনসামঙ্গলের গানখানিও লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো

লোকে বলে -ঘরের কড়িকাঠ যেমন করে দেখতে হয়, চন্দননগরের বারোয়ারি পুজোর জগদ্ধাত্রী প্রতিমাও তেমনি করে দেখতে হয়, অর্থাৎ মাথাটা ঘাড়ের ওপরে পেছনে বেশ করে হেলিয়ে, চোখ কপালে তুলে।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়! কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু প্রতিমা, কোনও কোনওটি ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পর্যন্তও উঁচু। কাছে দাঁড়িয়ে প্রতিমার মুখ কিংবা মুকুট দেখতে হলে শুধু উঁচুতে চোখ তুলে চাইলে হবে না -ঘাড় পেছনে ভাল করে কাত করা চাই। বুড়িরা নাম দিয়েছে তাই ঘাড়-কন্‌কন্‌ করানো ঠাকুর, পেল্লায় উঁচু এইসব ঠাকুর দেখতে দেখতে ঘাড় কন্‌কন্‌ করে বলে।

সাহেব-মেমের টুপি-খোলানো প্রতিমা

বুড়োদের মুখে শোনা এক অনেককালের গল্প---হয়তো সত্যি ঘটনা। চটকলের একজোড়া খাস ইংরেজ সাহেব-বিবি শখ করে চন্দননগরের বারোয়ারি পুজোর ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। চন্দননগর তখন ইংরেজদের খাস দখলে না থাকলেও, তাঁদেরই মত ভারত সাম্রাজ্যের আর এক শরিক ফরাসি প্রভুদের হাতে। প্রজার ক্রিয়াকর্মে প্রজার কৃতকৃতার্থ বোধ করা উচিত—এই ভাব নিয়ে যেন সাহেব-বিবি গট্‌গট্‌ করে বারোয়ারি পুজোর এক প্যান্ডেলে গিয়ে ঢুকলেন। সাহেব-বিবির মাথায় টুপি। হিঁদুর ঠাকুরকে দেখে পেন্নাম না করুক, অন্তত এটিকেট দেখানোর জন্যে মাথার টুপিটা তো একবার খুলুক---বারোয়ারি পুজোয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাঁরা বর্ষীয়ান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কানাকানি করতে লাগলেন। কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা, সাহস করে সাহেব-বিবির কাছে গিয়ে সে-কথা বলবার। তাই মনের কথা চেপে সবাই দন্ত বিগলিত করে সাহেব-বিবিকে কাছে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখাতে লাগলেন। ডাকের সাজে ঝলমল বিশাল প্রতিমা। সাহেব-বিবি তো দেখে তাজ্জব বনে গেছেন। তাঁরা প্রতিমার বাহন, সাজ, গয়না সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন আর নিজেদের মধ্যে অস্ফুটস্বরে আলোচনা করছেন। নিচু থেকে শুরু করে চাল-চিত্তিরের একেবারে মাথা পর্যন্ত তাঁরা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। মুকুটের কারুকার্য ভাল করে দেখবার জন্যে একবার তাঁরা যেমনি ঘাড় কাৎ করেছেন পেছনে, আর অমনি তাঁদের দুজনেরই মাথা থেকে টুপি খুলে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে তখন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে সাহেব-বিবির টুপি কুড়িয়ে দেবার জন্যে। লজ্জায় তো সাহেব-বিবির রাঙা মুখ আরো রাঙা—নেটিভদের ঠাকুর কিনা এমন করে মাথার টুপি খুলিয়ে ছাড়ল! কিন্তু চালাক তাঁরা। সে-ভাব তাড়াতাড়ি সংবরণ করে উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় বল্লেন -"আমড়া টোমাডের ডেবী ডেখিয়া বহুট আনন্ডিট হইয়াছে। বহুট উঁচা ডেবী, মহান্‌ ডেবী!' বলেই সাহেব নিজের পকেট থেকে দুখানা কর্‌করে দশ টাকার নোট বার করে উদ্যোক্তাদের একজনের হাতে গুঁজে দিলেন নিজের চাঁদা-স্বরূপ। সাহেব-বিবি চলে গেলে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বুড়ো যাঁরা, তাঁরা হিন্দু ধর্মের এমন মাহাত্ম্য দেখে বলাবলি করতে লাগলেন -'চাট্টিখানি কথা নয়, বাবা, এ প্রাণপ্রতিষ্ঠে করা দেবী, এখানে চালাকি চলবে না। সাহেব-বিবি, নমস্কার করল না তো, মহামায়া তাদের তাই টুপি মাটিতে ফেলিয়ে আর কুড়ি টাকা প্রাণামী দিইয়ে তবে ছাড়লেন।"

তিনদিনব্যাপী পুজো

কলকাতা থেকে মাইল বিশেক দূরে হুগলি জেলার চন্দননগরে আজও এই রকম অনেকগুলি

বিশালকায় জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বারোয়ারি পুজো হয়। দুর্গাপুজোর ঠিক এক মাস পরে এই বারোয়ারি পুজো আরম্ভ হয় শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে। তিনদিন পুজো চলার পর দশমীতে হয় প্রতিমা বিসর্জন। এই তিনদিন ধরে শুধু চন্দননগরেই নয়, তার পাশাপাশি মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর, তেলেনিপাড়া, হুগলিতেও চলে এই পুজো। তিনদিন ধরে পুজোয় মণ্ডপে মণ্ডপে চলে যাত্রা, থিয়েটার, আধুনিককালের নাচ গানের বিচিত্রানুষ্ঠান। আগে আগে যাত্রা, থিয়েটার, কবির লড়াই, তরজা, হাফআখড়াই, খেমটা, ঝুমুরেরই আসর বেশি করে বসত। কারণ, চন্দননগরই তো ছিল আগেকার দিনের কবিওয়ালা, পাঁচালিওয়ালা, যাত্রাওয়ালাদের পীঠস্থান। সুপ্রসিদ্ধ এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, নৃসিংহ, রাসু, নীলমণি পাটুনী, বলরাম কপালী প্রভৃতি কবিওয়ালা, নবীন গুঁই, চিন্তে মালা প্রভৃতি পাঁচালিওয়ালা, বৌ-মাস্টার, মদন-মাস্টার, মহেশ চক্রবর্তী, ব্রজ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালা, রঘুনাথ শিরোমণি, উদ্ধব চূড়ামণি, তমাল অধিকারী প্রভৃতি কথক—উনিশ শতকের এই সমস্ত ডাকসাইটে লোকরঞ্জক শিল্পীর দল চন্দননগরে বাস করতেন। চন্দননগরে এই বহু পুরনো বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোয় তাঁদেরই অনেকে এসে আসর জমাতেন রাতের পর রাত, আর দিগদিগন্ত থেকে লোক আসত সে সমস্ত আসরে, বুঁদ হয়ে যেত আনন্দে।

আগে আগে এই সমস্ত বারোয়ারি আসরে জ্বলত লাল, নীল, সবুজ, হলদে, সাদা রঙ-বেরঙের বেলোয়ারি কাঁচের দেওয়ালগিরি, মোমবাতির ঝাড়-লণ্ঠন। নক্সাকাটা ঝালর দেওয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালপাতার আড়ানি পাখা নেড়ে আসরের উষ্ণতা নিবারণ করা হত। কর্মকর্তা আর বিশিষ্ট অভ্যাগত ব্যক্তিদের আলবোলায় খাওয়া অম্বুরী তামাকের গন্ধে আসর মাত হত। সে-সব দিন অনেককাল গেছে। এখন তার বদলে বারোয়ারি আসরগুলোতে নিওন আলোর জৌলুসে, ইলেকট্রিকের ফ্যানের বনবনানিতে, সিগারেটের আর বিড়ির গন্ধে, নাচ-গানের বিচিত্র অনুষ্ঠানই জমে। কোথাও কোথাও হাল আমলের যাত্রা, থিয়েটার আর কবির গানের আসরও বসে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম

যে উৎসাহ, আনন্দ নিয়ে অন্য জায়গায় দুর্গোৎসব হয়, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে ঠিক সেইরকমটি সাড়া পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তোলা, মণ্ডপ সাজানো, প্রতিমা তৈরি, তোরণ রচনা, ভলান্টিয়ারবাহিনী গঠন, আর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে চারদিকে সবাই মেতে যায়। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, কলকাতা প্রভৃতি জায়গা থেকে পুজোর কটি দিন প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক আসে চন্দননগরে। কয়েকদিন রেল কোম্পানি কয়েকখানি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দেন। কলকাতা এবং আশেপাশের জায়গা থেকে যে সমস্ত বাস আসে, তাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। লোকে পায়ে হেঁটে, নৌকায়, ট্রেনে, বাসে চড়ে, লরি ভাড়া করে বোঝাই হয়ে আসে চন্দননগরের এই পুজো দেখতে। প্রতিমা বিসর্জনের দিনও চন্দননগরে মহা হুলস্থুল পড়ে যায়। বিশালকায় প্রতিমাগুলো একের পর এক গঙ্গার ঘাটে এসে জমা হয়। বাজনাবাদ্যি আলোর মিছিল নিয়ে। গঙ্গার ঘাটে বেলা তিনটে থেকে লোক জড় হয়—গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে-ভিড় জমাট হয়ে থাকে। এই পুজো উপলক্ষে চন্দননগরে চারদিন স্থানীয়ভাবে ছুটি দেওয়া হয় অফিসে-আদালতে। লোকেদের বাড়িতেও আত্মীয়স্বজনের সমাগম ঘটে। একটি বিচিত্র আনন্দময় উৎসবে চন্দননগর এইভাবে কদিন মেতে ওঠে।

প্রতিমার সাবেকি গড়ন ও সজ্জা

আনন্দ-উৎসবের চেহারার রকমফের ঘটলেও, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সাবেকি গড়ন,

সাজসজ্জার ঢং কিন্তু বেশি পাল্টায়নি আজও। সেই আগেকার মতই সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দেবী—হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনু, বাণ। পশুরাজ সিংহ নিজের তাগদ আর দাপট দেখাবার জন্যে হাতির মাথায় থাবা বাগিয়ে বসেছে। এই সিংহের পিঠে বিশালকায়া জগদ্ধাত্রী প্রতিমা, আর দেবীর চাইতেও বিশালাকৃতি দেবীর মাথার মুকুট, কল্কাদার অজস্র কারুকর্মে ভরা আঁচল আর বিচিত্র উজ্জ্বল চালচিত্তির। চালচিত্তিরে অবশ্য কোনও আঁকা পট থাকে না এবং আকারে একটু লম্বাটে ধরনের। বিসর্জনের সময় এই পেল্লায় উঁচু প্রতিমা যাতে বার করতে অসুবিধা না হয়, তার জন্যে কোনও কোনও প্রতিমার চালচিত্তির দু'পাশে কব্‌জা দিয়ে আঁটা, যাতে মণ্ডপ থেকে বার করবার সময় চালচিত্তিরখানা দু'পাশে মুড়ে সরু করে নেওয়া যায়। অধিকাংশ প্রতিমাই এখন শোলার সাজে সাজানো হয়, খাঁটি ডাকের সাজের অলঙ্করণ ক্রমেই আসছে বলা চলে।

শতাধিক বৎসরের পুরনো বারোয়ারি

চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে এই বারোয়ারি পুজো হয়। পালপাড়া, চাউলপটি, কাপড়ে পটি, মুলোপটি, নিচুপটি, বাগবাজার, ফটকগড়া, মাড়োয়ারীপটি, বেঁশোপটি, হালদার বাগান, খলিসানি, হাটখোলা, গোন্দলপাড়া প্রভৃতি স্থানের পুজোর খুবই জাঁকজমক। এদের মধ্যে চাউলপটিরই পুজো নাকি খুব পুরনো। চন্দননগরের সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন চাউল ব্যবসায়ীরাই নাকি চাঁদা তুলে এখানকার বারোয়ারি পুজোর প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। বাগবাজারের পুজো ১২৫ বছরের আর নিচুপটির পুজো ১৫০ বছরের বলে দাবি করা হয়। অন্যান্য জায়গার উদ্যোক্তারাও নিজেদের পুজোকে বহু প্রাচীন বলে দাবি করতে ছাড়েন না। এ সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা স্থির করা শক্ত। তবে এখানকার অধিকাংশ পুজোই যে অনেকদিন ধরে হয়ে আসছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

চন্দননগরের পুরনো সমৃদ্ধির কথা

চন্দননগরে অনেককাল থেকে বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর এত প্রাবল্যের কারণ তার পুরনো দিনের সমৃদ্ধি আর সম্ভ্রমের ইতিহাসে লুকানো রয়েছে। বাণিজ্য আর শিল্পকেন্দ্ররূপে পশ্চিম বাংলায় পুরনো কাল থেকে এর খ্যাতি। ইংরেজ আমলে সুতানুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা যেমন বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল, তেমনি ফরাসি আমলে গঙ্গার ধারে খলিসানি, বোড়ো আর গোন্দলপাড়া—এই তিনটি পাড়া নিয়ে একদিন সমৃদ্ধিশালী চন্দননগরও গড়ে উঠেছিল। ফরাসিরা চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করার আগে ১৭ শতকের শেষভাগেও চন্দননগর থেকে বহু পরিমাণ মোম, সোরা, গালা, বেত, শালকাঠ, কাপড়, রেশম, মরিচ, নানারকম শস্য, চন্দনকাঠ প্রভৃতি পণ্য ভারতের অন্যান্য জায়গায় এবং ইউরোপেও যে রপ্তানি হত তার প্রমাণ রয়েছে 'La Compagine des Indes Orientales' নামক গ্রন্থটিতে। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়', কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল', কবিরামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যাদিতেও চন্দননগরের বিভিন্ন পল্লীর নামোল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে কলকাতা যখন ভাল করে জমে ওঠেনি, তখন চন্দননগরে বাণিজ্যলক্ষ্মীর স্বর্ণসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং ভারতের বাইরে চীন, তিব্বত, পারস্য, ব্রহ্মদেশ, জেড্ডা প্রভৃতির সঙ্গে বাণিজ্যলক্ষ্মী, চন্দননগরকে স্বর্ণসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। ক্লাইভ চন্দননগরকে The Granery of the Island অর্থাৎ ভারতের শস্যাগার বলে অভিহিত করেছিলেন। এরপরও যখন ভদ্রেশ্বর, বেলেঘাটার গঞ্জ প্রভৃতি খ্যাতিলাভ করেনি, তখন চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ ছিল কলকাতায় ও কাছাকাছি অঞ্চলে চাল, ডাল, সর্ষে, তিল প্রভৃতি সরবরাহের কেন্দ্র। এই ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় চন্দননগর প্রায় দুশ বছর আগে ধনসম্পদশালী ও

উন্নতিশীল জনপদে পরিণত হয়েছিল। এই জনপদের অধিবাসীরাই এবং বিশেষ করে ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই সেদিনকার নতুন দিনের সর্বজনীন উৎসব এই বারোয়ারি পুজোর প্রবর্তন করতে তাই পেরেছিলেন।

বাংলায় বারোয়ারি পুজো প্রবর্তন

বাংলাদেশে প্রায় ১৭০ বছর আগে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে হুগলি জেলারই গুপ্তিপাড়ায় প্রথমে বারোয়ারি পুজো শুরু হয়েছিল এবং তারপর হাওড়া, হুগলি, নদীয়া জেলার বল্লভপুর, কোন্নগর, উলা, চাকদহ, শ্রীপুর প্রভৃতি কাছাকাছি স্থানে যে উৎসব ছড়িয়ে পড়েছিল—এই বিবরণ রেখে গেছেন তদানীন্তন ইংরেজি সাময়িক পত্রিকা 'The Friend of India' (May, 1820). ইংরেজ শাসনের পক্ষপুটের তলায় বাংলায় কালক্রমে জমিদারি শাসনব্যবস্থা কায়েমে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো সেদিনকার সমাজের রুচি, রীতি প্রতিফলন করে এই বারোয়ারি পুজো জমে উঠেছিল। মুখ্যত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন শ্রেণীই এই উৎসবের পুরোভাগে থাকতেন। তাঁরাই হতেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, যদিও বহুজনের কাছ থেকে, এমনকি যে জায়গায় পুজো হত তার বাইরে বহুদূরে লোকজন পাঠানো হত চাঁদা আদায়ের জন্য। এইসব চাঁদা আদায়কারীদের নানারকম ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে টাকা আদায় করতে হত। অনেকে আবার চাঁদা আদায় করতে গিয়ে আর ফিরতেন না। এ সমস্ত বিবরণও উল্লিখিত ইংরেজি পত্রিকাটিতে এবং সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে দেখতে পাওয়া যায়।

জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রথম প্রবর্তনকারী

জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রথম প্রবর্তন কে করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ কেউ বলেন, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই পুজোর প্রবর্তক। তিনি যখন নদীয়ার রাজা ছিলেন, তখন মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁ জমিদারি খাজনা না দিতে পারার জন্যে তাঁকে মুর্শিদাবাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করেছিলেন। তখন শারদীয় দুর্গোৎসবের সময়। মহারাজ নিজের প্রাসাদে এসে পুজো করতে পারেননি বলে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। দেবী নাকি স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে দুঃখ করতে বারণ করে বলেছিলেন, মহারাজ যেন দুর্গোৎসবের পরবর্তী শুক্লানবমী তিথিতে চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী মূর্তি গড়ে দেবীর পুজো করেন, তাতেই মহারাজের দুর্গোৎসব করা হবে। মহারাজ তারপর বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে নদীয়ায় ফিরে এসে জগদ্ধাত্রী পুজো করেন এবং সেই থেকে এই পুজো শুরু হয়।

কেউ কেউ বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় নদীয়াতে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামে তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ এক সাধক জগদ্ধাত্রীর পুজো প্রবর্তন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ঐ তন্ত্রোক্ত পুজো অনুমোদন করেন এবং তারপর কৃষ্ণনগরের ঘরে ঘরে জগদ্ধাত্রী মূর্তির পুজো শুরু হয়। তারপর কৃষ্ণনগর থেকেই সারা বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজো ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীন স্মৃতি ও তন্ত্রগ্রন্থে জগদ্ধাত্রী দেবী

এইসব মত অনুসারে জগদ্ধাত্রী পুজোকে খুব বেশি আড়াইশো বছরের বেশি পুরনো বলে মনে করা যায় না এবং অনেকে তাই এই পুজোটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মনে করেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের স্মৃতিকার বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং তারই কিছু পরবর্তীকালের স্মৃতিকার শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, দুজনেই কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে এই জগদ্ধাত্রী পুজোর উল্লেখ করেছেন, প্রাচীনতর অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিক্রমে। (শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণিকৃত 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব', এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, ১১৫ পৃষ্ঠা) শুধু তাই নয়, কাত্যায়নীতন্ত্র, মায়াতন্ত্র, দুর্গাকল্প, বিশ্বসারতন্ত্র,

ভবিষ্যপুরাণ, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থেও জগদ্ধাত্রী পুজাবিধি দেখা যায়। 'নিগম কল্পসার জ্ঞানসারস্বত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কার্তিক মাসের শুক্লানবমী তিথিকে দুর্গানবমী বলে। প্রাতে সাত্ত্বিকী, মধ্যাহ্নে রাজসী এবং সায়ংকালে তামসী এই ত্রিকালিক পুজো ঐ দিনে করে দশমীতে দেবীর বিসর্জন বিধেয় (শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়', পৃ ১৩৫)। এই পদ্ধতি অনুসারেই চন্দননগর ছাড়া বাংলাদেশে আর সর্বত্র দুর্গানবমীর দিনই জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। চন্দননগরে কিন্তু তিনদিনই পুজো হয়।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার স্মৃতি

জগদ্ধাত্রী পুজোতে তান্ত্রিক মন্ত্রাদিরই আধিক্য। এইজন্যে একে তান্ত্রিকী পুজো বলা হয়। মায়াতন্ত্রে স্পষ্টই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কালী পুজোর মতই শাক্তাচারে এবং পঞ্চমকারে জগদ্ধাত্রী পুজো বিধেয়।

আদিম মাতৃতান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজের জাদু-অনুষ্ঠান থেকেই তন্ত্র তথা শাক্তাচারের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সমাজ-বিকাশের একটি আদিম পর্যায়ে জীবনযাত্রার তাগিদেই ভূমি এবং নারীর প্রজননশক্তির মধ্যে সাদৃশ্য ও সমন্বয়ের সন্ধানে তন্ত্রাচারের বিকাশ ঘটেছে—সেই বিকাশতন্ত্র বহু প্রাচীন। এই হচ্ছে আধুনিক কালের অনেক নৃতাত্ত্বিক তথা সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অভিমত। মাতৃতান্ত্রিক নরগোষ্ঠীই বাংলার জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। অতীতের স্মৃতি ও সংস্কার তাই বাংলায় তন্ত্রবাদের পুষ্টি সাধনে অনেক সহায়তা করেছে। উত্তরকালে আর্যসভ্যতার এখানে অভিযান সত্ত্বেও বাংলার বিভিন্ন শক্তি উপাসনার মূলেও রয়েছে প্রাচীনকালের কৃষিভিত্তিক জাদু-অনুষ্ঠানের সংস্কার—যা ছিল তখনকার আদিম, অসহায়, অপরিণতবুদ্ধি মানুষগোষ্ঠীর জীবনমরণের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু আজকের দিনে অন্তত তা থেকে অনেক এগিয়ে আসা সমাজের পক্ষে যা একেবারে তাৎপর্যহীন।

সেই প্রাচীন সংস্কারেরই রেশ চলেছে বাংলায় ঋতুতে ঋতুতে নানান দেবী অর্চনার মধ্যে, যদিও তার ওপরে পড়েছে পরবর্তীকালের অনেক আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার পলিমাটি।

শান্তিপুরের ভাঙা রাস

নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমা পেরোতে না পেরোতেই নবদ্বীপের বিরাট জনস্রোত গঙ্গা পার হয়ে ওপারের শান্তিপুরে ভাঙারাসে গিয়ে ভেঙে পড়েছে।

নবদ্বীপ আর শান্তিপুর ওরা যেন বই-এর একখানি পাতার এ-পিঠ আর ও পিঠ—একই কাহিনীর প্রারম্ভ আর পরিণতি। এপারে নবদ্বীপ, ওপারে শান্তিপুর মাঝখানে গঙ্গা। জননীর দুটি স্নেহমুষ্টির বন্ধনে যেন দুদিকে দুটি শিশুর হাত ধরা। ওরা একই ভাবরসে লালিত, এক সুতোয় বাঁধা, পাঁচশো বছর ধরে—নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য আর শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতের লীলাকাল থেকে। এক তীরের ভাবের লালন আর এক তীরকে ডুবিয়ে দিয়েছে। "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।" ভক্ত-বৈষ্ণবের ভাবমুগ্ধ জল্পনা-কল্পনা : শান্তিপুরের পরমভাগবত শ্রীঅদ্বৈত জীবদুঃখে কাতর, অসহিষ্ণু। শুষ্ক শূন্য প্রান্তরে তিনিই ছিলেন ভক্তির একটি নিঃসঙ্গ ধারা। তাঁরই সকরুণ আহ্বানে গঙ্গার ওপারে নবদ্বীপে মহাকরুণা আর কৃষ্ণপ্রেমের ধারা দেখা দিয়েছে শ্রীচৈতন্যরূপে। এই দুটি ধারার সঙ্গে প্রেমানন্দের আর একটি ধারা এসে যুক্ত হয়েছে শ্রীনিত্যানন্দরূপে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের ত্রিধারার ভাবাত্মা একই, "একে তিন, তিনে এক"। তবুও শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতের পরম মর্যাদা, বিশেষ নাম—"গৌর-আনা ঠাকুর"।

যাই হোক, একথা সত্যি যে, পনেরো-ষোলো শতকে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আর সংস্কৃতির প্রবল প্লাবন সারা বাংলাদেশ এবং সে সীমানা ডিঙিয়ে ভারতের অন্য অন্য অঞ্চলকেও ডুবিয়েছে, নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে—বাংলাদেশের নবদ্বীপ আর শান্তিপুরই ছিল তার উৎসমুখ। অবশ্য সেদিন বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীই এই নবজাগ্রত ধর্ম আর সংস্কৃতিকে দার্শনিক তত্ত্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার, আচার-আচরণের সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ণয়ের একচ্ছত্র অধিকার পেয়েছিলেন। তবুও সপরিকর শ্রীচৈতন্য আর শ্রীঅদ্বৈতের লীলারঙ্গভূমি নবদ্বীপ আর শান্তিপুরই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও মতের অনুকূলে অনুশীলন, আচার আর উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ছিল বহুদিন ধরে।

গঙ্গা থেকে শান্তিপুর আজ অনেক দূরে সরে গেছে। তবুও নবদ্বীপ আর শান্তিপুর—বৈষ্ণবের এই শ্রীধাম দুটিকে গঙ্গাই যেন যুক্ত করে রেখেছে। তাই আজও তীর্থযাত্রীরা নবদ্বীপে এলে গঙ্গা পেরিয়ে ছোট লাইনের ট্রেনে চেপে যান শ্রীপাট শান্তিপুর দর্শনের পুণ্যাকাঙ্ক্ষায়।

নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমা তথা পটপূর্ণিমার বিশাল ভিড় তাই শান্তিপুরের ভাঙারাসে গিয়ে শেষ হয়, এবারও শেষ হয়েছে। এবার নবদ্বীপের আড়ং-এর দিনটিতেই শান্তিপুরের ভাঙারাস হয়েছে। সেই জন্যে নবদ্বীপের বিশাল ভিড় ঐ দিন ভোর থেকেই নৌকাতে করে গঙ্গা পেরোতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর ওপারে ছোট লাইনের ট্রেনবোঝাই হয়ে শান্তিপুরে গেছে। বাসবোঝাই হয়েও অনেকে গেছে। কলকাতা থেকেও বহু লোক গেছে ট্রেনে। শান্তিপুরের ভাঙারাস তাই লোকে লোকারণ্য।

নবদ্বীপের রাসযাত্রায় মুখ্যত শক্তিপুজোরই আয়োজন। সেখানে গোস্বামীদের মন্দিরে মন্দিরে রাসযাত্রার আয়োজন থাকলেও বারোয়ারী শক্তিপুজোর তুলনায় তা নিষ্প্রভ। কিন্তু শান্তিপুরের রাসযাত্রার উৎসবের চেহারা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব, কারণ রাধাকৃষ্ণকে নিয়েই সে আয়োজন। অবশ্য শাক্ত-প্রভাব থেকে শান্তিপুরও মুক্ত নয়। এখানেও শাক্তাচারের যথেষ্ট প্রাবল্য প্রাচীনকাল থেকে। তাই নবদ্বীপের পটপূর্ণিমার মত এখানেও রাসপূর্ণিমার দিন এখনও আট-দশখানি বিরাট বিরাট বারোয়ারী কালীমূর্তির পুজো হয়। তাছাড়া 'পটেশ্বরী' নামে পটে আঁকা একখানি কালীমূর্তির পুজো পটপূর্ণিমার ঐতিহ্য আজও এখানে বহন করছে। এই মূর্তিগুলোরও কয়েকখানি রাধাকৃষ্ণের ভাঙারাসের মিছিলেই বাজনাবাদ্যি করে বিসর্জন যায়। শান্তিপুরের গোঁসাইবাড়িতেও দুর্গাপুজো হয় : শাক্ত-বৈষ্ণবের পুরনো দ্বন্দ্ব কালক্রমে সহাবস্থানের মধ্যে ঘুচে গেছে।

তিন দিনব্যাপী রাসযাত্রা

শান্তিপুরে পূর্ণিমার দিন থেকেই রাস বসে। তিন দিন চলে। গোস্বামীদের বিভিন্ন মন্দিরে এবং শান্তিপুরের আরও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহদের সাধ্যমত রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে রাসমণ্ডপে বসানো হয়। নাটমন্দিরগুলো চাঁদোয়ায়, ঝালরে, ঝাড়লণ্ঠনে সাজে। তিন দিন ধরে পুজো, পাঠ, কীর্তন, যাত্রা প্রভৃতি চলে। যদিও অনেক মন্দিরে উৎসবের আয়োজন এখন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, অর্থনৈতিক অবস্থাই তার মুখ্য কারণ।

কিন্তু এই রাসের চাইতে তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে দেববিগ্রহদের নিয়ে যে মিছিল বার হয় শান্তিপুরে, তারই আকর্ষণ বেশি। রাসের শেষ পর্যায়ে এটির অনুষ্ঠান হয় বলে এর নাম ভাঙারাস। এই ভাঙারাসের মিছিল শুরু হয় রাত আটটা-নটা থেকে আর একের পর এক দেববিগ্রহের নগর পরিক্রমায় রাত প্রায় কাবার হয়েই আসে। এ ভাঙারাস দেখতেই লোকের ভিড় ভেঙে পড়ে শান্তিপুরের রাস্তায় রাস্তায়। এই মিছিলের পরিক্রমার পথের প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদ, বারান্দা, জানালা, রক দর্শনার্থীতে ভরে যায়। মিছিল দেখবার জন্যে বিকেল থেকেই লোকে গিয়ে জমা হয় এ সমস্ত জায়গায়। অনেকে ছাদের ওপরে ত্রিপল খাটিয়ে দর্শনার্থীদের জন্যে জায়গা করে দেন। এর জন্যে কোথাও কোথাও কিছু দর্শনীও দিতে হয়।

শান্তিপুরের রাস উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে, রথতলায় দোকানপাটও বসে। কাঠের বাসনকোসন, ধামা-চুপড়ি, খেলনা, শোলার পুতুল, পাখিরই বেশি বিক্রি এই মেলায়। তা-ছাড়া রাসতলার পাঁপড়, কচুরি, বেগুনির দোকানগুলি তো আছেই। লোকের কেনা-কাটায় দোকানগুলো বেশ জমে ওঠে কদিন।

বড়গোস্বামী পাড়া, পাগলা গোস্বামী পাড়া, চাকফেরা, খাঁবাড়ি, আতাবুনে, মদনগোপাল পাড়া, হাটখোলার গোস্বামী বাড়ি, সাহাবাড়ি, পরামানিক বাড়ি এবং আরও অনেক পল্লী আর বাড়ি থেকে ভাঙারাসের মিছিল বার হয়।

ভাঙারাসের মিছিল

মিছিলের প্রধান বাদ্যভাণ্ড ঢাক। ৬০ থেকে ১৫০ ঢাকির গুরু গুরু আওয়াজ তুলে নাচতে নাচতে এই মিছিলে যাওয়ার প্রথা অনেক দিনের। কিন্তু এই ঢাকির সংখ্যাও এখন বেশ কমেছে দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ এখন পপুলার গানের গৎ বাজানো হাল আমলের ব্যান্ড পার্টিও দিচ্ছেন। গরুর গাড়ির ওপরে ময়ূর-পঙ্খী, নানান পৌরাণিক আর সামাজিক ঘটনা বিবৃতকারী পুতুলের গ্যালারি বা থাকা, হাওদার ওপরে রাধাকৃষ্ণ-বেশী দুটি ছেলের নাচ, তা-ছাড়া আলোর গেট, আর নানান সং এই মিছিলের অঙ্গ। কার মিছিলের কোন্ অঙ্গটি বাদ পড়ল কিংবা কোন্টি সরেস-নিরেস তা দর্শনার্থীরা সকলে বিচার করেন।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় রাইরাজা

কিন্তু মিছিলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে রাইরাজা। ব্রাহ্মণদের ঘরের একটি ১০/১২ বছরের সুন্দরী কুমারী মেয়েকে শ্রীরাধার বেশে বসনে, ভূষণে, চন্দনে, তিলকে সাজিয়ে হাওদায় চড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। জরির পর্দায়, ঝালরে, আসনে তাকিয়ায় সাজানো হাওদা। তার চারপাশে কাঁচের ফানুসে বাতির নরম আলো জ্বলে। এই হাওদায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকে রাইরাজা আর সেই হাওদা কাঁধে নিয়ে বেহারারা চলে। রাইরাজা আসা মাত্র দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ভাল করে দেখার জন্যে। মেয়েদের শঙ্খ-রোলে হুলুধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়।

রাসমণ্ডলের রাসেশ্বরী শ্রীরাধা। তাঁর প্রণয়-ঋণের জালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বন্দী। তিনি দাসখত

লিখে দিয়েছিলেন শ্রীরাধার কাছে—কলিকালে গৌররূপে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে চোখের জলে সে ঋণ শুধবেন আর রাধার প্রণয়মহিমা কেমন নিজে আস্বাদ করবেন। শ্রীরাধার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া জীবের রাগমার্গে কৃষ্ণভজনের, কৃষ্ণসেবার অধিকার পাওয়া যাবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই দার্শনিক পরাতত্ত্বের পপুলার ভার্সান বলে এই রাইরাজাকে মনে করা যেতে পারে।

রাইরাজার হাওদার পর আসে অনুরূপভাবে সুসজ্জিত আর একটি হাওদা, তার মধ্যে মন্দিরের সুসজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিগ্রহ।

প্রভাতে কুঞ্জভঙ্গের গান

দেববিগ্রহরা এইভাবে নগর পবিভ্রমণ করে যখন আবার নিজের নিজের মন্দিরে ফিরে যান তখন রাত অল্পই বাকি থাকে। তাঁরা আবার রাসমঞ্চে গিয়ে ওঠেন। সারারাত্রির রাসবিলাসের পব রাইকানু নিদ্রায় ঢাকা পড়েছেন। ভোরে তাঁদের জাগাবার জন্যে কুঞ্জভঙ্গের পালা গান চলে :

রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে।।
উঠেছে গোকুলের চাঁদ রাইকে জাগাও।
অকলঙ্ক কুলে কেন কলঙ্ক লাগাও।।

মঙ্গল আরতি, কুঞ্জভঙ্গের পালা গান, বাল্যভোগ ইত্যাদি শেষ হবার পর, কোনও কোনও নাটমন্দিরে আবার কীর্তন, কথকতা, যাত্রার আসর বসে। এসব শেষ হতে হতে বেলা বাড়ে। তারপর গোস্বামীদের ছেলেরা রাসমঞ্চ থেকে বিগ্রহদের তুলে নিয়ে কোলে করে গান করতে করতে নাচতে নাচতে যে যার মন্দিরে গিয়ে ওঠেন। মেয়েরা তখন দেববিগ্রহের উদ্দেশে ফুল ছুঁড়তে থাকেন চারদিক থেকে—একে বলে ফুল খেলা। এরপর মন্দিরে অভিষেক শেষে ষোড়শ উপচারে অর্চনা, আবতি, ভোগরাগের পর ভাঙারাসেব পর্ব শেষ হয়।

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে রাসযাত্রার অনুল্লেখ

রাসযাত্রা মুখ্যত বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই উৎসব। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপাব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' (আনুমানিক রচনাকাল খৃষ্টীয় ১৫৪০ সাল) এ উৎসব পালনের কোনও বিধান নেই। জীমূতবাহন, বৃহস্পতি, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি কিংবা রঘুনন্দন (অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব) প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকার কয়েকটি বৈষ্ণব উৎসবের উল্লেখ করলেও এই অনুষ্ঠানের কোনও উল্লেখ করেননি। তাই এই উৎসবটি খুব বেশি প্রাচীন নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।

কার্তিকের লড়াই

উঁচুতে পঁচিশ হাতও ছাড়িয়ে যায়—এত প্রকাণ্ড মাটিব কার্তিকঠাকুর! লম্বা বাঁশের ডগাতে নৈবিদ্যির চাল, কলা, মণ্ডা বেঁধে কার্তিকঠাকুরের মুখের কাছে তুলে ধরতে হয়, ভোগ নিবেদনের জন্যে।

শ-দেড়েক বছর আগে বাংলাদেশে কি রকম পেল্লায় উঁচু কার্তিকঠাকুর গড়া হত, এ হচ্ছে তার এক নমুনা; পাওয়া গেছে পাদরী ওয়ার্ড সাহেবের লেখা 'A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos'-এর দ্বিতীয় খণ্ডটিতে।

ওয়ার্ড সাহেবের ঐ বই-এ দেখা যায়—এখনকার মত সেকালেও কার্তিক পুজোর খুব রেওয়াজ ছিল, আর ঠাকুর গড়ার হিড়িকও পড়ে যেত সব জায়গায়। বাংলাদেশের কোনও কোনও শহরে শ'পাঁচেক পর্যন্ত কার্তিক পুজো হতো। কলকাতা সব বিষয়ে যেমন অন্য শহরকে টেক্কা দিত, কার্তিক পুজোর সংখ্যা পাঁচ হাজারও ছাড়িয়ে যেত আর বাজনাবাদ্যি, নাচ, গান, ইয়ার্কি, ফুর্তির ঢেউ বইত এই উপলক্ষে।

ওয়ার্ড সাহেবের ঐ বইখানিব দ্বিতীয় খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ সালে, শ্রীরামপুর থেকে। তিনি যে এ দেশের পালপার্বণ সব লক্ষ্য করেছিলেন সেকেলে খ্রিস্টান পাদরির চশমা চোখে এঁটে, তার পরিচয় রয়েছে তাঁর রচনায়, অহেতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আর বাড়ানো-ফাঁপানো বিবরণে। তবুও আঠারো শতকের শেষের দিকে আর উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের পালপার্বণের পরিচয় পাবার ব্যাপারে ঐ বইখানা যে অনেকখানি ডক্যুমেন্টের মত, তা অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ববঙ্গের কোকাই কার্তিক

কলকাতায় কার্তিক পুজোর হাল আমলের ধুমের কথা তো সকলেরই জানা। সন্তানলাভের আশায় নারীরাই সাধারণত কার্তিক পুজো করে। কামনা পূরণে কালীঘাটে মাকালীর কাছে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়ার মত এখানে জোড়া কার্তিক পুজোরও রেওয়াজ আছে গেরস্থবাড়িতে। পূর্ববঙ্গে কিন্তু কেবলমাত্র পুত্রহীনা রমণীরা নয়, পুত্রবতীরাও কার্তিকের পুজো করে থাকেন। কার্তিকের অনেকরকম মূর্তির মধ্যে 'কোকাই কার্তিক' অর্থাৎ খোকা কার্তিকই তাঁদের খুব প্রিয়। ময়ূরের ওপরে দুহাত উঁচু করে তুলে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়ানো এই শিশু কার্তিকের মূর্তির পুজো হয় পূর্ববঙ্গীয়দের ঘরে ঘরে। এঁদের মধ্যে আবার কারও কারও বাড়িতে সারারাত্রি কার্তিকের গান গেয়ে নিশি জাগরণেরও রেওয়াজ আছে।

বাবু-কালচার ও কার্তিকঠাকুর

কিন্তু কলকাতায় কার্তিক পুজোর ধুমটা সবচেয়ে বেশি গণিকামহলে, সেই সাবেককাল থেকে কলকাতায় যখন বাবু-কালচারের পত্তন হয়েছিল। একদিকে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত, আর একদিকে ইংরেজ কোম্পানির 'হৌসের মুচ্ছুদ্দীবেনিয়ানগিরি', দালালি, চড়া সুদের পোদ্দারি ব্যবসা, পয়সা কুড়োবার আরও হরেকরকম ফন্দিফিকির গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতায় আসা একশ্রেণীর বাঙালীকে টাকা পয়সায় বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছিল। কালক্রমে, দু-তিন পুরুষে তাঁদের বংশধরদের রুজি রোজগারের কোনও ভাবনা আর রইল না। তাঁরা পায়ের ওপরে পা দিয়ে আরাম করে বসে টাকায়, বাড়িতে, জুড়িগাড়ি-টমটমে কলকাতার বাবু-কালচারের ধারক-বাহক হয়ে উঠলেন।

বারোয়ারি পুজোর পাণ্ডাগিরি, কবি, তরজা, হাফ-আখড়াই-এর দল পোষা, বুলবুলের লড়াই এ মাতা কিংবা ঘুড়ির পেছনে দশ, বিশ, হাজার টাকার পর্যন্ত নোট বেঁধে আকাশ ওড়ানো থেকে শুরু করে কালক্রমে পায়রা ওড়ানো, রেসের ঘোড়া আর সেই সঙ্গে গণিকা পোষা, খেমটা, টপ্পাগানের আসর জমানো, মাতলামি এবং আরও নানা ফুর্তির ফোয়ারা ছোটানো—এইসবই ছিল সেদিনকার ঐসব শৌখিন বাবুদের শখ। এইভাবেই বাবুদের গণিকালয়ে কার্তিক পুজোরও পত্তন হয়েছিল সেদিন। মহাধুমধামে খানা-পিনায় গণিকামহল জমজমাট হয়ে উঠত কার্তিক পুজো উপলক্ষে। কালস্রোতে ঐসব বাবুরা আজ কোথায় ভেসে গেছেন কে জানে। তাঁদের ঐতিহ্যবাহী ছুটকো-ছাটকা কিছু দল যাঁরা টিকে আছেন কোনও মতে, তাঁরাই আজকাল নমো নমো করে কোনও মতে গণিকামহলের কার্তিক পুজোর ট্র্যাডিশনটা বজায় রেখেছেন। আর সর্বজনীন পুজোর ঢেউ-এ কার্তিকঠাকুর এখন 'দেবসেনাপতি' সেজে অলিতে গলিতে পুজোর প্যান্ডেল সাজিয়ে বসছেন। চেহারাখানাও তিনি এখন পালটিয়ে ফেলেছেন। কলকাতায় বাবু-কালচারের পত্তনীদারদেরই মত ছিল তাঁর আগেকার চেহারা। ডগ্‌ডগে হলদে রঙ, টানাটানা চোখ। মাঝখানে সিঁথি কাটা বাবরি চুলের বাহার, গালে গালপাট্টা, বেশ করে চোমরানো লম্বা গোঁফ। ফিনফিনে, চওড়া কালোপেড়ে ধুতি পরনে; কাপড় ভেদ করে গায়ের গৌরবরণ যেন ফুটে বেরোচ্ছে। বাবুদেরই মত তাঁর গলায় সোনার হার, হাতে ইষ্টি-কবচ বাঁধা, পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা বা লপেটা জুতো। ময়ূরের ওপরে চড়া সেকালের কামিনীরঞ্জন চেহারার এই কার্তিক 'বাবু-কার্তিক' নামেই পরিচিত। এ চেহারা বদলে এখন সর্বজনীন পুজোর প্যান্ডেলে তিনি নেটিভ প্রিন্সের নয়তো সিনেমা আকাশের অমুক-কুমার, তমুক-চন্দ্র প্রভৃতি নামধেয় স্টারদের ছিরি-ছাঁদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব নকল করছেন।

যাই হোক, কলকাতায় কার্তিক পুজোর ট্র্যাডিশনটা আজও যে বজায় আছে ওয়ার্ড সাহেবের দেখা আমলেরই মত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কাটোয়ায় 'কার্তিকের লড়াই'

কার্তিক পুজোয় কলকাতায় যত ধুমধামই হোক না কেন কাটোয়ার 'কার্তিকের লড়াই'-এর সঙ্গে কিন্তু তার কোনও তুলনাই হয় না। কার্তিকঠাকুর দেবসেনাপতি—তারকাসুর প্রভৃতি দুর্ধর্ষ দৈত্যদের নিপাত করে তিনি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দাদের নির্ভয় করেছেন। লড়াই করাই তো তাঁর কাজ। কিন্তু কাটোয়াতে 'কার্তিকের লড়াই'-এ কার্তিকরা লড়াই করেন না, লড়াই করেন তাঁদের ভক্তরা, বারোয়ারি কার্তিক পুজোর উদ্যোক্তারা। সেখানে কার্তিকঠাকুর গড়া, সাজানো-গোজানো নিয়ে কম্পিটিশন হয়। আর সে কম্পিটিশনের পরিণতিতে মাথা ফাটাফাটি, খুনজখমের লড়াইও খুব জমে ওঠে। এখন অবশ্য পুলিশের কড়াকড়িতে এসব লড়াই অনেক কমে এসেছে। তবুও পুরনো আক্রোশ মেটাতে নানা অছিলায়, বিশেষত বিসর্জনের দিনে কাদের ঠাকুর আগে যাবে তাই নিয়ে কলহ, কোলাহল, মারামারি প্রায়ই বেধে যায়।

'কার্তিকের লড়াই'-এ আসল জিনিস হচ্ছে, থাকা সাজানোতে, নতুন জিনিসের উপস্থাপনে কে কাকে কীরকম টেক্কা দিতে পারল, তারই বিচার। এই থাকা বা গ্যালারিতে কেবলমাত্র কার্তিকের মূর্তিই থাকে না, তার সঙ্গে নানা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেব, দেবী, মুনি, ঋষি, দৈত্য, দানব, অপ্সরা প্রভৃতির মূর্তিও জুড়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক থাকার একেবারে উঁচুতে থাকে কার্তিকের মূর্তি, তারপর ক্রমান্বয়ে নেমে আসে পৌরাণিক কাহিনীর কুশীলবরা। কার্তিকের সঙ্গে এই সমস্ত কাহিনীর অবশ্য কোন সংযোগ নেই। তবুও থাকার এই পৌরাণিক কাহিনীগুলির আকর্ষণই জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে বেশি। প্রত্যেক বারোয়ারি দলই প্রতি বৎসর নতুন নতুন কাহিনী নিয়ে থাকা গড়েন।

এবং এক দলের সঙ্গে আর এক দলের কাহিনীতে, মূর্তির গড়নে, সাজসজ্জায়, বিন্যাসে, রোশনাই-এ কোনও কিছুতেই মিল থাকা চলবে না।

এ বছরের বিভিন্ন থাকা

এ বছর জামতলায় হয়েছে 'লব-কুশের অস্ত্রশিক্ষা', কলাইপটিতে 'রাবণের স্বর্গ জয়', নুনেগোলায় 'জয়দ্রথ বধ' ও 'বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ', নিচে বাজারে সিংদরজায় 'অভিমন্যু বধ', পশারিপটিতে 'নরকাসুর বধ', চাউলপটিতে 'শিব দরবার', খড়ের বাজারে 'দুর্গাসুর বধ', পুরনো বাজারে 'রামের বিবাহ' প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি। এ ছাড়া কাঠগোলায় তরকারির বাজার প্রভৃতি অঞ্চলেও পুজো হয়েছে। হরিসভার 'ন্যাংটা কার্তিক'ও এখানকার একটি ডাকসাইটে পুজো। এখানে শিশুবেশী উলঙ্গ কার্তিক—এক হাতে মোযা আর এক হাতে দোয়াত-কলম, বগলে পাততাড়ি, এই মূর্তিটি প্রায় ১০/১২ ফুট উঁচু। এত বড় উলঙ্গ শিশু কিন্তু রামখোকারই মত দৃষ্টিকটু।

দেবসেনাপতি ও শিশু কার্তিক

বিভিন্ন থাকার শীর্ষে যে কার্তিক মূর্তিটি থাকে সেটিও নানান ধরনের হয়। কোথাও দেবসেনাপতির বেশ— গায়ে জরিজড়োয়ায় ঝলমল, ঝলমলে হাতা আচকান, মাথায় সেই রকমেরই তাজ, বাবরি চুলের বাহার, পাকানো গোঁফ। এই থাকার নাম কার্তিক-থাকা। এবং এই থাকার কার্তিক মূর্তিটি বেশ বড় সাইজেরই হয়। আর একরকমের থাকায় উলঙ্গ শিশুর বেশে কার্তিকের মূর্তি গড়া হয়। নধর গড়ন, স্মিতমুখ, দুরন্ত দামাল, এই উলঙ্গ শিশু জননী কাত্যায়নী অর্থাৎ দুর্গার কোলে চড়ে নয়তো তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে—জননীর স্নেহমুষ্টিবন্ধনে দুরন্ত শিশুর হাতটি ধরা। দেবী কাত্যায়নী দ্বিভুজা, বিশাল নয়নের দৃষ্টিতে বাৎসল্যের সুধা ক্ষরিত। অপরূপা মাতৃমূর্তি। যে থাকায় এই রকমের শিশু কার্তিকমূর্তি থাকে তার নাম কাত্যায়নী-কার্তিক-থাকা।

অনেক দিনের পুরনো উৎসব

কাটোয়ার এই সমস্ত বারোয়ারি পুজো অনেক দিনের। কোনও কোনও পুজো দুশো বছরেরও পুরনো বলে দাবি করা হয়। এমনই একটি কচুয়াড়া-তাঁতীপাড়ার 'সাতভাই'। এই থাকাটিতে দেবসেনাপতি বেশে কার্তিক বসে থাকেন ওপরে তারপর ওপর থেকে নিচে কার্তিকেরই মত আর ছটি মূর্তি। এঁরা কার্তিকের সাঙ্গোপাঙ্গ। জনসাধারণের কাছে এই থাকা 'সাতভাই' নামে পরিচিত। এই 'সাতভাই'-থাকা চিরকাল একইরকমের হয়ে আসছে—এর কোনও রকমফের হয় না।

কচুযাড়া-তাঁতীপাড়ার এক নিঃসন্তান ব্যক্তি নাকি এই পুজোর প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন, তারপর এটি বারোয়ারিতে পরিণত হয়েছে।

কাটোয়ার পল্লীতে এই সমস্ত বারোয়ারি পুজো হয়। বড়, মেজ, সেজ ইত্যাদি ক্রমে একেবারে বালখিল্যদেরও পর্যায়ে এই সমস্ত বারোয়ারিকে ফেলা যায়। বড় বড় বারোয়ারির থাকা এখন ১৫ থেকে ১৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। আগে আরও উঁচু করে গড়া হত। কিন্তু কাটোয়ার ইলেকট্রিকের তারের জন্যে এই উচ্চতা এখন কমিয়ে ফেলতে হয়েছে। আগে বড় বড় থাকার সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। এখন সে সংখ্যা কমে ১৫/১৬টিতে দাঁড়িয়েছে। মাঝারি আর ছোট সাইজের থাকার সংখ্যাই এখন বেশি। এই সমস্ত ধরে কাটোয়াতে কার্তিকের লড়াই-এর থাকার মোট সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে শ-খানেক। আগে এই সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল। আর্থিক দুরবস্থাই এই সংখ্যা হ্রাসের মুখ্য কারণ বলে এখানকার প্রবীণরা মনে করেন।

গঠন সৌন্দর্যে, বর্ণবিলেপনে, সাজসজ্জায় মূর্তিগুলি রমণীয়দর্শন। কাটোয়ার আর গঙ্গার ওপারে মাটিয়ারি থেকে শিল্পীরা এসে এগুলি গড়েন। এইসব মৃৎশিল্পীর নিপুণ হাতের শিল্পকর্ম নিঃসন্দেহে উঁচু দরের। তাঁদের রচনায় বাংলার মৃৎপ্রতিমানির্মাণকলার সাবেকি ধ্রুপদী ঢংটি যে সব সময় অনুসৃত হয়েছে, তা বলতে চাই না। তাঁদের রচনায় সাবেকি রীতির মধ্যে যে কিঞ্চিৎ অতি আধুনিক আমলের রীতিও এসে পড়েছে তা লক্ষণীয়। কিন্তু তবুও সে মিশ্ররীতি হালকা ধরনে পর্যবসিত হয়নি। পৌরাণিক চরিত্রের রূপায়ণে পুরনো মেজাজটি রাখা দরকার। তাকে এখানকার শিল্পীরা যে জবাই করেননি সেটাতেই তাঁদের কৃতিত্ব অসামান্য।

দূরদূরান্ত থেকে জনসমাগম

কাটোয়ার এই কার্তিক পুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। মাহেশের রথযাত্রা, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো, নবদ্বীপের পটপূর্ণিমা, শান্তিপুরের ভাঙারাসে যেমন হুড় হুড় করে লোক আসে, তেমনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় লোক আসে কার্তিকের লড়াই দেখতে। বর্ধমান জেলার তো লোক আসেই; কাটোয়ার নিকটবর্তী বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলা থেকেও অনেক লোক আসে। হাওড়া, এবং কলকাতা থেকেও বাদ যায় না। বর্ধমান-কাটোয়া লাইন, আহমদপুর-কাটোয়া লাইনের ট্রেন ভর্তি হয়ে দলে দলে লোক আসে কাটোয়ায়। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন রাত্তিরে কার্তিক পুজো। তার পরের দিন বিসর্জন। কাটোয়াতে এই বিসর্জনের নাম বাঁইচ বা বাঁচ। এই বাঁচের সময়েই কার্তিকের লড়াই সবচেয়ে বেশি জমে। বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে আলোর রোশনাই-এ বিভিন্ন বারোয়ারির থাকা বেরোয়। নবদ্বীপের পোড়ামাতলার মত কাটোয়ার বারোয়ারিতলাও একটা প্রসিদ্ধ স্থান। সমস্ত থাকার এখানে একবার আসা চাই-ই চাই। এখানে ঘুরে যাবার পর তারা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জনে যায়। তাই এই বারোয়ারিতলায় দুপাশের বাড়ির ছাদে, বারান্দায়, জানালায় তিলধারণের জায়গা থাকে না। দুপুরবেলা থেকেই সেখানে গিয়ে মেয়ে, পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঠাঁই নেয়। অনেক রাত্তির অবধি এই পরিক্রমা চলে। বড় বড় থাকাগুলো আসার সময় সেখানটা জনসমুদ্রের চেহারা নেয়। অনেক সময় কাদের থাকা আগে যাবে, তাই নিয়ে লড়াই বেধেও যায়। তখন কাটোয়ার কার্তিকের লড়াই সত্যিকারের লড়াই-এ পরিণত হয়। তাই আগে থাকতেই পুলিশ দল তৈরি হয়ে থাকেন, যাতে কোনও অঘটন না ঘটে। এর ওপরে মাতালদেরও উৎপাত আছে। বাজনাবাদ্যির সঙ্গে উদ্দামভাবে নাচতে নাচতে তাঁরাও মাঝে মাঝে অঘটন ঘটান। সেই কারণে তারও জন্যে সতর্ক থাকতে হয় সবাইকে। সুখের বিষয়, এসব অঘটন কমে আসছে এখন। পুজো উপলক্ষে কাটোয়াতে কদিন ধরে দোকানপাটও বসে। বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, ধামা, কুলো, চুপড়ি, খেলনা, পুতুলের দোকানে কাটোয়ার কার্তিক পুজো বেশ জমজমাট হয়। এটিই এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব। তাই কাটোয়ার বাড়িতে বাড়িতে তখন আত্মীয় কুটুম্বের সমাগমে, আদর আপ্যায়নের পালা চলে। এই প্রাচীন লোকোৎসবে কাটোয়ার ছেলে বুড়ো সবাই কদিন বেশ মেতে ওঠে।

কোকাই কার্তিক

কোকাই কার্তিক কথাটি খোকা কার্তিকের একটি রূপান্তরিত কথ্য রূপ। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পুজো বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। পৌরাণিক মতে দেবী দুর্গার দুই পুত্র। গণেশ ও কার্তিক। গণেশ হস্তিমুখো স্থূলোদর, রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ। উনি সিদ্ধিদাতা বলে পরিচিত। দুর্গার দ্বিতীয় সন্তান কার্তিক গৌরবর্ণ, অতি সুন্দর, বীরভাবাপন্ন। তিনি দেবতাদের হয়ে দেবতাদের শত্রু অসুর, দৈত্য, দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। নারীদের মধ্যে যাঁরা সন্তানহীনা বা মৃতবৎসা তাঁদের কেউ কেউ

কার্তিক পুজো করে থাকেন। তাঁদের যে পূজিত কার্তিক, তাঁদের ভাষায় তা কোকাই কার্তিক। এটি খোকা কার্তিকের একটি পরিবর্তিত রূপ। এটি পুজোর পদ্ধতি হল—কোকাই কার্তিকের একটি মাটির মূর্তি তৈরি করে সেটিকে পেছন দিক থেকে মোটা পাটকাঠির সঙ্গে বেঁধে থোড়ের খোলায় বসানো হয়। এই পুজো পুরোহিত করেন না। সাধারণত নিঃসন্তান নারীরাই এ পুজো করে থাকেন। পুজোর প্রধান উপকরণ হল নাড়ু। কোকাই কার্তিক তো শিশু। অতএব তিনি খুব নাড়ুপ্রিয়। সেজন্যে এর পূজারিণীরা নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, মুগের নাড়ু ইত্যাদি দিয়ে খোকা কার্তিকের পুজো করেন। সবাই বলে ওঠেন :

কোকাই কার্তিক, কোকাই কার্তিক,—
তোমায় রাখব আমাদের দুই হাতে, আমাদের বুকে
আমাদের মাথায়।
আমরা চাই তুমি আমাদের পুত্র হয়ে আমাদের
সব দুঃখ ঘোচাও................।

ধানের ভার না সহে ধরণী

ধান আর ধান। ক্ষেতভরা পাকা হলদে রঙের ধানগাছ—মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ধানেব ভারে। সে হলদে সমুদ্র দূরদিগন্তে যেখানে বিলীন সেখানে একটি সরু কালো রেখা, জনপদের নিশানা। ওটি মাজিগ্রাম—বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার একটি নিভৃত পল্লী।

বর্ধমান-কাটোয়া ছোট রেল লাইনের কৈচর স্টেশন থেকে পশ্চিম মুখে কমপক্ষে চার মাইলব্যাপী একটানা ধানক্ষেত পার হলে তবে মিলবে মাজিগ্রাম। কৈচর থেকে মাজিগ্রামে যেতে অবশ্য পথে পড়বে দুটি গ্রাম—চৈতন্যপুর আর মাথরুন। এ-দুটি গ্রামের পর শুধু একটানা ধানক্ষেত—উর্বর, সুফলপ্রসূ। জননী বসুন্ধরা সেখানে যেন ঢেলে দিয়েছেন তাঁর অন্নথালী—প্রসন্নজননীর সে আশীর্বাদ কুড়িয়ে ঘরে তুলতে এখন ব্যস্ত সেখানে চাষীর দল।

মাজিগ্রামের আর একটা দিনের ছবি আমার মনে পড়ছে। সেদিনটা ছিল গত আষাঢ় মাসের ১৯ তারিখ—আষাঢ়ী শুক্লানবমী তিথি, মাজিগ্রামের গ্রামদেবী শাকম্ভরীর বার্ষিক মহাপুজোর দিন। এই উৎসবটি দেখতে সেদিন মাজিগ্রামে আমি হাজির হয়েছিলুম। সেদিন মাথার ওপর ছিল আষাঢ় মেঘের কালো ছায়া, আর ছায়ামণ্ডপের তলায় ছিল দিগন্তের কোলে গিয়ে মেশা সদ্যচষা ধানক্ষেত। সকাল থেকে বর্ষণ শুরু। তবুও লোক আসছে আশেপাশের কাছের দূরের নানান গ্রাম থেকে মাজিগ্রামের দিকে—ঢাক, ঢোল, ডগর বাজিয়ে, বলির পাঁঠা আর নৈবেদ্যের থালা নিয়ে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই তারা আসছে,—এক-হাঁটু জলকাদা ভেঙে, চষা ধানক্ষেত, আলপথ, গাঁয়ের পিছল অগম্য পথ ধরে। ঢাক-ঢোলের চামড়া ভিজে গিয়ে ঢ্যাপ্-ঢোপে আওয়াজ বেরোচ্ছে। ঢাকের মস্ত পালকের সাজ গুটিয়ে-সুটিয়ে কাত হয়ে পড়েছে। ছেলে-বুড়ো সকলেরই পরনের কাপড় চোপড় ভিজে সপ্‌সপে। তবুও লোক আসতে ছাড়ছে না, দেবী শাকম্ভরীর বার্ষিক উৎসবে। শাকম্ভরীতলা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। দোকানপাটও বসেছে—খাবারের দোকানই বেশি। লোকে খাবার কিনছে, খাচ্ছে। মণিহারি দোকানে টুকিটাকি জিনিস কিনছে। শাকম্ভরী দেবীর উত্থান মন্দিরের চারধার ঘিরে চলছে পুজো, পাঁঠা, ভেড়া ইত্যাদি বলি, একটার পর একটা।

বৃষ্টির জলে পাঁঠার রক্তে সেখানে দাঁড়ানো যায় না, পা গেঁথে যায়। কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে, তারই ওপরে দাঁড়িয়ে 'জয় মা শাকম্ভরী' রবে পাঁঠা আর ভেড়াদের খাঁড়া বগির কোপ পাড়ছে লোকে। শাকম্ভরীর উত্থান মন্দিরের সামনে তিল ধারণের জায়গা নেই।

এমন বিদ্‌কুটে বাদলা দিনের বদলে অন্য আর একদিন শুকনো সময়ে এ-উৎসবটা করলে লোকের আনন্দের পাওনায় কি কিছু ঘাটতি পড়ত? গাঁয়ের 'ন্যায়রত্ন টোলবাড়ির' দাওয়ায় বসে গ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমশাই শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বিদ্যাভূষণকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। পণ্ডিতমশাই হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলেন, আষাঢ় মাসের এই শুক্লানবমী তিথিই, মাজিগ্রামের দেবী শাকম্ভরীর বার্ষিক মহাপুজোর দিনরূপে নির্দিষ্ট—এর কোনও নড়চড় হবার উপায় নেই। আর গাঁয়ের লোক এই দিনটিতে বৃষ্টির জন্যেই আকাশের মুখপানে চেয়ে থাকে, কারণ এমন দিনে বৃষ্টি হলে, তবে সে-বছর ভাল ধান হবে—এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

খনার বচন

আবার যেমন তেমন বৃষ্টি হলেই চলবে না, তারও রকমফের আছে। পণ্ডিতমশাই আকাশের দিকে মুখ তুলে খনার বচন আওড়ালেন :

আষাঢ় নবমী শুকুলা পখা।

কী কর শ্বশুর লেখাজোখা।।
যদি বর্ষে রিণি-ঝিণি।
ধানের ভার না সহে ধরণী।।
যদি বর্ষে মুষলধারে।
মধ্যসমুদ্রে বগা চরে।।
যদি বর্ষে ছিঁটে ফোঁটা।
পর্বতে হয় মীনের ঘটা।।
সূর্য হেসে বসে পাটে।
সেবার শস্য না হয় মোটে।।

অর্থাৎ খনা তাঁর জ্যোতিষী শ্বশুর বরাহকে বলছেন : আজ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। বছরে কেমন শস্য-সম্পদ হবে তার জন্যে আজ খড়ি পেতে আঁকজোক করে কষে গুণে দেখবার কোনও দরকার নেই। এই দিনটির বৃষ্টিই সেসব কথা স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে। যদি আজ বৃষ্টি হয় মৃদু মন্দ গতিতে ধীর ছন্দে, তবে বুঝতে হবে, সে-বছরে এমন ধান হবে যে, পৃথিবী তার বোঝা আর বইতে পারবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হলে, এমন শুখো হবে যে, মাঝ সমুদ্রও শুকিয়ে খটখট করবে, তাতে বক চরবে। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হলে, এত প্রচুর মাছ হবে যে, মাছের পাহাড় জমে যাবে। আর এই দিনটিতে যদি সারাদিনই আকাশ মেঘহীন থাকে আর সন্ধ্যাতেও যদি মেঘমুক্ত অবস্থায় সূর্য অস্ত যায়, তবে বুঝতে হবে, সে-বছরে ধানের দফা-রফা হয়ে গেছে।

গ্রামীণ আবহাওয়া ও শস্যের পূর্বাভাস

এসব বচন, ছড়া গ্রামীণ মানুষের মিটিবিওলজিক্যাল ফোরকাস্ট, ক্রপ ফোরকাস্ট। আবহাওয়া কেমন যাবে, কেমন ফসল হবে—সে-সম্বন্ধে এই লোকপ্রচলিত প্রবচনগুলিই গ্রামের মানুষকে হদিশ দেয়। খনার বচন, ডাকের ছড়া বাংলার কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনের সঙ্গে সুদূরকাল থেকে জড়ানো। এরা লোকমুখে চলে, তাই অঞ্চলে অঞ্চলে এদের ভাষাগত বিভিন্নতা থাকলেও তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রায় অপরিবর্তিত আছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, উড়িষ্যায়, আসামে, বাংলার প্রান্তবর্তী বিহারের জেলাগুলিতেও এইসব প্রবচনের প্রচলন দেখা যায় আঞ্চলিক ভাষায়। মেঘ, বৃষ্টি, রোদ্দুর, পুকুর, মাঠঘাট, গাছপালা, পাখি, জীবজন্তু, চাষ-বাস, ফসল, ঘর-বাড়ি, মানুষের আচার-আচরণ, এক কথায় বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে সবকিছুকে সুদূর অতীত কাল থেকে পর্যবেক্ষণ করে মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করেছে তাকেই ধরে রেখেছে এই সমস্ত ছড়ার বচনে। হয়তো তারা পূর্ণমাত্রায় বৈজ্ঞানিক অমোঘ সত্য নয়, কিন্তু অনেক দিনের অনেক মানুষের আবিষ্কৃত তথ্য তারা। অনেক দিন ধরে অনেক মানুষের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরখ হতে হতে তারা যে বৈজ্ঞানিক সত্যের অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে, তা অনস্বীকার্য।

চাষের সঙ্গে খনার নাম কেন জড়ানো?

আমাদের দেশে খনার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। খনা এই সমস্ত প্রবচনের রচয়িত্রী কিনা, খনা সত্যিই গণিতজ্ঞা, জ্যোতিষশাস্ত্রপারঙ্গমা, বিদুষী ভারত-নারী (সিংহল রাজকন্যা) ছিলেন কিনা, কিংবা 'বৃহৎসংহিতা'র রচয়িতা উজ্জয়িনীর বরাহমিহিরের (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা—এ সমস্ত জনশ্রুতিমূলক তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না। কিন্তু একটি কথা বলতে চাই, নারী খনার নামের সঙ্গে পুরুষের কাজ চাষবাস এবং তার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আবহাওয়াতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির কথা ঐসব ছড়ায় বচনে কেন জড়ানো? আমাদের দেশে নারীরা কৃষিকর্মে কিছু কিছু অংশগ্রহণ করলেও তার মুখ্য দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে পুরুষেরই ওপরে অর্পিত। অতএব চাষবাসের জ্ঞানের কথাপূর্ণ প্রচলিত ছড়া, বচনগুলি পুরুষেরই নামের সঙ্গে জড়িত থাকা উচিত ছিল কিন্তু তা না হয়ে, নারীর নামের সঙ্গে কেন জড়িত?

নারীর হাতেই চাষের আবিষ্কার

এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আধুনিক কালের কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের গবেষণা থেকে। নৃতত্ত্ব এবং মানুষের সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা দেখাচ্ছেন, আদিম কৃষিবিদ্যা আবিষ্কার করেছিল নারী, পুরুষ নয়। মানুষেব ক্রমোন্নতির পথযাত্রায় যে কৃষিবিদ্যা তাকে বিপুল অগ্রগতির পথে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, তার গোড়াপত্তন করেছে আদিম ট্রাইব্যাল যুগের মানবী। ঐ পণ্ডিতরা বলছেন, শিকার আর তা থেকে কালক্রমে পশুপালনের কাজ মুখ্যত পুরুষদের হাত দিয়েই বিকাশ লাভ করেছে। কারণ, গর্ভিণী এবং স্তন্যদায়িনী নারীর কতকগুলি সাময়িক শারীরিক অসুবিধা আর সন্তানকে স্তন্যদান করে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তাকে হাতিয়ার হাতে পুরুষের সঙ্গে বিপদসঙ্কুল অরণ্যপথে শিকারের সন্ধানে কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পথে প্রায়শই নিয়ে যায়নি। তার বদলে ছুঁচলো গাছের ডাল কিংবা পাথরের কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে এখানে-সেখানে ফল, মূল, কন্দ খোঁজা, নয়তো শস্যবীজ আবিষ্কার করা, নিজেদের আস্তানার আশেপাশে সেই বীজ পুঁতে শস্যোৎপাদনের চেষ্টার পথে নারীকে চাষের কাজে পরিচালিত করেছে। এইভাবেই নারীই শিকারজীবী পুরুষের সঙ্গে খাবার সন্ধানের পরিপূরক ব্যবস্থা স্বরূপ ছোটখাটভাবে মাটি খোঁড়া, বাগিচা বাগানের কাজে হাত লাগিয়েছে। কালক্রমে মানুষ যখন হাল-লাঙলের ব্যবহার শিখেছে, পালিত পশুর সাহায্যে উন্নত ধরনের চাষের কাজ শিখেছে, তখন সে-কাজের মুখ্য দায়িত্ব নারীর হাত থেকে পুরুষেরই হাতে চলে এসেছে। এ-সম্বন্ধে কয়েকজন গবেষক পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করা যাক।

কয়েকজন গবেষকের অভিমত

কেমব্রিজের ইম্যানুয়েল কলেজের অধ্যাপক পিটার গাইলস্ বলছেন : আদিম কৃষিকার্যের দায়িত্ব পুরুষের হাতে সম্পূর্ণভাবে কিংবা বহুল পরিমাণে ন্যস্ত ছিল না। নারীই নিয়েছিল ঐ মুখ্য দায়িত্বভার।.......

ভন্ ডেন্ স্টেইনেন্ মধ্য-ব্রেজিলের 'বাকাইরি'-উপজাতিদের প্রসঙ্গে দেখাচ্ছেন, তাদেব নারীরাই কৃষিকার্যের উদ্ভাবন করেছে।........জেন এলেন্ হ্যারিসন বলছেন, আমেরিকার আদিবাসীদের বিশ্বাস, কৃষিকার্য আদিপর্বে নারীদেরই কাজ ছিল এবং যেহেতু তারা নিজেরা সন্তান প্রসবিনী তারা স্বভাবতই ফসল উৎপাদনে পারদর্শিনী হবে; তাই, তারা ভুট্টার চাষ করলে এক-এক বৃন্তে তিনটি করে ভুট্টা হবে।.....('এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এ্যান্ড এথিকস্', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৭)।

রবার্ট ব্রিফল্ট-এর 'দি মাদার্স' নামে তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত বৃহৎ গ্রন্থখানি নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের এক প্রামাণ্য দলিল এবং স্যার জেমস্ জর্জ ফ্রেজারের বারোটি খণ্ডে রচিত 'গোল্ডেন বাউ'-এরই সমান সম্মানার্হ। রবার্ট ব্রিফল্ট লিখেছেন : কৃষিবিদ্যা একমাত্র নারীর হাতেই বিকাশ লাভ করেছে—এবং তিনি এই ব্যাপারে সমাজবিকাশের অগ্রগতির পথে আজও আটকে পড়ে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের সংস্কার ও আচার-আচরণ থেকে ভূরি-ভূরি উদাহরণ আহরণ করে নিজের ঐ বক্তব্যটিকে সুদৃঢ় করেছেন। ('মাদার্স', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২-১১)।

ভারতই পাথরের কুড়ুলের আবিষ্কারক

ওমর্ রলফ্ এরেনফেল্স্ তাঁর 'মাদার-রাইট ইন ইন্ডিয়া'-তে দেখিয়েছেন ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর নারী সমাজই চাষের কাজ আবিষ্কার করেছিল এবং চাষের কাজকর্ম তারা ভালভাবেই চালাত। তিনি এই প্রসঙ্গে এই বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় জার্মান পণ্ডিত মেন্‌ঘিন্-এর যে অনুমানের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেন্‌ঘিন্ অনুমান করেন, কৃষিকার্যে ব্যবহার্য নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের যে কুড়ুল সারা পৃথিবীতে পাওয়া গেছে, তা ভারতের মাতৃপ্রাধান্যমূলক সমাজের আদিম স্তরেরই আবিষ্কার। মেন্‌ঘিনের এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে ভারতবাসী হিসাবে একথা ভাবতে নিশ্চয়ই গৌরব বোধ হবে যে, ভারতই পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে কৃষিবিদ্যায় হাতেখড়ি দিয়েছে, চাষের যন্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলায় লেখা 'লোকায়ত দর্শন' এবং ইংরেজীতে লেখা 'লোকায়ত' নামে বই দুটিও উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত পণ্ডিতদের গবেষণা সম্বন্ধে তিনি তাঁর বই-এ বিস্তৃতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

যদি কৃষিকর্ম আদিতে নারীর আবিষ্কার, নারীর কাজই হয়ে থাকে, তবে এ-দেশের কৃষিকার্য, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে লোক-প্রচলিত ছড়ার বচন খনা নামে একটি নারীর নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকাতে আশ্চর্যের কী আছে? এরেনফেল্স্, মেন্-ঘিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে তো ভারতবর্ষেও কৃষিকর্ম মেয়েদেরই হাতে আবিষ্কৃত এবং বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ নারীপ্রাধান্যমূলক

প্রাগার্য-ভারত নারী বা মাতৃপ্রাধান্যমূলক নরগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের দেহে তাদেরই রক্ত যে বহুলভাবে প্রবাহিত—এটা পণ্ডিতদের নিশ্চিত ধারণা। অনেক আধুনিক পণ্ডিতের ধারণা, যে-সমাজ আদিতে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সে-সমাজ নারীপ্রাধান্যমূলক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠতে বাধ্য। আর পশুপালন, বন্য জন্তুকে ধরে গৃহপালিত করার চেষ্টা থেকে যার উদ্ভব, তা পুরুষেরই কাজ, পুরুষেরই এক্তিয়ারের ভেতরে। সুতরাং এই কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ওপরে গড়ে ওঠা সমাজের ওপরে উত্তরকালে পুরুষপ্রাধান্যমূলক অন্য আর এক সমাজের প্রভাবপ্রতিপত্তি যদি পড়েও, তবুও তার অঙ্গে নারীপ্রাধান্যমূলক সমাজের অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়ে যায়। ভারত তথা বাংলাদেশ সম্বন্ধেও এ সত্য খাটতে পারে। আদিতে পশুপালক, উর্বর জমির সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ আর্যরা ছিল পুরুষপ্রাধান্যমূলক সংস্কৃতির লোক। তারা ভারতবর্ষে কালক্রমে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে, আর্য-প্রাগার্যের সংঘর্ষে-সমন্বয়ে ভারতের যে নতুন সংস্কৃতি রচিত হয়েছে, তাতে প্রভূত শক্তিশালী আর্যদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বিপুলভাবে মুদ্রিত হলেও ভেতরে ভেতরে নারীপ্রাধান্যমূলক সংস্কৃতির অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে—আচারে, আচরণে, দৈনন্দিন জীবনযাপনে, বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে।

খনার বচন নারীর কৃষিপ্রয়াসের স্মারক

তাই বৈদিক সমাজে পুরুষ-দেবতার যেমন প্রাবল্য ছিল, তেমনই মহেনজোদাড়ো, হরপ্পার সভ্যতায় ছিল নারী-দেবতারই প্রাবল্য। বিভিন্ন প্রাগার্য নারীপ্রাধান্যমূলক সমাজের কাছ থেকেই ভারত তথা বাংলাদেশ পেয়েছে অসংখ্য দেবী, শক্তি-সাধনা, মাতৃ-উপাসনার ধারা! অতএব যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আদিম কৃষিভিত্তিক নারীপ্রাধানামূলক সমাজেরই স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে খনা, কৃষি-বিষয়ক ছড়াগুলি, শ্লোক-প্রবচনগুলি, —তবে সে সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে,

কোটি কোটি বিস্মৃতনাম কৃষিজীবী পুরুষের ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, প্রকৃতিকে জানবার প্রয়াস মিলিত হয়েছে, ঐ কৃষিবিষয়ক বচনগুলিতে। কিন্তু একটি নারীর নামাঙ্কিত হয়ে সেগুলি আদিম নারীজাতির কৃষিপ্রয়াসের স্মারক হয়ে রইল।

মাজিগ্রামের লোকোৎসব দেবী শাকম্ভরীর বার্ষিক মহাপুজোর কথা বলতে গিয়ে নারীপ্রাধান্যমূলক কৃষিভিত্তিক সমাজের কথা আলোচনা করেছি। ধান ভানতে এই শিবের গীত গেয়েছি, তার কারণ দেবী শাকম্ভরীর সঙ্গে কৃষিভিত্তিক নারীপ্রাধান্যমূলক আদিম সমাজের ধ্যানধারণা বিশেষভাবে সংযুক্ত। দেবী শাকম্ভরী শস্যেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তিনি অন্নদাত্রী; তিনি দুর্ভিক্ষে জীবরক্ষিণী; নির্জলা, রিক্তশস্য কৃষিক্ষেত্র তাঁর করুণ নয়ন-সম্পাতে জলে সিক্ত হয়, শস্যের ভার উপচে পড়ে, তিনি নিখিল বিশ্বের মাতৃরূপে, ধাত্রীরূপে পরিকল্পিতা। কৃষিভিত্তিক আদিম সংস্কৃতিতেই এই দেবীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে—সুদূর মহেনজোদাড়োর কাল থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত। ভারতের নানা স্থানে দেবী শাকম্ভরীর পুজো প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্ধমান জেলার মাজিগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও এই দেবীর মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নেই, কিংবা এই দেবীকে কেন্দ্র করে বার্ষিক উৎসবও হয় না।

পুরাণের চেয়েও পুরনো

কৃষির আবিষ্কার—সভ্যতার নতুন দিগন্তের দিকে আদিম মানুষের অভিযাত্রা; মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার পথে চলার একটি সুনিশ্চিত ছাড়পত্র।

পণ্ডিতরা বলেন : শিকার আর যত্রতত্র খাবারের সন্ধানে ঘোরা—এই অনিশ্চিত অস্থির জীবনযাত্রার ভেতরে মানুষ কাটিয়েছিল কয়েক লাখ বছর। মাত্র হাজার সাতেক বছর আগে সে কৃষি অবলম্বনে নিজেই খাদ্যোৎপাদন করে পা বাড়িয়েছিল সুস্থির সুনিশ্চিত জীবনপদ্ধতির দিকে, যার পরিণতিতে পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছিল নীল নদের দেশ মিশরে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দেশ মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধুনদের দেশ পাঞ্জাবে। মানুষের বুনো-দশা ঘুচিয়ে তাকে সভ্যতার পথে টেনে আনতে সাহায্য করেছে কৃষি-উৎপাদন। কৃষি মানুষের সভ্যতার পথে আলোর দিশারী উজ্জ্বল দীপ।

আদিম অন্ধকারে কে জ্বেলেছিল এই দীপ?

পণ্ডিতরা বলেন—নারীই জ্বেলে দিয়েছিল এই দীপ, নারীই কৃষি-আবিষ্কারের গৌরবভাগিনী; প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষি-উৎপাদন নারীর হাতেই হয়েছিল। নানান্ তথ্যের ভিত্তিতে এই দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন পিটার গাইল্‌স্, ই জে টমসন্, রবার্ট ব্রিফল্ট্, গর্ডন চাইল্ড, জন এলেন্ হ্যারিসন্, ভন্ ডেন্ স্টাইনেন্ প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতজনরা।

উদ্ভিদজগৎ নারীগর্ভপ্রসূত

এই পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন সভ্যতার উঁচু স্তরে ওঠবার সিঁড়িখানার নিচের দিকে নানান ধাপে আজও আটকে আছে পৃথিবীর নানান অঞ্চলের নানান গোষ্ঠীর মানুষ, যারা প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষি-উৎপাদনের ভেতর দিয়ে সবেমাত্র পার হয়ে এসেছে কিংবা সেখানেই রয়ে গেছে। বেশি দূর এগোতে পারেনি। কৃষিনির্ভর এই মানুষদের প্রাচীন উপকথা, সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা কৃষিকর্ম আবিষ্কার ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, এঁরা মনে করেন—উদ্ভিদজগৎ নারীগর্ভপ্রসূত, নারীর দেহ থেকেই পৃথিবীর প্রথম বৃক্ষ, লতা, শস্য উদ্‌গত হয়েছে।

রবার্ট ব্রিফল্ট তাঁর 'Mother' নামে বিশাল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন। এ গ্রন্থ থেকে কয়েকটি তথ্য চয়ন করছি।

ম্যানিওক-লতার মূল আমেরিকার ব্রাজিলের টুপি নামে আদিবাসী নরগোষ্ঠীর প্রিয় খাদ্য। ম্যানিওকের জন্মকাহিনী ব্রিফল্ট বিবৃত করেছেন। কাহিনীটি হচ্ছে এই : একদা এই জ্যোতির্ময় শ্বেততনু পুরুষ একটি কুমারী বালিকার সামনে আবির্ভূত হবামাত্র বালিকা যৌনমিলন ব্যতিরেকেই গর্ভবতী হয়ে তখনই এক শ্বেততনু সন্তান প্রসব করেছিল। ঐ সন্তানের মৃতদেহ মাটিতে সমাধিস্থ করামাত্র সেখানে উদ্‌গত হয়েছিল—পৃথিবীর প্রথম ম্যানিওক-লতা। ('মাদার', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪)। ঐ আত্মজ যেন নারীর দেহবীজ। মাটির নিচে অঙ্কুরিত দেহবীজ থেকে, প্রকারান্তরে ঐ নারীর নিজেরই দেহ থেকে যেন পৃথিবীর প্রথম ম্যানিওক-লতার উদ্ভব হয়েছে—এমন ইঙ্গিতই আদিবাসীর এই উপকথাটি।

ব্রিফল্ট উত্তর আমেরিকার আদিবাসী ইরোকোয়দেরও কথা উল্লেখ করেছেন। ইরোকোয়-জাতি ছিল মুখ্যত কৃষিজীবী কিন্তু এদের প্রতিবেশী আল্‌গন্‌কিন্-জাতির লোকেরা ছিল প্রধানত শিকারজীবী।

ইরোকোয়দের কৃষির দিকে বেশি ঝোঁক ছিল দেখে আল্‌গন্‌কিন্‌রা তাদের মেয়েলি ভাবাপন্ন বলে নাসিকা কুঞ্চিত করত ('মাদার', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৯-৪৫০)। আদিতে নারীর হাতেই যে কৃষির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছে এবং উন্নত পর্যায়ের কৃষি কর্মোদ্যোগের আগে যে এ-কাজটি সম্পূর্ণ মেয়েদের এক্তিয়ারেই ছিল, তা এই সিদ্ধান্তকে জোরদার করছে, শিকারজীবী আল্‌গন্‌কিন্‌দের কৃষিকে মেয়েলি কাজ বলে ঘৃণার চোখে দেখার এই কাহিনীটি।

কৃষিজীবী ইরোকোয় জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি গোষ্ঠীর নাম চেরোকী। চেরোকীদের ধারণা--- পৃথিবীর আদিশস্যকণা আবিষ্কার করেছিল এক নারী; আর, এই আদি মানবীর মৃতদেহ মাটির ওপর দিয়ে যেখানে যেখানে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার দেহের স্পর্শ পাওয়া মাত্র সেখানে সেখানে উদ্গত হয়েছিল প্রচুর বৃক্ষলতা—শস্যভারে অবনত। ('মাদার', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২)।

নারী সন্তানজননে সক্ষম। তাই তার দেহের সংস্পর্শে বন্ধ্যা পৃথিবী শস্যপ্রজননক্ষমতা পাবে— এমন বিশ্বাসই উল্লিখিত কাজের পেছনে রয়েছে যেন। তাছাড়া, আদি মানবী---পৃথিবীর প্রথম শস্যকণা যার হাতে আবির্ভূত, সে সামান্য রমণী নয়! মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সঙ্গে তার দেহ একাকার হয়ে বৃক্ষ-লতা, ফল-শস্য প্রসব করছে, অর্থাৎ নারীদেহ থেকেই পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ সমুদ্‌গত—এমন ধারণাতেও ঐ আদিম মন আচ্ছন্ন, এই ইশারাও যেন ঐ কাহিনীটি দিচ্ছে।

ব্রিফল্ট আরও উদাহরণ দিয়েছেন, পৃথিবীর আদি নারীই যে কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছে, তার হাতেই যে পৃথিবীর আদি শস্যবীজ আবির্ভূত হয়েছে, প্রকারান্তরে নারীদেহ থেকেই যে পৃথিবীর আদি উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটেছে---এ বিশ্বাস বিশ্বের আরও অনেক আদিবাসী নরগোষ্ঠী, যথা— আমেরিকার বাসুটোল্যাণ্ডের বাসুটো জাতির লোকেরা, পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী মানুষেরাও পোষণ করে।

গ্রিক লোকসঙ্গীত

ঐ আদিম ধারণা গ্রিক কৃষকদের মনে আজও কেমন গাঁথা হয়ে আছে, ব্রিফল্ট তাদের লোকসঙ্গীত থেকে তা দেখাচ্ছেন : "ফসল কাটছে এক ইহুদি মেয়ে। কখনও সে নুয়ে পড়ছে, কখনও সে গমের শিসের ওপরে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ছে, সোনার শিশু সে প্রসব করছে।" ('মাদার', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫)।

নারী ও পৃথিবী

সন্তানপ্রসবিনী নারী আর শস্যোৎপাদিনী পৃথিবী---এদের দুজনকে, সভ্যতার আদিম স্তরের মানুষ যেন অনেকখানি একই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছিল, অনেক নৃতত্ত্ববিদের এইরকম ধারণা। অবশ্য এ হচ্ছে মানুষের সভ্যতার সেই আলো-আঁধারি প্রত্যূষের কথা, যখন প্রকৃতি তার কাছে অবগুণ্ঠিতা অপাররহস্যময়ী, প্রাকৃতিক কার্যকারণের বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের কথা সে কিছুমাত্র চিন্তা করতে পারেনি। মাটির ফসল আহার্যস্বরূপ গ্রহণ করতে সে সবেমাত্র শিখেছে, তখন, মাটিতে ফসল ফলাবার আয়োজনেও ব্যাপৃত, কিন্তু কৃষিবিজ্ঞান তার মনের নাগালের অনেক বাইরে পড়ে। নিজের অপরিণত বিচারবুদ্ধি দিয়ে সে প্রকৃতির রহস্যকে বোঝবার চেষ্টা করছে। তার পার্শ্বচারিণী নারীর সন্তানপ্রজননক্ষমতা তার মনে ইঙ্গিত এনে দিচ্ছে। পৃথিবীও নারীর মত জননীর মত গর্ভ থেকে শস্য প্রসব করছে। ঐ আদিম সমাজে যখন কৃষির নির্ভরতা ভাল করে গড়ে উঠল, তখন দেখা গেল সন্তানদায়িনী নারী আর উদ্ভিদজনয়িত্রী পৃথিবীর ফলপ্রসূতার ধারণা তার মনে একই সংস্কারের বন্ধনে গাঁথা হয়ে গেছে। পাথুরে-হাতিয়ার-সম্বল, সেদিনকার অসহায় মানুষ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,

বন্ধ্যাভূমির অক্ষমতা, ঝড়জল, পতঙ্গ, বন্যজন্তুর উৎপাতের মুখে ফসল নিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁচবার সংগ্রামে, প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় জাদুভিত্তিক বিশ্বাস, আচরণ, সংস্কারের আশ্রয় নিয়েছে। তদনুযায়ী নানান অনুষ্ঠানেও সে ব্রতী হয়েছে—মানবীয় সন্তানপ্রজননের সঙ্গে যাদের গভীর সম্পর্ক, মিল এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেগুলি অনুকরণমূলক অনুষ্ঠানও। ব্রিফল্ট, জেমস্ ফ্রেজার প্রভৃতি এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দিয়েছেন। ঐ জাদুভিত্তিক সংস্কার থেকেই পৃথিবী জড়প্রকৃতি হয়ে উঠেছে রমণীস্বরূপিণী, অনন্তকোটিজীবজনয়িত্রী, অনন্তকোটিউদ্ভিদপ্রসবিনী মহাজননী।

এই আদিম পর্যায়ের কৃষিকর্ম নারীর হাতেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নারীর এক্তিয়ারেরই মধ্যে অনেকদিন আবদ্ধ থেকেছে। তাই জাদুভিত্তিক মেয়েলি সংস্কারে, আচার-আচরণে, কৃষি-উৎপাদনের আয়োজনে সমাজটিও নারীপ্রাধান্যমূলক হয়ে গড়ে উঠতে বাধ্য। কালক্রমে এ সমাজ পুরুষপ্রাধান্যমূলক সমাজে রূপান্তরিত হলেও, আদিম পর্যায়ের নারীপ্রাধান্যমূলক অনেক আচার, আচরণ, সংস্কার স্মারকচিহ্নের মত যে টিকে থাকে, সমাজতত্ত্ববিদরা তার বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন।

পৌরাণিক শাকম্ভরী দেবী

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতেও দেবী শাকম্ভরীর মধ্যে এই আদিম মাতৃতান্ত্রিক সংস্কারের চিহ্ন রয়ে গেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে, বামন পুরাণে, দেবী পুরাণে দেবী শাকম্ভরীর কাহিনী বিবৃত আছে। বিভিন্নকালে বিভিন্ন দৈত্যবধের জন্যে দেবী চণ্ডী বা দুর্গা যে সমস্ত অবতাররূপে অবতীর্ণ হবেন, দেবতাদের কাছে তার পূর্বাভাস দেবার সময় তিনি ঘোষণা করছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী-মাহাত্ম্য' :

> ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্টামনম্ভসি।
> মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা।।
> ততঃ শতেন নেত্রানাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
> কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মান্ততঃ।।
> ততোহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
> ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।।
> শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামাহং ভুবি।।

অর্থাৎ আবার পৃথিবীতে যখন শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলবে, তখন মুনিদের স্তুতিতে দেবী নির্জলা পৃথিবীতে অযোনিসম্ভবারূপে আবির্ভূত হয়ে শতনয়নের করুণাদৃষ্টিতে তিনি মুনিদের দর্শন করবেন, তখন তাঁর নাম হবে শতাক্ষী। তারপর যতদিন না বৃষ্টি হবে দেবী ততদিন নিজদেহজাত শাকের দ্বারা জীবজগৎকে রক্ষা করবেন। সেইজন্য তাঁর নাম হবে শাকম্ভরী অর্থাৎ শাকের দ্বারা জীবজগতের ভরণপোষণকারিণী।

দেবী ভাগবতের কাহিনীতে আছে . অনাবৃষ্টিজনিত দারুণ দুর্ভিক্ষে জীবজগৎকে প্রপীড়িত দেখে মুনিরা হিমালয়ে গিয়ে দেবী দুর্গার স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। তখন দেবী তাঁদের সামনে আবির্ভূতা হলেন, অনন্ত নয়ন বিস্তার করে মুনিদের দর্শন করতে লাগলেন। নীলাঞ্জনের মত তাঁর দেহকান্তি, নীলপদ্মের মত তাঁর আয়তনয়ন। পীনস্তনী সেই পরমরূপময়ী দেবীর চার হাতে বাণ, পদ্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণাজরানাশন পুষ্প, পল্লব, ফল, মূল শাক আর এক মহাধনু। করুণার্দ্র-হৃদয়া দেবীর নয়ন থেকে অবিরত অশ্রু-বিসর্জনে ন-দিন ধরে নির্জলা পৃথিবীতে খুব বৃষ্টি হতে লাগল। তাতে ভরে গেল নদনদী, তৃপ্ত হল গাছপালা, মানুষ, সমস্ত প্রাণিজগৎ। যতদিন না আবার নতুন ফসল উঠল, ততদিন দেবী নিজকরধৃত শাক, ফল, মূল প্রভৃতি আহারদানে মানুষ, গবাদিপশুর প্রাণরক্ষা করলেন।

অবশেষে দুর্গম নামে বেদহরণকারী যে অসুর পৃথিবীতে এই নিরম্বু দুর্ভিক্ষের দুর্গতি ঘটিয়েছিল, দেবী তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তার প্রাণবধ করলেন এবং শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দেবী দুর্গা নামে ত্রিলোকে খ্যাত হলেন।

প্রাক্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল সমাজের সংস্কার

শাকম্ভরী সম্বন্ধে ওপরের কাহিনী দুটি প্রায় একই রকমের হলেও মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনীটিই দেবী ভাগবতের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি পুরনো। দেবী ভাগবতের রচয়িতা মার্কণ্ডেয় পুরাণের সংক্ষিপ্ত কাঠামোরই ওপরে কাব্যকল্পনার কিছু কারুকর্ম রচনা করেছেন। পার্জিটার সাহেবের মতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের রচনা। কিন্তু কাহিনী দুটিতে যে কৃষিনির্ভর সমাজের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, কল্পনা, সংস্কার প্রতিফলিত হয়েছে, তার ইতিহাস ভাবতে পুরাণকাহিনীর লিপিবদ্ধকরণ কিংবা সঙ্কলনের সময়ের চেয়ে অনেক—অনেক বেশি পুরনো। ভারতে আর্যপূর্ব যে আদিম প্রাক্-বিভক্ত কৃষিনির্ভর ট্রাইব্যাল সমাজ ছিল, আদিম পর্যায়ের কৃষি-উৎপাদনের জন্য যারা নানান জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত সেই অতিপ্রাচীন যুগের অতিপ্রাচীন মানুষদেরই সংস্কার, বিশ্বাস কালপ্রবাহে ভেসে এসেছে তার ঢের পরবর্তীকালের লোকস্মৃতিতে, লোকচর্যায়, লোককাহিনীতে। পুরাণকারদের রচনায়-সঙ্কলনে সেই দূর স্বপ্নের অস্পষ্ট ছায়ার মত অতীত জগৎ এসে প্রতিফলিত হয়েছে। কেন অতীত এসে এমন করে প্রতিফলিত হয়েছে তার উত্তরে সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্য · শুধুমাত্র ভারতভূখণ্ডে নয়, এশিয়ার সমস্ত প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজেরই কৃষি-উৎপাদনের পদ্ধতি সুদূর প্রাচীনকাল থেকে প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই একটানা বয়ে এসেছিল। তাই এখানকার সমাজেও অতিপ্রাকৃত প্রাচীন সংস্কার, কল্পনা, ধ্যানধারণার অস্তিত্ব সুচিরস্থায়ী হয়েছে—যদিও পরবর্তীকালে এসব সংস্কার, কল্পনা, চিন্তার আদিম প্রয়োজনীয়তা বা তাৎপর্য হারিয়ে গেছে। এটি শুধু এশিয়াখণ্ডেই নয়, পৃথিবীর আরও নানান দেশে ঐ রকম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে গড়ে ওঠা সমাজেও দেখা যায়।

নেচার-মিথ

ওপরের ঐ কাহিনীগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—ওরা কৃষিভিত্তিক আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কথা, যাদের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসে দেবী শাকম্ভরী শস্যসম্ভারের প্রসবিত্রী জননী, অনাবৃষ্টি-অজন্মা-লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে জগৎত্রাসকর অসুরদের প্রাদুর্ভাব। দীর্ঘকালস্থায়ী অনাবৃষ্টি-অজন্মার পর আকাশ ছেয়ে এসেছে স্নিগ্ধদর্শন নীলাঞ্জন মেঘের ছায়া, আর্ত মানুষের ওপরে আনত করুণাদৃষ্টির মত। তারপর বহুদিনের বাঞ্ছিত বর্ষণে তৃষিত ভূমি জলতৃপ্ত, রিক্ত ভূমিতে শস্যবীজ অঙ্কুরিত, কালক্রমে শস্যভারে পরিপূর্ণ সে ভূমি। এই সুখপ্রদ প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিয়ে আদিম মন দেবীর দৈত্যবিজয়ের কাহিনী উদ্ভাবন করেছে। আদিম মনের এই NATURE MYTH অবলম্বনেই পুরাণের কবি ছবি এঁকেছেন নীলাঞ্জনকান্তি করুণার্দ্রহৃদয় দেবী শতাক্ষীর, দেবী শাকম্ভরীর, যাঁর নীলপদ্মের মত চোখ থেকে অশ্রুবিসর্জনে তৃষিত ধরণী তৃপ্ত, যিনি চতুর্ভুজে ধনু আর বাণের সঙ্গে ধারণ করেছেন নয়নশোভন পদ্ম আর জীবজগতের ক্ষুধাতৃষ্ণাদূরকারী শাক, পল্লব, ফলমূলাদি।

কৃষি ও দুর্গাদেবী

আদিম এই ব্যাপার সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ইন্দো-এরিয়ান রেসেস'-এ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত আদিম শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী থেকেই দেবী দুর্গার পরিকল্পনা বিকাশ

লাভ করেছে। দুর্গোৎসবের একটি প্রধান কৃত্য নবপত্রিকার পূজা দেবী দুর্গার কৃষিপর্যায়েরই স্মারক-চিহ্নরূপে টিকে আছে। তিনিই দেবী শাকম্ভরী, আত্মদেহে শাকোৎপাদনকারিণী। তিনি অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা। তিনিই শস্যোৎপাদিনী, জীবধাত্রী জগজ্জননী বসুন্ধরা। তিনি কৃষকের ধান্যলক্ষ্মী—গ্রিসদেশে তিনি যেমন হয়েছেন ডিমিটার, যবলক্ষ্মী—যবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমেরিকার আদিবাসীদের ঘরে ভুট্টালক্ষ্মী।

দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিতের অভিমত এই কৃষিদেবীই ভারতের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য মঙ্গল-অমঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অসংখ্য নামে, অসংখ্য পূজাবিধিতে প্রতিষ্ঠিতা। এই গ্রামদেবতাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক এখনও অব্রাহ্মণ--বিশেষত সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তর, অস্পৃশ্য পূজারীদের এক্তিয়ারের মধ্যে আছেন এবং তাঁদের পুজোর ভার অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরই ওপরে অর্পিত। আবার এই কৃষিদেবীই কালান্তরে অসংখ্য পৌরাণিক দেবীতে রূপান্তরিত এবং বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্য অধ্যাত্মদর্শনের আচ্ছাদনে মহিমময়ী হয়ে ওপরের স্তরে উঠেছেন এবং বেদবন্দিতারূপে পুজো পাচ্ছেন।

পৌরাণিক দেবী শাকম্ভরী আদিম কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজের শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরই কালান্তরের রূপ। তাঁর আদিকথা খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখলুম তিনি পুরাণকথার চাইতে আরও অনেক পুরনো। এবং প্রাগৈতিহাসিক ভারতের সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেও যে তিনি ছিলেন, হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া একটি পোড়ামাটির শিলমোহর তার প্রমাণ। স্যার জন মার্শাল প্রভৃতি সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ববিদরা ঐ শিলমোহর সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছেন, দেবী শাকম্ভরীর আদিরূপের ইঙ্গিত সেখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারতের নানা স্থানে আজও এই দেবীর পূজার্চনা চলছে। কিন্তু বাংলাদেশে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মাজিগ্রাম ছাড়া আর কোথাও তাঁর শাকম্ভরীর মূর্তিতে পূজার্চনার সন্ধান পাইনি। ঐ মাজিগ্রামে দেবী শাকম্ভরী অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে মাজিগ্রামে যে নানা লোকোৎসব হয়, তার কিছু বিবরণ আমার পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে রেখেছি। আমার পরবর্তী প্রবন্ধেও আরও কতকগুলি এমন অনুষ্ঠানের বিবরণ দেবার চেষ্টা করব যেগুলি নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রামেশ্বরী দেবী শাকম্ভরী

নারী আর পৃথিবী—এরা আদিম কৃষিনির্ভর মানুষের মনে একই সংস্কারের সুতোয় গাঁথা। আদিম যুগে সন্তানপ্রসবিনী নারী আর শস্যপ্রসবিনী ভূমিকে-পৃথিবীকে এক, অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে: দুজনের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য. নিবিড় সম্পর্ক কল্পনা করে একের ফলপ্রসূতার সাহায্যে অপরে ফলপ্রসূ, এই সংস্কার থেকেই দেশে দেশে জন্ম নিয়েছে—ফসলের কামনায় আদিম মানুষের জাদুনির্ভর আয়োজন, বা উর্বরতামূলক অনুষ্ঠান। এই আদিম সংস্কারে ভূমি হয়েছে আদি-জননী. শস্যাধিষ্ঠাত্রী মহামাতৃকা, উদ্ভিদ জনয়িত্রী, জীবধাত্রী দেবী বসুন্ধরা। ভারতের পৌরাণিক দেবী শাকম্ভরী. যিনি শতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষে নিজের দেহে শাক, পল্লব. ফল, মূল ইত্যাদি সৃষ্টি করে জীবজগৎ রক্ষা করেছিলেন বলে পুরাণে কীর্তিত, তাঁরও কল্পনা ঐ সংস্কার থেকেই বিকাশ লাভ করেছে। আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এই দেবীব আদিকথা খুঁজতে গিয়ে দেখিয়েছি, ইনি পুরাণের চেয়েও পুরানো আদিম প্রাগ্‌বিভক্ত কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উর্বরতামূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেই আদিম কাল থেকে ইনি ভাবতে বিরাজ করছেন।

হরপ্পার ধ্বংসস্তূপে শাকম্ভরী

প্রাগৈতিহাসিক ভারতে সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে যে তিনি বিরাজ করতেন, হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া একটি পোড়ামাটির ছোট্ট ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রলিপি সে ইঙ্গিত বহন করছে। এই জাতীয় পোড়ামাটির ফলক প্রত্নতত্ত্ববিদদের ভাষায় সাধারণত শিলমোহর বা শিল নামে অভিহিত। হরপ্পার উল্লিখিত শিলমোহরের এক পিঠে একটি নগ্নমূর্তি উৎকীর্ণ। স্যার জন মার্শালের মতে ওটি নারীমূর্তি। মূর্তিটির মাথা যেন মাটির দিকে আর পাদুটি ওপরের দিকে তোলা দুপাশে ছড়িয়ে রাখা। মূর্তিটির গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছে একটি লতা। এই মূর্তিটির সঙ্গে মার্শাল সাহেব উত্তর প্রদেশের ভিটা থেকে পাওয়া পোড়ামাটির আর একটি ফলকে উৎকীর্ণ ঠিক অনুরূপ ভঙ্গির আর এক মূর্তির মিল খুঁজে পেয়েছেন। তবে ভিটার মূর্তিটির কণ্ঠের ওপরে মুণ্ড নেই, মুণ্ডের বদলে কণ্ঠদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে একটি পদ্মফুল। প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে ভিটার ফলকটি গুপ্তযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ের বলে অনুমিত। (মার্শাল : 'মহেনজোদারো এ্যান্ড দি ইন্ডাস সিভিলিজেশন', প্রথম খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা, ১২নং প্লেটের ১২ সংখ্যক চিত্র এবং এ এস আর ১৯১১-১২, ২৩নং প্লেটের ৪০ নম্বর চিত্র)

এই দুটি মূর্তিকে পৌরাণিক যুগের নিজদেহে শাকোৎপাদনকারিণী দেবী শাকম্ভরীরই প্রোটোটাইপ বলে গ্রহণ করা যায়। সিন্ধুসভ্যতায় দেবীর সঙ্গে যে উদ্ভিদ-জগতের খুব নিকট-সম্পর্ক ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে হরপ্পায়, মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত আরও অনেক শিলে উৎকীর্ণ উদ্ভিদ-পরিবৃতা দেবীর মূর্তিতে।

মার্শালের মতে, হরপ্পার শিলটি প্রাগার্য সিন্ধু-সংস্কৃতির দেবীর প্রাধান্যমূলক সমাজের প্রাকৃতিক উর্বরতার কামনায় বসুমতী অথবা মাতৃদেবীর উপাসনারই ইঙ্গিত বহন করছে। এরই উল্টো পিঠে উৎকীর্ণ আর একটি লিপিচিত্রকে তিনি বন্ধ্যাভূমির উর্বরতাবৃদ্ধির কামনায় আদিম সমাজে প্রচলিত নারীবলি (নারী প্রজননক্ষম অতএব নারীর রক্তে বন্ধ্যাভূমি শস্যপ্রসূ হবে. এই বিশ্বাসে জাদুনির্ভর আদিম সমাজে নারীবলি পরিকল্পিত হয়েছিল—এ হচ্ছে অনেক নৃতত্ত্ববিদের অনুমান) বলেও চিহ্নিত করতে চান। অব[illegible] এটি নরবলির দৃশ্য কিনা, এ-নিয়ে ডি ডি কোসাম্বী প্রমুখ পণ্ডিতরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। কি[illegible] সিন্ধুধর্ম যে দেবীপ্রধান, এখানে পাওয়া অসংখ্য পোড়ামাটির নারীমূর্তি যার অনুরূপ মূর্তি পারস্য থেকে শুরু করে পশ্চিমে ঈজিয়ান পর্যন্ত পাওয়া গেছে, সেগুলি যে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাকৃতিক উর্বরতা সাধনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত নানা magic ritual বা

জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সে বিষয়ে দেশী-বিদেশী অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিত একমত। নানা তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঐ পোড়ামাটির মূর্তিগুলি মাতৃদেবী, মহামাতৃকা বা দেবী বসুমতীর cult-object অর্থাৎ উপাসনা সংক্রান্ত বস্তু।

কৃষিনির্ভর মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধ্যানধারণা

বলাবাহুল্য, এসব নারীপ্রাধান্যমূলক বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই ধ্যানধারণার চিহ্ন। কেন? তথ্যভূয়িষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের উত্তর : কৃষি নারীর হাতেরই আবিষ্কার। আদিম পর্যায়ে কৃষি-উৎপাদন নারীর এক্তিয়ারের মধ্যে নানা মেয়েলি সংস্কার, আচার-আচরণ, জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে। যে সমাজ মূলত এইরকম আদিম পর্যায়ের কৃষি-উৎপাদনকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, সে-সমাজ নারীপ্রাধান্যমূলক হয়ে গড়ে উঠতে বাধ্য, সে-সমাজে কৃষিভিত্তিক নানা আচার-আচরণের প্রাচুর্যও অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে পশুপালন-নির্ভর সমাজ পুরুষপ্রধান। এ সমাজ কালক্রমে কৃষিকে গ্রহণ করলেও এর উপরে কৃষিভিত্তিক আদিম আচার-আচরণের প্রাচুর্য তেমন থাকে না অথবা সামান্যই থাকে, সেগুলি তাৎপর্যবিহীন, অসঙ্গত বলেই মনে হয়। মাতৃপ্রধান সমাজ, কালক্রমে পুরুষপ্রধান সমাজে রূপান্তরিত হলেও প্রাচীন ফেলে আসা মাতৃতান্ত্রিক জীবনের অনেক স্মৃতিচিহ্ন সে বহন করে চলে। প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের সিন্ধুদেশ, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তীবিস্তৃত অঞ্চলে কৃষিকেই ভিত্তি করে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই সভ্যতা ছিল তাই মাতৃপ্রাধান্যমূলক, আর সেইজন্যই সেখানে ছিল এত দেবীমাহাত্ম্য, এত মহামাতৃকা বসুন্ধরা দেবীর ছড়াছড়ি। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "কৃষি উৎপাদনই ছিল সিন্ধু-সভ্যতার চরম অর্থনৈতিক ভিত্তি। তাই সভ্যতায় শস্যদায়িনী পৃথিবীর—বসুমাতার, শাকম্ভরী—উপাসনা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।" ('ভারতীয় দর্শন', পৃষ্ঠা ৮৬)।

কৃষি আবিষ্কারের প্রাকৃত পর্যায়ের মধ্যেই যে দেবীরহস্য, তথা শাক্তাচার, তান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলিকে বোঝবার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে—অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রম-সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা সে-কথাও প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, তাঁর দুখানি বিশাল গ্রন্থে—বাংলায় লেখা 'লোকায়ত দর্শনে' আর ইংরেজীতে লেখা 'Lokayata'-তে।

কত পুরনো!

কিন্তু একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এবং অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর 'লোকায়ত দর্শনে' (পৃষ্ঠা ৫৪৪-৫৪৫) সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে : যে আদিম প্রাগ্-বিভক্ত কৃষি-নির্ভর মাতৃতান্ত্রিক সমাজে দেবী শাকম্ভরীর কল্পনা উদ্ভূত হয়েছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধুসভ্যতা তার চেয়ে অনেক অর্বাচীন। সিন্ধুসভ্যতার যুগের সমাজ কৃষিনির্ভর হলেও প্রাগ্-বিভক্ত ট্রাইব্যাল সমাজের লক্ষণের বদলে 'কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি ও শ্রেণীশোষণের' যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে। "ঐ শ্রেণী-শোষণ ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির পর্যায়ে পৌঁছেও সিন্ধুসভ্যতার মানুষগুলির চেতনা থেকে মাতৃপ্রধান ধ্যানধারণার স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।"

দেবী শাকম্ভরী প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার যুগেই দূর প্রাচীনের স্মৃতি যখন, তখন একালের বিচারে তিনি আরও কত পুরনো!

মাজিগ্রামের শাকম্ভরীর কাহিনী

দেবী শাকম্ভরী আজও বাংলাদেশে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত মাজিগ্রামে পূজিত

হচ্ছেন। ভারতের নানা স্থানে এই দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি বা তীর্থস্থান আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মাজিগ্রামে ছাড়া আর কোথাও তাঁর পুজো প্রচলিত আছে কিনা জানি না।

মাজিগ্রামে দেবীর অধিষ্ঠানের মূলে একটি স্বপ্নাদ্যা পুরনো কাহিনী আছে—যেমন আছে অনেক প্রাচীন বিখ্যাত গ্রামদেবতাদের সম্বন্ধে। কাহিনীটি এই : মাজিগ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের (আগুরি) এক ব্যক্তি জানকী সর্দার (মতান্তরে রাম সর্দার) নামে বাগ্রক্ষত্রিয় (বাগ্‌দি) সম্প্রদায়ের একজন মৎস্যজীবীকে নিয়ে একটি পুকুরে মাছ ধরতে যান। কিন্তু জালে উঠল কালো পাথরের টুকরো। বিরক্ত হয়ে তাঁরা সেটিকে পুকুরপাড়ে ফেলে চলে এলেন। দেবী শাকম্ভরী রাত্রে দুজনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন, বললেন অবহেলিত কালো পাথরটি তাঁরই মূর্তি আর আদেশ দিলেন, তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর পুজোর ব্যবস্থা করতে। তার পরদিন স্বপ্নাদিষ্ট দুজনে ঐ পাথর নিয়ে মাজিগ্রামের 'বটব্যাল'-উপাধিধারী ব্রাহ্মণদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন, তারপর থেকে মাজিগ্রামে শুরু হলো দেবী শাকম্ভরীর নিত্যপূজা।

এইরকম কাহিনীর রূপান্তরও অনেক সময় থাকে। এ-কাহিনীটিরও আছে। সেটি হচ্ছে বাগ্‌দি-সর্দারের জালে প্রথম দিনে একটি মাগুর মাছ পড়েছিল। বাগ্‌দি সর্দার সেটিকে জিইয়ে রাখেন, পরের দিন খাবেন বলে। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন—দেবী শাকম্ভরী বলছেন তাঁকে, মাগুর মাছরূপে তিনি সর্দারের জালে ধরা দিয়েছেন, যেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁকে রেখে আসা হয়। ঐ 'বটব্যালদের'ও একজন ঠিক একই স্বপ্ন দেখলেন। সকালে স্বপ্নাদিষ্ট দুজনে মাছের কাছে গিয়ে দেখেন, মাছ নেই, তার বদলে একটি শিলামূর্তি পড়ে রয়েছে। ঐ শিলামূর্তি 'বটব্যালরা' বাড়িতে এনে পুজো করতে লাগলেন।

মাজিগ্রামের দেবী শাকম্ভরীর সম্বন্ধে কিছু 'ঐতিহাসিক কিংবদন্তীও' শোনা যায়। সেটি হচ্ছে : দেবী শাকম্ভরী নাকি আগে বর্ধমান জেলারই ভাতাড় থানার অন্তর্গত এড়ুয়ার গ্রামে—মাজিগ্রামের থেকে মাইল বারো দক্ষিণ-পশ্চিমে উগ্রক্ষত্রিয়দের ঘরে পূজিত হতেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় তাঁকে সেখান থেকে প্রথমে তসর আড়া গ্রামে এবং পরে মাজিগ্রামে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। মাজিগ্রামে তখন পুজোর কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় দেবীমূর্তিকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর উগ্রক্ষত্রিয়রা স্বপ্নে আদেশ পেয়ে আবার জল থেকে দেবীকে তুলে আনেন।

বর্গীদের ধ্বংসলীলা

কিংবদন্তীটির স্বপ্নাংশটুকু ছাড়া বাদ বাকি অংশ সত্যি বলেই মনে হয়। বর্গীর হাঙ্গামার জন্যেই দেবী শাকম্ভরীকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে শেষে মাজিগ্রামের পুকুরের জলে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল এবং কালক্রমে তিনি সেখান থেকে উঠে মাজিগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই ঘটনা বাস্তব সত্য বলেই মনে হয়। বাংলাদেশে বিশেষত বর্ধমান জেলায় প্রায় সওয়া দুশো বছর আগে লুণ্ঠনকারী মারাঠা দস্যুদের এবং মূর্তিভাঙা কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলায় নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজজীবনে কী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে চূর্ণ প্রাসাদ, মন্দির, বিগ্রহের ধ্বংসস্তূপে। মোগল-পাঠান আমলেও রাজ্যলোভী রণপিপাসুদের হানা বর্ধমানের ওপর দিয়ে কম হয়নি। এদের সকলের হাতের ধ্বংসচিহ্ন হয়ে পড়ে আছে অসংখ্য দেবদেবীর পাষাণমূর্তির কলাশ্রীমণ্ডিত খণ্ডিতাংশগুলি।

মাজিগ্রামের ভৈরব

মাজিগ্রামেও এরা পড়ে আছে। মাজিগ্রামের চারকোণে এই রকম চারটি ধ্বংসস্তূপ চার 'ভৈরব' নামে এবং একটি ধ্বংসস্তূপ 'ষষ্ঠী' নামে পূজিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে আছে বিষ্ণুমূর্তি, গরুড়, সূর্যের পাদপীঠের সপ্তাশ্ব আর সারথি অরুণ, নৃত্যরত গণেশ মূর্তির পৃষ্ঠপটের পরিচিত অলঙ্করণ,

পঞ্চাস্রস্তবক, আকাশপথে ধাবমান বংশীবাদনরত গন্ধর্ব যুগল, আরও কত চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশ। দক্ষিণ পাড়ার ভৈরবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি একটি মহাযানী বৌদ্ধ মূর্তি বলে মনে হয়। এই সমস্ত 'ভৈরবে'র কাছে খুব বলি পড়ে—তা সেই 'ভৈরব'দের মধ্যে বিষ্ণুই থাকুন আর মহাযানী বৌদ্ধ দেবতাই থাকুন, তাতে কিছুই আসে যায় না।

মাজিগ্রামের শাকম্ভরীর মূর্তি

মাজিগ্রামের দেবী শাকম্ভরীকেও যে দুর্বৃত্তদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, তার চিহ্ন তিনি আজও বহন করছেন তাঁর মূর্তিতে। মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের গায়ে উৎকীর্ণ—লম্বায় হাতখানেক এবং চওড়ায় আধহাত। খুব ক্ষয়প্রাপ্ত মূর্তি—মনে হয় কেউ যেন চেঁচে, ঘষে, উৎকীর্ণ অংশের উঁচুনিচু অংশ প্রায় লেপে মুছেই দিয়েছে। ঐ আবছা মূর্তি দেখে মনে হয় দেবী মহিষমর্দিনী—মহিষের দেহ থেকে উদ্গত অসুরকে দেবী যেন শূলে বিদ্ধ করেছেন। দেবীর দক্ষিণ চরণ ভূমিতে, বাম চরণ যেন ঊর্ধ্বে উত্তোলিত—'আলীঢ়' ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী। তাঁর আসল মুখটি কি রকম তা বোঝবার উপায় নেই। ক্ষীণ কটিদেশের উপরই ধুনোর আটা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি সিঁদুর মাখানো কিম্ভূতকিমাকার এক প্রকাণ্ড কৃত্রিম মুখ আঁটা; তার ওপরে ছোট্ট ছোট্ট কালো পাথরের চোখ আর সোনা-রুপোর টিপ বসানো—ভক্তদের দেওয়া। বেমানান অদ্ভুত এই মুণ্ডের তলায় মূর্তির ঊর্ধ্বাংশের প্রায় সবটুকুই চাপা পড়ে গেছে। অতএব দেবীর হাত কখানি, আয়ুধ কী কী তা বোঝবার উপায় নেই। দেবীর শুধু একখানি রমণীয় বাম কর দেখা যায়, যেন অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত। এই অপরূপ ভঙ্গিময় হাতটুকুতে তক্ষণনৈপুণ্যের যে আভাস রয়েছে, তাতেই ধারণা করতে পারা যায়—এই দেবীমূর্তির সর্বাঙ্গে একদা মাখানো ছিল প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল শিলাশিল্পের লাবণ্য। অত্যাচারীর নির্মম হাতে সেই অপরূপা দেবীর লাবণ্য ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—শুধু একটু রূপ, একটু লাবণ্যের আভাস রয়ে গেছে, অভয়মুদ্রায় উত্তোলিত ক্ষমাসুন্দব ঐ হাতের ভঙ্গিতে।

মূর্তিরহস্যের বর্ণনা

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে দেবী শাকম্ভরীর উল্লেখ রয়েছে। এরই খিলাংশ নামে রচিত 'সপ্তশতী রহস্যত্রয়ে'র অন্তর্গত 'মূর্তিরহস্যে' আছে দেবী শাকম্ভরীর রূপ, আয়ুধ, পূজার ফলাফলের বর্ণনা। এই খিলাংশ যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনেক পরবর্তী কালের সংযোজন, তাতে সন্দেহ নেই। আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দেবী-ভাগবত থেকে দেবী শাকম্ভরীর যে বর্ণনা দিয়েছি, 'মূর্তিরহস্যে'রও বর্ণনা তারই প্রায় অনুরূপ। এই দুটির মধ্যে ভাব আর ভাষার মিল দেখে মনে হয়, এরা যেন একই হাতের রচনা কিংবা একের রচনা কিঞ্চিৎ অদলবদল করে অন্যের আত্মসাৎকরণ।

'মূর্তিরহস্যে'র বর্ণনায় আছে—দেবী শাকম্ভরী পদ্মবনবাসিনী, তাঁর চার হাতে বাণ, পদ্ম, পুষ্প-পল্লব-ফল-মূল-শাক আর মহাধনু। তাঁর অর্চনায় অক্ষয় অন্ন, পান আর অমৃতময় ফল লাভ হয়।

মাজিগ্রামে কিন্তু দেবীর 'জয়দুর্গা'র ধ্যানে পুজো হয়। সে ধ্যানে সিংহারূঢ়া দেবীর চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ আর ত্রিশূল। এই ধ্যানের সঙ্গে শাকম্ভরীর ঐ পাষাণমূর্তির খুবই গরমিল।

শাস্ত্রীয় বিধি, আচার-আচরণ যাই হোক, এই দেবীই মাজিগ্রামের সাধারণ মানুষের মন জুড়ে আছেন। তিনিই গ্রামেশ্বরী। গ্রামের ফসল তাঁকে না দিয়ে কেউ ভোগ করে না। গ্রামে বিয়ের নতুন বৌ এলে আগে এই শাকম্ভরীতলায় এসে সে প্রণাম করে। আষাঢ় নবমীতে দেবীর বার্ষিক উৎসবে দেবীকে নিয়ে গ্রামের উঁচুনিচু সব জাতের মানুষ একসঙ্গে আনন্দোৎসবে মাতে। শাকম্ভরীই দেবী দুর্গা, তাই মাজিগ্রামে দুর্গামূর্তি গড়ে দুর্গোৎসব নিষিদ্ধ—শাকম্ভরীর মূর্তিতেই দুর্গাপুজার অনুষ্ঠান হয়। এই দেবীই মাজিগ্রামের লোক-উৎসবের কেন্দ্রভূমিতে বিরাজিত।

কালো কনে বুড়ো বর

কত উদ্যোগ-আয়োজন। সব কিন্তু পণ্ড হল। ছাঁদনাতলাতে বিয়ে গেল ভেঙে। দেউলেশ্বর ঠাকুরের বিয়ে হল না। বরপক্ষ ছাঁদনাতলা থেকে দেউলেশ্বর ঠাকুরকে বার করে নিয়ে চলে গেল।

দানসামগ্রী সাজানো, খাবার-দাবার তৈরি করছে। ঢাক-ঢোল বাজছে, আলো জ্বলছে। লোকজনে বিয়েবাড়ি গমগম করছে। ছাঁদনাতলাতে ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ, হুলুধ্বনি। কনের সাতপাক সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এমন সময় বরপক্ষ বেঁকে বসেছে—কনে কুচকুচে কালো। এমন কনের সঙ্গে দেউলেশ্বর ঠাকুরের বিয়ে তারা দেবে না।

কনের কালো রূপ দেখে বিরূপ বরপক্ষের লোকদের মধ্যে প্রথমে চলছিল কানাকানি। অবিলম্বে কানাকানি সরব ঘোষণায় ব্যক্ত হলো। স্বভাবতই কন্যাপক্ষ বিমূঢ়। ঢাক-ঢোল থেমে গেল, শাঁখও স্তব্ধ। কন্যাপক্ষ থেকে প্রথমে অনুনয়ে বিনয়ে বরপক্ষের মন গলাবার চেষ্টা চলল খানিকক্ষণ। চিঁড়ে কিন্তু ভোলবার নয়। বরের ধবধবে ফর্সা চেহারা—তার ওপরে বংশগৌরব। ভট্টাচার্য বাড়ির কী কম নাম-ডাক। এমন পাত্রের সঙ্গে কিনা এক হতকুচ্ছিত মেয়ের বিয়ে। এইসব মন্তব্য উঠছে বরপক্ষ থেকে। তারা ঘন ঘন মাথা নেড়ে এই বিয়েতে ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল।

কনে কালো—তাতে কী হয়েছে! পাত্রীপক্ষেরই বা কুলগৌরব পাত্রপক্ষের চাইতে কম কোথায়! বটব্যাল পরিবারের মানমর্যাদা শুধু এ গাঁয়ে নয়, সাতগাঁয়ের মানুষ জানে। আত্মমর্যাদায় আঘাত খেয়ে পাত্রীপক্ষও হয়ে উঠেছে এবার বেশ গরম। নিজেদের কুলমর্যাদা উঁচু গলায় জাহির করতে করতে বরের বয়সের কথাও তারা তুলেছে। থুড়থুড়ে বুড়ো বর—বয়সের গাছ-পাথর খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো। বরের গায়ের রং ফরসা! তা রং নিয়ে কি ধুয়ে খাবে! এমন বুড়োর কিনা রূপবতী কনে বিয়ে করার শখ! গর্জে উঠল তারা, "বের করে দাও ওদের। আমাদের মেয়ের নিন্দে শুনব না। দোব না ঐ বুড়োর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে। তাতে আমাদের মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকে তো থাকুক।"

ওপক্ষ থেকেও উঁচু গলায় পাল্টা জবাব এল, "কালো মেয়ে গছিয়ে দেবার ফন্দি এঁটেছ! ওসব চালাকি চলবে না। চল্লুম আমরা বর নিয়ে। থাকুক তোমাদের কেলেকুচ্ছিত মেয়ে চিরকাল আইবুড়ো হয়ে।"

মহা হট্টগোল। পরস্পরের উদ্দেশে টিটকিরি আর নিন্দে ছোঁড়াছুঁড়িতে বিয়ের ছাঁদনাতলার এক অদ্ভুত চেহারা। বরপক্ষ দেউলেশ্বর ঠাকুরকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কনেকে নিয়ে কন্যাপক্ষও চলে যাচ্ছে ছাঁদনাতলা থেকে।

হঠাৎ শোনা গেল, ঢাকে ঢোলে কাঁসিতে নতুন বোল বাজছে, আর কী বরপক্ষ, কী কন্যাপক্ষ, সবাই সেই বোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গলা মিলিয়ে সুর করে ছড়া কাটছে :

"কালো কনে বুড়ো বর।
বিয়ে হল না চল ঘর।।"

এই বিয়েতে প্রহসন মানুষের বরকনেকে নিয়ে নয়—গ্রাম্য দেবদেবীকে নিয়ে। এ বিয়ের বর দেউলেশ্বর ঠাকুর বর্ধমান জেলার মাজিগ্রামের অনাদিলিঙ্গ শিব আর কনে ঐ মাজিগ্রামেরই কালো কষ্টিপাথরের তৈরি দেবী শাকম্ভরী। মাজিগ্রামের লোকেরা এই গ্রাম্য দেবদেবীকে নিয়ে বিবাহের কৌতুকোৎসবে মাতে—চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশীর রাত্রে। চৈত্ররাতের শুক্লা চতুর্দশী। চাঁদের আলোয় গ্রাম-পথ ঝলমল। নিমফুল আর বাতাবি ফুলের গন্ধে বাতাস আকুল। এমন রাতে মাজিগ্রামের গ্রামদেবতার বিয়ে নিয়ে এই কৌতুকরঙ্গ।

দেউলেশ্বর তো পাতাল থেকে ফুঁড়ে ওঠা লিঙ্গমূর্তি—অনাদিলিঙ্গ নামে খ্যাত। অচল ইনি, মাটি থেকে তোলা যায় না। তাই তাঁর প্রতিভূস্বরূপ অষ্টধাতুর তৈরি একটি শিবমূর্তি নিয়ে বিয়ের মিছিল বার হয়। উড়িষ্যায়, দক্ষিণ ভারতে মন্দিরে স্থাপিত দেবদেবীদের প্রতিনিধি 'ভোগমূর্তি' নামে পরিচিত ছোট্ট মূর্তিদের নিয়ে যেমন নানান উৎসব শোভাযাত্রার আয়োজন হয়, এও যেন সেই ধরনের।

মাজিগ্রামে দেউলেশ্বর আর শাকম্ভরীর সেবাপুজার ভার যথাক্রমে ভট্টাচার্য আর বটব্যাল পরিবারের ওপরে ন্যস্ত। গ্রামের এই দুই ব্রাহ্মণ পরিবার যথাক্রমে বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি আচারও যথারীতি পালিত হয়। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কন্যা সম্প্রদানকারী আর বর-কনের উপবাসী থাকার নিয়ম। এখানেও সে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। তবে এক্ষেত্রে দেবদেবী বর-কনে, তাঁদের তো আর সারাদিন উপবাসী রাখা চলে না। তাই তাঁদের যথারীতি ভোগরাগ চললেও, তাঁদের হয়ে বরপক্ষ তার কন্যাপক্ষ থেকে দুজনে সারাদিন উপবাসী থাকেন।

পাড়ায় পাড়ায় মল্লযুদ্ধ

ভট্টাচার্যদের বাড়ির একজন অষ্টধাতুর শিবমূর্তিটিকে কোমরের সঙ্গে নতুন কাপড়ে বেঁধে নেন। এইভাবে দেউলেশ্বর ঠাকুর বাজনাবাদ্যি, আলো, বরযাত্রীদের নিয়ে বিয়ে করতে বেরোন। বিয়ের মিছিল শাকম্ভরীতলায় আসার আগে সমস্ত পাড়া ঘুরে আসবে। তখন দেখা যাবে দেউলেশ্বরের নিজের পাড়াটি ছাড়া মাজিগ্রামের আর সব পাড়া কন্যাপক্ষে চলে গেছে, আর প্রতিটি পাড়ায় দেউলেশ্বরকে ঢুকতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে, কারণ সেখানে পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে, বর আর বরযাত্রীদের কিছুতেই পাড়ার ভেতরে ঢুকতে দেবে না তারা। খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি, শক্তি পরীক্ষার পালা চলে তখন দুদলের ভেতরে। তারপর এক ফাঁকে দেউলেশ্বর পাড়ার ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন আর কে রোখে। এ যেন আদিম রাক্ষসবিবাহের একটা কৌতুককর অনুকরণ, জোর করে মেয়ে কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার পুরনো রীতির একটু ভগ্নাবশেষ।

এমনি করে পাড়ায় পাড়ায় মল্লযুদ্ধ হতে হতে বর যখন শাকম্ভরীতলায় এসে পৌঁছলেন, তখন রাত অনেক গড়িয়ে গেছে। শাকম্ভরীর মন্দিরের সামনেই বিয়ের আসর সাজান রয়েছে। চাঁদোয়ার তলায় মঙ্গলঘটে, কলাগাছে, আমের পল্লবে সাজানো ছাঁদনাতলা। বরণডালা, জলের ঝারি, দানসামগ্রী কিছুই বাদ যায়নি। বর এলে বর আর বরযাত্রীদের যথারীতি আদর-আপ্যায়নের পালাও চলল কন্যাপক্ষ থেকে। তারপর বিয়ের পর্ব। দেউলেশ্বর ঠাকুরকে ছাঁদনাতলায় হাজির করা হল। শাকম্ভরী দেবীকেও মন্দির থেকে বার করে আনা হল—কনে সাজিয়ে। তারপর সাত পাক শুরু হতেই বিয়ে কেমন করে ভণ্ডুল হয়ে গেল, তার বর্ণনা ওপরে দিয়েছি। বিয়ে ভেঙে যাবে বটে, কিন্তু বিয়ের ভোজ বাদ যাবে না। পরের দিন গ্রামের সবাই মিলে ভোজের আয়োজন করবেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সেই ভোজ খাবেন। আগে আগে এই লোক-উৎসবটি খুব আড়ম্বরময় জমজমাট হত। পাশের গ্রামগুলো থেকেও লোকে এসে সে আনন্দযজ্ঞে মিলিত হত। গ্রামের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় এই লোকোৎসবে এখন খুব ভাঁটা পড়ে গেছে। এখন কোনও রকমে নিয়মরক্ষা হচ্ছে যেন।

নিছক কৌতুকরঙ্গ?

গ্রাম্যদেবতাকে নিয়ে বিবাহের এই প্রহসন, এ কি গ্রামীণ মানুষের নিছক কৌতুকরঙ্গ উপভোগের জন্যে পরিকল্পিত? না, এর ভেতরে বিস্মৃতযুগের আদিম, অসহায় মানুষদের বাঁচবার তাগিদে

উদ্ভাবিত, অনুষ্ঠিত আচার-আচরণের স্মারকচিহ্ন হয়ে টিকে আছে? শুধুমাত্র মাজিগ্রামে নয়, বর্ধমান জেলার আরো অন্য গ্রামে, বাংলাদেশেরও আরো নানান অঞ্চলে, ভারতেরও নানান জায়গায়, এমন কি ভারতের বাইরেও নানান জাতের নানান গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের অনেক রকমফের প্রাচীনকালে ছিল, কিংবা এখনো আছে। এদের রহস্য, তাৎপর্য নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করব। এখন মাজিগ্রামের অনুষ্ঠানটির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনার অবতারণা করা যাক।

মাজিগ্রাম উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি) আর ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের (বাগদি) অধ্যুষিত গ্রাম। দেবী শাকম্ভরীর স্বপ্নাদ্য আবির্ভাব কাহিনীতে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বিবৃত করেছি। দেবী শাকম্ভরীর সব উৎসবে এঁরা তাই অপরিহার্য। আষাঢ়ী শুক্লানবমীতে দেবীর বার্ষিক মহাপুজোর দিনে যখন দেবীকে স্থায়ী মন্দির থেকে বার করে এনে গ্রামের উত্থান মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সিকদার, চৌধুরী প্রভৃতি পরিবারেব মুখপাত্ররাই বাদ্যভাণ্ডসহকারে দেবীকে সবার আগে আহ্বান করে আনেন। অবশ্য দেবীকে স্পর্শ করার অধিকার এঁদের নেই, ব্রাহ্মণ-সেবাইতদের মধ্যেই একজন দেবীকে বহন করে নিয়ে যান। তবুও উৎসবের আনুষঙ্গিক উদ্যোগ আয়োজনে এঁরা অপরিহার্য।

উত্থান মন্দিরে সে দিন যে বিশেষ পুজো হয়, তাতে কেবলমাত্র মাজিগ্রাম থেকে নয়, পাশাপাশি অনেক গ্রামেব নানান সম্প্রদায়ের পুজো, বলি ইত্যাদি আসে। মন্দিরের চারধারে তখন চলে ঘট পেতে পুজো, হাড়িকাঠ পুঁতে, কিংবা বিনা হাড়িকাঠেই বিপুল সংখ্যক ছাগল-ভেড়ার বলি। সিংহত গ্রামের রায়পরিবার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। দেবীর ব্রাহ্মণ সেবাইতদের সঙ্গে পারিবারিক যোগসূত্রেই হোক কিংবা অন্যভাবেই হোক, এই রায়পরিবারেরই উত্থান মন্দিরে সর্বাগ্রে পুজো, বলিদানের অধিকার। তাঁদের পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মাজিগ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের শিকদার, চৌধুরীদেরই পুজো, বলি চলবে। তারপর চলবে সর্বসাধারণের পুজো, বলি। কিন্তু বলির ব্যাপারে এদের পরই বাগদি-সর্দারদের অধিকার। বাগদি-সর্দারদের বলি না হলে অন্যদের বলির অধিকার নেই। দেবী শাকম্ভরী বাগদি-সর্দারদের মাছ ধবার জালে উঠেছিলেন। দেবীর ওপরে তাই এঁদের যেন বিশেষ অধিকার। উত্থান মন্দিরে দেবী যখন যান, আর সেখান থেকে ফিরে আসেন তখন এই বাগদি-সর্দাররাই মিছিলের সবার আগে থাকেন, ঢাকের তালে তালে লাঠি নিয়ে কিংবা গাছের পাতা শুদ্ধ ডাল নিয়ে নাচেন। বিস্তৃতবক্ষপট, মাংসপেশীবহুল, দৃঢ়কায় এই কর্মিষ্ঠ বীরদের নাচ উপভোগ্য বটে।

আদিতে এ উৎসব ছিল কাদের?

মদন চতুর্দশীর রাত্রে দেবীর বিবাহ উৎসবেও উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা এসে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। প্রধানত এঁরাই তখন পাড়ায় পাড়ায় বিবাহের শোভাযাত্রায় নকল মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন; ছাঁদনাতলায় প্রধানত এঁরাই বরপক্ষ, কন্যাপক্ষের ভূমিকা নিয়ে বাদ-বিসংবাদের কৌতুকরঙ্গে মহড়া নেন। এইসব উৎসবে গ্রামের ব্রাহ্মণরাও এসে সোৎসাহে যোগ দেন; কিন্তু তবুও মনে হয়, এই গ্রাম্য উৎসবে যেন উগ্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য। আদিতে এই সমস্ত অনুষ্ঠান যে এঁদেরই ছিল এবং পরবর্তী কালে সমন্বয়ের পথে ব্রাহ্মণ্যসমাজও যে এঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন নানান ক্রিয়াকাণ্ডে, আজকের ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রভাব-প্রাধান্য সত্ত্বেও সে ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। তাই আজ ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত সহযোগিতায় অন্যান্য উৎসবের মত মাজিগ্রামের এই কৌতুককর লোকোৎসবও বেশ জমে ওঠে।

দেউলেশ্বর ও ধর্মঠাকুর

মাজিগ্রামের দেউলেশ্বর ঠাকুরটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এঁর মন্দির একটি খালের ধারে মাটি থেকে প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এক স্তূপাকৃতি জমির শীর্ষে অবস্থিত। মন্দিরটি ছোট্ট এবং হাল-আমলেরই তৈরি। মাজিগ্রামের সুসন্তান প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক পরলোকগত গণপতি পাঁজা মহাশয়ই দেউলেশ্বরের এবং শাকম্ভরীর বর্তমান মন্দির দুটি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। মন্দিরের ভেতরে দেউলেশ্বরের অনাদিলিঙ্গ নামে খ্যাত লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত। ইঞ্চি দশেক ব্যাসের লিঙ্গমূর্তিটি গ্রেনাইট পাথরের তৈরি—মাটি থেকে প্রায় আধ হাতটাক বেরিয়ে আছে। যে স্তূপাকৃতি উঁচু ভূখণ্ডের ওপরে হাল-আমলের মন্দিরটি স্থাপিত, সেটিকে বৌদ্ধস্তূপ বলেই মনে হয়। রাঢ়বাংলায় বৌদ্ধধর্ম কালান্তরের রূপপরিবর্তনে ধর্মঠাকুরের উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, ধর্মপুজোয় শুধু বৌদ্ধ নয়, আরও অনেক সংস্কৃতির পলিমাটি তার ওপরে পড়ে তাকে এক জটিল ধর্মচর্চার রূপ দিয়েছে। কিন্তু তার প্রাথমিক উদ্ভবসূত্র যে বৌদ্ধধারা থেকে উদ্‌গত, তাতে কেউই সন্দেহ রাখেন না। দামোদর নদ ধর্মঠাকুরের ভক্তের কাছে মহাপুণ্যময় জলধারা—"আদ্যের গঙ্গা দামোদর", "সত্যের গঙ্গা দামোদর।" সেই দামোদরের তীরভূমি বর্ধমান জেলা ধর্মপুজোর প্রধান পীঠভূমি—একথা যদি মনে রাখি, তবে বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য স্তূপাকৃতি ভূখণ্ড, দেউল, ভাঙা মূর্তি, যা হিন্দুধর্মের ভেতরে কোথাও শিব, কোথাও শক্তিপীঠ. কোথাও বা আরও অন্যান্য দেবদেবী বা তাঁদের সাধনভূমি বলে পুজো পাচ্ছে, সেগুলি যে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল—সে ধারণা করতে বাধে না। মাজিগ্রামের এক বিস্তৃত বৌদ্ধ দেউলেরই ভাঙা স্তূপের ওপরে স্থাপিত দেবতা 'দেউলেশ্বর' শিব নামে পূজিত, এ ধারণাও অমূলক নয়। হয়তো ইনি গোড়ার দিকে ধর্মঠাকুরই ছিলেন, কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাঁর সমস্ত বৌদ্ধ ভাব ঘুচিয়ে তাঁকে শিব বানিয়ে নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছে। ধর্মের গাজন 'দেউল পুজো', বা, 'দেলপুজো' নামেও অভিহিত হয়। মাজিগ্রামের শিবের 'দেউলেশ্বর' নামে সেই দূরাগত বৌদ্ধগন্ধটুকু হয়তো রয়ে গেছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির চিহ্ন

মাজিগ্রামে যে এক সময় বৌদ্ধ ধর্মচর্চা বেশ ছিল তার আরও কিছু পরিচয় যেন রয়ে গেছে বলে মনে হয়। এখানকার দক্ষিণ পাড়ায় শেওড়াগাছের তলায় একটি ভাঙা বিষ্ণু আর গরুড়ের মূর্তির সঙ্গে 'মহাকাল' নামে পূজিত মুণ্ডহীন আর একটি পাথরের মূর্তি দেখেছি। এই 'মহাকালের' কিছু বিবরণ এবং আলোকচিত্র আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে উপস্থাপিত করেছি। এই মূর্তিটির পাদপীঠে চারটি মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তির ডান দিক থেকে ধরলে মূর্তি চারটি এই রকম : (১) একটি শ্মশ্রুমণ্ডিত মূর্তি। (২) একটি লোক (৩) আর একটি লোকের ঝুঁটি ধরে তাকে লাঠি মারছে। (৪) একটি নৃত্যপরা নারী মূর্তি। 'মহাকাল' নামে পূজিত মূর্তিটির দক্ষিণকর বুকের ওপরে জ্ঞান মুদ্রায় ন্যস্ত। এটিকে মহাযান বৌদ্ধ দেবসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষের মূর্তি বলে মনে হয়। চুলের ঝুঁটি ধরে প্রহারের যে দৃশ্য এই মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ, সেটি অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে বধের দৃশ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ 'সাধনমালা' কিংবা 'নিষ্পন্নযোগাবলী'তে এমন মূর্তির কোনও সাধনা বা ধ্যান আমি খুঁজে পাইনি। কিন্তু এটি যে একটি ব্রাহ্মণ্য দেবতা তারই বা সুস্পষ্ট প্রমাণ কী?

মাজিগ্রামের ধর্মঠাকুর ও সূর্য

মাজিগ্রামে খুব পুরনো বলে খ্যাত ধর্মঠাকুরও আছেন। সদ্‌গোপ জাতির এক ব্যক্তি এঁর সেবাইত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় এঁর যথারীতি গাজন হয়, পাঁঠা বলি পড়ে। নিত্যনৈমিত্তিক পূজার ভার কিন্তু

ব্রাহ্মণের ওপরে অর্পিত। মাজিগ্রামে চৈত্র মাসে শিবের গাজনও হয়। সাধারণত দেখা যায়, যে গ্রামে শিবের গাজন হয়, সেখানে ধর্মের গাজন প্রায়শ অনুপস্থিত। মাজিগ্রাম কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এখানে ধর্মরাজ আর দেউলেশ্বর শিব (প্রচ্ছন্ন ধর্মঠাকুর বলতে বাধা কী) দুইই জাঁকিয়ে আছেন। এখানকার বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন প্রভাবই যে এর কারণ, এছাড়া আর কী অনুমান করা যায়।

ধর্মঠাকুর নিরাকার, নিরঞ্জন। তাঁকে বর্তুলাকারে ধ্যানের বিধি দিয়েছেন রামাই পণ্ডিত। অনেক জায়গায় ছেলেদের খেলার মার্বেল গুলির মত স্ফটিকের তৈরি গুলি ধর্মঠাকুরের মূর্তি বলে পূজিত হতে দেখেছি। মাজিগ্রামে দেবী শাকম্ভরীর মন্দিরে এবং ভট্টাচার্যদের বাড়িতেও এইরকম স্ফটিকের তৈরি দুটি গুলি আছে। তারা কিন্তু ধর্মঠাকুর বলে নয়, সূর্য বলে পূজিত। বর্ধমান শহরের প্রাচীন দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দিরেও স্ফটিকের তৈরি একটি বড় সাইজের গুলি দেখেছি। সেটিকে 'আদি সর্বমঙ্গলা' নামে অভিহিত করা হয়। ধর্মঠাকুর কত না রকমে হিন্দু ধর্মের আসরে ঢুকে পড়েছেন।

দেউলেশ্বর ঠাকুর অনাদিলিঙ্গ যখন, তখন তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী সংযোজিত হতে বাধ্য। কাহিনীটি হচ্ছে : এখন দেউলেশ্বরের মন্দির যেখানে, সেখানে নাকি আগে খুব বনজঙ্গল ছিল। একবার একদল মাঝি নৌকো করে নিকটবর্তী খাল দিয়ে যেতে যেতে দেখে—একটা ইঁদুর একটা বেরালকে ধরে খাচ্ছে। এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে মাঝিরা তীরে উঠে ইঁদুরের অনুসরণ করতে করতে বনের ভেতরে গিয়ে যখন উপস্থিত হল, তখন ইঁদুরও অদৃশ্য হয়েছে আর সেখানে এই দেউলেশ্বর শিবও দেখা দিয়েছেন। তারপর দৈববাণীতে আদেশ : "এখানে আমার মন্দির তৈরি করে পুজো কর ; আমি দেউলেশ্বর ঠাকুর।" মাঝিরা নাকি আর ফিরে যাননি, বন হাসিল করে সেখানে বসবাস শুরু করে। তাদের নাম থেকে ঐ জনপদের নাম হয়েছে মাঝিগ্রাম, কালক্রমে উচ্চারণবিকৃতিতে মাজিগ্রাম।

অষ্টধাতুর মূর্তি

দেউলেশ্বর ঠাকুরের প্রতিভূস্বরূপ যে অষ্টধাতুর তৈরি মূর্তিটির কথা বলেছি, সেটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি ভট্টাচার্যদের বাড়িতে বংশপরম্পরাক্রমে পূজিত। কবে কে এঁকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা কেউ বলতে পারেন না। মূর্তিটি প্রায় আট ইঞ্চি উঁচু। মহাপদ্মের ওপরে অর্থাৎ পদ্মের দুথাক পাপড়িতোলা আসনে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে মূর্তিটি উপবিষ্ট। ধ্যানমুদ্রায় বদ্ধ হাতদুটি কোলের ওপরে কিছু শূন্যে অবস্থিত। মূর্তিটিকে নগ্ন বলেই মনে হয়—অথচ সামনের দিকে পায়ের কাছে একটুখানি কোঁচার মত কী যেন ঝুলছে। মূর্তির মাথায় মুকুট, কানে অলঙ্কার, কাঁধের ওপরে দুদিক থেকে কেশগুচ্ছ এসে পড়েছে। এটিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—একটি ফিতের মতো জিনিস পেছনে কোমর বেষ্টন করে সামনের দিকে দুই বাহুর ওপরে দুটি ফাঁসের মত বেরিয়ে এসেছে। যোগাসনে উপবিষ্ট, যোগপট্টে জানুবদ্ধ ধ্যানী মূর্তি অনেক দেখা গেছে। এটিকে কিন্তু যোগপট্টের মত দেখতেও নয়, আর সেভাবে দেহের সঙ্গে বেষ্টিতও নয়। মূর্তিটির কপালে শিবের তৃতীয়নয়ন নেই। অনেক মার্জনে ঘর্ষণে নাক খানিকটা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। তবুও বিস্তৃত বক্ষপট, নিরুদ্ধবায়ু, ধ্যানমগ্ন মূর্তিটির অবিচল স্থাণুভাব লক্ষণীয়। এটি শিবমূর্তি না বৌদ্ধ কিংবা আর কোন্ মূর্তি তা কে জানে!

শুধু অকারণ পুলকে?

শীতে ঝরাপাতা নাড়িয়ে বসন্ত আসে পৃথিবীতে। দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে শীর্ণ রিক্ত গাছের ডাল নতুন পাতায় পল্লবে ভরে ওঠে। ফুলের গন্ধে বাতাস হয় বিহ্বল। জীবজগতে জাগে মিলনের আকুলতা। এসব মীনকেতন পুষ্পধনু মদনদেবের কারসাজি বলে ভারতের প্রাচীন কাব্যে পুরাণে বর্ণিত। তাঁরই চক্রান্তে শান্ত সংযত মুনির মন টলে, কঠিন তপস্বীর ধ্যান ভাঙে। তাঁরই কৌতুকরঙ্গে স্বর্গের সাধারণ দৈবতকুল তো ছার, খোদ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্রেরও যে মন সংক্ষুব্ধ হয়, ভারতের প্রাচীন কাব্যপুরাণের পাতায় পাতায় তার বিচিত্র কাহিনী ছড়ানো। মধুময় মধুঋতুতে মদনকে নিয়ে প্রাচীন ভারত মদনোৎসবেব বিপুল আনন্দে মেতেছে। গ্রিক পুরাণও মদনদেবের মহিমা কম বর্ণনা করেনি। প্রাচীন ইউরোপেও মদনোৎসবের কত না বিচিত্র আয়োজন হয়েছে।

এহেন দেবতা ভারতে শুধু কবি, কাহিনীকারের কাছে নয়, শাস্ত্রকারদেরও কাছে পরম সম্মানলাভ করেছেন। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আর শুক্লা চতুর্দশী তিথিদুটি হিন্দুস্মৃতিগ্রন্থে মদন ত্রয়োদশী আর মদন চতুর্দশী নামে চিহ্নিত। রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকাররা এই তিথি দুটিতে মদনদেবের যথাবিধি অর্চনার বিধান দিয়েছেন। বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাসে'ও কন্দর্পপূজার বিধান রয়েছে—চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীতে। সেখানে এটি 'দমনক-অরোপণ উৎসব' নামে কথিত। ঐ উৎসবে চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশীতে অশোক তরুরূপী কন্দর্পের পুজোর বিধান দেওয়া হয়েছে।

মদন-চতুর্দশীতে বর্ধমান জেলাব মাজিগ্রামে দেউলেশ্বর শিব আর দেবী শাকম্ভরী—এই গ্রামদৈবতযুগলের বিয়ের আয়োজন হয়। সে শুভকর্ম কিন্তু সম্পূর্ণ হয় না, ছাঁদনাতলাতেই পণ্ড হয়ে যায়—বর-কনের রূপ নিয়ে ববপক্ষ আর কন্যাপক্ষের বিরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, তুমুল বাদানুবাদে। তার পরিণতিতে বরকনে বিবাহের মাল্যবন্ধনে পবস্পরকে না বেঁধেই নিজের নিজের মন্দিরে ফিরে যান। "কালো কনে বুড়ো বর। বিয়ে হল না চল ঘর।।" এই ধ্বনি দিতে দিতে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ ফিরে যান।

বলা বাহুল্য—এসব কল্পিত কলহ, সুপরিকল্পিত অভিনয়। মাজিগ্রামের গ্রামদৈবতযুগলের এই বার্ষিক বিবাহ-আয়োজনের কৌতুকরঙ্গে সেখানকার অধিবাসীরা জাতি বর্ণ শ্রেণী নির্বিশেষে মাতেন। মাজিগ্রামের ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, বিত্তশালী উচ্চবর্ণের মানুষদের সঙ্গে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্তী স্তরের অনগ্রসর, গরিব, খেটেখাওয়া সাধাবণ মানুষরাও এসে মিলিত হন এই উৎসবে। সকলের সানন্দ সহযোগিতায় এই কৌতুককর লোকোৎসব কেমনভাবে পালিত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে রেখেছি।

গ্রামদৈবতকে নিয়ে বিবাহের এইরকম অভিনয় কেবলমাত্র বর্ধমানের মাজিগ্রামেই নয়, বর্ধমানের অন্য অঞ্চলে, বাংলাদেশ এবং ভারতেও নানান জাতের নানান গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের বকমফের এখনও প্রচলিত আছে কিংবা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে স্বতঃ-ই মনে হয়, এরা শুধু অকারণ পুলকে কিংবা নিছক কৌতুকরঙ্গ উপভোগের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়নি। বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ্, সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতরাও এর তাৎপর্য নানাভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনার আগে অন্যত্র এইরকম যে সমস্ত আয়োজন হয়, তাদের কিছু বিবরণ উপস্থাপিত করছি।

জগদ্গৌরীর বিয়ে

বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত মণ্ডলগ্রামে আছেন দেবী জগদ্গৌরী—দেবী মনসারই নামান্তর। দশহরার পর সৌর আষাঢ়ের প্রথম পঞ্চমী তিথিতে মণ্ডলগ্রামে জগদ্গৌরীর বার্ষিক

মহাপুজো হয় মহা আড়ম্বরে। এই উপলক্ষে দেবী যখন গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হন, তখন তিনি তাঁর মন্দির থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে আর একটি মন্দিরে যান। ঐ মন্দিরে আছে জরৎকারুর মূর্তি নামে কথিত একটি এবড়ো-খেবড়ো পাষাণখণ্ড। কেউ কেউ বলেন, এটি ধর্মশিলা, ধর্মরাজ ঠাকুরের মূর্তি। এই শিলাখণ্ডেরই সঙ্গে দেবী জগদ্‌গৌরীর বিয়ের আয়োজন হয়। কিন্তু মাজিগ্রামেরই মত এখানকার বিয়েও অসমাপ্ত থাকে। আব "কালো কনে গোদা বর। বিয়ে হলো না চল ঘর।।"—এই ধ্বনি দিতে দিতে সকলে দেবী জগদ্‌গৌরীকে নিয়ে ফিরে আসেন।

নবদ্বীপের শিবের বিয়ে

নবদ্বীপের শিবের বিয়ে নামে যে উৎসব হয়, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে। এখানে তার একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি প্রসঙ্গত। নবদ্বীপে চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিন দিন ধরে যথাবিহিত পদ্ধতিতে বাসন্তীপুজো বা বসন্তকালীন দুর্গোৎসব হয়। দশমীর দিন রাত্রে বাসন্তী প্রতিমার সঙ্গে সেখানকার 'বুড়োশিব', 'যোগনাথ' প্রভৃতি শিবলিঙ্গের বিয়ের আয়োজন হয়। মহাধুমধামে বাজনাবাদ্যি, আলো, লোকজন নিয়ে শিবঠাকুররা চতুর্দোলায় চেপে বিয়ে করতে আসেন। নবদ্বীপের অধিবাসীরা মহোৎসাহে বিয়ের ছাঁদনাতলায় দানসামগ্রী সাজান, বরকনের বাসরঘর তৈরি করেন। অনেক রাত্রে ছাঁদনাতলায় বর এসে দাঁড়ালে বরের বুনো চেহারা দেখে বাসন্তী বেঁকে বসেন। শিবঠাকুরেব পক্ষ থেকেও অনেক সাধ্যিসাধনা চলে, দেবীর বিরূপমন বদলাবার জন্যে। অবশেষে দেবী বুড়ো বরের গলায় মালা দিতে রাজি হন। কিন্তু মালা বদল হওয়া মাত্র দেবী বাসন্তী চলে যান গঙ্গাগর্ভে বিসর্জনে, আর শিবঠাকুররা নিজের নিজের মন্দিরে। সাজানো বাসরঘর শূন্য পড়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের 'মদনকাম' পুজো

উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, আসামের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের রাজবংশীরা চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে 'মদনকামের' পুজো করেন। জলপাইগুড়িতে 'মদনকাম' না বলে বলা হয় 'মদন কামান'। এইদিন শিবদুর্গার বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষেই 'মদনকামেব' পুজো চলে। তাঁর প্রতীক হচ্ছে—একটি বাঁশের ধ্বজা, বাড়ির উঠোনে পোঁতা হয়। এর তলাকার মাটি 'মদনকামের হেতু' নামে পরিচিত, সবরোগহর ঔষধরূপে খ্যাত। আলোচালের গুঁড়ো, দুধ, দৈ, ঘি, মধু, চিনি, সিদ্ধির নাড়ু পুজোর উপকরণ। ব্রাহ্মণ হোম করেন। একজোড়া পায়রা বলি দেওয়া হয়, মানতকারীরা পাঁঠাও বলি দেন। বিয়েতে যেমন গান হয়, এই 'মদনকামের' উৎসবে বা শিবদুর্গার বিয়েতেও সেই ধরনের অনেক গান হয়। 'মদনকামে'র অনেক গানে চাষবাসের কথাই দেখা যায়। একটি গান উদ্ধৃত করছি :

"চইত্‌ মাসে চতুরল খেলা
ভর পূর্ণিমার চান্‌।
হাতে ধনুক কোহে বাট্‌ল
নামিল মদনকাম।।
হেটোনিচা সমান হইল্‌
ভূমি হইল্‌ চাষ।
নয়া জল পাইয়া তাকে;
উজাই লাগিল্‌ মাছ।।"

("রাজবংশীগণের লৌকিক দেব-দেবী" : ভবানীগোপাল সান্যাল, 'সাহিত্যের খবর', কার্তিক, ১৩৬৬ সাল)।

রাজস্থানের উদয়পুরে বৈশাখ মাসে গঙ্গৌর-উৎসব বা দেবী গৌরীর বিবাহের যে অনুষ্ঠান হয়, টড সাহেব তাঁর বিখ্যাত 'Annals and Antiquities of Rajasthan'-এ তার বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। উৎসবটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

উৎসবের কয়েকদিন আগে উদয়পুরের বাইরে থেকে মাটি আনিয়ে তাই দিয়ে দেবী গৌরীর পাকা ফসলের হলদে রঙের অনুরূপ রঙের মূর্তি গড়া হয়। শিবেরও একটি মূর্তি সেইসঙ্গে তৈরি হয়। দুটি মূর্তিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাশাপাশি স্থাপন করা হয়। এটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যোষিৎ-উৎসব—পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাড়ির উঠোনে একটি ছোট পরিখা কেটে তাতে যব রোপণ আর জলসেচন করা হয়। যবগুলি অঙ্কুরিত হলে পুরাঙ্গনারা পরিখাটি বেষ্টন করে হাত ধরাধরি করে নাচ গান শুরু করে দেন। এই অঙ্কুরিত যবের গাছগুলি তাঁরা নিজের নিজের স্বামীকে দেন, তাঁরা সেগুলি তাঁদের পাগড়ির ভেতরে রেখে দেন মহাপবিত্র বস্তুরূপে। এরপর দেবীর গৌরীমূর্তিকে বেশভূষায় সজ্জিত করে, মহাধুমধামে বাজনাবাদ্যি করে উদয়পুরের হ্রদে আনা হয় স্নানের জন্যে। মূর্তিকে বেষ্টন করে আবার নাচ-গান শুরু হয়ে যায়, উদয়পুর হ্রদের ঘাটে ঘাটে। দেবী স্নানশেষে আবার সাড়ম্বরে মিছিল করে ঘরে ফিরে যান। (William Crooke : 'Tod's Rajasthan'. Vol. II. পৃষ্ঠা ৬৬৫-৬৬৮)।

দক্ষিণ ভারতে দেববিবাহ

দক্ষিণ ভারতের মাদুবাতে দেবী মীনাক্ষীর সঙ্গে চোক্কালিঙ্গম্ নামে শিবের বিবাহের আয়োজন হয় প্রতিবৎসর। কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান শুরু হওয়া মাত্র একজন হঠাৎ হাঁচে—আর শুভকর্মে হাঁচি অশুভসূচক বলে বিয়ের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। (W. T. Elmore : 'Dravidian Gods in Modern Hinduism', পৃষ্ঠা ৮৪)।

দক্ষিণ ভারতে কন্যাকুমারিকার বিবাহের কাহিনীও বিখ্যাত। তিনি বিয়ের বরণডালা সাজিয়ে, বরমালা নিয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু বিয়ে হল না, বরমালা নিয়ে আজও তিনি অপেক্ষা করছেন, তাঁর দয়িতের অপেক্ষায়। বিবাহের আয়োজনের কিন্তু কোন ব্যতিক্রম হয় না আজও।

প্রাচীন ইউরোপের অনুষ্ঠান

শুধু ভারতে নয়, দৈবতবিবাহের অনুষ্ঠান প্রাচীন ইউরোপেও বহুলপ্রচলিত ছিল। স্যার জেমস্ জর্জ ফ্রেজার তাঁর সুবিশাল রচনা 'The Golden Bough'-এ তার অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাচীন এথেন্সে প্রতি বৎসর দ্রাক্ষা ফলের অধিষ্ঠাতা দেব ডায়োনিসাসের সঙ্গে এথেন্সের দেবীকল্প সম্রাজ্ঞীর বিবাহের অভিনয় হতো,—প্রচুর দ্রাক্ষাদি ফলোৎপাদনের কামনায়।

ফ্রেজার ইলিউসিসের গুহ্যসাধনার কথাও উল্লেখ করেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে আকাশ-দেবতা জিউসের সঙ্গে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ডিমিটারের বিবাহের অভিনয়ে ভক্তরা অবতীর্ণ হতেন। এক্ষেত্রে দুই দেবদেবীর ভূমিকা নিতেন পুরুষ ও নারী-পুরোহিত। পুরুষ-পুরোহিতকে অবশ্য হেমলকলতার নির্যাস প্রয়োগে সাময়িকভাবে পুরুষত্বহীন করা হত। দেবদেবীর প্রতিভূস্বরূপ এই পুরুষ ও স্ত্রীপুরোহিতযুগল মিলিত হতেন বিবাহে, তারপর তাঁরা অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তেন। ভক্তরা অন্ধকারে বসে থাকতেন অধীর আগ্রহে। তারপর, হঠাৎ পুরুষপুরোহিত তাঁদের সামনে এসে একটি যবের শিষ দেখিয়ে বলতেন, শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শস্য প্রসব করেছেন। তখন সমবেত ভক্তরা

আনন্দোল্লাসে ফেটে পড়তেন। সমস্ত ঘটনাটি, এমনকি জননীর প্রসববেদনা পর্যন্ত অভিনীত হতো। এই প্রাচীন গুহ্যসাধনায় প্রত্যেকেই গভীর বিশ্বাস আর আগ্রহ নিয়ে এতে বিভিন্ন ভূমিকাতে অবতীর্ণ হতেন।

আমেরিকার আদিবাসীদের বিশ্বাস

প্রাচীন গ্রিসে, মিশরে, ব্যাবিলনে দৈবতবিবাহের যে সমস্ত অনুষ্ঠান হত ফ্রেজার তার বহুল বিবরণ দিয়েছেন। আধুনিককালেও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সভ্যতার বিভিন্নস্তরে আটকে থাকা আদিবাসীদের মধ্যে এই দৈবতবিবাহের অনুষ্ঠান কোনও না কোনও চেহারায় টিকে রয়েছে। উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের বিশ্বাস আকাশদেবতা আর ধরিত্রীদেবী পরস্পরের বরবধূ, আকাশদেবতার বৃষ্টিপাতে ধরিত্রী গর্ভবতী হয়ে শস্যপ্রসব করেন, মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দেন। তাই ঐ আদিবাসীরা Corn Dance বা শস্য-নৃত্যাভিনয়ে অবতীর্ণ হয়। এই নৃত্যাভিনয়ে পুরুষরা আকাশদেবতা, আর, নারীরা দেবী ধরিত্রীর ভূমিকা নিয়ে সমবেতভাবে নৃত্যরঙ্গে মাতে। ফসলের কামনায় গভীর বিশ্বাসে আর বিস্তৃত উদ্যোগ-আয়োজনে তারা এই কৃত্য যেভাবে পালন করে এইচ বি আলেকজান্ডার তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর রচিত গ্রন্থ 'The Worlds's Rim'-এ।

মানব-মানবীর বিবাহ

দৈবতবিবাহে কোথাও দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠিত মূর্তি নিয়ে, কোথাও তাঁদের প্রতিভূস্বরূপ মানব-মানবী নিয়েই বিবাহের অনুষ্ঠান অভিনীত হয়। দেব-দেবীর প্রতিভূ না হয়েও বিভিন্ন ধর্মকৃত্যে মানব-মানবীর বিবাহের অভিনয়-অনুষ্ঠানও পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত আছে। এ-দেশেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটির উল্লেখ করছি—বর্ধমানের ক্ষীরগাঁয়ে মাকরী সপ্তমীর দিন, মালাকর আর মালাকরবধূর বার্ষিক বিবাহ অনুষ্ঠান। ঐ দিন দেবী যোগাদ্যার মন্দিরে সূর্যপূজার পর ঐ দুজনকে বরবধূ সাজিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করানো হয় এবং গ্রামের ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের সম্ভ্রান্ত ঘরের পুরাঙ্গনারা তাঁদের বরণ করেন,—ঠিক আসল নববধূবরণের মত।

উইলবার থিওডোর এলমোরও দেখিয়েছেন দক্ষিণ ভারতে দিল্লী পোলাসী নামে এক গ্রামদেবীর পূজা অনুষ্ঠানে গৃহস্বামী আর তাঁর পত্নীর আবার নতুন করে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর শস্য, সুখ, শান্তি লাভই এসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলে অনুমিত হয়। সন্তানাদির কামনায় নেল্লোর জেলায় যে বিবাহের অনুষ্ঠান হয় এলমোর তার উল্লেখ করেছেন তাঁর 'Dravidian God in modern Hinduism' গ্রন্থে। (পৃষ্ঠা ২০, ২৮)

আদিম মানুষের জাদুভিত্তিক সংস্কারের স্মারকচিহ্ন

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের এই সমস্ত অনুষ্ঠান, কৃত্যগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণে নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা,—এগুলি নিছক কৌতুকরঙ্গ উপভোগের জন্যে পরিকল্পিত হয়নি। এগুলি আদিম যুগের অসহায় মানুষদের বাঁচবার কঠিন সংগ্রামে তাদের নিজেদের অপরিপক্ক, অপরিণত মনের গঠন অনুযায়ী উদ্ভাবিত কৌশলকলার স্মারকচিহ্ন। বিস্মৃত সেই আদিম যুগের মানুষ, যারা সবেমাত্র কৃষিকাজে অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু কৃষি-উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কার্যকারণসূত্রের, প্রাকৃতিক রহস্যের চাবিকাঠির কোনও সন্ধান পায়নি,—অপরিণত মানুষের হাতিয়ার নিয়ে যারা হিংস্র বন্য জীবজন্তু, প্রতিকূল প্রকৃতি, বিরোধী অন্যান্য মানুষগোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বদা লড়াই করে বাঁচছিল, খাদ্যোৎপাদনে, বিশেষত কৃষি-উৎপাদনে জাদুভিত্তিক কৌশলকেই তারা সেদিন আঁকড়ে ধরেছিল।

তাদের অপরিণত মন আবিষ্কার করেছিল, মানুষের প্রজননক্ষমতা আর প্রাকৃতিক ফলপ্রসব যেন একসূত্রে বাঁধা। এই ধারণা নিয়েই একের সাহায্যে অপরকে ফলপ্রসূ করার কথা সে ভেবেছিল সেদিন। প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করার জন্যে, ভূমি থেকে প্রচুর শস্যলাভের কামনায়, মানবীয় প্রজননকর্মের অনুকরণে নানান অনুষ্ঠান, কৃত্যাদির পরিকল্পনা সে করেছিল। প্রকৃতিকে ভুলিয়ে এনে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনবার জন্যে পরিকল্পিত জাদু-আশ্রয়ী অনুষ্ঠানে সে মত্ত হয়ে ভেবেছিল, দেবী ধরিত্রীকে পুরুষদেবতার সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে মিলিত করলেই তার পরিণতিতে মানুষের সন্তানজন্মের মত প্রচুর শস্যোৎপাদন হবে, প্রচুর পশু উৎপন্ন হবে, খাদ্যের কোনও অভাব হবে না।

আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পণ্ডিতজনের অনুমান থেকে দেখেছি, আদিম কৃষিনির্ভর মাতৃতান্ত্রিক মানুষগোষ্ঠীর পরিকল্পিত দেবী বসুন্ধরাই নানা দেবী রূপে কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছেন। শস্যপ্রসবিনী জীবধাত্রী জননী বসুন্ধরাই এদেশে হয়েছেন দেবী শাকম্ভরী, গ্রিসে যবলক্ষ্মী ডিমিটার, আমেরিকার আদিবাসীদের ঘরে ভুট্টালক্ষ্মী। অনেক স্থানে এই দেবী পুরুষ দেবতাতেও পরিণত হয়েছেন কালক্রমে। দৈবতবিবাহের অনুষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য শস্যের কামনা। মদনপূজাকে ঐ অনুষ্ঠানেরই আর এক রকমফের বলে ধরে নিতে বাধা কী? কারণ, রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্বে' মদনপূজার ফলশ্রুতি বর্ণনায় ইঙ্গিত দিয়েছেন, মদনের পূজা করলে পুত্রপৌত্র, সমৃদ্ধিলাভ হবে। মদন প্রাকৃতিক প্রজননলীলার সঙ্গে তাই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। মাছ প্রজননের চিহ্ন রূপে আদিম সংস্কারে পরিকল্পিত। প্রাচীন ভারতে মদন তাই মীনকেতন।

ভারতের খাদ্য-উৎপাদন কৌশল অনেকখানি প্রাচীন ধারাতেই বয়ে আসছে, তাই এখানকার সামাজিক কাঠামোরও খুব দ্রুত এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আমাদের ধর্মচর্যায় সেই বিস্মৃত যুগের আদিম সংস্কারের চিহ্নাবলী তাই এত প্রকট। অতি প্রাচীন যুগের অসহায় অপরিণত সমাজে এগুলির যে তাৎপর্য ছিল আজ আর তা নেই। তবু প্রাচীন সমাজ সেগুলিকে বয়ে নিয়ে চলছে।

বোড়ো-বলরামের মেলা

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় গাজন দেখেছি, শিবের গাজন, ধর্মের গাজন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরামের গাজন একমাত্র বর্ধমান জেলার বোড়োগ্রাম ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। বলরাম ঠাকুরের মূর্তি কাঠের তৈরি। বপু বিশাল, উঁচুতে প্রায় হাত দশেক হবে। ঠাকুরের বিশাল বপুর মত তাঁর মাহাত্ম্য ছড়ানো। তাই ঠাকুরের কাছে মানত-পুজো দিতে, বছরে কয়েকটি পালপার্বণ উপলক্ষে বোড়োগ্রামে বেশ জনসমাগম হয়—নানা অঞ্চল থেকে। ঠাকুর বলরামের এত নামডাক যে, সরকারি খাতায় পত্রে, ডাকঘরে, থানায়, নাম শুধুমাত্র বোড়ো নয়, বোড়োর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলরাম-নামটিও। গ্রামের নাম হয়েছে বোড়ো-বলরাম।

ঠাকুরের নিত্য সেবা-পুজো যথারীতি তো হয়ই। বছরের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উৎসবও হয়, যেমন ভাদ্র মাসে অনন্ত চতুর্দশীতে, পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তিতে, মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমীতে। এই সমস্ত উৎসব উপলক্ষে নানা অঞ্চল থেকে অনেক লোক আসে বোড়ো-বলরাম গ্রামে। মাকরী সপ্তমী উপলক্ষে প্রায় ১১ দিন ধরে চলে উৎসব, তখন খুব ভিড় হয়, মেলা বসে।

কিন্তু ঠাকুরের সবচেয়ে জমকালো উৎসব হচ্ছে বৈশাখ মাসের গাজন। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী—নৃসিংহ-চতুর্দশীর দিনই এই গাজনের শেষ পর্ব এবং সবচেয়ে বেশি ধুমধাম। আগুপিছু ধরে মোট চার পাঁচ দিন এই গ্রামীণ উৎসবটির মেয়াদ। গাজনে শুধু বোড়োরই নয়, কাছের আর দূরের অনেক গাঁয়ের—দামোদরের এ-পার ও-পার, দুদিক থেকেই মানুষ আসে দলে দলে।

মেলা ছাড়া এসব গ্রামীণ উৎসব জমে না। তাই গাজন উপলক্ষে বোড়োতে দোকানপাট গজায়, লোক গিস্‌গিস্ করে, বেচাকেনার ধুম পড়ে যায়। গাছপালার আড়ালে ঘুমিয়ে থাকা এই দূর নিভৃত পল্লী হঠাৎ যেন জেগে ওঠে। নানা দিক্ দেশের থেকে আসা হাজার রকমের মানুষের কোলাহলে, ঢাকের বাজনায়, গাজনের সন্ন্যাসীদের নাচে কদিন সে বেশ জমজমাট হয়ে থাকে।

পিঁপড়ের সারির মত লোকসমাগম

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের সব গাঁয়ের মত এই বোড়োগ্রামও দুরধিগম্য। পাকা রাস্তা নেই, কাঁচা রাস্তাই সম্বল। অধিকাংশ মেঠো পথ, ক্ষেতের আলপথ। গোরু কিংবা মোষের গাড়ি ছাড়া আর কোনও যানবাহনের প্রশ্নই ওঠে না। অধিকাংশ যাত্রী—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, কচি-কাঁচা সবাই হেঁটেই আসে বোড়োগ্রামের উৎসবে। ব্যবসায়ীরা মালপত্র মাথায় নিয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ ভেঙে আসে মেলায়—কটি দিনের জন্যে। বৈশাখ মাসের দারুণ গরম। চারধার শুকনো, তৃষিত। ধানক্ষেত শুকনো, পুকুরের তলা জলহীন, ফেটে চৌচির। তবুও দেখেছি, উৎসবের টানে যাত্রী বা ব্যবসায়ীরা সবাই আসছে এ মেলায়, পিঁপড়ের সারির মত।

মেলার আকর্ষণ

শুধু মানতের পুজো দিতে কিংবা ব্রত-উপবাস করে বলরাম ঠাকুরের কাছে দু-চার পয়সা দামের পুজোর ডালি ধরে দিতেই এই পিঁপড়ের সারি আসছে না। অন্য আকর্ষণও আছে। সে আকর্ষণ হচ্ছে মেলার। শহর থেকে অনেক দূরে, যোগাযোগব্যবস্থাহীন দূর গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এই মেলায় আসে শুধু শখ মেটাতে নয়, ঘর-গেরস্থালির নিত্যনৈমিত্তিক দরকারি জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে। ধামা, কুলো, চুপড়ি, লোহার হাতা, বেড়ি, কড়া, খুন্তি, এ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন, মাছ ধরার

হুইল, জাল, ছিপ, বঁড়শি—এসব দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তো আছেই, গামছা, কাপড়, গেঞ্জি, ছিটের শার্ট, ব্লাউস, পুঁতি, কেমিক্যালের গহনা, আর্শি, চিরুনি, আলতা, স্নো, সাবান, খেলনা, পুতুল—এসব শৌখিন জিনিসপত্রেরও দরকার কম নয়। কে আর যাচ্ছে রোজ দূর শহরে এসব কিনতে। তাই গাঁয়ের মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো সকলেই ছুটে আসে এইসব মেলায়।

নানা জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরাও তাই আসে মালপত্র নিয়ে, এসব মেলায়। এক অঞ্চলের মেলা ফুরোলে, ওরা আর এক অঞ্চলের মেলার দিকে পা বাড়ায়। গ্রামের মেলাগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ব্যবসায়ীরই মুখ চেনা হয়ে গেছে আমার। ওদের সঙ্গে কথাবার্তায় শুনেছি, ওরা কোন্ গাঁয়ের, কেমন ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা, কোন্ গাঁয়ের লোক কোন্ জিনিস চায়—তা দৈনন্দিন প্রয়োজনেরই হোক, কিংবা শখ মেটাবার জিনিসই হোক, ওরা তার সঠিক খবর জানে। আর ঠিক সেই চাহিদামত বিভিন্ন মেলায় বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে ওরা মেলায় মেলায় ঘোরে। গাঁয়ের রাস্তাঘাটের খবব ওদেব কাছে থেকেই ভাল করে পাওয়া যায় দেখেছি। আর দেখেছি, সরকারি স্ট্যাটিসটিকসের চাইতে ওদের সংগৃহীত তথ্য অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আমার গ্রামপরিক্রমার পথে ওরাই আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার এ্যান্ড গাইড।

গ্রামের উৎসব-আনন্দে ভাঁটা

কিন্তু বোড়ো-বলরামের গাজনের আর একটা জিনিসেরও আকর্ষণ আছে। সেটি হচ্ছে যাত্রাগানের। এই গাজন উপলক্ষে ক-রাত্রি যাত্রা চলে, মন্দিরের সামনেকার রাস্তায়, সামিয়ানার তলায়। এই দূর গ্রামাঞ্চলে সিনেমা থিয়েটার নেই। যাত্রা, পালাকীর্তন, তর্জা, কবির গানই এখনও এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। বোড়ো-বলরামের গাজনে যাত্রার আয়োজনে তাই লোকসমাগম এত বেশি।

জমিদারি ব্যবস্থাব ওপরে নির্ভরশীল পুরনো সামাজিক কাঠামোতে গ্রামের দেবসেবা, পালপার্বণ, আমোদআহ্লাদের অনেকখানি আয়োজন এতদিন গ্রামের বিত্তশালী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় হয়ে এসেছে। পুবোহিত থেকে শুরু কবে ঢাকি, ঢুলি, চাকর সকলকেই নিষ্কর জমি, বাধাঁবরাদ্দ মাইনে কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থার বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছিল বংশপরম্পরাক্রমে। গ্রামের শোষিত সাধারণ মানুষদের মাঝে মাঝে এই রকম আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থায় ভুলিয়ে রাখতেই হোক, কিংবা নিজেদের পারলৌকিক বিশ্বাসে অথবা নিছক ইহলৌকিক আত্মতৃপ্তির জন্যেই হোক, গাঁয়ের জমিদাররাই এইসব উৎসবে বেশ বদান্যতা করে এসেছেন। জমিদারি ব্যবস্থা বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত নিষ্কর জমিজমারও ওপর খাজনা বসেছে। ফলে গ্রামের যারা গ্রাম্যদেবতার পালপার্বণে নানারকমের কাজের ভার নিত, তারা সবাই এখন অসন্তুষ্ট, নিজের নিজের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, বিনা পয়সায় গাঁয়ের পালপার্বণে নিজেদের যথানির্দিষ্ট সাহায্য দিতে আর রাজি নয়। ফলে গাঁয়ের এই সমস্ত প্রাচীন উৎসব-আনন্দেও গত পাঁচ-ছ বছর থেকে বেশ ভাঁটা পড়ছে দেখছি। বোড়ো গ্রামেও এইরকম ব্যাপাব। শুনলুম বোড়ো-বলরামের গাজনে আগে অনেক সন্ন্যাসীর মেলা হত, ঢাকি-ঢুলির সংখ্যা ষাট-সত্তরে দাঁড়াত, ভাল ভাল যাত্রা, পালা-কীর্তনের দল আসত। এখন এসব কমে গেছে। এবারে দেখলুম মাত্র ছটি ঢাক এসেছে। সন্ন্যাসীর সংখ্যাও গুটি ছয়েক। ভাল যাত্রা-পার্টির বদলে মামুলি যাত্রা-পার্টি এসেছে—এই অভিযোগে দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষরা এবার খুব ক্ষুব্ধ।

বর্ধমান জেলার সদর মহকুমার রায়না থানার ভেতরে বোড়ো গ্রামটি। দামোদর নদের দক্ষিণ কূলে। কলকাতা থেকে যেতে হলে শক্তিগড় স্টেশনে নেমে, সেখান থেকে মাইল দুই দূরে বড়শুল

যেতে হয়। তারপর দামোদর নদ পেরিয়ে ওপারে আরও মাইল তিনেক হাঁটতে হবে। তবে মিলবে বোড়োগ্রাম।

২০ ফুট উঁচুতে মন্দির স্থাপিত

বলরাম ঠাকুরের মন্দিরটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গাঁয়ের জমির লেভেল থেকে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু এক বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি। এত উঁচুতে মন্দির স্থাপনের কারণ নিশ্চয়ই দামোদরের বন্যা। দামোদরকে নিয়ে তো এসব অঞ্চলের লোকের চিরকালের আতান্তর। দেশ স্বাধীন হবার পরও সে আতান্তব ঘোচেনি।

মন্দির তৈরির পরিকল্পনাটিও খুব সুন্দর। চওড়া উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয় ওপরে বিশাল প্রাঙ্গণে। এই সিঁড়িই গ্যালারির কাজ করে, এর ধাপে ধাপে মেয়ে পুরুষেব দল বসে, রাস্তায় সামিয়ানার নিচে যাত্রা দেখে, সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ খাওয়া, দণ্ডী খাটা, গাজনের নাচ দেখে।

সিঁড়ির প্রবেশপথে মস্ত তোরণ। মাঝখানে বাংলা চালাঘরের মত খিলানের অলঙ্করণ। দেওয়ালের গায়ে মোগল ঢং-এর কুলুঙ্গি। চারপাশে নানারকম কারুকার্য ছিল বোধ হয় এক কালে। সেসব কারুকর্ম কালক্রমে সাফ হতে হতে এখন তাদের ক্ষীণ রেখাটুকু ঝাপসা স্মৃতির মত দেওয়ালের গায়ে লেগে আছে। এই তোরণ দিয়ে বিশাল প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। প্রাঙ্গণটি লম্বায় প্রায় ৮২ ফুট, চওড়ায় ৬৫ ফুট। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, একটুও আবর্জনা নেই।

উড়িষ্যার জগমোহনের ঢঙের মন্দির

বিশাল প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে উঁচু মন্দির। ইঁট, চুন, সুরকিতে তৈরি। গড়নের ঢং উড়িষ্যার মন্দিরের জগমোহনের মত। মন্দিরের ঊর্ধ্বভাগ মোট সাতটি ধাপে উঠে গেছে। তবে উড়িষ্যার মন্দিরের শীর্ষ-অলঙ্করণ আমলক শিলার বদলে পলতোলা নিম্নমুখী ঘণ্টাকৃতি অলঙ্করণই এই মন্দিরের শীর্ষভাগে বিরাজিত। এর ওপরে বোধ হয় ছিল কলসের অলঙ্করণ, আর তার ওপরে বিষ্ণুমন্দিরের চক্রলাঞ্ছন। এ দুটিই এখন অদৃশ্য, তাদের কাঠামোস্বরূপ লোহার একটি ডাণ্ডা, বোধ হয় বজ্রনিবারক, মাথা তুলে আছে।

মন্দিরটির চারপাশের দেওয়াল পল তোলা, খাঁজ কাটা, পিরামিডের আকারের ঊর্ধ্বভাগও খাঁজে খাঁজে ভাগ করা। গায়ে কোনও নক্সা বা বিচিত্র অলঙ্করণ নেই। তবুও এর সরল, সুদৃঢ়, নিরলঙ্কৃত স্থাপত্যসৌন্দর্য মনকে আকর্ষণ না করে পারে না।

উড়িষ্যার জগমোহনের ঢঙের এই মন্দিরের গায়ে কিন্তু বাংলার প্রাচীন চালাঘরের স্থাপত্যকলায় তৈরি প্রবেশদ্বার। বাংলাদেশে—বিশেষত রাঢ়দেশের মাটির ঘরের চাল বাঁশের কাঠামোতে, চেঁচারি, বাঁখারিতে তৈরি করে খড় দিয়ে ছাওয়া হয়। খড়ো ঘরের চালের এই ঢালু বাঁকানো ডৌলটি প্রাচীন বাংলার ইঁটসুরকিতে তৈরি মন্দিরে, মুসলমানদের কবরখানায়, দরগাতে স্থাপত্যের অলঙ্করণ হিসেবে বেশ ব্যবহৃত হয়েছে। মালদহে, পুরনো গৌড়ে কদমরসুল মসজিদের পাশে যে কবরখানাটি আছে তার ছাদ এই দোচালা খড়ো ঘরেরই অনুকরণে তৈরি। পুরনো গৌড়ে অনেক দরগাতেও এই রকম অলঙ্করণ নজরে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাচীন মন্দিরে মন্দিরে তো এর বহুল ব্যবহার হয়েইছে। বাংলার এই স্থাপত্যকলা ভারতের উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলেও যে খুব আদর পেয়েছিল, জয়পুর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন প্রাসাদের শীর্ষ, অলিন্দ, প্রবেশদ্বার তার সাক্ষী। বোড়োর বলরামের মন্দিরেরও গায়ে এই ঢঙেরই প্রবেশপথ সংযোজিত। এই প্রবেশপথের গায়ে এককালে পোড়ামাটির নানা অলঙ্করণ ও মূর্তিফলক ছিল। এখন তাদের সামান্যমাত্র

অবশিষ্ট আছে। আর যেটুকু আছে, সেটুকুও বেপরোয়া চুনকামের ফলে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

এই মন্দিরের ডান দিকে একেবারে গা ঘেঁষে আছে আর একটি মন্দির, লালরঙের, পঞ্চরত্ন— অর্থাৎ পাঁচটি চূড়াওয়ালা। এর গায়েরও অলঙ্করণ এখন অবলুপ্তপ্রায় এবং মন্দিরটিও ভগ্নপ্রায়। মন্দিরটি শূন্য, কোনও কালে বিগ্রহ ছিল কিনা, তা কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু জগমোহনের মত আকৃতির মন্দিরের গা ঘেঁষে হঠাৎ এই রকম পঞ্চরত্ন কেন উঠল? এ যে একেবারে বেখাপ্পা!

দুটি বেখাপ্পা সংযোজন

আমার মনে হয়, বলরামের জগমোহনের আকৃতির মন্দিরটিই সবচেয়ে পুরনো এবং অনেককালের পুরনো। নিঃসন্দেহে এটি তিন-চারশো বছরের পুরনো হবে। আর এর সামনে সংযোজিত বাংলা চালাঘরের ঢঙের প্রবেশপথ আর পাশের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি অনেক পরবর্তীকালের সংযোজন। কারণ যে স্থপতি সুন্দর, সুদৃঢ়, সুসঙ্গতিপূর্ণ এই মূল মন্দিরটি গড়েছেন, অন্য চরিত্রের আর এক স্থাপত্যকলাকে তিনি এমন বিসদৃশভাবে তার সঙ্গে জুড়ে দেবেন— এ কিছুতেই মন মেনে নিতে চায় না। ঐ বিশাল প্রাঙ্গণের প্রান্তে ঐ বিশাল মন্দিরকে তার অবারিত সৌন্দর্য নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেই চোখ চায়। চোখ চায় না, অন্য আর এক ধরনের স্থাপত্যকলা উড়ে এসে সামনে আর পাশে এমন করে দাঁড়িয়ে এর সরল স্থাপত্যের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করুক।

এই বিশাল মন্দিরের ভেতর বলরাম ঠাকুরের কাঠের তৈরি বিশাল মূর্তি। বিচিত্র তাঁর গঠন, বিচিত্র তাঁর বেশভূষা এবং বিচিত্র তাঁর পুজো ও উৎসবের পদ্ধতি। এই সমস্ত বিষয় এবং রাঢ়বাংলার এই গ্রামদেবতাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র লোকোৎসবের অনুষ্ঠান প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে তার বিবরণ পরবর্তী প্রবন্ধে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব।

বোড়োর অনন্ত-বাসুদেব

পুরাণে বলরাম বিষ্ণুরই অবতাররূপে, সাক্ষাৎ ভগবান বাসুদেবরূপে কীর্তিত। আর্ত পৃথিবীর ত্রাণের জন্যে তিনি বসুদেবের পুত্র হয়ে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শিশুঘাতী কংসের হাতে মৃত্যু এড়াবার জন্যে দেবকীর গর্ভ থেকে তিনি বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে সংকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তাঁর আর এক নাম সঙ্কর্ষণ।

এসব পুরাণ-কথা। শুধু জন্মের ব্যাপারেই নয়, কৃষ্ণেরই মত বলরামেরও শৌর্য-বীর্যের অনেক ভাগবতী কীর্তি-কাহিনীতে বিভিন্ন পুরাণ মুখর।

বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদাবলীতে কিন্তু বলরামও কৃষ্ণের মত ঈশ্বরের সব ঐশ্বর্য হারিয়ে হয়েছেন ব্রজের রাখাল ছেলে। কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি রাখালবন্ধুদের নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে গরুর পাল নিয়ে গোষ্ঠে ছোটেন, গরু চরান, বনফল কুড়োন, প্রাণের ভাই কানাই আর রাখাল-সখাদের সঙ্গে তা ভাগ করে খান, তাঁদের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুকরঙ্গে মাতেন।

বলরাম যখন পুরাণে বিষ্ণুরূপেই কীর্তিত, তখন বিষ্ণুর বিভিন্ন আয়ুধ তাঁর হাতে যে থাকবে, তাতে আশ্চর্যের কী আছে! তবুও পুরাণে লাঙ্গল আর মুষলই তাঁর প্রধান আয়ুধ। কিন্তু পদাবলীর কবিরা তাঁর হাতে শিঙা আর পাঁচনি তুলে দিয়েছেন। পদাবলীতে তাই দেখি ছোটভাই কানাই মোহনবাঁশি আর দাদা বলাই শিঙা বাজাতে বাজাতে অন্যসব রাখাল ছেলের সঙ্গে গোষ্ঠে চলেছে—শ্যামলী-ধবলীদের পাল নিয়ে। সাদা ধপ্‌ধপে বলাই-এর রং, পরনে নীল কাপড়। কালো কানাই-এর পরনে পীতবসন। দুজনেই নন্দ-যশোদার দামাল দস্যি আনন্দ-দুলাল। গোষ্ঠে কদম গাছের ছায়ায় রাখাল আর গরুর পালের মাঝখানে রাম-কানু দুই ভাই দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গসুন্দর ঠামে—পাশাপাশি গলাগলি করে। এর মাথার চুড়ো ওর চুড়োয় ঠেকে, এর বাঁশি ওর শিঙার শব্দে মেশে। শুধু গোষ্ঠেই নয়, নন্দ-যশোদার গৃহাঙ্গনেও এই যুগলরূপ দেখে বিভোর বৈষ্ণব কবিরা পদাবলীর মালা গেঁথেছেন—বাৎসল্য, সখ্য, সৌভ্রাত্রের সুধারসে সিঞ্চিত করে। রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে মাধুর্য বা কান্তারসের ধারায় বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পরিপ্লাবিত হলেও কৃষ্ণ-বলরামকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য, সখ্য, সৌভ্রাত্রের সে লীলাতেও বাংলার বৈষ্ণব কাব্যকলা কম উজ্জ্বল হয়নি।

বাংলার সংস্কৃতিতে কানাই-বলাই

বাংলাদেশে তাই মন্দিরে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির উপাসনার সঙ্গে কানাই-বলাই-এরও যুগল উপাসনা প্রবর্তিত হয়েছে। শুধু মন্দিরের পুজোর বেদীতেই নয়, কীর্তনগানে, যাত্রায়, লোকসঙ্গীতে, বাংলার পুরনো মন্দিরের গায়ে, প্রাচীন শিল্পীদের রচিত পোড়ামাটির আশ্চর্য চিত্রফলকে কৃষ্ণবলরামের গোষ্ঠলীলা কম স্থান পায়নি। বাংলার লোকশিল্পী পটে, পুঁথির পাটাতে, মাটির পুতুলে কৃষ্ণবলরামের যুগলমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্রফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তিসম্ভারের মধ্যে পৌরাণিক লাঙল-মুষলধারী বলরামের শান্ত গম্ভীর মূর্তি দুর্লভ নয়। কিন্তু অপরূপ গতিব্যঞ্জনাময় প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিপূর্ণ কৃষ্ণলীলা-রূপায়ণের যে চিত্রফলক বাংলার মন্দিরকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে, তাদের মধ্যে নটবর বেণুকর কৃষ্ণের পাশে শিঙাধারী লীলামোহন রাখাল বলাইও এসে দাঁড়িয়েছে, বলরামের লাঙল-মুষলধারী অবতারমূর্তি নয়। এসবই মুখ্যত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ঐশ্বর্যবিরহিত অনুরাগনির্ভর সাধনপদ্ধতি প্রবর্তনেরই ফলশ্রুতি।

কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি

উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের নানান জায়গায় কানাই-বলাই-এর রাখালবেশী যুগল মূর্তিরই পুজো হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি খুবই প্রাচীন এবং প্রাচীনকাল থেকেই তাদের বেশ নামডাক আছে। এইরকমের একটি হচ্ছে বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ায় রামাই গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত কানাই-বলাই-এর মূর্তি। এই মূর্তি যোড়শ শতকের শেষভাগে বৃন্দাবন থেকে আনা হয়েছিল বলে লোকপ্রসিদ্ধ। বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাঁটি থানায় সাওড়াকোণ গ্রামের রামকৃষ্ণ বেশ বিখ্যাত।

বাংলাদেশে কৃষ্ণবিগ্রহের পুজো বহুল প্রচারিত নয়। সাধারণত কৃষ্ণের সঙ্গে হয় রাধা, নয়তো বলরামের বিগ্রহের পুজো প্রচলিত। অবশ্য কৃষ্ণের নাড়ুগোপাল কিংবা বালগোপালমূর্তির একক পুজো খুবই প্রচলিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া বলরামের এককমূর্তির সেবাপূজা খুব অল্পই আছে বাংলাদেশে। বলরাম বিষ্ণুর অবতার হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় প্রায় সমস্ত স্থানটুকু অধিকার করে বসে আছেন। সেই জন্যে বলরাম একক মহিমায় নয়, কৃষ্ণনির্ভর হয়েই চৈতন্যযুগ থেকে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছেন। তবে কয়েক জায়গায় কৃষ্ণ থাকুন আর নাই থাকুন বলরামের নামেরই মাহাত্ম্য যে সব জায়গায় জুড়ে বসে আছে এমন দৃষ্টান্তও বাংলাদেশে দু-চারটি আছে। এমনি একটি হচ্ছে, বাঘনাপাড়ার বলরাম। ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, গ্রামদেবতার গাজন, ঝাঁপান, ব্রত ইত্যাদি উপলক্ষে গ্রামীণ গায়ক-কবির দলের যাত্রা, নাটগীত ইত্যাদির অনুষ্ঠানে 'দিগ্‌বন্দনা'য়, বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রামদেবতার প্রাচীন পুঁথির 'দিগ্‌বন্দনা' থেকে বাংলাদেশের লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় দেবদেবীর পরিচয়সূত্র উদ্ধার করা এখনো সম্ভব। ('বর্ধমান সম্মিলনী'র 'সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা')। এমনি পুরনো কবির 'দিগ্‌বন্দনা'য়' ড. সেন পেয়েছেন "বাঘনাপাড়ায় বলরামে বন্দি ভক্তি করি" আর, "বোড়ো গ্রামের বলরামে নত কৈনু শির।" বর্ধমান জেলার কৈচর স্টেশনের কাছেই কানাডাঙা বা কাননডাঙায় নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামীদের বলরামের সেবারও বেশ খ্যাতি আছে।

কিন্তু তাই বলে বলরামের হলমুষলধারী চতুর্ভুজ কিংবা বহুভুজ অবতারমূর্তি দুর্লভ ছিল না। চৈতন্যের অনেক পূর্ববর্তী কালের এবং কিছু সমসাময়িক যুগেরও এইরকম অনেক পাথরের ও ব্রোঞ্জের মূর্তি পাওয়া গেছে এবং কোনও কোনও জায়গায় বিষ্ণুর মূর্তিরই মত প্রবল প্রাধান্য প্রতিপত্তি নিয়ে এইরকম কয়েকটি মূর্তির পূজার্চনা আজও চলছে। এই রকম কয়েকটি মূর্তির কথা পরে বিবৃত করব। এখন বর্ধমানের বোড়োগ্রামের বলরাম ঠাকুরের কথা বলি। ইনি কিন্তু এককভাবে পূজিত হন। আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে ঠাকুরের বিশাল মন্দিরের গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। মন্দিরের মতো ঠাকুরের মূর্তিটিও বিচিত্র গঠন ও বিশালাকৃতি। মূর্তিটি কাঠের তৈরি, সম্ভবত নিম কাঠেরই। এত বড় কাঠের মূর্তি বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে—নৃসিংহ চতুর্দশীতে ঠাকুরের চক্ষুদান গাজন উৎসবের প্রাক্কালে যখন মূর্তির অঙ্গরাগ হচ্ছিল, তখন গর্ভমন্দিরের ভেতরে ঢুকে মূর্তিটিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ আমার মিলেছিল। অন্য সময়ে ঠাকুরের ব্রাহ্মণ সেবাইতরা ছাড়া আর কেউই গর্ভমন্দিরে ঢুকতে পারে না।

বোড়োর বলরাম মূর্তি

মূর্তিটি দাঁড়ানো—ভাস্কর্যকলার ভাষায় 'সমপদস্থানক' মূর্তি। পেছন মাটিতে পোঁতা, প্রায় ফুট চারেক উঁচু দুটি বিভিন্ন গড়নের পাথরের লম্বা টুকরোর ওপরে মূর্তিটিকে ঠেসান দিয়ে রাখা। ঐ পাথর দুটোর গায়ে কারুকার্যের কিছু ক্ষয়িত চিহ্ন। দেখে মনে হয় কোনও মন্দির বা প্রাসাদের স্তম্ভাংশ

ও দুটি। মূর্তিটির পাদমূল থেকে মাথার পিছনে সংযুক্ত চিহ্নিত কাষ্ঠফলকের শীর্ষভাগ পর্যন্ত মাপ নিয়ে দেখা গেল প্রায় ১৬ ফুট উঁচু। শুভ্রবর্ণ চতুর্দশভুজ মূর্তি। মাথায় তেরটি নাগ ছত্রাকারে বিন্যস্ত। 'অনন্ত-বাসুদেব' নামে দেবতা পূজিত।

চতুর্দশভুজ মূর্তি, কিন্তু মাত্র পাঁচটি হাত সম্পূর্ণ মুষ্টিবদ্ধ আর একটি অর্ধোন্মুক্ত। পাঁচটি মুষ্টিবদ্ধ হাতে আছে লাঙল, মুষল, গদা, চক্র আর শঙ্খ। আর বাকি নয়টি হাতে কোনও আয়ুধ নেই। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত প্রসারিত, রক্তিম পাণিতলে শুধু একটি করে পদ্ম আঁকা। হাতগুলি খুবই স্থূলাকৃতি এবং দেহের তুলনায় অনেকগুলি বৃহদাকার, বেমানান। পায়ের গড়নও এই ধরনের।

মূর্তিটির বিশাল পরিস্ফুট মুখে দীর্ঘ আয়ত চোখ, গোঁফ দাড়ি চিহ্নিত। সুগঠিত, বিস্তৃত বক্ষে উপবীত, জানু পর্যন্ত বিলম্বিত বনমালা—বিষ্ণুবিগ্রহের পরিচিত আভরণ। কানে মকরকুণ্ডল, হাতে বালা, বাজু, পায়ে নূপুর। কারুকার্যখচিত বিচিত্র নীলবসন নেমে এসেছে পাদপ্রান্তে। কটিদেশে বিস্তৃত উদরবন্ধ।

বলরামের তৃতীয় নয়ন

মূর্তির শীর্ষাভরণ ক্রমহ্রস্বায়মান মোচার আকারে ওপরে উঠে গেছে। তার শেষসীমান্তে ধর্মচক্রের মত দেখতে একটি সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত চক্র চট করে নজরে পড়ে। মূর্তিটির আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে কপালে তৃতীয় নয়ন। হিন্দু আইকনোগ্রাফিতে একমাত্র শিবশক্তি এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক দেবদেবীরই ত্রিনয়ন দেখা যায়। 'বৃহৎসংহিতা'য় প্রতিমালক্ষণে ইন্দ্র ও গণেশের ত্রিনয়নের ব্যবস্থা দেখা যায়। অনেক মহাযান বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতেও ত্রিনয়ন আছে। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তির ত্রিনয়নের ব্যবস্থা কোনও প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রে পাওয়া যায়নি। বোড়োর বলরাম ঠাকুর 'অনন্তবাসুদেব' নামে অভিহিত—তিনি বৈষ্ণব দেবতাই বটে। কিন্তু তাঁর এই তৃতীয় নয়ন থাকা আশ্চর্য ব্যাপার। বিষ্ণু বা বলরামের কোনও মূর্তিতে আজ পর্যন্ত তৃতীয় নয়ন দেখা যায়নি। মূর্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট উদরের গড়ন, অনেকটা দেখতে বাংলাদেশের মাটির গড়া শিবের ভুঁড়ির মত। বিষ্ণুমূর্তিতে ভুঁড়ি কিন্তু কখনও দেখা যায়নি।

দশনদংশিত অধর

বোড়োর বলরামের মূর্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—দুটি দাঁত সামনে বেরিয়ে আছে ঠোঁটের ফাঁক থেকে। তাতে অবশ্য বলরামের হাস্যস্ফুরিত মুখের সৌন্দর্য বেশ বেড়েছে। পৌরাণিক চিত্রণে বলরামও সদানন্দময়, হাস্যমুখ, সরলপ্রকৃতির মানুষ। শৌর্যবীর্যে কৃষ্ণের চাইতে কিছু কম তিনি না হলেও কৃষ্ণের মত কূটরাজনীতিজ্ঞতা, সূক্ষ্মবুদ্ধির ধারের কোনও পরিচয় তাঁর নেই। মদে তাঁর খুবই আসক্তি, চোখ সর্বদাই মদে ঢুলুঢুলু। তবু নিজের আনন্দময় মেজাজ নিয়ে সকলের কাছে খুব প্রিয়। রগচটা, কিছুটা পাগলাটে ধরনেরও বটে। কোনও অন্যায় দেখলেই তখনই তিনি হুলুস্থুল বাধান। মহাভারতে এসবের অনেক কাহিনী আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও তাঁর সদানন্দময়, সরল শিশুস্বভাবটি বেশ ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মত্ততার ভাব (ভক্তের ভাষায় প্রেমোন্মত্ততা), উচ্চারণে তোতলামি, নিজের ছায়াকে হাতের পাঁচনি দিয়ে বেদম প্রহার, অকারণে লম্ফঝম্ফ—এইসব নিয়ে বৈষ্ণবকবিরা প্রাণোচ্ছল নর্মকৌতুকময় সরলমূর্তি শিশুর সুন্দর ছবি এঁকেছেন। বলরামের শুভ্রদশনপঙ্‌ক্তির সৌন্দর্যেও তাঁরা কম বিভোর হননি। বল্লবীদাস লিখেছেন :

"বদন শারদচন্দ্র দশন কুমুদকুন্দ
সদানন্দ মন্দ মন্দ হাসে।"

শশিশেখরের রচনা .

"দশনে দাপি অধরে খর
নয়নশরে তাড়ই.....
বাহুমূলে তাল ধরি গাজে।
দম্ফ করি লম্ফ দেই
ঝম্ফ মহীমণ্ডলে
নীলধটি আঁটি সমরে সাজে।।"

বোড়োগ্রামের বলরামেরও দশনদংশিত অধর। বিশেষজ্ঞদের কালবিচারে এ-মূর্তি আনুমানিক চতুর্দশ শতকেব বলে নিরূপিত হয়েছে যদিও এর ওপর দিয়ে কালপ্রবাহে অনেক পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। তবুও এর সেই আদিপর্বের নির্মাণকলায় বৈষ্ণবকবিদের প্রভাব পড়ার কথা নয়। মনে হয়, দশনদংশিত এই অধর অনেক পরবর্তীকালের শিল্পীর অঙ্গরাগের তুলিতে বেরিয়েছে।

বলরামের মূর্তিব শীর্ষদেশে চিত্রিত কাষ্ঠফলকের ওপরে বামদিকে সংযোজিত আছে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বিভুজ নারীমূর্তি—তাঁরও মাথায় তেবটি নাগফণার ছত্র। নারীর দক্ষিণ কর একটি শিশুর মাথার ওপরে ন্যস্ত। মূর্তিটিও কাঠের তৈরি। এটি কার মূর্তি তা কেউ বলতে পারে না। এই মূর্তিটি ছাড়া কাষ্ঠফলকে আর কোনও মূর্তি নেই, কেবল ছবিই আঁকা—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, হনুমান, গরুড়, রামরাজা, রাধাকৃষ্ণ, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদির ছবি। মনে হয়, আগে উল্লিখিত ক্ষুদ্রাকৃতি নারী মূর্তির মত আরও নানারকম মূর্তি এই কাষ্ঠফলকের ওপরে সংযোজিত ছিল। কালক্রমে সেগুলো অবলুপ্ত হয়েছে, তাদের বদলে এইসব ছবি এসে জুড়ে বসেছে।

লোকেশ্বর-বিষ্ণু

নাগছত্রের তলায় এই বহুভুজ বিশাল বিচিত্র কাষ্ঠ-নির্মিত মূর্তির অনুরূপ মূর্তি বাংলাদেশে আর মেলে না। কিন্তু ঠিক এরকম না হলেও বাংলাদেশের নানাস্থান, বিশেষত বর্ধমান জেলারই বিভিন্ন গ্রাম থেকে এই জাতীয় অনেক মূর্তি—পাথরে ও ব্রোঞ্জে তৈরি পাওয়া গেছে। রাখালদাস ব্যানার্জীর 'ইস্টার্ন ইন্ডিযান স্কুল অফ মিডিয়াভ্যাল স্কাল্পচার্স'-এ তাদের বিশদ বর্ণনা আছে। তিনি এই মূর্তিগুলিকে বৌদ্ধ মহাযানী দেবতা 'লোকেশ্বর' আর ব্রাহ্মণ্যদেবতা 'বিষ্ণুর' সংমিশ্রণে সমন্বিত রচিত 'লোকেশ্বর বিষ্ণু' নামে আখ্যাত করেছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মসমন্বয়ের অনেক চিহ্ন বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্তরে স্তরে আঁকা আছে। বোড়োগ্রামের বলরাম—অনন্তবাসুদেবও ঐরকম ধর্মসমন্বয়ের এক বেশ প্রাচীন চিহ্ন একথা বলা যেতে পারে।

চক্ষুদান গাজন

বোশেখ মাসের নিশুতি রাত। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ, জ্যোৎস্নায় দিগ্‌দিগন্ত ঝলমল। মাঠের আলপথ ধরে বোড়োগ্রামের দিকে এগোচ্ছি। দূরদিগন্তে গাছপালার কালো রেখা বোড়োগ্রামের নিশানা। আজকের রাতে ওর আর একটা নিশানা—গাছপালার কালো রেখার মাথা থেকে ওঠা আলোর ছটা, আর দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কোলাহল। বোড়োগ্রামে আজ রাত্তিরে বলরাম ঠাকুরের চক্ষুদান গাজন, সেই উপলক্ষে মেলা বসেছে। দোকানপাটে জ্বলছে ডে লাইট, হ্যাজাক, লণ্ঠন। ভিড়ে ভিড়াক্কার, হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দ। মেলার আলোর ছটা আর জনতার কোলাহলই আজ রাত্তিরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে উৎসবমুখর বোড়োগ্রামের সুনিশ্চিত নিশানা।

বর্ধমান জেলার বোড়োগ্রামের বলরাম ঠাকুরের বিচিত্র মন্দির আর বিগ্রহের কিছু বিবরণ আগেকার প্রবন্ধে দিয়েছি। নৃসিংহ-চতুর্দশীর রাতে ঠাকুরের যে চক্ষুদান গাজন হয়, এবার সেই বিচিত্র উৎসবটির কথা বলি।

সেদিন রাত্তিরে মাঠ ভেঙে আমরা যখন বোড়োগ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম, তখনও অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়নি। পূর্ণিমা তিথি পড়বার পূর্ব মুহূর্তে চতুর্দশীর ভেতরেই উৎসবটি করণীয়। পূর্ণিমা পড়তে তখন অনেক দেরি ছিল, তাই অনুষ্ঠান শুরু হতেও দেরি হচ্ছিল। কিন্তু ভিড় ইতিমধ্যে বেশ জমে গেছে। মেলার দোকানপাটে তো লোকজন গিস্‌গিস্ করছেই। মন্দিরে ওঠবার উঁচু চওড়া সিঁড়ির ধাপে ধাপে আর মন্দিরের সামনেকার উঠোনটিতেও মেয়ে-পুরুষ, কচি-কাঁচার খুব ভিড়। মেলাতে কত আলো, কিন্তু ঐ উঠোনটিতে একটিও আলো জ্বলছে না, জ্বলবার দরকারও নেই। মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশে চাঁদের ডে-লাইট পূর্ণ মহিমায় জ্বলছে। তাতে বিশাল মন্দির, বিশাল প্রাঙ্গণ উজ্জ্বল, অপূর্ব রূপময় হয়ে উঠেছে।

নির্দিষ্ট ক্ষণ এগিয়ে আসতেই সন্ন্যাসীরা স্নান সেরে এলেন পাশের গ্রাম দক্ষিণকূলের বাসদেব পুকুর থেকে। তালপুকুর নাম আছে, কিন্তু ঘটি ডোবে না। এও ঠিক সেই রকম। এই পুকুর থেকেই নাকি বলরাম ঠাকুরের এই অনন্ত-বাসুদেব মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, এক সন্ন্যাসীর কাছে। সেই থেকে পুকুরের নাম হয়েছে বাসুদেব পুকুর, লোকমুখে বাসদেব পুকুর। এত বড় যখন ঘটনা, তখন পুকুরের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই খুব বড়। কিন্তু পুকুর এখন শুকনো খটখটে, বুজে এসেছে। এরই তলায় কোনরকমে গর্ত করে একটু জল বার করে সন্ন্যাসীরা গাজনের স্নানকৃত্য সারেন।

'বীর বলাই'

সন্ন্যাসীরা স্নান করে এলেন সশব্দে—অর্থাৎ ঢাকঢোল বাজিয়ে। দু-ফাঁক গেল জনতা। তাদের মাঝখান দিয়ে সন্ন্যাসীরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। মূল সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে অন্য সন্ন্যাসীরা। হাত-দুটিকে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে যুক্ত করে তর্জনী দুটির দ্বারা খুব দ্রুতগতিতে কপাল স্পর্শ করে, আর 'বীর বলাই' 'বীর বলাই'—এই ধ্বনি দিতে দিতে তাঁরা এগিয়ে আসছেন। জনতার মধ্য থেকে উচ্চকণ্ঠে ঘন ঘন নিনাদিত হচ্ছে : "বল অনন্ত-বাসুদেব।" শিবের গাজনে শিবঠাকুরের, ধর্মের গাজনে ধর্মঠাকুরের গাজনের নামডাকা।

অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন বলরামের স্নানের পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তিন দিনের জন্যে। তখন সূত্রধর শিল্পী ছাড়া আর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি রুদ্ধদ্বার মন্দিরে বাঁশের উঁচু ভারার ওপর ঠাকুরের অঙ্গরাগ সম্পন্ন করেন। তিন দিন পর সপ্তমীতে মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

কিন্তু নৃসিংহ-চতুর্দশীতে ঠাকুরের চক্ষুদান অনুষ্ঠানের আগে মন্দিরে আর সেবা-পুজো হয় না, বাড়ির ভেতরেই সে অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বলরাম ঠাকুরের অঙ্গরাগের অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরীর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর রুদ্ধদ্বার কক্ষে অঙ্গরাগের বেশ মিল আছে।

এবার চক্ষুদান অনুষ্ঠানের কথা বলি। সেদিন রাত্রে সন্ন্যাসীরা স্নান করে মন্দিরে যখন ঢুকলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিও ঢুকলেন। ব্রাহ্মণ-সেবাইতরা তো আছেনই। বাঁশের ভারার ওপরে উঠে দাঁড়ালেন সূত্রধর হাতে তুলি নিয়ে, আর ব্রাহ্মণ-সেবাইত একজন,—হাতে একটি প্রদীপ আর চোখ আঁকবার কালিভর্তি শরা নিয়ে।

গ্রামের ষোল আনা হাজির

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই স্কুল-কলেজের মত রোল-কলের কিংবা আদালতে পেয়াদাদের মতো হাঁক দিয়ে নাম ডাকার পালা। অঙ্গরাগশিল্পীরই ওপরে এ-কাজ ন্যস্ত। তিনি ভারার ওপরে বসে গ্রামের ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কয়েকজনের নাম ধরে হাঁক পাড়তে লাগলেন : "অমুক হাজির?" উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরাও জবাব দিতে লাগলেন : "হাজির"। সবশেষে শিল্পী হাঁক পাড়লেন : "গ্রামের ষোল আনা হাজির?" প্রত্যুত্তরে এল : "সবাই হাজির।"

যাঁদের এইভাবে নাম ধরে ডাকা হল, তাঁরা বলরামের এই বার্ষিক উৎসবে কিংবা বারমেসে সেবা-পূজায় কোনও না কোনও কাজের ভার নিয়ে থাকেন। যেমন কারও কাজ—বলরামের হাতে ঝোলানো শোলার তৈরি প্রকাণ্ড মালা জোগানো, কারও কাজ কীর্তনের ব্যবস্থা করা, কারও বা নানা রকম উদ্যোগ-আয়োজন করা। ঐ-সমস্ত কাজ যে খুব কঠিন, কিংবা বিশেষ বিশেষ লোকেরই পক্ষে করা সম্ভব, এমন নয়। কিন্তু তবু নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ লোকই সে-সমস্ত কাজ করে থাকেন—কারও হুকুমে নয়, নিজেদেরই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টায়। এটি বংশপরম্পরাক্রমে চলে আসছে। প্রাচীন গোষ্ঠী-জীবনেরই পরিচয় এটি। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমশ হারিয়ে গেলেও, গ্রাম্যদেবতাদের কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত উৎসবে-অনুষ্ঠানে এই সম্মিলিত প্রয়াস এখনও অনেকখানি টিকে আছে। গ্রাম্যদেবতাটি ব্যক্তিগত কিংবা পরিবারগত মালিকানায় থাকলেও গ্রামের পাঁচজনের সম্মিলিত উদ্যোগ আয়োজনের দরকার, নতুবা উৎসবাদির সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব নয়। যেখানে পাঁচজনের হাত যুক্ত হয়নি, সেখানে বুঝতে হবে দেবতাটি পরিবার কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানাকে ডিঙিয়ে গ্রামের সর্বসাধারণের জিনিস বলে পরিগণিত হননি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত অনেক দিনের পুরনো গ্রামদৈবত বিরাট মাহাত্ম্য নিয়ে আজও জাঁকিয়ে বসে আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই সম্পর্কে এই সত্যটি প্রযোজ্য। ক্ষীরগাঁয়ে যোগাদ্যার মন্দিরে দেখেছি, প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের উঠোনে একজন হাতে সুপুরি নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধরে ডাকেন। একে বলে গুয়া-ডাক। যাঁদের নাম ধরে ডাকা হয়, তাঁদের নামধাম এখন বিস্মৃত কিংবা কিংবদন্তীর আশ্রয়ে কোনও রকমে বেঁচে আছে। এই পুরনো রেওয়াজের অনুবর্তনটি মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। এটি প্রাচীন যৌথ, গোষ্ঠীভুক্ত সমাজের সম্মিলিত জীবনযাত্রা, ধ্যান ধারণা অনুসরণের দিকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। বোড়োগ্রামে অঙ্গরাগশিল্পীর "গ্রামের ষোল আনা হাজির আছ?" বলে হাঁক পাড়াতেও ঐ একই ব্যাপারের ইঙ্গিত রয়েছে।

চোখ আঁকার অভিনয়

সকলের নামডাকার পালা শেষ হলে অঙ্গরাগশিল্পী ঠাকুরের চক্ষুদানের অনুষ্ঠান শুরু করলেন।

ভারার ওপরে দাঁড়ানো ব্রাহ্মণ মূর্তির মুখের সামনে তুলে ধরলেন প্রদীপ। ব্রাহ্মণের আর এক হাতে ধরা কালির শরাতে তুলি ডুবিয়ে শিল্পী প্রথমে সেটি স্পর্শ করলেন বলরামের তৃতীয় নয়নটিতে, তারপর আর দুটি নয়নে। এটি যেন চোখ আঁকার অভিনয়। চোখ আঁকার আসল কাজ কয়েক দিন আগেই তো শেষ হয়ে গেছে। তবু আজ এই অনুষ্ঠানটি করণীয়। এরই নাম চক্ষুদান। আর এই উপলক্ষেই আজ নৃসিংহ-চতুর্দশীতে সন্ন্যাসীদের গাজনের ধুম। চক্ষুদানের সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকে বাজতে লাগল এক বিশেষ বোল আর সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে হুঙ্কার দিতে লাগলেন "বীর বলাই" "বীর বলাই"। অন্যান্যরা ধ্বনি দিতে লাগলেন সমস্বরে চিৎকারে : "বল অনন্ত-বাসুদেব"। মন্দিরের গর্ভগৃহ সেই সম্মিলিত ধ্বনিতে গম্‌গম্ করছে। বাইরে প্রাঙ্গণেও বিশাল জনতার কণ্ঠে সেই ধ্বনি নিশীথ রাত্রির নীরবতা বিদীর্ণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর হৈ হট্টগোল, মন্দিরে ঢোকবার জন্যে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি, বাবার মুখচন্দ্র দর্শনের জন্যে।

চোখ আঁকার পর্ব শেষ হওয়া মাত্র অঙ্গরাগশিল্পী গর্ভমন্দিরে আর একটুও রইলেন না। ভারা থেকে নেমে মন্দিরের দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরে ছুটে বেরিয়ে এলেন মন্দিরের সামনে। কে যেন তাঁর পিছনে ধাওয়া করছে—এমন যেন তাঁর ভাবখানা। তিনি মন্দিরের সামনে এসেই তুলসীমঞ্চের কাছে বসে হরিনাম জপ করতে শুরু করলেন। এরকম করবার কারণ কী জিজ্ঞাসা করাতে শিল্পী উত্তর দিলেন : "বাবার চক্ষু দেওয়া কি সহজ কথা! কোথাও ভুলচুক হলে আর রক্ষে আছে!" বলেই তিনি দুহাত কপালে তুলে ঠেকালেন, আর আরও জোরে জোরে হরিনাম করতে লাগলেন।

চক্ষুদানের পর মন্দিরের ভেতরে বাঁশের ভারা খুলে নিয়ে ঘর ধোওয়া-মোছা করা হল। তারপর ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা ঠাকুরের অভিষেক, পুজো, ভোগরাগ, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠান শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার করেই আনলেন। গাজনের সন্ন্যাসীরা বলরামের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে হোমের ফোঁটা নিয়ে সে-রাত্রির মত ছুটি পেলেন।

পাটভাঙা

তার পরের দিন সকালে সন্ন্যাসীদের দণ্ডী খাটা, প্রদক্ষিণ, পাটভাঙার অনুষ্ঠান। মন্দিরের বাইরে একটি একতলা ঘরের ছাদ থেকে সন্ন্যাসীরা নিচে ঝাঁপ খান। নিচে কয়েকজন খড়পোরা বস্তা ধরে তার ওপরে তাঁদের লুফে নেন। এই ঝাঁপ খাওয়া চলতে থাকে অনেকক্ষণ। মাটিতে পড়েই সন্ন্যাসীরা আবার ছাদে উঠে পড়েন। ছাদে ঘড়া জল নিয়ে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসীদের গায়ে সেই জল ঢেলে দেন—যাতে তাঁরা ক্লান্ত না হয়ে পড়েন। নিচে ঝাঁপ খেয়ে পড়ার আগে সন্ন্যাসীরা মন্দিরের ভেতরে বলরাম ঠাকুরকে যাতে দেখতে পান, তার জন্যে বিশাল জনতা দুফাঁক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ন্যাসীরা ছাদে উঠে জোড় হাত করে বলরামের মুখ দর্শন করে ফুল আর আম ছুঁড়ে দেন বলরামের উদ্দেশ্যে, তারপর সকলের "বল অনন্তবাসুদেব" ধ্বনির মধ্যে নিচে ঝাঁপ দেন। যে দূর থেকে তাঁরা ফুলফল বলরামের উদ্দেশ্যে ছোঁড়েন, তাতে সেগুলোর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছবার কথা নয়, বরং জনতার মুখে চোখে লাগারই ভয় বেশি। আমার সামনে এক অঘটন ঘটল। একটি মহিলা এক আমের ধাক্কায় বেশ ঘায়েল হলেন। তাঁর নাক ফেটে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল। কিন্তু সন্ন্যাসীদের ছোঁড়া ফুলফল নাকি কুড়িয়ে পাওয়া মহা সৌভাগ্যের কথা। কারণ অপুত্রকের পুত্রলাভ, নির্ধনের ধন ইত্যাদি সর্ববিধ মনস্কামনা পূরণ হয়, এ ঘরে রাখলে। তাই এগুলি সংগ্রহের জন্যে লোকে কম হুড়োহুড়ি করে না।

এবারকার গাজনে দুজন গোপ, দুজন ব্যগ্রক্ষত্রিয় এবং একজন হাড়ি সম্প্রদায়ের লোক সন্ন্যাসী

হয়েছিলেন। সাধারণত এই সমস্ত সম্প্রদায়েরই লোক এখানকার গাজনের সন্ন্যাসী হন। তবে মূল সন্ন্যাসী বরাবরই কায়স্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় থেকেই নির্বাচিত হন। এবারও ঐ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়নি।

শিব বা ধর্মঠাকুরের গাজনের মত বলরামের এই গাজনেও সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন নির্দিষ্ট দিনে কামান, স্নান, নিরামিষ ও হবিষ্যি আহার, উপবাস, কুশবাঁধা উত্তরীয় ও বেত্রগ্রহণ, ঢাকের তালে তালে নাচ, দণ্ডী খাটা, পাটভাঙা ইত্যাদি বিধিনিয়ম মেনে চলতে হয়।

শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন রাত্রে সন্ন্যাসীরা মন্দিরের চাতালের সামনে বসে উত্তরীয় গ্রহণ করেন। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরা এসে এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তাঁরা যত রাজ্যের খ্যাত-অখ্যাত শিব, ধর্মঠাকুর আর বর্ধমান জেলার গ্রামদেবতদের নামে ফুল দিয়ে শেষে বলরামের পুজো করান সন্ন্যাসীদের, আর "আত্মগোত্রং পরিত্যজ্য বলরামস্য গোত্রং প্রবিশয়" বলে তাঁদের গাজন সন্ন্যাসীদের চিহ্ন উত্তরীয় দেন। এর পর থেকে সন্ন্যাসীরা প্রতিদিন ঢাকের তালে তালে নাচেন, পূর্বকথিত বাসদেব পুকুরে স্নান করেন আর গ্রামের ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দিরে দিয়ে সেখানকার বাগ্রক্ষত্রিয়ভুক্ত সেবাইতদের হাত থেকে একটি ঘটি করে জল নেন। বিশেষ করে লক্ষণীয় বোড়োগ্রামে ধর্মঠাকুর থাকা সত্ত্বেও, তাঁর গাজন হয় না, গাজন হয় বলরাম ঠাকুরেরই। আর এই বলরাম ঠাকুর বিষ্ণুবিগ্রহ, অনন্তবাসুদেব রূপে পূজিত। রাঢ়দেশ গাজনের দেশ। গাজনই এখানকার প্রিয় লোকোৎসব। ধর্মঠাকুর কিংবা শিব ঠাকুরকে নিয়েই সে উৎসব সর্বত্র চলে, বিষ্ণুবিগ্রহকে নিয়ে নয়। বোড়োগ্রামের বলরামকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গাজনের অনুষ্ঠান আশ্চর্য ব্যাপার। এই ঠাকুর আদিতে শিব কিংবা বৌদ্ধ মহাযানী দেবতা ছিলেন, পরবর্তীকালে বিষ্ণুরই আর এক অবতাররূপে স্বীকৃত শুভ্ররূপ বলরামে রূপান্তরিত হয়েছেন—এই ধারণা আরও দৃঢ় হচ্ছে, এই বিচিত্র গাজনের উৎসব দেখে।

নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলায়

ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্ ডিগ্...। নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলায় বেদের হাতে বিষম ঢাকি বাজছে একটানা। জগৎগৌরী-মায়ের আষাঢ়পঞ্চমীর ঝাঁপান। মন্দির থেকে দেবীকে এই সবেমাত্র ঝাঁপানতলায় নিয়ে আসা হল, চতুর্দোলায় চড়িয়ে, চতুর্দোলাশুদ্ধু নাচতে নাচতে। সঙ্গে ঢোল, কাড়া, ডগর, কাঁসির বাজনা। আজ মায়ের ওপরে সবার অধিকার। বামুন, বাউরি, সদ্‌গোপ, তিলি, কায়স্থ, কোঁড়া—সবাই মায়ের চতুর্দোলা বইবে, চতুর্দোলাশুদ্ধু নাচবে তালে তালে। মন্দির থেকে ঝাঁপানতলা মাত্র মিনিট দশেকের পথ। কিন্তু নাচতে নাচতে আসতে দেড়-ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল।

আষাঢ়পঞ্চমীতে দেবী সারাদিন ঝাঁপানতলার মন্দিরে কাটান। তখন ঐ মন্দিরে ঢোকাই দায়। দূরদূরান্তর থেকে আসা মানুষদের পুজো আর প্রণামী পড়ে মন্দিরের ভেতরে আর ঝাঁপানতলার চারপাশে চলে পাঁঠা, ভেড়ার বলি—সংখ্যায় প্রায় কয়েক হাজার। আগে আগে মোষ বলিও হয়েছে। এখন অবশ্য তা বন্ধ হয়ে গেছে। কোঁড়াদের শুয়োর বলিও চলে। এসব কাণ্ড চলবার পর অনেক রাত্তিরে দেবীকে আবার চতুর্দোলাশুদ্ধু নাচাতে নাচাতে নিজের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঝাঁপানতলার চারধারে মেলা বসে গেছে। দিন তিনেক থাকবে। সার্কাস, ম্যাজিক, দোকানপাট। কত দূর দূর অঞ্চল থেকে দোকানিরা এসেছে। ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর-কালনা গ্রাম থেকে মুসলমান জেলেরা এনেছে মাছ ধরার জন্যে ঘাটজাল, খেপলাজাল, ছাঁকনিজাল। মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছে মাদুর, পাটি, বেতের পেতে, ধামা, তালপাতার টোকা, পেকে। গাছপালার চারা আর আম কাঁঠালের স্তূপ তো আছেই; তাছাড়া আছে মনিহারী দোকান, ছিপ, বঁড়শি, কাঁটার পশরা।

চারধারে লোকে লোকারণ্য। এর ভেতরে আবার লাঠিখেলাও আছে। বাগদি, বাউরি, কোঁড়া, সাঁওতাল আসছে দলে দলে এক হাঁটু জলকাদা ভেঙে, মোটা মোটা বাঁশের মজবুত লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে আর ধাম্‌সা বাজাতে বাজাতে। কাড়া, ডগর, কাঁসির বাজনার সঙ্গে নাচ চলছে অবিরাম। চোখ তাদের রক্তবর্ণ, পদক্ষেপ অনিশ্চিত—আকণ্ঠ মদিরাপানের পরিণতি।

ঝাঁপান শব্দের অর্থ

ঝাঁপান শব্দের অর্থ ডুলি, বহনমঞ্চ। দেবীকে ডুলিতে বা চতুর্দোলায় চড়িয়ে ইতস্তত ঘোরানো হয় বলে উৎসবটির নাম হয়েছে ঝাঁপান-উৎসব। সাধারণত মনসাদেবীরই ঝাঁপান উৎসব হয়। তবে বর্ধমান জেলার কোথাও কোথাও শীতলা দেবীরও ঝাঁপান হয়। মনসার ঝাঁপান উৎসবে সাপের ওঝা, গুণিন, বিষবেদেরা এসে সাপের খেলা, সাপের বিষের মন্ত্র-তন্ত্র, জড়ি-বুটির কেরামতি দেখায়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে দারুণ। বাঁশের উঁচু মাচার ওপরে দাঁড়িয়ে দু-পক্ষ সাপ আর মন্ত্রতন্ত্রের লড়াই-এ মাতে। এরও নাম ঝাঁপান। কিন্তু অনুষ্ঠানটির ঝাঁপান নাম এসেছে ঐ ডুলি থেকেই। ওঝা, গুণিন, বেদে সর্দার বা সাকরেদদের কাঁধে ডুলিতে চেপে সর্বাঙ্গে সাপ জড়িয়ে ঝাঁপানতলায় আসত আগে। তাদের মাচায় উঠে কেরামতি দেখানোর নামও হয়েছে তাই ঝাঁপান। রাঢ়বাংলার এটি একটি পুরনো লোকোৎসব। বিপ্রদাস প্রভৃতি প্রাচীন মনসামঙ্গল রচয়িতাদের রচনায় 'ঝাঁপানিয়া ওঝা'দের ডুলিতে চেপে মহোৎসবে আসার বেশ বর্ণনা আছে। কিছুদিন আগে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ঐরকম ভাবে ওঝাদের আসতে দেখা যেত। এখন অবশ্য সে সমস্ত কমে গেছে। সাপের কামড়ের ওষুধ বেরিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে হেলথ সেন্টারের কিছু কিছু সুবিধেও মিলছে। সুতরাং ঝাঁপানিয়া ওঝাদের ওপরও মানুষের ভয়ভক্তি ক্রমশ কমে তো আসবেই। নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলাতেও অনেক আগে 'ঝাঁপানিয়া ওঝাদের' মেলা হত। এখন তারা বিশেষ কেউ আসে না। আসে কিছু সাপ-খেলানো বেদে।

নারকেলডাঙ্গার ঝাপানতলার বেদেদের কথা বলি।

ঝাঁপানতলায় মন্দির থেকে অনেক দূরে উঁচু পগারটার সামনে বেদে বসেছে। বিষম ঢাকি বাজিয়ে মনসার গান গেয়ে সাপ খেলানো শুরু করে দিয়েছে। দেখতে দেখতে তার চারপাশে ঘিরে তৈরি হয়ে গেছে মানুষের কালো কালো মাথায় প্রকাণ্ড একটা গোলাকার বেড়া।

নারকেলডাঙ্গার প্রাচীন কিংবদন্তী

এই ঝাঁপানতলার প্রাচীন ইতিহাস লোকের মুখে মুখে ফেরে। ইতিহাস নয় কিংবদন্তী। মরা পতি লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা কলার ভেলায় ভেসে গাঙ্গুড়ী নদী দিয়ে যাচ্ছিল। নারকেলডাঙ্গার এই ঝাঁপানতলার ঘাটে ভেলা ভিড়িয়ে বেহুলা জগৎগৌরী-মায়ের পুজো করে, মরা পতির প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। মা বলেছিলেন বেহুলাকে ত্রিবেণীতে নেতা ধোপানির ঘাটে যেতে, সেখানে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আজ যেখানে, ঝাঁপানতলায় জগৎগৌরী-মা এসে উঠেছেন, ঐখানেই মায়ের নিত্য অবস্থিতি, ঐখানেই মায়ের পুজো করেছিল বেহুলা! সুতরাং এ সাক্ষাৎ মায়ের থান। এর মাহাত্ম্য মুখে বর্ণনা করা যায় না—ভক্তদের এমন ধারণা।

ঝাঁপানতলায় সিঁদুরের কৌটো দেওয়া দুটো হাঁড়ি থেকে দুটো সাপ বের করেছে বেদে। একটা লালচে রঙের আর একটা কালো রঙের, তার মাথা থেকে লেজ অবধি প্রকৃতির হাতের সাদা রঙের কারুকর্ম, ফণায় গোখরো সাপের চিহ্ন। শুনলুম লাল সাপটার নাম গেঁড়িভাঙা কেউটে, কালোটার নাম তেঁতুলে গোখরো।

বেদের বয়স খুব অল্প—বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। জাতিতে মাল। সাপধরা, সাপের বিষ ঝাড়ায় নাকি এদের জাতিগত নৈপুণ্য। তবে বিলে, ঝিলে, জঙ্গলে থাকা বুনো বিষবেদেদের মত এর চেহারা নয়, আর সাজপোশাকও তো নয়ই। বুনো বিষবেদেদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের ওপরে বাঁধা থাকে লাল রঙের ফেটি, কানে মাকড়ি, হাতে লোহার বালা, শেকড়-বাকড় জড়ি-বুটির তাগা, গলায় পুঁতির মালা। পরনের কাপড়ের দিক থেকে তাদের প্রায় উলঙ্গ বললেই চলে। ঝাঁপানে যখন সাপ খেলা তারা দেখায় তখন তাদের হুঙ্কার আর বকুনিরই বা কী তোড়!

এই বেদেটিকে কিন্তু বেশ শান্তশিষ্ট গো-বেচারা ধরনের দেখতে। ধুতি শার্ট পরনে। নাম কান্ত মাল, হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানায় বাড়ি। চাষবাস করে আবার সাপধরা, সাপের বিষ কামানো এসব কাজও আছে। কান্ত মালের বোধ হয় ওঝা গুণিনের গুণপনার পুঁজিপাটাও তেমন নেই। ঝাঁপান খেলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসা সাপের সামনে শুধু হাঁটু দুলিয়ে, হাতের সরা ঘুরিয়ে, লাঠি নাচিয়ে বিষমঢাকি বাজিয়েই সে তার সব কেরামতি দেখাল। আর অস্পষ্ট অবোধ্য মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে সে শোনাল মনসার গান, বেহুলার বাসরঘরেই কালরজনীর কাহিনী। এখানে তাদের নিজেদেরই রচনা পয়ারছন্দে, মুখে মুখে গান বাঁধার ধরনে। নিরক্ষর এরা, এদের হাতে লেখা পুঁথি কিংবা ছাপা বই নেই। বাপঠাকুর্দার কাছে শেখা ছড়া। সরল, সাদামাটা কথায়, নিজেদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চারণের ভঙ্গিতে একটানা গান গেয়ে গেল :

> মা-মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগর।
> সাঁতালী পর্বতে তোলে নোহার বাসরঘর।।
> সোনার নখিন্দর বর বেউলা সোনার কনে।
> দারুণ মনসার কোপে এড়াবে কেমনে।
> তবুও না ডরে চাঁদ হেঁতাল বাড়ি হাতে।
> বিশাল্যকরণী বোঁজি ময়ূর নিয়ে সাথে।।
> আর নোহার বাসরঘরের সামনে দাঁড়াইয়ে রয়।
> চোখ ঘুরিয়ে সাবধানে ইদিক উদিক চায়।।

বিষম বিধির লেখা কেমনে খণ্ডাবে।
বিষহরীর সঙ্গে বাদে কে ভবে বাঁচিবে।।

ঝাঁপানতলায় উঁচু পগারের ধারে প্রকাণ্ড অশথ আর ঘোড়ানিমের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া ডালপালার নিচে আলো-আঁধারি ছায়ায় কেমন যেন রহস্যময় ভাব। চারপাশে বাবলা, আসশেওড়া, ঘেঁটুর ঝোপজঙ্গলের বেড়। সামনে বেহুলা নদীর মরা খাত। বেহুলার কলার ভেলায় মরা পতিকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার প্রাচীন কিংবদন্তীর সূত্রে নদীও বেহুলার নাম নিয়েছে। এই বেহুলা নদীর খাতের পাশে এই গানের আসর। মাথার ওপরে আষাঢ়মেঘের বিশাল কালো সামিয়ানা টাঙানো। দূরে জগৎগৌরীর ঝাঁপানতলার ভাঙা মন্দির—মায়ের ভক্তদের ভাষায় মায়ের আদি মন্দির, যেখানে মা মনসা বেহুলার পুজোয় তুষ্ট হয়ে তার অভীষ্টপূরণের পথ বলে দিয়েছিলেন। এসব মিলিয়ে একটি বহুশ্রুত প্রাচীন কিংবদন্তী বেদের হাতের বিষমঢাকির তালে তালে আর তার গলার সুরে যেন সত্যিকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। না হলে অসংখ্যবার শোনা একই কাহিনী এমন নিবিষ্টভাবে এরা শুনছে কেন?

তেঁতুলে গোখরো ফণা তুলে মাথা নেড়েই যাচ্ছে আর বেদেও বিষমঢাকির তালে তালে সুর করে গেয়ে যাচ্ছে পয়ার ছন্দে :

দারুণ বিয়ের রাতি দারুণ জননী।
চারিধারে মায়া পেতে দিলেন আপনি।।
তবে সূর্য ডোবে চাঁদ ডোবে ডোবে গগন তারা।
ঝৈ-ঝংকার আকাশ ফাটে পড়ে জলের ধারা।।
বেঁজি পালায় ময়ূর পালায় পালায় দ্বারের দ্বারী।
তখন নাগের সিংহাসনে বসে হাসেন বিষহরী।।

আষাঢ়ের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ ফেটেও তখন ঝাঁপানতলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুষলধারায়। পালা পালা রব চারধারে। বেদের আসর ভেঙে গেল। চারধারে জলের স্রোত। কাদায় মাখামাখি। গাছতলায় গিয়ে লোক দাঁড়িয়েছে—সেখানেও রক্ষে নেই। জলে সবাই ভিজে ঢোল।

শুধু কান্ত মাল নয়, এমন আরও কয়েকটি বেদে সেদিন নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানে মনসার গান শুনিয়েছে।

আষাঢ়ের বৃষ্টিতেই নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপান মেলা চিরদিন হয়ে আসছে। এতবড় ঝাঁপান মেলা এ-তল্লাটে আর একটাও নেই। বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মধ্যে নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানই সবচেয়ে বড় ঝাঁপান। হুগলি জেলার বৈঁচি স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে নারকেলডাঙ্গা। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া আর বলাগড় থানা, বর্ধমান জেলার মেমারি, জামালপুর, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী আর কালনা থানার মোট প্রায় শ-দুয়েক গ্রাম থেকে লোক আসে নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানমেলায়। মাইলের পর মাইল এক হাঁটু জলকাদা ভেঙে লোক তো আসেই বলির পাঁঠা আর পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে, লরিতেও ঐ সব জিনিস বোঝাই করে অনেক লোক আসে।

আষাঢ়পঞ্চমীতে সকালবেলায় তারা জগৎগৌরীর মন্দিরে এক প্রস্থ বলি দিয়েছে। প্রায় শ-খানেক বলি মন্দিরেই পড়ল। রক্তে মন্দিরের উঠোন ভেসে গেল। তারপর দেবী ঝাঁপানতলায় এসেছেন। এখানে সারাদিন কয়েক হাজার বলি পড়েছে সমস্ত ঝাঁপানতলাটা জুড়ে। আষাঢ়পঞ্চমীর পরের দিন মন্দিরে আবার আর এক দফায় আরও কিছু বলি পড়বে, এর নাম 'পান্টা পূজা'। খালি বলি আর বলি। ব্যাপক রক্তপাতের সাহায্যে ধরণীর উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় পরিকল্পিত আদিম জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানের জের চলছে এইসব প্রাচীন গ্রামীণ লোকোৎসবে। বলির বীভৎসতায় মন বিরূপ হয় বটে, কিন্তু নাচ, গান, ছড়াবাঁধার 'সয়লা-উৎসব'ও এই গ্রামীণ অনুষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জগৎগৌরীর পাষাণমূর্তিটিও খুব পুরনো এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

সোনার পদ্ম জলে যায় ভেসে

সেদিন নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলায় কান্ত মালের সাপ খেলানোর আসর মাটি করে দিয়েছিল মুষলধারায় বৃষ্টি এসে।

কান্ত ছাড়া আরও দু একটা বেদে সেদিন আষাঢ়পঞ্চমীর ঝাঁপানমেলায় এসে আসর জমিয়েছিল, জামুরিয়ার বুড়ো ভোলা মাল তাদের মধ্যে একজন। বেহুলা নদীর শুকনো খাতের পাশে ডি-ভি-সি-র খালের ওধারের বুড়ো বটগাছটার তলায় ভোলা আস্তানা গেড়েছিল, ঝুলি-ঝোলা, সাপের ঝাঁপি নিয়ে।

গাছের গুঁড়ির কাছে মাটিতে নামা একটা মোটা ঝুরির সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে ভোলার হাঁড়ি-মালসাব সংসার। সামনে তার খোলা বয়েছে গোবরমাটি দিয়ে লেপানো চেঁচারির ঝাঁপি। একটা বেশ বড় সাইজের গোখরো সাপ—কালো রঙের গা, মাঝে মাঝে সাদার ছিট, কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা ধরে বসে আছে। এর নাম শুনলাম চন্দন-গোখরো।

ভোলার তালে তালে হাঁটু নাড়ানো, হাতের বিষমঢাকি ঘোরানো আর লাঠি নাচানোর সঙ্গে সঙ্গে সাপও সমানে হেলছে দুলছে। ওধারের কান্ত মালের মত বুড়ো ভোলাও মনসার গান জুড়ে দিয়েছে আর চারপাশে জড় হয়েছে ভিড়।

ভোলাব বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে মনে হল। তামাটে রঙের, রোগা, শুকনো চেহারা। মাথায় চুল খোঁচা খোঁচা, গোঁফদাড়ি বেশ সাদা হয়ে এসেছে। শিরাবেরোনো শীর্ণহাতে বিষমঢাকি বাজিয়ে ভোলা গান কবছে।

গান তো গান। হরদম গাঁজা খেয়ে গলার দফা রফা, চোখ ঘোলাটে। লাল। চেঁচাতে পারে না। গলাব শিবা ফুলে ওঠে কথা বলতে গেলে। তবুও বুড়ো ভোলা ভিড় জমাবার জন্যে সাপ খেলাতে খেলাতে গান গাইছে—নইলে ছেঁড়া গামছাখানা সামনে বিছিয়ে রাখাই সার হবে, একটাও পয়সা পড়বে না দর্শকদের কাছ থেকে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে বসা ফণাধরা চন্দন-গোখরো মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ ফোঁস করে উঠেই সামনে এক ছোবল মারলো জোরসে। বুড়ো বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপির ঢাকনাখানা ঢালের মতন নিজের সামনে ধরে আটকালো সেই সাক্ষাৎ যমকে। ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ করতে করতে ঢাকনাখানার ওপবে কয়েকবার নিষ্ফল ছোবল দেবার পর সাপটা নেতিয়ে পড়ল মাটিতে, ফণা গুটিয়ে। বুড়ো তার ফণায় হাতের টোক্কর মেরে মেরে আবার তাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা ধরিয়ে বসালো। চেরা জিভ দুটো মুহুর্মুহু বার করতে করতে সাপটা বিষমঢাকির তালে তালে মাথা দোলাতে লাগলো আবার।

নাঃ, ওধারের কান্ত মালের সাপের মত এটা বিষকামানো নির্জীব সাপ নয়, খুব তেজী। তারিফ করে দর্শকরা।

কথাটা বুড়ো বেদের কানে যায়। গর্ব হবারই কথা। গান থামিয়ে গাঁজা খাওয়া গলায় বলে : "ওস্তাদে মানা করে দিয়েছে, বাপ। বুলেছে—বেটা যদি আসল সাকরেদ, আসল বেদে হোবি, তবে সাক্ষাৎ মায়ের থানে যিখানে ঝাঁপান খেলা হবেন, সিখানে কখ্খনো ঝুটা বেদের মত কামানো লাগ লিয়ে যাবি না। আসল বেদে লাগের বিষকে ডরায় নাকি বাপ!"

পরমভক্তিতে ওস্তাদের নামে বুড়ো বেদে নিজের কানে একবার হাত ঠেকালো।

বেদেরা সকলেই আসরে নেমে নিজের দলের ছাড়া অন্য দলের বেদেকে ঝুটো বলে বাতিল

করে দেয়। এ ওদের আত্মবিজ্ঞাপনের চিরকেলে কসরত। ভোলা মালও সেই ঐতিহ্য অনুসরণে এক লম্বা বকুনি দিয়েছে দর্শকদের থ করে দিতে। কিন্তু সাপটা সত্যি সত্যিই আ কামানো, অর্থাৎ তার বিষদাঁত ভাঙা নয় কিনা, কে আর তা দেখতে গেছে।

বিষমঢাকি বাজাতে বাজাতে ভোলা গান ধরলো গাঁজাখোরের ভাঙা গলায়, গলার শিরা ফুলিয়ে।

উথাল পাথাল জল
গাঙ্গুড়ী কল্‌কল্‌
হাঙ্গর, ভাঙ্গড়, বোয়াল
সদা মারে ঘাই রে।
কলার ভেলায় বেউলো সতী
কোলে লিয়ে মরা পতি
ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভেস্‌সে চলে
প্রাণে ডর লাইরে।।

গাঙ্গুড়ী নদী বেয়ে কলার ভেলায় চড়ে সতী বেহুলা চলেছে মরা স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে বাঁচাবার আশায়। সেই দুর্গম যাত্রাপথে বেহুলার ভেলা এসে ঠেকেছিল বর্ধমান জেলার এই নারকেলডাঙ্গার ঘাটে—মা মনসা জগৎগৌরীর অধিষ্ঠানভূমিতে। সতীর করুণ প্রার্থনায় জগৎগৌরীর মন টলেছিল। বেহুলাকে বলেছিলেন দেবী ত্রিবেণীর ঘাটে বেয়ে যেতে, সেইখানেই তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

ভোলা সুর করে শুনিয়ে দিলে এই কাহিনী।

ভোলা গেয়ে চলেছে

আহাগো সোনার পদ্ম
জলে যায় ভেসে
মরি হায়রে।
কত ঘাট পার হল কত শত দেশে
মরি হায়রে।
তবে নারকেলডাঙ্গা হাসনহাটি
মহামায়ার ঠাঁই
মরি হায়রে।
বিষহরী জগৎগৌরী মায়ের গুণ গাই
মরি হায়রে।
মরা পতি কোলে লিয়ে
হেথায় আসে সতী
মরি হায়রে।
বলে আমি তোমার চরণদাসী
জীয়াও আমার পতি
মরি হায়রে।।

কতবার শোনা এ-কাহিনী, কতবার শোনা এ-গান। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে লোকমুখে এ ছড়ানো। মঙ্গলকাব্যে, পাঁচালিতে, ভাসানগানে। এ কতদিন ধরে আপন মহিমাতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

যে মননশীলতা, আধুনিক বুদ্ধির দীপ্তি, জীবনকে বিস্তীর্ণ পথে প্রসারিত করার চেষ্টা সমাজের উঁচু স্তরকে আজ নানা দিক থেকে বিচিত্র, বিপুলগতিময় করে তুলেছে, গ্রামের নিভৃত সমাজজীবনে গরিব, বঞ্চিত, নিপীড়িত এই সমস্ত তথাকথিত নিচুস্তরের মানুষদের মধ্যে সে চিন্তা, সে চেতনা আজও খুব ভাল করে এবং ব্যাপকভাবে এসে পৌঁছয়নি। প্রাচীন কল্পনা, জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন ভাবনাতেই আজও বিভোর হয়ে আছে তাদের প্রাণ। প্রাচীন কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রাচীন আচার-আচরণের মায়াজালে তারা সহজে আত্মসমর্পিত সেই জন্যে। সুতরাং নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলায় গাঁজাখোর বেদে বুড়োর ভাঙা গলায় বিকৃত উচ্চারণের গানেও জনতা যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আর গলাটা খারাপ হলেও, ভোলার গানের কথার বাঁধুনিরও কম আকর্ষণ ছিল না। ভোলা নিরক্ষর। পুঁথিপত্তরের ধার ধারে না। কিন্তু বাসরঘরেই বিধবা হওয়া একটি অভাগিনী মেয়ে মরা স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে অকূলে ভেসে যাচ্ছে—এই করুণ ব্যাপারটির বর্ণনায় বেদের সহজ সরল ভাষাও কেমন উত্তাল হয়ে ওঠে, তার নমুনা তার গানের উদ্ধৃত অংশটি। ভোলা মালরাই প্রকৃত লোককবি, তাদের গানই লোকচিত্তকে জয় করে সহজে।

নারকেলডাঙ্গার পুরনো ঐতিহ্য

বর্ধমান জেলার কালনা থানার এই নারকেলডাঙ্গা গ্রাম আর তার মনসাপুজোর ঐতিহ্য কিন্তু বেশ অনেককালের পুরনো। খ্রিস্টীয় সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি কেতকাদাস তাঁর মনসামঙ্গলে নারকেলডাঙ্গা গ্রামের মনসাপুজোর কথা লিখে গেছেন। তাঁর কাব্যে আছে—নরলোকে পুজো চাই বলে মনসা যখন শিবের কাছে বায়না ধরলেন, তখন শিব তাঁকে বর দিচ্ছেন :

নারিকেলডাঙ্গায় হব তোমার নিজ স্থান।
প্রত্যক্ষ ভাটির জল বহিব উজান।।

(কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত 'মনসা মঙ্গল' প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত)।

ঐ কারণেই বেহুলার কলার ভেলায় মরা লখিন্দরকে নিয়ে ভেসে যাবার যাত্রাপথের বিবরণে আছে :

প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায়।
মৃন্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাণী তায়।।
কলার মান্দাসে তথা বেহুলা নাচনী।
নারিকেলডাঙ্গায় পুজে ভুজঙ্গজননী।
গলায় কাপড় দিয়া মনসার আগে।
প্রাণপতি জীয়াইব এই বর মাগে।।

(ঐ, পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫)।

কেতকাদাস নারকেলডাঙ্গার কথা আরও কয়েকবার উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যে। শুধু নারকেলডাঙ্গাই নয়, এর আশে-পাশের অনেক গ্রামের নাম তিনি করেছেন, যেগুলির অস্তিত্ব আজও রয়ে গেছে। দামোদর, বাঁকা, গাঙ্গুড়ী প্রভৃতি নদীর তীরেই এই সমস্ত গ্রাম, আর এদের মনসা পুজোর ঐতিহ্য আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রাঢ়দেশের ঐ অঞ্চলটিতেই শুধু নয়, পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলারই আরও অনেক অঞ্চলে,—বিহার, আসামেরও বিভিন্ন গ্রাম জনপদ, নদীতীর, পরিত্যক্ত বাস্তুভূমি বেহুলা, লখিন্দর, চাঁদবেনের লীলাভূমি বলে লোকস্মৃতিতে লালিত হচ্ছে আজও। এর কারণ বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী—সে সত্যই হোক, কিংবা নিছক কিংবদন্তীই হোক, মর্মস্পর্শী

আবেদনে পূর্ব ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের লোকচিত্তকে জয় করেছে। সারা পৃথিবীতে এত বিপুল অঞ্চলে বিস্তৃত, এত বিরাট সংখ্যক লোকচিত্তে লালিত এ-রকম লোককাহিনী সত্যিই দুর্লভ। স্বভাবতই এটি অনন্যসাধারণ 'ফোকলোর'।

ড. সুকুমার সেন প্রমুখ অনুমান করেছেন, কেতকাদাসের মনসামঙ্গল খ্রিস্টীয় ১৬৪১ সালের অল্প কিছু কাল পরে রচিত। অতএব নারকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের মনসা পুজোর ঐতিহ্য ঐ রচনাকালের অনেক আগে যে গড়ে উঠেছে এমন ধারণা সহজেই করে নেওয়া যায়। কোনও গ্রাম বা কোনও গ্রামদেবীর প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লোকসমাজে যথেষ্ট ব্যাপক আর প্রাচীন না হলে প্রাচীন কবিদের রচনায় তাদের স্থানলাভ স্বভাবতই শক্ত হয়ে উঠত। এইসব বিচার করে অনুমান করা যেতে পারে, কেতকাদাসের মনসামঙ্গল রচনার অন্তত একশো বছর আগে থেকে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে নারকেলডাঙ্গা রাঢ়দেশের মনসা পুজোর অন্যতম পীঠভূমিরূপে জনসাধারণের কাছে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। আর পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে সারা বাংলাদেশেই মনসা পুজো যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'

> দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
> পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া নানা ধন।।

এ উক্তিটি তার বিশেষ প্রমাণ। আর সেই জন্যেই ষোড়শ শতকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী স্মৃতিকার রঘুনন্দনকেও তাঁর 'তিথিতত্ত্বে' মনসা পুজোর বিধান দিতে হয়েছে।

নারকেলডাঙ্গায় জগৎগৌরীর যে পাষাণমূর্তিটির পুজো হয়, সেটি কিন্তু আরও পুরনো, আর মূর্তিকলাতত্ত্বের দিক থেকে অনন্যসাধারণও বটে। আগামী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করব।

নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী

বৈদ্যপুর থেকে নারকেলডাঙ্গায় চলেছি—দেবী জগৎগৌরীর আষাঢ়পঞ্চমীর ঝাঁপান উৎসবে। আমার ডাইনে বাঁয়ে, কাছে-পিঠে আব অনেক দূরে ছড়ানো রয়েছে হাসনহাটি, মাচ্ছার, গোদা-অন্নদা, বাদলা, ওসমানপুর, আমাদপুর, কেজা, দলুইবাজার, গাংপুর, বর্ধমান, জুজুটি—আরও কত জনপদ, গ্রাম, নগরী। তিনশো বছর আগে এই সমস্ত গ্রাম-জনপদ নিয়েই রাঢ়দেশের বিখ্যাত কবি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের রঙ্গভূমি কল্পিত হয়েছিল। এরা বর্ধমান জেলার দামোদর, বাঁকা, গাঙ্গুড়ী, বেহুলা নদীর ধারে ধারে। নদী এখন কোথাও এদের কাছে পিঠে রয়েছে; কোথাও বা অনেক দূরে সরে গেছে, পুরনো শুকনো খাতের চিহ্ন ফেলে রেখে। কিন্তু তিনশো বছর আগে নদী এদের পাশ দিয়েই যে বইত, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে তার প্রমাণ রয়েছে। 'তাঁর মনসামঙ্গলের বেহুলা মরা পতিকে কোলে নিয়ে চাঁপাতলার ঘাট থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত একটানা নদীপথে এই সমস্ত গ্রাম-নগরীর পাশ দিয়েই কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিল। এই যাত্রাপথে মোট ২২টি ঘাট তাকে পেরোতে হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৪টিরও বেশির অস্তিত্ব আজও রয়েছে। বেহুলার মরা পতিকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যাওয়ার নদীপথ আরও অনেক মনসামঙ্গলের কবি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যাত্রাপথেব আশেপাশে যে সমস্ত জনপদের নামোল্লেখ তাঁরা কবেছেন, তাদের অধিকাংশই কাল্পনিক। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের প্রদর্শিত যাত্রাপথের বাস্তব-অস্তিত্ব কিন্তু আজও রয়েছে। তাঁর স্মৃতিব নক্সাকাটা নদীপথের বাঁকে বাঁকে আজও সেদিনকার গ্রাম-নগরীগুলি গাঁথা রয়েছে একটির পর আর একটি—একটি দীর্ঘ মালায় ফুলের মত।

গ্রাম-জনপদের বিচিত্র কাহিনী

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের বেহুলা এ গ্রাম-নগরীগুলিরই পাশ দিয়ে মরা পতিকে কোলে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিল ত্রিবেণীব দিকে, মরা পতির প্রাণসঞ্চারের আশায়। মড়া কোলে করে দীর্ঘ দুর্গম নদীপথে দুঃসাহসিকা তরুণীব নিঃসঙ্গ যাত্রার মর্মস্পর্শী বিবরণ রেখেছেন কবি। তার অঙ্গের রূপযৌবনের লোভে ঐ ঘাটে ঘাটেই মনুষ্যত্বহীন পচা মানুষের দল লুব্ধ বাহু বিস্তার করে বার বার ছুটে এসেছে তাকে ধরতে। আব, কোলেব কৃমিকীটে ভরা পচা মড়াটার লোভে নদীর বাঁকে বাঁকে শেয়াল, কুকুব, ভেলার পেছনে পেছনে হাঙ্গব, বোয়াল ছোঁক ছোঁক করে বেড়িয়েছে। বেহুলা স্বামীর পচা মড়া ছাড়েনি। বেহুলা দুর্গম যাত্রাপথে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়নি।

"কিছুই না টলে তাঁর সিঁথার সিন্দূর"

বেহুলার অচলপ্রতিষ্ঠ পতিপ্রেমের চিহ্ন সিঁথির সিঁদুরে দপ দপ করে জ্বলছে—কবি মুগ্ধনেত্রে দেখলেন। ঐসমস্ত ঘাট, গ্রাম-নগরীর সঙ্গে বেহুলার চরম দুঃখ-লাঞ্ছনা-ভোগ, কঠিন অভিজ্ঞতালাভের কত না বিচিত্র কাহিনী কবি জুড়ে দিয়েছেন। কল্পিত সে সমস্ত কাহিনী—লোকে কিন্তু স্মরণ করে বাস্তব সত্যের মত। এই প্রাচীন কিংবদন্তীগুলিই গ্রাম জনপদেব অনেক মূল্য বাড়িয়েছে—তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে। অবশ্য তিনশো বছব পরে ঐ সমস্ত জনপদের কারও নাম আজও অবিকৃত আছে, কারও কারও নাম অনেক পরিবর্তিত হয়েছে লোকমুখে। বৈদ্যপুরে স্নানের ঘাটে এক বৈদ্য বেহুলাকে ধরতে এসেছিল। সে বৈদ্যপুর এখনও আছে। গোদাঘাট—সেখানে এক গোদা পায়ের গোদ নিয়েও ধরতে এসেছিল বেহুলাকে, তার নাম এখন গোদা-অন্নদা। এটি বৈদ্যপুর থেকে মাইল ছয়েক দূরে বেহুলা নদীব ধারে। মাছিশ্বরে লখিন্দরের গলিত শবদেহে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে আক্রমণ করেছিল। সেই মাছিশ্বরের নাম হয়েছে এখন মাতীশ্বর বা মাচ্ছাব—নারকেলডাঙ্গা থেকে মাইল পাঁচেক উত্তর-পূর্ব কোণে এটি রয়েছে। 'বোদাল্যার

দহে' রঘু বোদালিয়া বেহুলার ভেলায় লাফিয়ে উঠে লখিন্দরের হাঁটুর মালাইচাকি খেয়ে ফেলেছিল। সেই বোদাল্যা হয়েছে এখন বাদলা। বৈদ্যপুর থেকে মাইল দেড়েক পূর্ব দিকে বাদলা গ্রাম রয়েছে।

তিনশো বছর আগেকার এ সমস্ত গ্রাম-জনপদ আজও টিকে আছে, আর এদের অধিকাংশই মনসামঙ্গলের পীঠভূমিরূপে আজও বিখ্যাত। এদের মনসা পুজো, ঝাঁপান-উৎসবের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। মনসা পুজোর পীঠভূমিরূপে এদের খ্যাতি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের সমকালীন মাত্র নয়, তাঁর অনেক আগে থেকে ছিল—এ অনুমান নিশ্চয়ই অমূলক নয়। এদের খ্যাতি পুরনো না হলে কবির কাব্যে এরা একটুও ঠাঁই পেত না। কবির মনসামঙ্গলের রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় বলে নিরূপিত হয়েছে। অতএব এইসব অঞ্চলের মনসা পুজোর ঐতিহ্য অন্তত ঐ সময় থেকে শ-খানেক বছরের পুরনো ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ ষোড়শ শতক থেকে এই গ্রাম-জনপদগুলি, রাঢ়দেশের মনসা পুজোর কেন্দ্ররূপে বিশিষ্ট স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

নারকেলডাঙ্গার ঐতিহ্য

মনসা পুজোর ঐ প্রাচীন পীঠভূমিগুলির মধ্যে নারকেলডাঙ্গা নিশ্চয়ই অন্যতম মধ্যমণিরূপে খ্যাত হয়েছিল। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ তাই বার বার তার কথা বলেছেন তাঁর মনসামঙ্গলে। লখিন্দরের শব নিয়ে ভেলায় ভেসে আসতে আসতে বেহুলা এখানে মনসার মন্দির দেখে উঠে দেবীর কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করেছিল—এ কিংবদন্তী শুধু আজই নয়, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের সময়ে এবং তাঁরও অনেক আগে প্রচলিত ছিল। সেই প্রাচীন কিংবদন্তীর মহিমা ব্যক্ত করে কবি লিখেছেন :

প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায়।
মৃন্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাণী তায়।।
কলার মান্দাসে তথা বেহুলা নাচনী।
নারিকেলডাঙ্গায় পূজে ভুজঙ্গজননী।।
গলায় কাপড় দিয়া মনসার আগে।
প্রাণপতি জীয়াইব এই বর মাগে।।

কবির সময়ে নারকেলডাঙ্গায় মাটির তৈরি মনসামূর্তি ছিল বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে এখন যে মূর্তিটি পূজিত হয়, সেটি পাথরের তৈরি। দেবীর নাম জগৎগৌরী, মনসারই নামান্তর। দেবীভাগবতে, দেবীপুরাণে মনসার 'জগৎগৌরী' নাম পাওয়া যায়। লৌকিক দেবী মনসাকে পৌরাণিক দেবী দুর্গার সঙ্গে যে সংঘাতে-সংঘর্ষে প্রথম দিকে পড়তে হয়েছে, পরবর্তীকালে দেবীভাগবত, দেবীপুরাণের যুগে, তাঁকে দেবী দুর্গার সঙ্গে সমন্বয়ের পথে আপোস করে 'জগৎগৌরী' নাম ধরতে হয়েছে। বর্ধমান জেলার কয়েকটি জায়গায় দেবী মনসা জগৎগৌরী নামে পূজিত হচ্ছেন।

নারকেলডাঙ্গায় জগৎগৌরী মূর্তি

নারকেলডাঙ্গায় জগৎগৌরী মূর্তিটি আইকনোগ্রাফির দিক থেকেও অনন্যসাধারণ বলে আমি মনে করি। আজ পর্যন্ত বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার—অর্থাৎ ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে পাথরের যতগুলি মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে,—তাদের সকলের মধ্যে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটি স্বতন্ত্র হয়ে আছে।

মূর্তিটি নিকষ কালো কষ্টিপাথরের একটি ফলকের ওপরে উৎকীর্ণ। চওড়ায় ইঞ্চি দশেক, উঁচুতে ফুট দেড়েক। নাক, চোখ, ঠোঁট, হাতের আঙুল অনেকখানি ক্ষয়িত। তার ওপরে ধুনোর আটা আর সিঁদুরে মাখামাখি লম্বা লম্বা সোনার চোখ পরিয়ে আরও কিম্ভূতকিমাকার বানানো হয়েছে। মূর্তিটির অঙ্গসৌন্দর্য তবুও ঢাকা পড়েনি।

সপ্তনাগ ফণা প্রসারিত করে দেবীর শিরে বিন্যস্ত। উঁচু পীঠের ওপরে, দু-থাক পাপড়িওলা পদ্মের আসনে দেবী বসে আছেন, বাম চরণটি মুড়ে, আর দক্ষিণ চরণটি নিচে ঝুলিয়ে। ধ্রুপদী প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের ভাষায় এই রকম পদ্মের নাম মহাপদ্ম, আর দেবীর এই রকম উপবেশনের ভঙ্গির নাম ললিতাসন। দেবীর বাম ক্রোড়ে একটি শিশু—বাম হস্তের বেষ্টনে দেবী তাকে ধরে রেখেছেন। জননীর স্তনের ওপরে হাত দিয়ে স্তন্যসুধাপিপাসু শিশু জননীর মুখের দিকে নিজের মুখটি তুলে তাকিয়ে আছে। দেবীর দক্ষিণ হস্ত ললিত ভঙ্গিতে নিজের দক্ষিণ জানুর ওপরে স্থাপিত। সাধারণত এই ধরনের মূর্তির দক্ষিণ হস্তে হয় একটি ফল কিংবা বরদানের ভঙ্গি থাকে। এ-মূর্তিটির করতল ক্ষয়িত। সুতরাং বোঝবার উপায় নেই, এ হাতে কী ছিল। ক্ষীণ কটিদেশ, গভীর নাভি, ত্রিবলির রেখা, পীবরস্তনমণ্ডল, সুগঠিত বাহুযুগল, মূর্তির দেহগঠনভঙ্গি সবই ধ্রুপদী শিল্পশাস্ত্রসম্মত। কিন্তু শিল্পীর হাতের গুণে তার নিগড়ে মূর্তির সজীব লাবণ্য শৃঙ্খলিত মনে হয় না। নিপুণ তক্ষণে বিচিত্র কবরী, মুকুট, কুণ্ডল, কণ্ঠহার, কেয়ূরের সুষমায় লাবণ্যময় সুগঠিত দেহ শোভনদর্শন হয়ে উঠেছে। মূর্তির পৃষ্ঠপট অনলঙ্কৃত, ঊর্ধ্বভাগ গোলাকৃতি। এটিও পাষাণপ্রতিমার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। তাছাড়া সুগঠিত শক্তিগর্ভ এই মূর্তিকে শিল্পীর হাত অলঙ্করণের মোহে কোনও জায়গাতেই বাহুল্যভারে পীড়িত করেনি। তাই লাবণ্যময় অথচ সুসংযত এই ভাস্কর্যের নিদর্শন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের দ্বাদশ শতকের এবং তার পরবর্তী কালের সেই সমস্ত মূর্তিগুলি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র—যেগুলিতে দেহের অতিমাত্রায় কোমলতা আর মাধুরী সৃষ্টিতে, পৃষ্ঠপটের আর মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বহুল অলঙ্কারসংযোজনেই শিল্পীর সমস্ত তক্ষণনৈপুণ্য ব্যয়িত, যেগুলিতে গুপ্তোত্তর, পালপর্বের দৃঢ়, শক্তিগর্ভ, সংযত মূর্তি রচনার দিকে তেমন লক্ষ্য নেই। এই বিচারেই নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর পাষাণ-মূর্তিটির নির্মাণকাল দশম-একাদশ শতকের বললে অন্যায় হবে না। রাঢ়দেশের প্রাচীন ভাস্কর্যনৈপুণ্যের এটি একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

নাগছত্রিত শিশুক্রোড়া পদ্মাসীনা প্রাচীন মনসামূর্তি ভারতের পূর্বাঞ্চলে একেবারে বিরল নয়, যদিও সেই সংখ্যাটা স্বল্পই। এরকম শিল্পসংযুক্তা মনসার ধ্যানও প্রচলিত আছে। ঐ ধ্যানে শিশুটির কোনও পরিচয় না থাকলেও অনেক মূর্তিতত্ত্ববিদের মতে ওটি মনসার পুত্র আস্তিকেরই মূর্তি।

দুটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য

কিন্তু দুটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর মূর্তিটি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মনসামূর্তি-মণ্ডলীর মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবে। সেই বৈশিষ্ট্য দুটির একটি হচ্ছে দেবীর দক্ষিণ চরণের নিচে একটি বৃহদাকার সিংহ উপবিষ্ট। সিংহবাহনা মনসামূর্তি আজ পর্যন্ত একটিও পাওয়া যায়নি। মনসার কোনও ধ্যানে দেবীকে সিংহবাহিনীও বলা হয়নি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেবীর বসন। অতিহ্রস্বপরিসর বস্ত্র দেবীর পরিধানে—তার প্রান্তভাগ জানুর অনেক ঊর্ধ্বে কটিদেশের কাছে লগ্ন। এটি কি ব্যাঘ্রচর্মের বসন? তবে কি ব্যাঘ্রচর্মবসনা, সিংহবাহিনী, নাগছত্রিতা, শিশুক্রোড়া এই দেবী মনসা নন? ইনি আর কোনও তান্ত্রিক দেবী? এ প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বলতেই হয়, যদি মনে রাখি, পাল আমলে বৌদ্ধ মহাযানীদের ধ্যানধারণা আর পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রোপাসনা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল সারা বাংলাদেশে, এবং তার সীমানা ছাড়িয়ে আসামে, উড়িষ্যায়, বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশে। তখন অসংখ্য শক্তিমূর্তি কল্পিত হয়েছিল। তদনুযায়ী মূর্তিও তৈরি হয়েছে অঢেল। কালক্রমে সেসব সাধনা অনেকখানি অবলুপ্ত হয়েছে। অনেক রাষ্ট্রবিপ্লবে, বৈদেশিক আক্রমণে মঠমন্দিরের সঙ্গে সে সমস্ত মূর্তিও ভগ্ন, বিকৃত, চূর্ণ হয়েছে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে নদীতে, জলাশয়ে। পরবর্তী কালে সেইসব মূর্তি পুনরাবিষ্কৃত হয়ে লোকসমাজে পুজো পাচ্ছে, অন্য নামে। নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর মূর্তিটিরও বোধ হয় ঐ রকম এক ইতিহাস ছিল—লোকমনে তার স্মৃতি আর জেগে নেই।

জগৎগৌরীর গ্রামবেড়ানি

বাংলাদেশে এক গ্রামের সঙ্গে অন্য আর এক গ্রামের দলাদলি রেষারেষি, ঝগড়া, মারপিট, খুনখারাবির অনেক ইতিহাস আছে। কখনও কখনও এসব ব্যাপারে গ্রামগুলোকে জোট বাঁধতেও দেখা গেছে। একাধিক গ্রাম জোট বেঁধে অন্য আর এক গ্রামজোটের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করেছে। জোত, জমি, ফসল, প্রধানত এসব নিয়েই স্বার্থে স্বার্থে লড়াই-এর আদি ইতিহাস। আর, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক তথা জমিদারিভিত্তিক সমাজের দর্প, অপরকে গ্রাস করার ইচ্ছা, নিরঙ্কুশ আধিপত্য-বিস্তারের কামনা থেকেই এসবের উদ্ভব হয়েছে। রাজায় রাজায় লড়াই হয়েছে। সে লড়াই এ নিমকখাওয়া প্রজাকেও সাধারণ মানুষকেও শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরিক হতে হয়েছে লাঠি, সড়কি, বন্দুক হাতে নিয়ে—মালিকের শত্রুর জমিদারিতে হানা দিতে। দুপক্ষেরই প্রজাসাধারণ পরস্পরকে হয় মেরেছে, নয় নিজেরা মরেছে। রাজাদের গায়ে কিন্তু আঁচড়টিও পড়েনি। এও দেখা গেছে, জমিদারিভিত্তিক এই ঝগড়া জমিদারদের পুরুষানুক্রমে প্রজাসাধারণের মধ্যেও পুরুষানুক্রমে বিসর্পিত হয়েছে। ঝগড়ার মূল সূত্র কবে কোন্ কালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু ঝগড়ার জের মেটেনি। গ্রামীণ বিরোধের এমন ইতিহাস বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গাঁথা আছে। কিন্তু জমিদারিভিত্তিক সমাজের দায়ে এক গ্রামের সঙ্গে গ্রামান্তরের যত মনোমালিন্যই দেখা যাক না কেন, এও খুব দেখা যায়—গ্রামদেবতা তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছেন অন্তত তাঁর বার্ষিক উৎসবের দিনটিতে। গ্রামদেবতার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শুধু সেই বিশেষ গ্রামটিরই মানুষেরা নয়, আরও অনেক গ্রামের মানুষরা এসে মিলছে একসঙ্গে। এটি ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। দেবতা ক্রুদ্ধ হবেন—ধন, জন, আয়ু, আরোগ্য, শ্রী, বিজয়, মানুষের কোন ঐহিক কামনাই পূর্ণ হবে না, এবং যেটুকু আছে সেটুকুও হারাতে হবে, যদি গ্রামদেবতা সকলের পুজো না পান। এই বিষম ভয়ই যেন গ্রাম-গ্রামান্তরকে বিশেষ বিশেষ গ্রামের দেবতার পদপ্রান্তে এনে মিলিত করেছে। যে-দেবতার মাহাত্ম্য যত বেশি, তাঁর এক্তিয়ারও তত বেশি সংখ্যক গ্রামে ছড়ানো। বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রামাঞ্চলেই এই বিশিষ্টতা দেখা গেলেও রাঢ়দেশেই এর প্রাবল্য বেশি মনে হয়। কারণ, রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে দেবদেবীর ছড়াছড়ি, আর তাঁদের অনেকের ঐতিহ্যও অনেককালের পুরনো। রাঢ়দেশের এক একটি গ্রামদেবতাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের বহু গ্রাম কেমন যূথবদ্ধ হয়েছে, গ্রামদেবতার বার্ষিক উৎসব বিপুলপ্রসারিত জনপদমণ্ডলীর মানুষকে ডেকে এনে কেমন একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে উৎসবের বিভিন্ন কৃত্যপালনে, গ্রামদেবতার পূজাপদ্ধতি, বার্ষিক উৎসবগুলি দেখলেই তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

প্রাগ্‌বিভক্ত সমাজের যূথবদ্ধ প্রয়াস

এই যূথবদ্ধ ধর্মচর্যার ইতিহাস কিন্তু অনেক কালের পুরনো। এর জন্ম হয়েছে সুদূর আদিম যুগে, প্রাগ্‌বিভক্ত মানুষের সমাজে। আদিম অসহায় মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার তাগিদেই সঙ্ঘবদ্ধ যূথজীবনের আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন যেমন শিকার করা জন্তু কিংবা সংগৃহীত অন্যান্য আহার্যসামগ্রীর ওপরে কারওই ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, সকলেরই ছিল সমান অধিকার, তেমনই শিকারে, আহার্য সংগ্রহে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যাপারে সম্মিলিত, যৌথ প্রয়াস ছাড়া তাদের এক পা-ও একলা চলার উপায় ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে নিয়ত লড়াই-এ আদিম মানুষের সেদিনকার অপরিণত মন প্রকৃতিকে হাতের মুঠোর ভেতরে আনবার চেষ্টায় খাবার আর জীবনযাপনের জন্যে দরকারি সব জিনিসপত্র তার কাছ থেকে আদায় করে নেবার

জন্যে অনেক জাদুভিত্তিক ধ্যান ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছিল। এবং সে সমস্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস নয়, যূথবদ্ধ প্রয়াসেই প্রণোদ ছিল। বাঁচার তাগিদে আদিম মানুষের পরিকল্পিত আদিম ধ্যানধারণাগুলি থেকেই কালক্রমে অধিকাংশ প্রাচীন গ্রামদৈবত-উপাসনার রূপপরিবর্তন ঘটেছে। এই হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক, সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। আধুনিককালেও গ্রামীণ দৈবতকুলের সঙ্গে যূথবদ্ধ জনপদমণ্ডলির সংযোগের সূত্র সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। অতএব গ্রামে গ্রামে রেষারেষির মূলের ইতিহাসের চাইতে তাদের ঐক্যের, তাদের যূথচারণার মূলের ইতিহাস অনেক বেশি পুরনো এবং মজ্জাগত। বর্ধমান জেলার ক্ষীরগাঁয়ের যোগাদ্যা, মাজিগ্রামের শাকম্ভরী, বোড়োর বলরাম প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামদেবদেবীর পুজো-অর্চনায়, বার্ষিক উৎসবে সেই আদিম যৌথ সমাজজীবনেরই ছায়া কেমন পড়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আমার পূর্ববর্তী বিভিন্ন প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। বর্ধমান জেলার নারকেলডাঙ্গার গ্রামদেবী জগৎগৌরীকেও কেন্দ্র করে আশেপাশের অনেকগুলি গ্রাম-জনপদ যেন যূথবদ্ধ রয়েছে। আমার বর্তমান প্রবন্ধে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি।

দেবীর বিভিন্ন গ্রাম-পরিদর্শন

দেবী জগৎগৌরী বর্ধমান জেলার কালনা থানার নারকেলডাঙ্গা গ্রামে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি ঐ গ্রামটিতেই আবদ্ধ নন। আশেপাশের অনেক গ্রামের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে তিনি ঐ সমস্ত গ্রামে বেড়াতে যান। একে বলে দেবীর গ্রামবেড়ানি। আষাঢ়পঞ্চমীতে ঝাঁপান-উৎসবের মত এই গ্রামবেড়ানিতেও দেবীকে চতুর্দোলায় চাপিয়ে নাচাতে নাচাতে নিয়ে যাওয়া হয়, বাজনাবাদ্যি করে। গ্রামে গ্রামে তখন বাজি পোড়ে, সং বার করা হয়, নানান আমোদ আহ্লাদ চলে। আর অঢেল পাঁঠা বলি তো আছেই। ঐ সমস্ত গ্রামে গিয়ে দেবী কোথাও ৭ দিন, কোথাও ৩ দিন, কোথাও ২ দিন, কোথাও বা ১ দিনও কাটিয়ে আসেন। গ্রামে গ্রামে দেবীর জন্যে মন্দির তৈরি করে রেখেছে লোকে। দেবী সেইসব মন্দিরেই গিয়ে ওঠেন। এইভাবে বর্ধমান জেলার বৈঁচি, বৈদ্যপুর, সিঙ্গারকোণ, তেহাটা, কুতুবপুর, রামনগর, আটকেটিয়া, পলতাপাড়া, হাসনহাটি প্রভৃতি গ্রাম দেবীর গ্রামবেড়ানির মধ্যে পড়ে। এইসব গ্রামের কোনও কোনওটি নারকেলডাঙ্গা থেকে দু-এক মাইলের ভেতরে, কোনও কোনটি অনেক দূরে। নারকেলডাঙ্গার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই—না আঞ্চলিক, না অর্থনৈতিক। গ্রামদেবী জগৎগৌরীর অর্চনাকে কেন্দ্র করে এরা যেন আত্মীয়তার সূত্রে নারকেলডাঙ্গার সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় কিংবা উচ্চকোটির ধ্যানধারণায় পরিকল্পিত নিষ্কাম ধর্মচর্যাকে আনুষঙ্গিক কৃত্য হিসেবে ঐ গ্রামগুলো থেকে যে দেবীকে গ্রামবেড়ানির জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়, এমন ভাব চোখে না পড়ারই কথা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয় গ্রামাঞ্চলে, তখন সেই ভয়ঙ্কর রোগাক্রমণকে দেবীর ক্রোধ, অভিশাপ বলেই যুগযুগব্যাপী অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণালালিত মানুষরা মনে করে। দেবীকে প্রসন্ন করলে গ্রাম রোগমুক্ত হবে, এই ধারণাই দেবীকে আমন্ত্রণ করে গ্রামবেড়ানিতে নিয়ে যাওয়ার, পুজো, বলি দেওয়ার, নানা আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের জাটারা-উৎসব

দক্ষিণ ভারতেও বিভিন্ন প্রাচীন আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত নবগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশের মত অনেক গ্রামদেবতাকে (তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশেরই মত স্ত্রীদেবতা, পুরুষদেবতা নন) এমনি ভাবে, গান-বাজনা করে, মশাল জ্বালিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করানো হয়, বলির পশুর রক্তে

মাটি ভিজিয়ে দেওয়া হয়—মহামারীর মরশুমে, কিংবা দারুণ খরায় বৃষ্টির আহ্বানে, আরও নানা আধিদৈবিক কিংবা আধিভৌতিক উৎপাতনিবারণে। ওদের ভাষায় দেবতার এই গ্রামবেড়ানির নাম 'জাটারা'। মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের ব্রিটিশ আমলের পুরনো 'মিউজিয়াম বুলেটিনে' প্রকাশিত হেনরী হোয়াইটহেডের সংগৃহীত তথ্যাবলীতে, উইলবার থিওডোর এলমোরের 'দ্রাভিডিয়ান্ গডস্ ইন মডার্ন হিন্দুইজ্‌ম' বইয়ে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও বিভিন্ন গ্রামদেবতার 'জাত' হয় নাচ-গান-বাজনার মিছিলে। দক্ষিণ ভারতের আদিম দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জাতিগত, সংস্কৃতিগত অনেক নিকট সম্পর্কের কথা মনে রাখলে, এই দুই অঞ্চলের গ্রামদেবতার বিচিত্র উপাসনা, উৎসবের সৌসাদৃশ্যের তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়। বাংলাদেশের 'জাত'-উৎসবটি দক্ষিণ ভারতের 'জাটারা' বা 'জাতারা' থেকেই হয়তো ঐ ভাবে এসেছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে দেবদেবীর বিভিন্ন স্থানে যাত্রা থেকে 'জাত' কথাটা এসেছে বলে ড. সুকুমার সেন প্রভৃতির অনুমান। তবে দক্ষিণ ভারতের জাটারা উৎসবে যেখানে গ্রামদেবদেবীকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘোরানো হয়, তার সঙ্গে রাঢ়বাংলার 'জাত' এর সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয় নিশ্চয়ই।

আধিদৈবিক, আধিভৌতিক উৎপাত নিবারণের জন্যে প্রাচীন যৌথগোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের জাদুভিত্তিক আদিম মানসিকতা থেকেই গ্রামদেবতার বিভিন্ন গ্রামপরিদর্শনের যে কৃত্য পরিকল্পিত হয়েছিল, বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে বার্ষিক মহাপুজোয় কিংবা ঝাঁপান-উৎসবে তারই দূরাগত ছায়া যেন রয়েছে।

নারকেলডাঙ্গার, মণ্ডলগ্রামের, চোটখণ্ডের জগৎগৌরীরা, সুসুনাগ্রামের তারাখ্যা, মাজিগ্রামের শাকম্ভরী, মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামদেবীদের বার্ষিক মহাপুজোর কিংবা ঝাঁপান উৎসবের দিনে স্থায়ী মন্দির থেকে বার করে এনে অন্য এক মন্দিরে সাময়িকভাবে স্থাপন করা হয়। মন্দির থেকে দেবদেবীদের কাঁধে করে যখন অস্থায়ী মন্দিরে আনা হয় কিংবা বিভিন্ন গ্রামপরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন জাতপাতের ভেদ থাকে না। তখন একসঙ্গে চারধারে হাজার হাজার বলি পড়ে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলে পুজো নিবেদন করে। নাচ, গান, বাজনা, লাঠিখেলা, মদ-খাওয়া, বাজিপোড়ানো, মশাল জ্বালানো, সং বার করা প্রভৃতি নানান আনন্দোৎসবে গ্রামের মানুষরা একসঙ্গে মেতে ওঠে।

আদিম মানুষের জীবনসংগ্রাম

এই গণ-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রামের লোকেদের একসঙ্গে বিভিন্ন কৃত্যে অংশগ্রহণকে নিছক আনন্দোৎসব বললে ভুল করা হবে। এর প্রকৃত তাৎপর্য ধরিয়ে দিচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা। তাঁদের বক্তব্য : আদিম অসহায় মানুষের সমাজে প্রতিকূল পরিবেশকে জয়ের জন্যে, প্রকৃতিকে হাতের মুঠোর মধ্যে বশীভূত করার জন্যে যে সমস্ত জাদুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন হয়েছিল, সেগুলি যূথবদ্ধপ্রয়াসেই করণীয় ছিল। সকলের মন, চিন্তা, দৈহিক প্রয়াস একসঙ্গে একতালে এক সুরে মিলিত হলে, তাদের সম্মিলিত মানসিক বলে, তাদের সকলের মিলিত প্রয়াসের জোরে, প্রকৃতি হার মানবে, তারা বশীভূত হবে—এই ধারণাকে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। বাস্তবক্ষেত্রেও তারা দেখেছে, বড় শিকার করতে যাওয়া, অতি হিংস্র বন্য জন্তু কিংবা অন্য উৎপাত থেকে আত্মরক্ষা করা—এ সমস্ত কঠিন কাজ একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। সেই অভিজ্ঞতাই আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে গোষ্ঠীচেতনার উদ্ভবসূত্র। ঐ গোষ্ঠীচেতনাই আদিম সমাজকে আহার্যসংস্থানে, উৎপাদনে, বণ্টনে, সম্মিলিত নাচে, গানে, বাজনায়, জাদুভিত্তিক আরও নানান কৃত্য-অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলিত, সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিল। শিকারের আগে, ফসল কাটার আগে যৌথভাবে অনেক জাদুভিত্তিক

আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন আজও পৃথিবীর নানান অঞ্চলে অনেক আদিম গোষ্ঠীর মানুষের সমাজে রয়েছে। আমাদের দেশে সভ্যতার নানান অনুন্নত অনগ্রসর স্তরে আটকে থাকা মানুষরা, যারা আদিবাসী নামে পরিচিত, তাদের মধ্যেও এসব রীতির বহুল প্রচলন রয়েছে আজও। তাই এইসব নাচ-গান, অন্যান্য অনুষ্ঠান নিছক আনন্দোৎসব নয়, জীবনসংগ্রামের কড়া তাগিদেই আদিম মানুষের আদিম অপরিণত মনের উদ্ভাবিত কর্মপ্রয়াস—এই হচ্ছে অনেক বিজ্ঞানীব সিদ্ধান্ত। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামদেবীর উৎসবে গ্রামীণ মানুষের নাচ, গান, বাজনা, লাঠিখেলা, দেবীকে নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ, ব্যাপক বলি--সেই আদিম সঙ্ঘবদ্ধ মানুষগোষ্ঠীর যৌথজীবনচর্যারই দূরাগত ছায়াস্বরূপ টিকে আছে।

বর্ধমান জেলাব এক-একটি গ্রামদেবীর উৎসবে তাই একাধিক গ্রাম যেন যূথবদ্ধ হয়ে আছে। নারকেলডাঙ্গায় আষাঢ়পঞ্চমীতে জগৎগৌরীর ঝাঁপান উপলক্ষেও বিভিন্ন গ্রামের সেই যূথবদ্ধতা বেশ নজরে পড়ে। শুধু সম্মিলিতভাবে পুজো-বলিতেই গ্রামগুলি মেতে ওঠে না। যৌথ অনুষ্ঠানে কোনও কোনও গ্রাম নানা পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে গরুর গাড়ির ওপরে পুতুলের গ্যালারি বার করে। কোনও কোনও গ্রাম বাজি পোড়ায়। কোনও গ্রামে লাঠিয়ালদের লাঠিখেলার আয়োজন হয়। সব গ্রামেরই মানুষ নিজেদেব সাধ্য ও শক্তিমত উৎসবের আয়োজন নিয়ে ঝাঁপানতলায় হাজির হয়। বলাবাহুল্য, এসব আচার-অনুষ্ঠানের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণা নেই, বর্তমান পরিপ্রেক্ষায় এরা তাৎপর্যহীন। শুধু দূরাগত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে সমাজের তথাকথিত পিছিয়ে পড়া মানুষরা আজও একে অব্যাহত রেখেছে।

নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপান-উৎসবের আগের দিনটিতে রাত্রে বিভিন্ন গ্রাম নাচ, গান, ছড়াকাটা, বাজিপোড়ানো, নানারকম উৎসব আয়োজনে মেতে ওঠে। এই বিচিত্র অনুষ্ঠানটির নাম সয়লা-উৎসব। 'সয়লা' শব্দটি 'সহেলা' থেকে এসেছে—অর্থ বন্ধুত্ব। বিভিন্ন গ্রাম বন্ধুত্বের সূত্রে যেন বাঁধা পড়ে দেবী জগৎগৌরীর আসন্ন ঝাঁপান উৎসবের প্রাক্কালে। এই সয়লা-উৎসব বর্ধমান জেলায় শুধু নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর ঝাঁপান-উৎসব উপলক্ষেই নয়, চোটখণ্ড প্রভৃতি আরও অনেক গ্রামেও সেখানকার ঝাঁপান-উৎসবের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয়। বৈদ্যপুরের বিচিত্র সয়লা-উৎসবের বিবরণ আগামী প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

সয়লা-উৎসব

জামাই ভাত খেয়ে যাও
নতুন তরকারি
নোড়া-ভাতে কোদাল-পোড়া
শাবল-চচ্চড়ি।

এ গান শুনে রাস্তার দু-পাশের ভিড়ের ভেতরে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়! তার ফিরিস্তি শুনে হাসি কে সামলাবে! ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ সবাই হাসির দমকে বিষম খাচ্ছে।

গরুর গাড়ির ওপরে সাজানো 'নাচঘর'—কাপড়, রঙিন কাগজ, রাংতা, ফুল, পাতা দিয়ে স্টেজের মতন করে তৈরি। একটা বছর বাইশ বছরের ছেলে মেয়েদের মত শাড়ি-কাঁচুলি পরে কোমরে হাত দিয়ে গরুর গাড়ির ওপরে 'নাচঘরে'র সামনে দাঁড়িয়ে গানটা গাইছে। মাঝে মাঝে ঘুঙুর পরা পায়ে তাল ঠুকে ঘুরে ঘুরে তার নাচও চলছে হারমোনিয়াম, বাঁশি, বেহালা, ডুগি, তবলার নেপথ্য-সঙ্গীতে। সেই নেপথ্য-সঙ্গীতের সঙ্গে সে জামাই-সৎকারের বিস্তৃত আয়োজন বর্ণনা করে চলেছে তার মানে :

সাধ করে আমি রেঁধেছি জামাই
গোঁজ, মুগুর, দড়ি—
নেয়ে তুমি এস জামাই
খুব তাড়াতাড়ি।
লাঙলটাকে ভেজেছি আমি
জোয়ালটা চচ্চাড়।
শোবার জন্যে রেখেছি জামাই
কাঁটাতারের মশারি।।

বর্ধমান জেলার নারকেলডাঙ্গার গ্রামদেবী জগৎগৌরীর ঝাঁপান উপলক্ষে বৈদ্যপুরে সয়লা-উৎসবে যে 'নাচঘরে'র গান হয়, এটি তারই একটা নমুনা। ঝাঁপানের আগের দিন রাত্তিরে বৈদ্যপুরের মোট ছটি পাড়া থেকে এমন 'নাচঘর' বেরোয়। দখিনপাড়া, পূর্বপাড়া, পশ্চিমপাড়া গাবতলা, বাজানপুকুরের বাউরিপাড়া, রথতলার বাউরিপাড়া, কোঁড়াপাড়া—এই ছটি পাড়া থেকে ছ'রকমের 'নাচঘর' বৈদ্যপুর আর আশেপাশের গ্রামপথ পরিক্রমা করে আর নাচ, গান, অভিনয়, ছড়া কাটাকাটির রঙ্গরসে সকলকে মাতিয়ে রাত কাবার করে দেয়। বৈদ্যপুরের এই 'নাচঘর' দেখতে আশেপাশের গ্রাম থেকে খুবই ভিড় হয়।

বৈদ্যপুরের এই উৎসবটির উদ্‌যোক্তাদের অধিকাংশই চাষি, দিনমজুরের দল। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সামাজিক দিক থেকেও এরা সমাজের তথাকথিত উচ্চ-কোটির মানুষদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। এরা চাষ করে, মাছ ধরে, গোরু চরায়, নৌকা বয়, আবর্জনা অপসারণ করে, দিনমজুরের কাজ করে। খাঁটি মেহনতি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এরা। এদের সামাজিক লাঞ্ছনা আর অর্থনৈতিক বঞ্চনার ইতিহাস কারও অজানা নয়। জীবিকার দায়ে লেখাপড়ার সুযোগ এদের অনেকেরই হয়নি। সুতরাং উঁচু মননশীল স্তরের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-রুচি এদের কাছ থেকে আশা করা অন্যায়। এদের নাচে, গানে, রঙ্গ-রসে স্থূলতারই অনেক ইঙ্গিত আছে। তবুও এরা জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, বঞ্চনা-বেদনা, পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্বন্ধে যে সচেতন, তাদের এই সয়লা-উৎসব উপলক্ষে রচিত অনেক গানে, অভিনয়ে তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। দেখেছি, এরা গানে গানে

কালোবাজারিকে ধিক্কার দিয়েছে, সমাজের 'ফোতো লবাব'দের উদ্দেশ্যে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হেনেছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের সম্পদ বাড়ল, না, দারিদ্র বাড়ল, তার বিচিত্র হিসাব-নিকাশ করেছে। সেচের জলের জন্যে ডি-ভি-সির কাছে হা-পিত্যেশ করে থেকে সময়মত জল পেল না, গানে গানে সে-কথাও তারা তুলে ধরেছে। আসামে বাঙালি নির্যাতনের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে নেহরুকে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তীব্র ভর্ৎসনায় হয়েছে তারা মুখর। মালদহের গম্ভীরা গানে, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলের টুসু, ভাদু গানে, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের আলকাপ গানে যে দরিদ্র বঞ্চিত, অন্যায় আচরণে নিপীড়িত মানুষদের শ্লেষ, ব্যঙ্গ, ধিক্কার ধ্বনিত হয়, তারই ঐতিহ্য রয়েছে বৈদ্যপুরের সয়লা-উৎসবের 'নাচঘরে'র গানে, অভিনয়ে, ছড়া কাটা-কাটিতে।

গ্রামদৈবতকে কেন্দ্র করে গ্রামের যূথবদ্ধ উৎসবানুষ্ঠানের ইতিকথা অনেককালের পুরনো। সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতরা এর আদিসূত্রের উৎসভূমির সন্ধান পেয়েছেন প্রাগ্‌বিভক্ত আদিম মানুষের যৌথ জীবনচর্যার ভেতরে, তার সেদিনকার বাঁচবার কঠিন সংগ্রামে। পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছি আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে, বর্ধমান জেলার নারকেলডাঙ্গার গ্রামদেবী জগৎগৌরীর 'গ্রামবেড়ানি' অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে।

ঝাঁপানের প্রাক্কালীন উৎসব

শুধু এই অনুষ্ঠানটিতেই নয়, আষাঢ়পঞ্চমীতে জগৎগৌরীর ঝাঁপান-উৎসবের প্রাক্কালে নারকেলডাঙ্গার আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে 'সয়লা-উৎসবে'র অনুষ্ঠানটিতেও ঐ যৌথ উৎসবের বিচিত্র ভঙ্গিটি বেশ ফুটে ওঠে। এতে নাচ, গান, ছড়াকাটা, লাঠি খেলা, বাজি পোড়ানো, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গরুর গাড়ির ওপরে মাটির পুতুলের গ্যালারি সাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো—এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে এক-একটিকে অবলম্বন করে এক-একটি গ্রাম নিজের নিজের কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য আর নিপুণতা নিয়ে একই সময়ে উৎসবের আয়োজন করে। জগৎগৌরীর ঝাঁপান-উৎসবের প্রাক্কালে গ্রামসমষ্টির এই মিলিত উৎসবের নামই 'সয়লা-উৎসব'। কেবলমাত্র নারকেলডাঙ্গাতেই নয়, বর্ধমান জেলার মণ্ডলগ্রাম, চোটখণ্ড প্রভৃতি আরও অনেক গ্রামের মনসা বা জগৎগৌরীর ঝাঁপানের প্রাক্কালে তাদেরও চারপাশের গ্রামে গ্রামে এই উৎসবের কমবেশি আয়োজন চলে। সাধারণত মনসার ঝাঁপান উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠানটি কেন করণীয়, তার তাৎপর্য বোঝা যায় না। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য অনেক পুরনো। যে আদিম পরিবেশে আর প্রয়োজনের দাবিতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল কালক্রমে সে সমস্ত পরিবেশ আর প্রয়োজনের পরিবর্তনে তারা মূল তাৎপর্য হারিয়ে শুধু পুরনো জীবনের স্মারকচিহ্নস্বরূপ লোকসমাজে রেওয়াজ হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু মূল তাৎপর্য না বোঝা গেলেও, এই সয়লা-উৎসব যে মনসার ঝাঁপানের প্রাক্কালীন সূচনার কাজ করে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বিয়ের আগে গায়েহলুদ, কীর্তনের আগে গৌরচন্দ্রিকা, পুজোর আগে দেবতার বোধন-অধিবাসের মত সয়লা-উৎসবেরও কাজ যেন আসন্ন ঝাঁপান-উৎসবের কথা ঘোষণা করা।

সয়লা শব্দের অর্থ

'সয়লা' শব্দের অর্থটি নিয়ে কিন্তু একটু মুশকিলে পড়তে হয়েছে। এটি বর্ধমান জেলার একটি লোকপ্রিয় উৎসবের নাম, কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী, তা আমি স্থানীয় অধিবাসীদের অনেককে জিজ্ঞাসা করেও পাইনি।

হিন্দীতে, পদাবলীর ব্রজবুলিতে 'সহেলী' শব্দটি আছে। তার মানে সখী, দাসী। 'সয়লা'-কে

'সহেলী' থেকে টানলে উপযুক্ত অর্থবোধ হয় না। বাংলায় সই-এর স্বামীকে সয়া বলে। সেদিক থেকেও 'সয়লা'কে টেনে প্রকৃত অর্থবোধ হয় না। কিন্তু 'সয়লা' নয়, 'সয়ালা' বলে একটি শব্দ পাচ্ছি পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রায় একশো বছর আগে সঙ্কলিত 'প্রকৃতিবাদ অভিধানে'। সেখানে 'সয়লা' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সমকক্ষতা। 'সয়লা' কথাটি ঐ 'সয়ালা'রই রূপান্তর বলে মনে হয়। আর ঐ অর্থের সঙ্গে উৎসবটিরও বেশ সামঞ্জস্য আছে। ঐ অর্থে সয়লা উৎসবের অর্থ দাঁড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎসব। নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপান উপলক্ষে বাজি পোড়ানো, পুতুলের থাকা নিয়ে ঘোরা, নাচ, গান, ছড়া কাটাকাটির ভ্রাম্যমাণ আসর জমানো—এ সমস্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গ্রাম বা পাড়া প্রতিযোগীর মত যে অংশগ্রহণ করে তা থেকে 'সয়লা' শব্দটির ঐ প্রকৃত অর্থটি আর অবোধ্য থাকে না। জনসাধারণই এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা আর জনসাধারণই তার উৎকর্ষের পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে হাজির হয় জনসাধারণের দরবারে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে নিজের নিজের কৃতিত্বে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে।

কিন্তু যত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই থাকুক, বিভিন্ন পাড়া বা গ্রাম যত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই মাতুক, এই উৎসবের উপলক্ষ কিন্তু একটিই। সেটি গ্রামদেবীর বার্ষিক উৎসবের আকর্ষণ। গ্রামদেবীই তাদের সমস্ত প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত। বাইরের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিয়ে ভেতরের দিক থেকে গ্রামগুলি একটি অন্তরঙ্গতার, একটি বন্ধুত্বের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যেন বাঁধা এবং ঝাঁপান-ডাঙ্গায় সকলের একসঙ্গে মিলনে সেই অন্তরঙ্গতার সূত্রকে তারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যেন। গ্রামসমবায়ের এই যৌথাচার গ্রামীণ লোকোৎসবের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রাচীন বৈচিত্র্যকেই বয়ে নিয়ে চলেছে—সয়লা-উৎসবে। সয়লা-উৎসব তাই গ্রামসমবায়ের বন্ধুত্বেরই উৎসব।

সয়লা-উৎসবে বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠানসূচি অনুসৃত হয় নারকেলডাঙ্গার পাশে তালা আর গোপালদাসপুর, এই গ্রামদুটিতে। তবে তালাতেই বেশি ধুম। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোলের তুবড়ি জ্বালানো তিনটে। তাতে নাকি মণখানেক করে মশলা ঠাসা হয়। তা ছাড়া হাউই, চরকি, কদমঝাড়, আসমান গোলা, বোম প্রভৃতি তো আছেই। নিশীথ রাত্রির আকাশপটে বাজির সেই আলোকসজ্জা আর গ্রাম প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়া বিস্ফোরণের শব্দ রাত্রি প্রভাতের আসন্ন ঝাঁপান-উৎসবের প্রস্তুতির ইঙ্গিত এনে দেয় গ্রামে গ্রামান্তরে।

ঝাঁপানের দিনটিতে পুতুলের থাকা বেরোয় বৈদ্যপুর আর মীরহাট থেকে। বৈদ্যপুরের থাকার সংখ্যাই বেশি—খানছয়েক হবে। পুতুলের থাকা বলতে বোঝায় গোরুর গাড়ির ওপরে বাঁশ-বাখারি দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড উঁচু গ্যালারি। এই গ্যালারির নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত থাকে থাকে পুতুল সাজানো। এক-একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে সেইসব থাকা সাজানো হয়। সুন্দর, সুগঠিত, সুবিন্যস্ত এই পুতুলের থাকাগুলির সঙ্গে কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের বিখ্যাত 'কার্তিকের লড়াই'-এর থাকার সৌসাদৃশ্য আছে। স্থানীয় মৃৎশিল্পীরাই এই সমস্ত থাকার রচয়িতা।

বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে থাকাগুলোর নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলায় গিয়ে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যায়। এইগুলো দেখবার আশায় সেখানে তখনও থৈ থৈ করছে বিশাল ভিড়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই জনসমুদ্রের মাঝখানে এ্যাসিটিলিন গ্যাস কিংবা হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল এই প্রকাণ্ড থাকাগুলো ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকে রূপোজ্জ্বল দ্বীপখণ্ডের মত।

বৈদ্যপুরকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না, এটি আধাশহর গোছের। অনেক দোকানপাট এখানে। ধান, চাল, ডাল, কড়াই, তিল, মশুরির ব্যবসায় এখানকার অনেকদিনের পুরনো। বৈঁচি স্টেশন থেকে একটানা পাকা রাস্তার সংযোগে এর শহুরে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভালভাবেই গড়ে উঠেছে। নন্দীদের মত প্রাচীন বিপুল বিত্তশালী পরিবারেরও উদ্ভব এখানে হয়েছে ব্যবসায়ের সূত্রে। এইসব কারণে

এখানকার বারোয়ারি পৃষ্ঠপোষকতায় সয়লা-উৎসবের জৌলুস অন্যান্য গ্রামের চেয়ে একটু বেশিই স্বভাবত। কিন্তু কিংবদন্তী সূত্রে বৈদ্যপুর নারকেলডাঙ্গার গ্রামদেবী জগৎগৌরীর সঙ্গে অন্যান্য গ্রামের চাইতে একটু বেশি অন্তরঙ্গ। সেই কারণেই জগৎগৌরীর ঝাঁপান-উৎসবে অন্য গ্রামের ওপরে তার সয়লা-উৎসবের প্রাধান্য গড়ে উঠেছে।

জগৎগৌরীর উদ্ভব

কিংবদন্তীটি হচ্ছে—বৈদ্যপুরের নন্দীদের অন্তর্ভুক্ত মেজনন্দী-পরিবারের এক মহিলাকে দেবী জগৎগৌরী স্বপ্নে জানান, তাঁর পাষাণমূর্তিটি নারকেলডাঙ্গার কচুদহের জলে পড়ে আছে, মূর্তিটিকে তুলে এনে যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বপ্নাদেশ অনুসারে মূর্তিটিকে জেলেদের জাল দিয়ে তুলে, বৈদ্যপুরে মেজনন্দীদের বাড়িতে এনে পূজার্চনার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দিন-তিনেক বাদেই দেবী আবার এক স্বপ্নাদেশ দিলেন, তাঁর সেবাপুজো ঠিকমতো হচ্ছে না, নারকেলডাঙ্গার এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে যেন তাঁকে রেখে আসা হয়। দেবীর আদেশে নন্দীরা তাঁকে নারকেলডাঙ্গাতে রেখে আসেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের দৌহিত্র বংশের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকেই দেবীর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের পর উত্তরকালে তান্ত্রিক সাধনায় বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষে নাকি পরিণত হন আর অনেক কঠিন রোগ, বিশেষত দুরারোগ্য স্ত্রীব্যাধির আশ্চর্য ফলপ্রদ ওষুধ-বিতরণে নাকি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। নারকেলডাঙ্গার ব্রাহ্মণ-সেবাইতরা আজও সেই ওষুধ দিচ্ছেন, আর এতে তাঁদের পশারও বেশ জমে উঠেছে। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থাহীন গ্রামাঞ্চলে দৈবাদ্য ওষুধের মাহাত্ম্য কম কী!

মেজনন্দীরা অবশ্য দেবীকে হারালেও, তাঁদের বৈদ্যপুরের বাড়িটি এখনও দেবীর 'বাপের বাড়ি' নামেই পরিচিত। দেবী প্রতি বছর গ্রামবেড়ানিতে বৈদ্যপুরে এসে তাঁদের পুরনো চালাঘরের মন্দিরেই এসে ওঠেন, তিনদিন সেখানে থাকেন, বাপের বাড়ির আদরে সোহাগে পুজো নেন। সুতরাং ঝাঁপান-উৎসবে বৈদ্যপুরের জাঁকজমকের প্রাবল্যের কারণটা দেবীর উদ্ভবসূত্রের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেন সকলে।

প্রীয়তাং দেবী গ্রামস্য

কুষাণ-রাজ কণিষ্কের আমলে উৎকীর্ণ একটি পাষাণ লেখে আছে—"প্রীয়তাং দেবী গ্রামস্য।" গ্রামদেবীর জন্যে মন্দির তৈরি করে তাঁর প্রসন্নতা কামনা করা হয়েছে ঐ পাষাণ-লেখে। গ্রামদেবতার সুস্পষ্ট উল্লেখের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক রেকর্ড বোধহয় এটিই। পাষাণ লেখটির প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত। এটি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সম্পত্তি। ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের 'Select Inscriptions' এর ১৩৪ পৃষ্ঠায় এর বিবরণ রয়েছে।

ভারতে দেবার্চনা, দেবদেবীর মূর্তি আর মন্দির নির্মাণের ইতিহাস অনেক কালের পুরনো। এ সমস্ত দেবদেবী সাধারণত সারা দেশেই স্বীকৃত, পূজিত। তাঁদের পূজার্চনা, সাময়িক উৎসব-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি মোটামুটি শাস্ত্রানুগ, নির্দিষ্ট নির্ধারিত। সর্বত্রই বাঁধাধরা একই রীতিতে সেগুলি চলে। যুগযুগান্তব্যাপী আধ্যাত্মিক, দার্শনিক চর্চার অভিযাত্রার পথে ভারতে বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য দৈবতকুলের আবির্ভাব ঘটেছে। ভারতের সমাজ, শাস্ত্র, দর্শন, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আদর্শ, শিল্পকলা এই দেবদেবীদেরই অবলম্বনে বিকশিত, বিবর্তিত, প্রধানত সমাজের উচ্চকোটির মানসে, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যেরই জন্যে।

কিন্তু এই দৈবতসঙ্ঘের পাশাপাশি গ্রামদৈবতকুলও রয়েছেন ভারতে। গ্রামজনপদই তাঁদের অধিষ্ঠানভূমি—যেখানে প্রাচীন জীবনধারা কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রাচীন উৎপাদন, বণ্টন, ভোগব্যবস্থার মধ্যে আজও অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে রয়েছে অনেকখানি। তাঁদের এক্তিয়ার সাধারণত তাঁদের নির্দিষ্ট অধিষ্ঠানভূমি কোনও একটি বিশেষ গ্রাম কিংবা গ্রামসমষ্টিরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। বহুবিচিত্র আদিম সমাজের এক একটি গোষ্ঠী বা কৌমকে কেন্দ্র করে তাঁদের আবির্ভাব ঘটায় তাঁদের পূজাপদ্ধতিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে বহু বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে জটিল আধ্যাত্মিক চিন্তা, আদর্শ, দার্শনিকতার বিকাশের বদলে লোকমানসে স্বভাবতই এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, গ্রামদেবতাই গ্রামের মঙ্গল-অমঙ্গলের অধিকর্তা। তিনি প্রসন্ন থাকলেই গ্রামের সকলের সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, নিরাময়। তিনি অপ্রসন্ন হলে গ্রাম-জনপদের মহা বিপদ। প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাত্রার কঠিন সংগ্রামের মুখে দাঁড়িয়ে আদিম মানুষের অপরিণত জাদু-আশ্রয়ী মন যে বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের উদ্ভাবন করেছে সেগুলিই গ্রামদেবতার উদ্ভবসূত্র। ঐ আদিম মানসিকতাই গ্রামদেবতাকে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-অমঙ্গলের নিয়ন্ত্রক বলে ভাবতে শিখিয়েছে। ঐ মানসিকতারই ছায়া পড়েছে আঠারোশো-উনিশশো বছর আগে কণিষ্কের আমলে উৎকীর্ণ শিলালেখের কথাটিতে—"প্রীয়তাং দেবী গ্রামস্য" গ্রামদেবী প্রসন্না হউন। গ্রামীণ ব্রত, উৎসব, পাল-পার্বণ, সমস্ত ধর্মচর্যার তাৎপর্য আর আদি ইতিহাস তাই মানুষের আদিম সামাজিক সংগঠনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক পণ্ডিতরা তথাকথিত উচ্চকোটির দৈবতসমাজের কুলজি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে দেখেছেন, গ্রামদৈবতকুল থেকেই তাঁদের অনেকের জন্ম হয়েছে; প্রাগার্য সমাজের অনেক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, কল্পনা কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য, তথা আর্যসমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে; সেই আদিম স্তরের ওপরে পরবর্তীকালের স্তরবিন্যাস অন্য এক মিলিত রূপ নিয়েছে। শুধু প্রাগার্যসমাজ থেকেই নয়, প্রাচীন আর্যসমাজও সমাজ বিকাশের বিভিন্ন আদিম স্তর দিয়ে পার হবার সময় আদিম মানসিকতায় যে আচ্ছন্ন ছিল, জাদু-আশ্রয়ী জীবনভঙ্গি গ্রহণে যে বাধ্য হয়েছিল, তারও অনেক পরিচয় বিশাল বৈদিক সাহিত্যে ছড়ানো হয়েছে। অতএব ভারতে গ্রামদেবতার ইতিহাস যে কত পুরনো তার সাক্ষী শুধু কণিষ্কের আমলের ঐ শিলালেখটি

নয়, বৈদিক সাহিত্যেও। মানুষের আদিম স্তরের ইতিহাস আর গ্রামদেবতার ইতিহাস—দুটিরই বয়স একসঙ্গে জড়ানো। গ্রামদেবতার ইতিহাস বৈদিকসাহিত্যের চেয়েও পুরনো।

রাঢ় অঞ্চলে গ্রামদেবতার প্রাবল্য

ভারতেব পূর্বাঞ্চল, বিশেষত বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে গ্রামদেবতার প্রাবল্য কেন, বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে এবং পশ্চিমবঙ্গের আরও অন্য অঞ্চলে আবিষ্কৃত বহু প্রাচীন যুগের পাথুরে হাতিয়ারই তার কারণ নির্দেশ করে দিচ্ছে। এই প্রত্নবস্তুগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে, আর্যভাষীদের এই অঞ্চলে আসার অনেক আগে থেকে এখানে মানুষের বসতি ছিল। যে আদিম নরগোষ্ঠী এখানে বাস করেছে, পাথুরে হাতিয়ার নিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই-এ তারাই প্রকৃতিকে করায়ত্ত করতে প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাত্রার সংগ্রামে জাদুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরই মনোভূমিতে আবির্ভূত দৈবতকুল কালক্রমে আজকের গ্রামদৈবতে পরিণত, রূপান্তরিত হয়ে শুধু সমাজের তথাকথিত অনগ্রসর নিচুস্তরে নয়, মাঝারি, উঁচু—সব স্তরেই উঠে, কায়েম হয়ে পুজো পাচ্ছেন, একথা যদি বলা হয়, তবে বোধহয় খুব ভুল হবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, অনেক পৌরাণিক অর্থাৎ পরিণতকালের দেবতাও গ্রাম-জনপদে গ্রামদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। খুঁজলে দেখা যাবে, তাঁদের প্রতিষ্ঠাকাল খুব পুরনো নয়, কিংবা তাঁরা প্রাচীনতর কোনও গ্রামদেবতাদের স্থানচ্যুত করে নিজেরা কায়েম হয়েছেন।

বর্ধমান জেলায় দামোদরের দক্ষিণতীরে খণ্ডঘোষ থানার শাঁকারী গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শঙ্করী, অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী। এঁর বার্ষিক উৎসব হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায় অর্থাৎ রাখী-পূর্ণিমার দিন। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামদেবীর বার্ষিক উৎসবের নাম মহাপূজা। এই মহাপূজা চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমনে লোকোৎসবের রূপ নেয়। শাঁকারী গ্রামের শঙ্করী দেবীরও বার্ষিক মহাপূজা উপলক্ষে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। এই উৎসবে অনেক লোকজন আসে, দোকানপাট বসে, অনেক বলিদান হয়, মানসিক পূজা শোধ করা হয়, ঢাকের আওয়াজে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপে, রাত্রে নাটমন্দিরে গানবাজনার আসর জমে।

পোড়ামাছের ভোগ

কিন্তু শাঁকারীর পার্শ্ববর্তী খুদকুড়ি গ্রামের ধর্মঠাকুর খুদি রায়ের বৈশাখী সংক্রান্তিতে বারান উৎসবে কিংবা শিবঠাকুর রাঘবেশ্বরের চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনে যে বিপুল জনসমাগম হয়, তার কাছে শাঁকারীর শ্রাবণী পূর্ণিমার এই মহাপূজা যেন নিষ্প্রভ মনে হয়। খুদি রায়ের সেবাইত উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত, পুরোহিত ব্রাহ্মণ। মন্দিরটি খুব প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড। খুদি রায়ের বারান উৎসবটিও বিচিত্র। এতে তাঁর প্রধান ভোগ হয় মাছপোড়া দিয়ে। তাছাড়া মাছ, পাঁঠাবলির মাংস দিয়ে অন্নভোগ তো আছেই। ব্রাহ্মণাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। এখানকার রাঘবেশ্বরের গাজনেরও খুব ধুম। এখনও পর্যন্ত শতাধিক সন্ন্যাসী হয় এই গাজনে। এই উপলক্ষে অনেক দোকানপাট বসে, যাত্রাগান চলে দিন রাত ধরে। তখন এই নিভৃত গ্রামটি নানা অঞ্চল থেকে আসা বিপুল জনসমাগমে গম গম করে দিনরাত্রি।

শাঁকারী গ্রামের গ্রামদেবী শঙ্করীরও ১লা মাঘ পৌষল্লা বা পৌষালী উৎসব হয়। খুদি রায়ের বারানের মত শঙ্করীরও তখন মাছপোড়া দিয়ে ভোগ হয়। আর হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি, তরকারি, পায়সের ভোগ তো আছেই। দেবীর এই পৌষল্লা উৎসবে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ সকলে এসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই দুটি গাঁয়ের গ্রামদেবতাদের উৎসবের তুলনামূলক বিচার করলে মনে হয়, এ-অঞ্চলে খুদি রায় আর রাঘবেশ্বর—এঁরাই এখানকার প্রকৃত গ্রামদেবতারূপে বিপুল বিস্তৃত গ্রাম-জনপদের লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। দেবী শঙ্করী এঁদের সঙ্গে তেমন পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেন না। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। সেটি হচ্ছে : দেবী শঙ্করীর যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধিতেই পুজো-অর্চনা হয়। তান্ত্রিক আভিচারিক ক্রিয়া ছাড়া দগ্ধমৎস্য দিয়ে পুজো শাস্ত্রসম্মত নয়। অপৌরাণিক দেবতা খুদি রায়ের বারানের প্রভাবেই পৌরাণিক দেবতা মহিষমর্দিনী শঙ্করীর পূজানুষ্ঠানেও এই অনুষ্ঠানটি এসে ঢুকেছে। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, যে-গ্রামদেবতার প্রতিষ্ঠা, প্রভাবপ্রতিপত্তি বেশি তাঁর সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান আশেপাশের অন্যান্য গ্রামদেবতাদেরও ক্ষেত্রে চালু হয়েছে।

শাঁকারী গ্রামের শঙ্করী দেবী

এখন দেবী শঙ্করীর কথা বলি।

শাঁকারী গ্রামে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদেরই বাস বেশি। অনেকেই উচ্চশিক্ষিত, সঙ্গতিসম্পন্ন। বিপুল বিস্তৃত ধানজমি ছাড়া অন্যত্র ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বাকরিতে তাঁরা বিপুল বিত্ত অর্জন করেছেন। এই সুদূর গ্রামাঞ্চলে তাঁদের কারুকার্য করা প্রাচীন মন্দিরগুলি তাঁদের প্রাচীন জমিদারিভিত্তিক সুখসমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে।

কায়স্থরাই দেবীর সেবাইত। ব্রাহ্মণের ওপরে দেবীর পূজার্চনার ভার ন্যস্ত। বর্তমান সেবাইতদের ১৮ পুরুষ আগে অর্থাৎ প্রায় ৪৫০ বছর আগে রায় রাঘব দত্তরায় দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নবাব সরকারের উচ্চপদে কাজ করে রায়রায়ান উপাধি পেয়েছিলেন। শুধু উপাধি নয়, বহু বিত্ত এবং তার জন্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাও তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বংশধররা পৌত্র এবং দৌহিত্রবংশে বিশাল বিস্তৃত রূপধারণ করে সেই বিশাল সম্পত্তি এবং দেবীর সেবাইতরূপে সেবাধিকারী হয়েছেন। জমিজমা ভোগদখল করে বহাল তবিয়তে আছেন।

শাঁকারী গ্রামের উত্তর দিকের মাঠে ঠাকরুণ-গড়্যে নামে একটি পুকুর থেকে নাকি রায় রাঘব দত্তরায় দেবী শঙ্করীকে পেয়েছিলেন। দেবী অবশ্য প্রথমেই স্বপ্নেই দর্শনদানে এই 'ভাগ্যবান' পুরুষকে ধন্য করেছিলেন এবং তাঁকে জল থেকে তুলে পুজো-অর্চনার ব্যবস্থা করবার আদেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন গ্রামদেবতাদের উদ্ভবের মূলে একটি স্বপ্ন-কাহিনী জড়িয়ে দিলে তাঁদের অলৌকিক মাহাত্ম্য লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হয় সহজেই। সুতরাং দেবী শঙ্করীর মাহাত্ম্যের খুবই জয়জয়াকার। তার ওপরে তাঁর স্বপ্নাদ্য ওষুধেরও খুব নামডাক আছে। তাই তাঁর বার্ষিক উৎসবের দিন সারা বছরের মানসিক পুজোর শোধ দিতে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকসমাগম হয়। শুনলাম আগে তেলুয়া, কুবিলা, চাগ্রাম, সাঁকো, খুদকুড়ি, ওঁয়ারি, সালুন, কামালপুর প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রাম থেকে দেবীর বহু পুজো ও বলি আসত। এখন খুদকুড়ি, তেলুয়া প্রভৃতি কাছেপিঠের গ্রামগুলো থেকেই আসে।

বার্ষিক উৎসবের দিন ষোড়শোপচারে পুজো, হোম ইত্যাদির পর বলি হয়। আমরা সেদিন যখন দামোদর পেরিয়ে বর্ধমান-আরামবাগ রোডের বাবরপুর থেকে সোজা পশ্চিমে একহাঁটু কাদাভরা সাড়ে তিন মাইল মেঠো পথ ভেঙে শাঁকারী গ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন দেখলুম, বলিদানের উদ্যোগ আয়োজন চলছে। মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরের বাইরে হাড়িকাঠের সামনে খুব ভিড়, ঢাক বাজছে।

বলিদানে নামডাকা

এখানকার বলিদানের বৈশিষ্ট্য নামডাকা। অর্থাৎ গ্রামের বিভিন্ন নির্দিষ্ট পরিবারের গোত্র উল্লেখ করে

সেবাইতদের একজন চেঁচিয়ে নাম ডাকেন। সেই ক্রম অনুসারে একটির পর একটি পাঁঠা বলি পড়ে। প্রথমেই দেবীর আদি পুরোহিত বংশের নামে বলি দেওয়া হল। তারপর ক্রমান্বয়ে দেবীর প্রতিষ্ঠাতা দত্ত-পরিবারের আর, এখানকার আর এক প্রাচীন কায়স্থ পরিবার মল্লিকদের বলির পর শুরু হল গ্রামের অন্যান্য কায়স্থ পরিবার এবং গন্ধবণিক, গোপ, নাপিত, মোদক, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বলি।

বিখ্যাত ব্যবহারজীবী দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষের মামার বাড়ি শাঁকারী গ্রামে। এখানকার বসুপরিবার তাঁর মাতুল বংশ। তিনি এক কঠিন মামলায় মক্কেলের পক্ষে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করায় দেবীর বার্ষিক মহাপুজোয় তাঁর নামে পুজোর ব্যবস্থা নাকি করে গেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সমস্ত বলির শেষে, ঢাকঢোল বাজিয়ে তাঁর মামার বাড়ি থেকে পুজো আর বলি এল মিছিল করে।

দেবী শঙ্করীর পাষাণমূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের তৈরি। গ্রামে একটি বৃহদাকার অতি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিও আছে। বাংলার ভাস্কর্যশিল্পে বিষ্ণুমূর্তিটি একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

শাঁকারী গ্রামে দেবী শঙ্করী

রাঢ়দেশের পথে প্রান্তরে গ্রামদেবতার ছড়াছড়ি। এখানে গাছতলায়, পুকুরের পাড়ে, নদীর ধারে, নির্জন শ্মশানভূমিতে তাঁরা থাকেন দেউল-দেহারায়। কেউ থাকেন খোলা আকাশের তলায়—শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় সর্বংসহ। স্থূল পাষাণখণ্ডের রূপহীন এবড়ো-খেবড়ো চেহারা নিয়েই কেউ ভক্তির আসনে মহিমান্বিত। কেউ কেউ পাথরে মাটিতে গড়া, শিল্পসুষমায় অভিন্যস্ত, রূপময়। এই গ্রামদৈবতকুলের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, শাস্ত্র-পুরাণের পাতায় যাঁদের কথা লেখা নেই, যাঁদের গাঁই-গোত্র-দেশের কোনও হদিশ মেলে না শাস্ত্রীয় দেবসমাজে, যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন মানুষের সভ্যতার আদিম প্রত্যূষে, মানুষের কঠিন জীবনযুদ্ধে বাঁচবার তাগিদে। সভ্যতার কল্প-কল্পান্তরের বিবর্তনের ধারায় তাঁরা ভেসে এসেছেন লোকমানসে। তাঁদের ঘিরে পুঞ্জীভূত হয়েছে অনেক অলৌকিক মাহাত্ম্যের কিংবদন্তী, অনেক বিস্ময়কর লোকশ্রুতি। অবিচল বিশ্বাসে, নির্ভরশীলতায় মানুষ তাঁদের আঁকড়ে ধরে আছে। তত্ত্বসন্ধানী বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত—এই দৈবতকুল মানুষের দূর বিস্মৃত অতীতের স্মারকচিহ্ন, একালের মানুষের জীবনে তাঁরা তাৎপর্যহীন। বিজ্ঞানীরা কিন্তু গ্রামদেবতাদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী, লোককাহিনী প্রভৃতিকে একেবারে উপেক্ষা করেন না। তাদের বহু প্রাচীন জটিল গ্রন্থিপুঞ্জের মধ্যে বিজ্ঞানীরা সতর্ক সন্ধানী বিচারে মানুষের আদিম সমাজসংগঠন, সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

এই ধরনের গ্রামদেবতার সঙ্গে কিন্তু বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার শাঁকারী গ্রামের গ্রামদেবী শঙ্করীর দস্তুরমত তফাৎ। শঙ্করী অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী, সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক। নানা পুরাণে, তন্ত্রে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীর কাহিনী, ধ্যান, পুজাপদ্ধতি ইত্যাদির বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মণ্য দেবতা ইনি, সমাজের উচ্চকোটির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য পণ্ডিতরা এইরকম পৌরাণিক দেবদেবীদেরও উদ্ভব, বিকাশ, নানা বিচিত্র মতাদর্শের সংঘাতে-সমন্বয়ে প্রাপ্ত পরিণতির ইতিহাস পাঠ করেছেন মানুষের আদিম সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসেরই মধ্যে।

কিন্তু তবুও শাঁকারীর দেবী শঙ্করীর পুজোপদ্ধতি, উৎসবাদিতে এমন কয়েকটি বিচিত্র অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় দেবতাদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়। আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে শঙ্করীর 'বারান' নামে পৌষালি উৎসবে মাছপোড়া দিয়ে ভোগ দেওয়া আর গ্রামের সর্বজনীন ভোজনোৎসবের কথার উল্লেখ করেছি। শাঁকারীর নিকটবর্তী খুদকুড়ি গ্রামের গ্রামদেবতা ধর্মঠাকুর খুদিরায়ের মাছপোড়া দিয়ে ভোগ এবং সর্বজনীন ভোজনোৎসবের প্রভাবেই শঙ্করীর উৎসবের মধ্যে 'বারান' উৎসবটি এসেছে বলে মনে হয়। গ্রামের সকল মানুষের একদিন একসঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামদেবতাকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন ভোজনোৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠা—রাঢ়দেশের, বিশেষত বর্ধমান জেলার প্রাচীন গ্রাম-জনপদের একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পৃথক পঙ্‌ক্তিতে খাদ্যগ্রহণাদির আচার-অনুষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—এটি যেন বর্ণাশ্রমী সমাজের পরবর্তী সংযোজন; আদি ব্যবস্থাটি হচ্ছে—সকলের একসঙ্গে উৎসবে অংশগ্রহণ, যেটির উদ্ভব হয়েছে, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের যৌথ আচার-আচরণের ভেতরে।

শক্তিদেবীর রাসযাত্রা

শঙ্করীর আর একটি বিচিত্র উৎসব হচ্ছে, রাসযাত্রা। কার্তিকী পূর্ণিমা, যেটি রাসপূর্ণিমা নামে খ্যাত, সেটিতে নয়, অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে তাঁর রাস হয়। রাসযাত্রা বৈষ্ণবদের একটি প্রিয় উৎসব—যদিও তাঁদের অনুসৃত স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তি বিলাসে এর কোনও উল্লেখ নেই। রঘুনন্দনও এ-উৎসবের

কোনও উল্লেখ করেননি। আগমশাস্ত্রে কিন্তু দেবীর রাসযাত্রার উল্লেখ পাচ্ছি। এশিয়াটিক সোসাইটির সংগৃহীত তান্ত্রিক পুঁথিসম্ভারের অন্তর্গত ২০৪০ সংখ্যক পুঁথি প্রাণতোষিণীতে তান্ত্রিকদের অনুসৃত একটি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ বামকেশ্বর তন্ত্রের ৫৪ ও ৫৫ সংখ্যক পটল থেকে উদ্ধৃত করে বারো মাসে দেবীর ষোলটি যাত্রা বা উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাতে চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে নাচ, গান, আনন্দোৎসবের মধ্যে দেবীকে রাসচক্রে বসিয়ে সেটিকে ঘোরাবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেমন বৈষ্ণবদের আখড়ায় রাধাকৃষ্ণকে রাসচক্রে বসিয়ে ঘোরানো হয় রাসপূর্ণিমায় রাসোৎসবে।

বাংলাদেশে আর কোথাও দেবীকে নিয়ে রাসযাত্রা হয় কিনা জানি না, বর্ধমান জেলায় শাঁকারী গ্রামে কিন্তু দেবীর এই উৎসবটি প্রচলিত আছে।

সংস্কৃতির প্রসার

আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলেছি, রায় রাঘব দত্তরায় নামে এক ধনী কায়স্থ প্রায় ৪৫০ বছর আগে শঙ্করী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ষোড়শ শতকের ধনে জনে ঋদ্ধ সেই ভাগ্যবান পুরুষের বংশধররা শাখায়-প্রশাখায় কেবলমাত্র শাঁকারী গ্রামেই নয়, অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছেন কালক্রমে। প্রায় একশো বছর আগে তাঁদের কয়েকটি দল শাঁকারী থেকে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন রায়না থানার সেহাড়া, বাঁকুড়া জেলার কাকটিয়া, ধনসিমলা প্রভৃতি গ্রামে। তাঁরা সে সমস্ত গ্রামে দেবী শঙ্করীর অনুরূপ মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছেন। শাঁকারী গ্রামে যে বিচিত্র নিয়মে ও অনুষ্ঠানে দেবীর দৈনিক সেবাপূজা ও সাময়িক পালপার্বণগুলি চলে, ঐ সমস্ত গ্রামেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগাঁয়ের বিখ্যাত দেবী যোগাদ্যা ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিত। ক্ষীরগাঁয়ের আশেপাশের অনেক গ্রামেও দেবী যোগাদ্যার থান বা অধিষ্ঠানভূমি আছে, সেখানেও তাঁর সেবা, পূজা, উৎসবাদি হয়। গ্রাম-জনপদের মানুষগোষ্ঠীর স্থানান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চলের ধ্যান-ধারণা-সংস্কৃতি অন্যত্র বিস্তৃত হয়েছে এইভাবেই। একালেই শুধু নয়, সুদূর বিস্মৃত অতীতেও এইভাবেই অনেক সংস্কৃতি উদ্ভবকেন্দ্র থেকে অন্যত্র প্রসারিত হয়ে বিশাল বিস্তৃত রূপ ধারণ করেছে।

শঙ্করীর মূর্তিটির কথা এবার বলি। আমরা যেদিন শাঁকারী গ্রামে গিয়েছিলুম, সেদিন ছিল দেবীর বার্ষিক উৎসব। সুতরাং বেনারসি কাপড়ে, আপাদমস্তক সোনার গহনায় আর পুঞ্জীভূত ফুল-বেলপাতায় দেবী তখন আচ্ছন্না। এর ওপরে দেবীর রূপার চোখে, আর সিঁদুরের মোটা প্রলেপে তাঁর মূর্তি বোঝাই ভার। আমাদের অনেক অনুরোধে সেবাইত ও পুরোহিতরা শেষে দেবীর সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে মোটা সিঁদুরের প্রলেপের অনেকখানি ঘষে তুলে দিয়ে তাঁর আলোকচিত্র আমাদের নিতে দেন।

কালো কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ মূর্তিটি। লম্বায় প্রায় আড়াই ফুট, চওড়ায় তিন ফুট। দেবীর ডান পা সিংহের ওপরে, বাম পাটি মুণ্ডহীন মহিষের কাঁধে। মহিষের কণ্ঠনির্গত অসুরের ঝুঁটি এক হাতে ধরে দেবী আর এক হাতে তাকে শূলবিদ্ধ করেছেন। দেবীর বাকি তিনটি ডান হাতে খড়্গ, পদ্মকলি আর বিচিত্রদর্শন একটি বস্তু, তিনটি বাম হাতে ঢাল, ধনু, নাগপাশ।

বাংলাদেশের মূর্তিতে সিংহ

সিংহটির আকৃতি বাংলাদেশের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ধাতু-নির্মিত মহিষমর্দিনীর সিংহের মত। বাংলার প্রাচীন মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্রালঙ্কারে এইরকম সিংহের বহুল দর্শন মেলে। চণ্ডী পূজায় ব্যবহৃত পিতলের সাবেকি পুরনো সিংহাসনেও সিংহের এই রকম গড়নই ছিল। বাংলাদেশের,

বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের দুর্গোৎসবের মাটির সাবেকি প্রতিমাতেও এই ঢঙের সিংহ আজও গড়া হয়। নদীয়া, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি পুরোনো অঞ্চলে এবং কলকাতাতেও কয়েকটি পুরনো পারিবারিক পূজার প্রতিমা থেকে এই সিংহ এখনও লুপ্ত হয়নি, যদিও তাদের গড়নে প্রাচীন আলঙ্কারিক গঠনসৌন্দর্য অনেকখানি এখন চলে গেছে। এই ধরনের সিংহের গ্রীবা, নাসিকা ও কর্ণ দীর্ঘাকৃতি, কটিদেশ ক্ষীণ। উল্লম্ফনরত সিংহের গতিময় ক্ষিপ্র ভঙ্গিকে আলঙ্কারিক ছাঁদে ফেলে বাংলার শিল্পী এই এক আশ্চর্য সিংহরূপ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে পাল-সেন আমল থেকে শিলামূর্তির পৃষ্ঠপটের অলঙ্করণে এই সিংহ আসতে শুরু করেছিল। তারপর সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ধাতু-নির্মিত প্রতিমায়, মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণে, পটে এই সিংহ বাংলা শৈলীর পূর্ণ প্রকাশ নিয়ে হাজির হয়েছে। শাঁকারী গ্রামের শঙ্করী মূর্তির সিংহেও সেই রচনারই ধারা রয়েছে। কিন্তু রচনাটিতে দুর্বলতার চিহ্ন অত্যন্ত পরিস্ফুট। শুধু মৌলিক পরিচিত ভঙ্গিটুকু ছাড়া এর গড়নে তক্ষণনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় নেই। মনে হয়, এটি কোনও অক্ষম শিল্পীরই রচনা।

মূর্তির অর্বাচীনতা

দেবীর গড়নেও দুর্বলতার চিহ্ন প্রকাশিত। হাস্যদীপ্ত মুখমণ্ডলটি অবশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকর্ষণ করে উন্মোচিত আয়ত চোখ, জোড়া নিম পাতার মত বাঁকানো ভুরু, বরবটির বীজের মত বিস্ফারিত নাসাপুট, আমের আঁটির মত সুডোল চিবুক—এই সমস্ত প্রচলিত রীতির অনুসরণে উৎকীর্ণ সুগঠিত হাস্যপ্রদীপ্ত মুখ নয়নসুখকর নিশ্চয়ই। কিন্তু ক্লাসিক্যাল শিলাশিল্পের ভঙ্গি এটি নয়। শুধু মুখেই নয়; দেহের কোনও অংশেই ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যের পরিচয় নেই। খ্রিস্টীয় সতেরো-আঠারো শতকের ধাতু ও মাটির তৈরি পটে আঁকা দুর্গামূর্তিরই সঙ্গে এর বেশি আদল রয়েছে। কিন্তু মুখটুকু ছাড়া শঙ্করী মূর্তির অন্যান্য উৎকীর্ণ অংশে শিল্পীর নৈপুণ্যের দৈন্যই প্রকাশিত হয়েছে।

অর্বাচীন আমলের এই ধরনের মূর্তি দুর্লভ নয়। আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কালো কষ্টিপাথরের তৈরি একটি চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী মূর্তির সঙ্গে এই শঙ্করীর মূর্তিটিরও কয়েকটি বেশ মিল দেখা যায়। মুখ, চোখ, স্তনের গড়ন, মাথার মুকুট এবং গলার বিচিত্র অলঙ্কার উভয়ের একই ধরনের। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিচারে মনে হয়, শাঁকারীর শঙ্করী মূর্তিটি অষ্টাদশ শতকের চাইতে বেশি পুরানো নয়।

শঙ্করীর সেবাইতেরও কাছ থেকে শুনলুম সাড়ে চারশো বছর আগে রায় রাঘব দস্তরায় যে প্রাচীন মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি নাকি কালাপাহাড় ভেঙে দিয়ে গেছে। সে মূর্তিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এই মূর্তি গঠিত হয়েছে। সুতরাং এ-মূর্তি যে নেহাৎ অর্বাচীন কালের, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

বিশাল বিষ্ণুমূর্তি

শাঁকারী গ্রাম সুদূর অতীতে রাঢ় অঞ্চলের এক বিপুল সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল—এ-কথা শুধু শাঁকারীর গ্রামদেবী শঙ্করীর কথা থেকেই অনুমিত হয় না, এখানকার বিশাল পাষাণনির্মিত বাসুদেব নামে পরিচিত যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিটি আছে, সেটি দেখেও তা অনুমান করা যায়। উঁচুতে প্রায় ৭ ফুট, চওড়ায় প্রায় ৫ ফুট— এই বিশাল মূর্তিটি বেলে পাথরে উৎকীর্ণ। এটি বাসুদেব মূর্তি নামে পরিচিত হলেও হাতের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের বিন্যাসের বিচারে যে চব্বিশ রকম বিষ্ণুমূর্তির নাম 'সিদ্ধার্থসংহিতা'য় আছে, তদনুসারে এই মূর্তিটির নাম 'শ্রীধর' হওয়া উচিত। এই শ্রীধর-মূর্তি সমপদস্থানক ভঙ্গিতে পদ্মের ওপরে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে পদ্মকরা শ্রী, বামে বীণধরা সরস্বতী। আকাশমার্গে অপ্সরাযুগল মালা নিয়ে চলেছে। কীর্তিমুখ

এবং অন্যান্য অলঙ্করণে পৃষ্ঠপট মণ্ডিত। এই বিশাল বিষ্ণুমূর্তিটিতে বাংলাদেশের ক্লাসিক্যাল ভাস্কর্যশিল্পের শ্রেষ্ঠপর্বের সুষমাই প্রকাশিত। এটির রচনাকাল নিঃসন্দেহে দশম শতকের পরে ফেলা যায় না। দুঃখের বিষয়, এমন সুন্দর মূর্তিটিতেও নিষ্ঠুর হাতের অনেক ধ্বংসকার্যের স্বাক্ষর রয়েছে। বিষ্ণুর মুখের অন্যান্য অংশের খণ্ডিতাংশ সিমেন্টে সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু সে প্রাচীন সৌন্দর্য আর ফিরে আসেনি।

এই বিশাল বিষ্ণুমূর্তিও কালাপাহাড়ের হাতে নিগৃহীত বলে কিংবদন্তী। কালাপাহাড়ই করুক, কিংবা আর অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় উপপ্লবেই এ ধ্বংসকার্য হোক, একথা নিশ্চিত যে, এই বিশাল গুরুভার মূর্তি নিশ্চয়ই এই নিভৃত গ্রামে অন্য কোনও জায়গা থেকে কেউ নিয়ে আসেনি। তা হলে এটি এখানকারই স্থানীয় সম্পদ। যেখানে এত চমৎকার, এত মূল্যবান শিল্পকৃতি থাকতে পারে, নিশ্চয়ই এককালে সেখানকার বিপুল সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিরও অস্তিত্বের অনুমান করা যায়। রাঢ়দেশের এমন অনেক সমৃদ্ধিশালী লুপ্ত জনপদের চিহ্ন বহন করছে স্থানীয় ভাস্কর্য আর স্থাপত্যের ভগ্নাংশগুলি।

প্রাচীন পঞ্চচূড় মন্দির

শাকারী গ্রামের বিপুল শ্রী, সম্পদ, সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছিল বলেই এখানকার অষ্টধাতুর তৈরি আর এক দেবী সিংহবাহিনীর প্রাচীন পঞ্চচূড় মন্দিরটি তৈরি হতে পেরেছে। সিংহবাহিনী এখন অবশ্য অন্যত্র অপসারিত, মন্দিরটি পরিত্যক্ত, চড়াই-চামচিকের বাসায় পরিণত। মন্দিরের গর্ভমন্দিরে অপরূপ রূপময়ী দেবীমূর্তির পরিবর্তে খড়ের গাদা এখন স্তূপীকৃত। শুধু মন্দিরের সামনে পোড়ামাটির অলঙ্করণ-চিত্র এখনও অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে জেগে আছে, রাঢ়দেশের শিল্পকুশল হাতের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।

মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব

সারাদিন দারুণ গুমোটের পর সন্ধ্যের মুখেই একচোট খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাতটা তাই বেশ ঠাণ্ডা। প্রকৃতিও আর কোনও অঘটন ঘটায়নি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ। শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণাঙ্গী চন্দ্রকলা, একবার মাথার ওপরে দেখা দিয়েই কখন উধাও হয়েছে। নক্ষত্র-চর্চিত বিশাল আকাশখানা বর্ষাস্ফীত ভাগীরথীর জলে মুখ দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়লেও আজ রাত্তিরে তার সুন্দর মুখে নয়, আর এক অন্য রূপে ভাগীরথী রূপময়ী হয়ে উঠেছে। বাঁশ আর কলাগাছ দিয়ে তৈরি বিচিত্রগঠন প্রকাণ্ড ভেলা মোমবাতির আলোর গহনা পরে ভাগীরথীর জলে ভাসছে। বাখারি, চেঁচাবির কাঠামোতে রঙিন কাগজে, অভ্রে, রাংতায় সাজানো তার মিনার, ছত্রি, বারান্দা, তোরণ। তাদের চুড়োয় চুড়োয় নিশান, ময়ূর, আলোর ঝালর। বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনের অভ্রের ঢাকনায় ঝোলানো মোমবাতির আলোর কারুকর্মে ভেলার সর্বাঙ্গ ভূষিত। জলের ঢেউ-এ ভেলা দুলছে। সেই দোলাতে চুড়ো থেকে তলা পর্যন্ত বেলোয়ারি আলোর সাজও দুলছে ঝিলিক তুলে। এই আলোর ভেলা আর তার কম্পমান প্রতিবিম্বিত রূপটিকে বুকে নিয়ে রাতের কালো ভাগীরথী স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে যেন।

এই ভেলার নাম বেরা। বেড়া, ব্যারা, ব্যাড়া—এসব নামও বলে কেউ কেউ। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্তিরে মুর্শিদাবাদ শহরে যে বিখ্যাত বেরা উৎসব হয়, সেই উপলক্ষেই ভেলাটি তৈরি হয়। মুসলমানি শাস্ত্রে জলদেবতা বলে কথিত খাজা খিজির নামে এক পীরের উদ্দেশ্যে এই ভেলাটি উৎসর্গ করে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, নবাব নাজিমদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের সামনে তোপখানার ঘাট থেকে। রাত এগারটার সময় তোপখানার কামান থেকে তোপ দেগে বেরা ভাসানোর লগ্নটি ঘোষিত হওয়ামাত্র ভেলার তীরের সঙ্গে রজ্জুবন্ধনীটি কেটে দেওয়া হয়। স্রোতের টানে হেলে দুলে রূপের আলো ছড়িয়ে ভেলা ভেসে চলে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর বুকে। তাকে ঘিরে অনেক নৌকোও চলে সঙ্গে সঙ্গে, আলো-বাজনাবাদ্যি নিয়ে। বাজি পোড়ানোর ধুমও পড়ে যায়।

ময়ূরপঙ্খী নাও

এই উৎসবে ভেলাটিই কিন্তু সর্বস্ব নয়। চেঁচারির কাঠামোতে কালো কাগজ দিয়ে যে চারটি ময়ূরপঙ্খী তৈরি করা হয় আসল উৎসব তাদেরই নিয়ে। ভেলার মাঝখানে থাকে সেই ময়ূরপঙ্খী চারটি। তারা তের হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া। ময়ূরপঙ্খী নাম, কিন্তু তাদের সামনের মুখ মকর আর পেছনের মুখ হাতির মত। এই মকরমুখো নৌকার ওপরে মাঝখানে চৌরি বাংলা। রঙিন কাগজের ঝালরে, নিশানে, নানান আভরণে, সাজসজ্জায় নৌকাগুলো বিচিত্র রূপ ধারণ করে। খুদু মিঞা নামে এক নিপুণ কারিগর বংশপরম্পরাক্রমে এই কারুকর্মটি করে আসছেন। তিনিই ভেলার সমস্ত আলোর আভরণ, গম্বুজ, মিনার, তোরণ, বারান্দা, ময়ূর, নিশান প্রভৃতি তৈরি করেন।

খাজা খিজিরের নামে সিন্নি

ময়ূরপঙ্খীগুলো ওয়াসিফ মঞ্জিলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নবাববাড়ির লোকজন মকরের মুখে ফুলের মালা বেঁধে দেন। একে বলে সেহারা বাঁধা। তারপর খাজা খিজিরের জন্যে সুজির পায়েস, রুটির সিন্নি আর সোনার পিদ্দিম নিয়ে বাজনাবাদ্যি করে মিছিল আসে তোপখানার ঘাটে। ময়ূরপঙ্খী চারটি ভেলার মাঝখানে স্থাপন করা হয়। তারপর খাজা খিজিরের নামে সোনার পিদ্দিম

আর ভেলার সব মোমবাতি জ্বেলে দেওয়ার রীতি। তোপখানার তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এর নাম বেরা কাটা।

বেরা ভাসানো ছাড়া আর একটি অনুষ্ঠান আছে, তার নাম কমল ভাসানো। কলার পেটোর ওপরে মোমভর্তি গেলাস বসিয়ে রঙিন কাগজের ঘেরাটোপে সাজিয়ে সেইগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভাগীরথীর বুকে দ্রুত ধাবমান সেই বিপুল সংখ্যক আলোর কমল চোখে যেন বিভ্রম সৃষ্টি করে।

সোদো ভাসানোর সঙ্গে মিল

এটি মুসলমানি উৎসব। ভাদ্র মাসে কলাগাছের পেটোতে কাগজ দিয়ে নৌকা সাজিয়ে, তার ভেতরে এলাচদানা, বাতাসার সিন্নি রেখে, ধূপ চেরাগ জ্বেলে পীরের নামে উৎসর্গ করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা এক সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কলকাতাতেও গঙ্গায়, পুকুরে মুসলমানদের ঐরকম নৌকা ভাসাতে দেখেছি। বাঙালি হিন্দু মেয়েরাও পৌষসংক্রান্তিতে ঠিক এইরকমভাবেই সোদো ব্রত করেন। কলার পেটোয় নৌকা বানিয়ে গাঁদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতরে বাতাসা রেখে পিদ্দিম জ্বালিয়ে নদীতে, পুকুরে ভাসিয়ে দেন তাঁরা। এর নাম সোদো ভাসানো। মুসলমানদের এই বেরা ভাসানোর সঙ্গে হিন্দু মেয়েদের সোদো ভাসানোর বেশ মিল আছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের বেরা ভাসানোর উৎসবে যে রকম ভিড় আর জাঁকজমক হয়, বাংলাদেশে এই উৎসবে সেইরকমটি আর কোথাও হয় বলে শুনিনি। মুর্শিদাবাদের এই উৎসবটির সূত্রপাতে নাকি নবাব-নাজিমরাই ছিলেন। এখনও এর সঙ্গে তাঁদের বংশধরদের যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি। তবুও এটি এখন আর শুধু নবাববাড়ির উৎসব নয়। অগণিত সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত যোগদানে এটি একটি প্রকৃত লোকোৎসবে পরিণত হয়েছে। আর শুধু মুসলমান সম্প্রদায়েরই লোক নয়, হিন্দুরাও এতে দলে দলে যোগ দেয় সমান উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে।

দারুণ ভিড়

এই বিচিত্র লোকোৎসবে যে বৃহৎ জনসমাগম ঘটে তার পরিচয় পেয়েছি সেদিন মুর্শিদাবাদে যেতে ট্রেনে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকেই সেদিন ট্রেনে মুর্শিদাবাদ যাত্রীদের ভিড় হতে শুরু করেছিল। তারপর পলাশি, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর প্রভৃতি স্টেশনের তো কথাই নেই। স্টেশনে দেখেছি, লোক থই থই করছে। মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চার দল গাদাগাদি হয়ে স্টেশনে বসে আছে ট্রেনে চড়ার অপেক্ষায়। উত্তরে লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্টেশনের ঐ একই অবস্থা। ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা মেলে না—ভিড়ের চাপে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবার দাখিল। শুধু ট্রেনেই নয়, বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসেছে মুর্শিদাবাদে বাসে, ট্যাক্সিতে, সাইকেল রিক্সায়। পায়ে হাঁটাও বাদ যায়নি।

আর নৌকা তো আছেই। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সারাদিন নৌকাবোঝাই লোক এসে নেমেছে মুর্শিদাবাদের ঘাটে ঘাটে। এইসব নৌকার মধ্যে অনেকে কাগজের মিনারে সেজে এ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোর ঝাড়, গেট নিয়ে এসেছে রাতের বেরা উৎসবের ভেলার সঙ্গে যাবার জন্যে। কোনও কোনও নৌকা আবার ডায়নামো চালিয়ে ইলেকট্রিক রঙিন কার আর টিউব লাইটের আলোয় সেজে এসেছে।

নিজামত কেল্লার উত্তর দরজা থেকে ওয়াসিফ মঞ্জিল পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী রাস্তায় খাবারদাবার, পুতুলখেলনা, ঘর-গেরস্থালির জিনিসপত্রের দোকানও বসে গেছে। মাত্র একটা রাতের মামলা। তবুও লোক আসার বিরাম নেই। তোপখানার ঘাট থেকে দক্ষিণে বরাবর গঙ্গার ধারে খালি

মানুষের মাথা আর মাথা। আর সেই ভিড়ের চাপ সবচেয়ে বেশি হল রাত্রি এগারোটা নাগাদ. যখন নবাববাড়ি থেকে ময়ূরপঙ্খীর মিছিল এল আর ভাগীরথীতে বেরা কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হল। মুর্শিদাবাদে মহরমেও খুব ভিড় হয় কয়েকদিন ধরে। বেরাভাসানো একটি রাতের উৎসব। কিন্তু তাতে যে ভিড় হয়, তার চাপ বোধহয় মহরমের কদিনের ভিড়কে ডিঙিয়ে যায় সহজে।

নবাব-নাজিমদের আমলে এ-উৎসবের যে জৌলুস ছিল এখন তার হাজার অংশেরও একাংশ নেই। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন তাঁরা। পরবর্তীকালে অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ক্লাইভ আর তাঁর পরবর্তী ইংরেজ ধুরন্ধরদের প্যাঁচে নবাব-নাজিমদের ঐ গালভরা উপাধিটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজদের হাতের পুতুল হিসেবে তাঁরা মসনদে উঠতেন, আর সেখান থেকে নামতেন। ইংরেজদের মঞ্জুর করা নিজামতি বৃত্তি নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। তবুও অনেক লাখ টাকা তাঁদের হাতে আসত। সুতরাং দরাজ হাতে আমোদআহ্লাদে টাকা খরচের ইতিহাস যে তাঁরা রচনা করে যাবেন তাতে সন্দেহ কী। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রজাপুঞ্জের দিকেও কিছু সদয় দৃষ্টিপাতে অর্থব্যয়ও করে গেছেন। কিন্তু নবাব-নাজিমরা বিলাসব্যসনে এমন নাম কিনে গেছেন যে, লোকে আজও কারও অমিতব্যয়িতা দেখলে বলে—নবাবী করে টাকা ওড়াচ্ছেন উনি।

এ-উৎসবের প্রবর্তক কে?

মুর্শিদাবাদের বেরা-উৎসবের প্রবর্তক কে, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ সিভিল সার্জন মেজর জে. এইচ. টাল্ ওয়াল্শ্ তাঁর ১৯০২ সালে রচিত 'এ হিস্ট্রি অফ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট'-এর ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুর্শিদকুলী খাঁ এই উৎসব করতেন। তিনিই মুর্শিদাবাদে এ-উৎসবের প্রবর্তক কিনা ওয়াল্শ্ কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করেন নি। প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর সিয়র-উল্-মুতাখ্-খরীন্ গ্রন্থে লিখেছেন, সিরাজদ্দৌল্লা মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের সূত্রপাত করেছিলেন। ডক্টর জেমস্ ওয়াইজও ঐ মুসলমান ঐতিহাসিকের মন্তব্যের জোরে তাঁর রচিত 'দি ম্যাহমেডানস অফ্ ইস্টার্ন বেঙ্গল' প্রবন্ধের ৩৯ পৃষ্ঠায় সিরাজকেই মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসবের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন। ('জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', তৃতীয় খণ্ড, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ)। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত রেখে গেছেন তাঁর 'দি ট্রাভেলস্ অফ্ এ হিন্দু' (১৮৬৯) নামক গ্রন্থে, তার ৮২ পৃষ্ঠায় তিনি মুর্শিদাবাদের বেরা-উৎসবের বিবরণে বলেছেন, সিরাজই মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের প্রবর্তক।

যদি মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদে এই উৎসব শুরু হয়ে থাকে তবে এই উৎসবের বয়স প্রায় আড়াইশো বছর হবে। আর সিরাজের আমলে শুরু হলে এর বয়স শ-দুয়েক বছর তো হবেই। মুর্শিদকুলী খাঁর আগে মুর্শিদাবাদের নাম যখন মুখসুদাবাদ ছিল কে জানে, তখন থেকে হয়তো এ-উৎসব চলে আসছে।

সেকালের উৎসবের চেহারা

কিন্তু দুশো-আড়াইশো বছরের মধ্যে এ-উৎসবের জৌলুস অনেক কমে গেছে। নবাব-নাজিমদের আমলে লাখ লাখ টাকা খরচ হত উৎসবে। আমির-ওমরাহ, ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে তাঁদের খানাপিনা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়ের আসর জমত। বেরা যখন ভাসিয়ে দেওয়া হত তখন তার সঙ্গে নৌকায় নৌকায় চলত বাঈজিদের অবিরাম নাচ-গান। নিজামত কেল্লার ঠিক উল্টোদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমপারে

রোশনিবাগের রোশনাই-এর কথা পুরনো ইতিহাসের কেতাবে লেখা আছে। লক্ষ লক্ষ মোমবাতিতে, সেজের আলোয়, বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনে তৈরি আলোর মিনারে, তোরণে রোশনিবাগ ঝলমল করে উঠত। সারারাত্রি ধরে পোড়ানো আতসবাজির আলোতে উদ্ভাসিত হত রাত্রি। আর তখন কী প্রকাণ্ড ভেলাই না তৈরি হত। ওয়াল্‌শ্‌ সাহেব তাঁর মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে (১৯০২ সালের কিছু আগে লেখা) যে ভেলাটির কথা লিখেছেন, সেটি ছিল চওড়ায় ১২৫ হাত অর্থাৎ ১৮৭ ফুট। ওয়াল্‌শ্‌ সাহেব যখন মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, তখন নবাব-নাজিমদের একেবারে পড়তি দশা। নামকোওয়াস্তে যেটুকু ক্ষমতা ছিল তাও ইংরেজ শাসকরা কেড়ে নিয়েছেন। ফেরিদুনজাই মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব-নাজিম। তারপরে সে উপাধি অদৃশ্য হয়ে শুধু 'নবাব-বাহাদুরে' এসে ঠেকেছে। সুতরাং উৎসববৈভবের মাত্রাও কমে গেছে। নবাব-নাজিমদের মধ্যে মীরজাফরের ছেলে মুবারকউদ্দৌলার কথায় ওয়াল্‌শ্‌ সাহেব লিখেছেন, তিনি ঈদ, বেরা, দেওয়ালি প্রভৃতি উৎসবে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন। তিনি মসনদে ছিলেন খ্রিস্টীয় ১৭৭০ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত। উইলিয়ম হজেস্‌ খৃষ্টীয় ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতভ্রমণের যে বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর 'ট্রাভেল্‌স্‌ অফ ইন্ডিয়া'তে, তার ৩৫ পৃষ্ঠাতে মুর্শিদাবাদের এই বেরা-উৎসবের বিবরণ আছে। মনে হয়, তিনি মুবারকউদ্দৌলারই বেরা উৎসবই দেখেছিলেন।

সেই প্রাচীন বিরাট উৎসবের ভগ্নাংশ এখন কোনওরকমে টিকে আছে। নিজামতি ব্যান্ডের বদলে এখন আধুনিক ভাড়াকরা ব্যান্ড পার্টি আসে। নৌকা থেকে লাউডস্পিকারে রেকর্ড সঙ্গীতের কমপিটিশান চলে। খাজা খিজিরের জন্যে সিন্নি নিয়ে চারটি ময়ূরপঙ্খী আজও আসে নবাববাড়ি থেকে জুলুস করে। তার জুলুস নামটুকু আছে, কিন্তু আগেকার সেই জৌলুস আর নেই। সোনার পিদ্দিম জ্বালানো সম্বন্ধে লোকে এখন ঘোর সন্দিহান। এখন যে বেরাটি ভাসান হয়, আকারেও সেটি অনেক ছোট হয়ে এসেছে। এখন লম্বায় আর চওড়ায় দুদিকেই সেটি ৩০ ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। রোশনিবাগে এখন ইলেকট্রিক আলোর একটা ছোটখাট গেট তৈরি করে তার রোশনাই-এর নামের পিত্তি রক্ষে হচ্ছে। আর তোপখানার ঘাটের সামনে একটাও আলো থাকে না। অন্য জায়গায় আলোর কথা তো দূরে। বাজির দফাও এখন রফা হয়েছে। ঘণ্টাখানেকও বাজি পোড়ে কিনা সন্দেহ।

একালের অতিথি আপ্যায়ন

তোপখানা থেকে সিকি মাইল দক্ষিণে ওয়াসিফ মঞ্জিলের সামনে বাঁধানো চাঁদনিতে একালের হোমরাচোমরার দল অর্থাৎ কিছু সরকারি অফিসার আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসেন, ভাড়াকরা ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারে বসেন। গালচে, কার্পেট, পর্দা, ঝালর, সোনা-রুপোর আসাসোঁটা, আতরদান, পানদান, গেলাস, থালা এখন গরহাজির। কালিয়া, পোলাও, কোপ্তা, কাবাবের ২৯ দফার বদলে এখন শুধু কোল্ড ড্রিঙ্ক, সিগারেট, পানের খিলি দিয়েই মানরক্ষার ব্যবস্থা।

একালের হোমরাচোমরার দল এই চাঁদনিতেই বসে স্রোতের টানে দ্রুত চলমান বেরাটি আর বাজিপোড়ানো দেখেন। নামমাত্র গোটাকতক বাজি। তাও তোপখানার ঘাট থেকে বেরার যাত্রারম্ভে জ্বালানো হয় না। হোমরাচোমরাদের দেখবার সুবিধের জন্যে বেরা চাঁদনির কাছাকাছি ভেসে এলেই তবে সেগুলি জ্বালানো শুরু হয়। এখন মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরার গায়ে আঁটা কদমঝাড়, ঝরণা, তুবড়ি, রংমশাল নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এইসব বাজি থেকে উৎসারিত ক্ষণকালীন আলোর ঝরনায় স্নান করতে করতে দীপময় সেই অভিনব আলোকযান যখন অন্ধকার রাত্রে রূপের ঢেউ তুলে স্বপ্নলোকবিহারিণী সুন্দরীর মত ভাগীরথীর দ্রুত স্রোতের টানে দক্ষিণমুখে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন মানুষ আজও মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

শেষ পরিণতি

নিজামতি কেল্লা থেকে মাইল দুই-আড়াই দক্ষিণে আমিনাগঞ্জে যখন ভেলাখানি গিয়ে পৌছয়, তখন তার মোমবাতি নিঃশেষ। অভ্রের ঘেরাটোপগুলো আগুনে পুড়ে কুৎসিত রূপ ধরেছে। ময়ূরের চূড়ো, ঝালর, নিশান স্খলিত। আর দুপাশ থেকে হিংস্র নেকড়ের মত একদল মানুষ সাঁতরে কিংবা নৌকায় চড়ে এসে সেই ভেলাতে লুটপাট করে তার অবশিষ্ট যা-কিছু আভরণ-উপকরণ থাকে সব খসিয়ে নেয়। কম বাঁশ লাগে না এই ভেলা তৈরিতে। সেই বাঁশগুলোও তারা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যায়।

আলোকতরীর দেবতা

সর্বাঙ্গ মোমবাতির আলোয় গহনায় ঝলমল। তুবড়ি, রংমশাল, কদমঝাড়, ঝরনার উদ্‌গলিত বিচিত্র আলোর ধারায় ক্ষণে ক্ষণে অভিস্নাত। গম্বুজ, মিনার, অলিন্দ, তোরণে ভূষিত স্বপ্নলোকের আলোকপুরী। রাতের কালো ভাগীরথীর বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেল—ক্ষিপ্রচরণা রূপসী কুহকিনীর মত। কে বলবে—কলাগাছ, বাঁশ, বাঁখারি, কাগজে তৈরি ওর অস্থিপঞ্জর! আলোর ঘেরাটোপে ঢাকা পড়ে আছে সে রূঢ় স্থূল বাস্তব রূপ। প্রদীপ্ত রূপে কল্পলোকের ইশারা দিয়ে নিমেষে সে অদৃশ্য হয়ে গেল ভাগীরথীর খরস্রোতের সঙ্গে।

মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত বেরা ভাসান উৎসবের বিচিত্র আলোকতরী ওটি। হাজার হাজার কলাগাছ আর কয়েক শো বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় ভেলাটি। ভেলার ওপরে থাকে চারটি বড় বড় ময়ূরপঙ্খী। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্রে পীর খাজা খিজিরের নামে ভেলাটি উৎসর্গ করে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, আলোকসজ্জা আর বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে। ভেলার ভেতরে পীরের উদ্দেশ্যে ধূপধুনোর সঙ্গে একটি সোনার পিদ্দিম জ্বেলে দেওয়া হয়। আর নিবেদিত হয় রুটি আর সুজির পায়েস। ভাগীরথীর দু-ধারে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক এই বেরা ভাসান দেখে সোৎসাহে। শুধু আলোর গম্বুজ, মিনারওলা প্রকাণ্ড ভেলাটিই নয়, কলাগাছের থোড়ের ওপরে রঙিন কাগজের ঘেরাটোপের ভেতরে মোমভর্তি মাটির গেলাসে পলতে বসিয়ে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়। এর নাম কমল। কমলগুলি সারি দিয়ে ভাগীরথীর বুক আলো করে ভেসে চলে। আগে আগে এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে অগণিত আলোর কমল ভেসে যেত ভাগীরথীর জলে। এখন তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এ বৎসর মাত্র গুটি ষাটেক কমল ভাসানো হয়েছে নবাবি এস্টেট থেকে। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণও কিছু কিছু কমল ভাসিয়েছে খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে, হলুদ, পান, কলা, বাতাসা, ছোট্ট ছোট্ট ভেলার ভেতরে রেখে। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্রে মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর বুকে অনুষ্ঠিত এই বিচিত্র উৎসবটির বিবরণ পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দিয়েছি।

উৎসবটি মুখ্যত মুসলমান সম্প্রদায়েরই। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়েরও অনেকে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে, খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তি জানায়।

খাজা খিজিরের পরিচয় সম্বন্ধে কিন্তু মুসলমান সমাজেই নানা মুনির নানা মত। কয়েকজন প্রাচীন ইংরেজ ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে গেছেন। হান্টার সাহেব লিখেছেন : 'খাজা খিজিরে'র অর্থ শ্যামল প্রভু; এটি মুসলমানদের অন্যতম পয়গম্বর ইলিয়াসেরই নাম। তিনি জীবের জীবনরক্ষার জন্যে জলের উৎসধারার আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজে জলাধিদেবতা রূপেই তিনি সম্মানিত। তাঁকেই কেন্দ্র করে নদীতে আলো দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট নৌকা ভাসানোর উৎসব প্রচলিত হয়েছে। ('স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ মুর্শিদাবাদ', পৃষ্ঠা ৬৯-৭০)।

ড. জেমস ওয়াইজের তথ্য

ড. জেমস ওয়াইজ ভারতীয়, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ সম্বন্ধে একটি তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ১৮৯৪ সালে, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের জার্নালের ৬৩ সংখ্যক খণ্ডে। প্রবন্ধটির নাম—'দি ম্যাহমেডানস অফ্ ইস্টার্ন বেঙ্গল'। তিনি পূর্ববঙ্গের তদানীন্তন মুসলমান সমাজের মধ্যে যে সমস্ত পীর-ফকিরদের

প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের বিবরণ সরেজমিনে সংগ্রহ করে ঐ প্রবন্ধটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ওতে লিখেছেন, "খাজা খিজিরের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত। কোরানের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আল্ খিদিরের সন্ধানে মুসা ও জোসুয়ার অভিযান কাহিনী বিবৃত আছে। আল্ খিদির জুলকারনৈন নামেও অভিহিত। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারও সমগ্র প্রাচ্যদেশে জুলকারনৈন নামে পরিচিত। অতএব খাজা খিজির আলেকজান্ডার ছাড়া যে আর কেউ নন, তেমন সিদ্ধান্তই করতে হয়। মুসলমান শাস্ত্রের অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে ইলিয়াস বা ইলিজাহ্, যিনি আব্-ই-হায়াত্ অর্থাৎ জীবন-বারি পান করে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, তিনি এবং খাজা খিজির একই অভিন্ন ব্যক্তি। অনেকে আবার বলে থাকেন, তিনি জুলকারনৈন কিংবা কায়কোবাদের সুহৃদ, উপদেষ্টা ও সেনাপতি ছিলেন।

খাজা খিজির যেই হোন না কেন, এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে, তিনি ভারতের সমুদ্র ও নদ-নদীতে বাস করেন, তিনি নাবিকদের জাহাজ নৌকা প্রভৃতি বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করে থাকেন। সবাই তাঁর দর্শন পায় না। যাঁরা একনাগাড়ে চল্লিশ দিন ধরে নদীর তীরে চোখ রেখে বসে থাকতে পারেন তাঁরাই কেবল তাঁর দর্শন লাভ করেন। (ডঃ জেমস ওয়াইজ এখানে পাদটীকায় লিখেছেন, যাঁর এই রকম সৌভাগ্য ঘটে, তিনি সাধারণত ভিস্তিওয়ালারই কাজ নেন)। সকল শ্রেণীর মুসলমানরা রোগে, বিপদে তাঁর কাছে মানত করেন। পুত্রলাভাদি সৌভাগ্যের উদয়ে তাঁরই আশীর্বাদে এসব ঘটেছে বলে মনে করে তাঁর উদ্দেশ্যে সিন্নি দেন।

মুসলমানি বৎসরের শেষ বৃহস্পতিবারেই বেরা উৎসবটি করণীয়। বাংলাদেশে কিন্তু হিন্দুদের মাস ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবারেই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাদ্র মাসেই বর্ষা ঋতুর অবসানের সূচনা। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই লোকই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে মাঝিমাল্লা, জেলেদেরই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।.......মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসবের সময় লোকে ভাগীরথীর ধারে কয়েক টুকরো আদা, একটু চাল আর দু তিনটি কলাও নিবেদন করে থাকে।" (উল্লিখিত জার্নালের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)।

জলের মধ্যে অশরীরী আত্মার বাসকল্পনা প্রাচীন পারস্য দেশ কিংবা এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়— যাদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা হোক না কেন, এদেশের মুসলমান সমাজ যে এটিকে বিনা দ্বিধায় ধর্মীয় সংস্কার হিসাবে গ্রহণ করেছেন, ডঃ জেমস ওয়াইজ তাঁর প্রবন্ধেও সে কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শুধু বাংলাদেশেই নয়, মুসলিম-অধ্যুষিত আরও অনেক দেশে সমুদ্র-অভিযাত্রী মানুষদের মধ্যে নানান জল-পীর কিংবা জলাধিদেবতার প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি রয়েছে। অনেক মুসলমান মাঝি-মাল্লার বিশ্বাস, পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রের অংশবিশেষের অধিকর্তা হচ্ছেন আবদুল কাদির জিলানি, পারস্যোপসাগরের সন্নিকটবর্তী সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন মামাসালমা। জেমস মোরিয়ার তাঁর 'এ জার্নি থ্রু পার্সিয়া'র ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ভারতীয় মাঝিমাল্লাদের পারস্যোপসাগরের কাছ দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাবার সময় তিনি তাদের মামাসালমা দেবীর উদ্দেশে নারকেল, ফল, ফুল ইত্যাদি অর্ঘ্য নিবেদন করতে দেখেছেন। এইসব দেবদেবীরা ছাড়া 'কানুন-ই-ইসলামে', ইবন বতুতার ভ্রমণবিবরণীতে এবং পাদরি ওয়ার্ডের 'হিন্দুজ'-এ আরও কয়েকজন সমুদ্রবাসী জলদেবতা বা পীরের উল্লেখ আছে, জলযাত্রা নির্বিঘ্ন হবার জন্যে মুসলমান মাঝি-মাল্লারা যাঁদের নাম স্মরণ করেন। ঐ জলদেবতাদের মধ্যে আছেন, ভারতের করোমণ্ডল উপকূলে কাদের ওয়ালি সাহেব, কাম্বে উপসাগরে আলি হায়দারি, সিরাজে আবু ইসাক আল কাজরুনি। বলা বাহুল্য এইসব জলপীরের বা জলাধিদেবতার কোনও কালে বাস্তব অস্তিত্বের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরনো কালের পুরনো ধরনের জলযানে নিরন্তর অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কূলহীন দরিয়ায় পাড়ি দিতে গিয়ে

অসহায় মাঝি-মাল্লারা বুকে ভরসা আনবার জন্যে এইসব জলপীরদের কল্পনা করেছে।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এতগুলি জলাধিদেবতা বা জলপীর থাকতেও বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে খাজা খিজির কীভাবে এসে হাজির হলেন সেটি বোধগম্য হয় না।

পীর বদরের কাহিনী

এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জেলে, মাঝি-মাল্লাদের নৌকায় যাত্রা শুরুর সময়ে কিংবা নদীতে সমুদ্রে ঝড়তুফানে পীর বদর বা পাঁচপীরের নাম স্মরণের কথা উল্লেখযোগ্য। ডঃ জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, পীর বদর চট্টগ্রামে বাস করতেন বলে মুসলমানরা মনে করেন। তবে তিনি কেমন করে জলপীর বনে গেলেন তা কেউ বলতে পারেন না। চট্টগ্রামে পীর বদরের দরগা আছে। সেখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকরা আসে, মানত করে, পিদ্দিম জ্বেলে দেয়। ঐ দরগার ফকিরের কাছ থেকে ড জেমস ওয়াইজ শুনেছেন, পীর বদর নাকি আকিয়াব থেকে একটি পাহাড় আঁকড়ে ধরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামে এসে হাজির হয়েছিলেন, আর সেখান থেকে ভূতপ্রেতদের বাসা ভেঙে তিনি সমস্ত দেশটি অধিকার করেছিলেন। কেউ কেউ আবার বলেন, পাস্ গল্ পিরিস বদেলিও নামে এক পর্তুগীজ মাল্লা সমুদ্রে জাহাজডুবির পর ভাসতে ভাসতে চট্টগ্রামে এসে হাজির হয়েছিলেন। ঐ অসীম সাহসিক কাজের খ্যাতিতে পিরিস বদেলিও কালক্রমে পীর বদরে পরিণত হয়েছেন। ড. জেমস ওয়াইজের মতে, পীর বদর হচ্ছেন বদরুদ্দিন বদর-ই-আলম নামে একজন মুসলমান সন্তপুরুষ। তিনি চট্টগ্রামে অনেক দিন বাস করেছিলেন। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিহারের ছোট দরগাতে তাঁর কবর আছে।

অশরিয়তি অনুষ্ঠান

খাজা খিজির এবং ঐতিহাসিক পুরুষ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার, এঁরা দুজনে অভিন্ন পুরুষ— ড. জেমস্ ওয়াইজের এই সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয়। কিছুটা উপকথা, কিছুটা বাস্তবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট মুসলমান সমাজের এই জলাধিদেবতার পরিচয় যে রহস্যাচ্ছন্ন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুর্শিদাবাদে যেভাবে বেরা ভাসান উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় সেটি যে সম্পূর্ণ মুসলিম শরিয়তি বিধানে অনুষ্ঠিত হয় না, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমত, মুসলমানি মাসের বদলে হিন্দুদের ভাদ্র মাসে এবং মুসলমানি দিনের বদলে হিন্দুদের লক্ষ্মীবার নামে অভিহিত বৃহস্পতিবারেই উৎসবটির দিন নির্ধারিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, খাজা খিজিরের উদ্দেশে সুজির পায়েস, রুটি ইত্যাদি ভোগ নিবেদন করা, মানত করা, সোনার পিদ্দিম জ্বেলে দেওয়া—এইসব অনুষ্ঠানও শরিয়তসম্মত নয়। তৃতীয়ত, হিন্দুদের জলদেবতাদের মধ্যে বরুণ আর গঙ্গা প্রসিদ্ধ। গঙ্গা মকরবাহনা। বরুণও তাই। খাজা খিজিরের উদ্দেশে ভাগীরথীর বুকে মকরমুখ নৌকা ভাসানোর ওপরে গঙ্গা ও বরুণ পূজার দূরাগত ছায়া যেন পড়েছে বলে মনে হয়। চতুর্থত, বিপুল বাদ্যভাণ্ড সহকারে আলোকসজ্জিত এমন জলযান ভাসানোর রীতি মুসলিম-অধ্যুষিত আর কোনও দেশেই নেই। এটিকে নিছক সামাজিক অনুষ্ঠান বলেও চালানো যায় না।

একটি ধর্মীয় সংস্কারের ছাপ এর সর্বাঙ্গে মুদ্রিত। রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্গতির অবসান ও সুখ-সমৃদ্ধির কামনায় পীরের কাছে প্রার্থনায়, সেলাম ও প্রণাম নিবেদনে, জলে কমল ভাসানোয়, ভাগীরথীর তীরে অর্ঘ্য প্রদানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোকদের ধর্মীয় সংস্কারে বিভিন্ন কৃত্যাপালনে তৎপরতা দেখেই ঐ কথা মনে হয়।

হিন্দু-মুসলমানের পূজিত পীর

বাংলাদেশে মুসলমান পীরপয়গম্বরদের কাছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোকেদের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদনের ইতিহাস শুরু হয়েছে—সেই সুদূর ত্রয়োদশ শতকে, তুর্কিদের বাংলা-বিজয়ের সময় থেকে। এই পীর-ফকিরদের মধ্যে অনেকে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন খ্যাতিমান পুরুষ রূপে সম্মানিত হয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এখানকার হিন্দু রাজ্যের উচ্ছেদ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন, অনেকে তাতে সফল হয়ে গাজিও হয়েছেন। এঁদেরও অনেকে কালক্রমে মুসলমান-সমাজে পীরের সম্মানে পূজিত হয়েছেন। হিন্দু সমাজও তাঁদের কাছে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজি হুগলি জেলায় আরামবাগের গড়-মান্দারনের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে ঐ স্থানটি দখল করেছিলেন। তাঁর দরগা পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োর হিন্দুরাজ্য-উৎখাতকারী শাহ সুফিউদ্দিনের সমাধি এক বিখ্যাত দরগা। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে যে প্রকাণ্ড মেলা হয়, তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিরাট জনসমাগম হয়। লোকে পীরপুকুরে স্নান করে ধানকড়ি ছড়াতে ছড়াতে পীরের আস্তানায় গিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করে। পীরপুকুরের জল তীর্থবারি বলে পরিগণিত। এসব ব্যাপার না শরিয়তসম্মত, না সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মত। ত্রিবেণীর সপ্তগ্রামবিজয়ী জাফর খাঁ একটি বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের মধ্যে সমাধিস্থ। বিখ্যাত গঙ্গাস্তোত্রের রচয়িতা দরফ খাঁ আর জাফর খাঁ একই অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনেকে মনে করেন। দরফ খাঁ বাংলার ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরামের দিগ্বন্দনায় বন্দিত। এই রকম অনেক পীরের আস্তানা বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ছড়ানো। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে মানত করেন, ফুল, সিন্নি, মাটির ঘোড়া দেন, বার্ষিক উৎসবাদিতে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর এমনই এক হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগের সৃষ্ট দেবতা, আজ নানা দরগায় ফকিরের আস্তানায় এবং হিন্দুদের বাড়িতে ব্রাহ্মণের মন্ত্রে যাঁর পূজা-অর্চনা মহা ধুমধামে চলছে। মুর্শিদাবাদের বেরা ভাসান উৎসবের আলোকতরণীর অধিদেবতা খাজা খিজির এমনই এক দেবতায় পরিণত হয়েছেন বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

রাজ্যহীনদের রাজা-রাজা খেলা

রাজা রাজড়াদের পালা চুকে গেছে, কিন্তু তাঁদের লীলা এখনও শেষ হয়নি। এখনও তাঁদের অনেকে রাজা-রাজা খেলা করছেন। বাঁকুড়া জেলার খাতড়ায় ইঁদ পরবে এমন রাজা রাজা খেলা দেখে এসেছি।

ঐ সব অঞ্চলের রাজাদের রাজ্যপাটের চেহারা এখন অন্য রকমের। হাতিশালের হাতি মরেছে। ঘোড়াশাল শূন্য। পাত্র, মিত্র, সভাসদ, পাইক, বরকন্দাজের দল উধাও। যাঁদের রাজপ্রাসাদের দেউড়ি এখনও ভেঙে পড়েনি, সেখানে এখন আর দাঁড়িয়ে থাকে না ঢাল-তরোয়াল হাতে সেপাই; প্রহরে প্রহরে বাজে না নহবৎ। আর, সাত দেউড়ির পারে জরাজীর্ণ রাজপ্রাসাদে বংশধররা যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণের কটা টাকার পাবার জন্য মহকুমার সদর অফিসে ধর্না দিয়ে পড়ে আছেন। কারও কারও রাজ্যপাট আবার অনেকদিনই লোপাট হয়েছে বকেয়া খাজনা আর দেনার দায়ে, গৃহবিবাদে আর মামলা মোকদ্দমায়। অতএব এখন তাঁদের ক্ষতিপূরণের টাকা পাবার ভরসাও নেই, ভাবনাও নেই। কারও কারও কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। তাতেই তাঁরা পুরনো রাজগিব স্মৃতিরেশ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মল্লরাজাদের রাজধানী খাস বিষ্ণুপুরই অতীত ঐশ্বর্যের ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে পড়ে আছে। বাঁকুড়ার অন্যান্য অংশের অন্য সামন্ত রাজত্বের কথাই তো নেই। খাতড়া, অম্বিকানগর, গড়রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা প্রভৃতি বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশের ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজ্যে রাজ্যে ঘুরলে তাঁদের অতীত ঐশ্বর্যের ভাঙা টুকরোও আর নজরে পড়বে না।

কিন্তু শুনেছি, কী দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল এইসব রাজাদের! তাঁরা নাকি বসে থাকলে, তাঁদের সামনে দিয়ে রাস্তায় কারও জুতো পায়ে দিয়ে, মাথায় ছাতা খুলে যাবার হুকুম ছিল না। জুতো খুলে, ছাতা মুড়ে তবে যেতে হত। রাজারাই ছিলেন প্রজাসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সেই রাজাদের রাজ্যপাট ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে প্রজাতন্ত্রী ভারতে। রাজ্যপাট না থাক, লোকে তাঁদের কিন্তু এখনও বলে রাজা, তাঁদের বাড়ির নাম রাজবাড়ি। অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস, চট করে কি ছাড়া যায়! রাজারা তাই আজ প্রজাদেব মুখেই বেঁচে আছেন।

ইঁদ পরব বা ইন্দ্রোৎসব এই রাজা-রাজড়াদেরই উৎসব। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে রাজারা দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজা তোলেন, তাঁর পুজো করেন। শ্রী, সম্পদ. শত্রুবিজয়, স্ব-রাজ্যের প্রবর্ধন, প্রজাবৃন্দেব সন্তোষে অবস্থান---এই সমস্ত কামনা পূরণের জন্যে শাস্ত্রে ইন্দ্রোৎসবের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাঁকুড়ার ক্ষত্রিয় রাজারা যে এই উৎসবের আয়োজন করবেন, তা বিচিত্র কী। বাঁকুড়া জেলার ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজ্যে এই উৎসবের রেওয়াজ অনেক দিনের।

ন-মহলের ইঁদ পরব

বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ জঙ্গলমহল পরগণা নামে বিখ্যাত হয়েছে। এর সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজাদের শাসিত ন-মহল নামে অভিহিত নটি অঞ্চল বাংলা দেশের ইঁদ পরবের কেন্দ্রভূমি বলে পরিগণিত। ন-মহল হচ্ছে---বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, খাতড়া (আগে নাম ছিল সুপুর পরগণা) ও রায়পুর, পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ও বোরাবাজার, বিহারের সিংভূম জেলার ঘাটশিলা ও নরসিংহগড় এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ও বাঁশবন। এই নটি অঞ্চলের শাসকদের ঐশ্বর্য ও দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই এই ন-মহলের ইঁদ পরবেরও জাঁকজমকের বেশি খ্যাতি। ন-মহলের দেখাদেখি পরে অবশ্য অন্যত্রও উৎসবটি ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই ন-মহলের মধ্যে চিরদিনই বিষ্ণুপুর আর খাতড়ার উৎসবেরই নামডাক বেশি। কিন্তু বিষ্ণুপুরের সে খ্যাতি আর অম্লান নেই। সেখানে এখন নমো নমো করে সারা হয়। একটুও ধুমধাম নেই, লোকসমাগমও নেই। মেলাও বসে না। অন্যত্রও উৎসবটি টিকে আছে। ন-মহলের মধ্যে খাতড়ার ইঁদ শেষ রেশটুকু কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে মনে হয়।

বারোয়ারিতে রাজাদের উৎসব

তার কারণও আছে। শুনলুম খাতড়ায় রাজার উদ্যোগে নয়, বারোয়ারিতে ইঁদ পরবের আয়োজন হচ্ছে। এই প্রাচীন উৎসবটির অনুষ্ঠান করেছেন তাঁরাই ইঁদকুড়িতে অর্থাৎ ইন্দ্রের ধ্বজা তোলার ময়দানে মেলা বসাচ্ছেন। রাজা-রাজড়াদের পালা সাঙ্গ হয়েছে। এখন সাধারণ মানুষদের যুগ। তাই রাজাব উৎসবের ভার একালের বারোয়ারি উদ্যোক্তারাই গ্রহণ করেছেন।

খাতড়ার রাজাদের রাজগির যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখন ইঁদ উৎসবে তাঁরা দরাজ হাতে টাকা খরচ করতেন। হাতি ঘোড়া তাঞ্জাম, রুপোর আসাসোঁটা বাজনাবাদ্যি নিয়ে, রোশনাই-এ এলাহি কাণ্ড করে রাজারা ইন্দ্রের ধ্বজা তুলতে আসতেন। সারা রাত্রি ধরে ইঁদকুড়িতে অর্থাৎ ইন্দ্রধ্বজা তোলার ময়দানে দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার সাঁওতাল, ভূমিজ, কুর্মি-মাহাতো, খেড়িয়া, বাউরি, বাগদির দল মাদল, কাড়া, ঢোল, কাঁসি, বাঁশি বাজিয়ে নাচগান করত। বিরাট মেলা বসত। সাঁওতাল-নাচই ছিল উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। বলতে গেলে এই উৎসবের কেন্দ্রে রাজা থাকলেও, এটি ওদেরই আনন্দোৎসবের রূপ নিত। এখন এতে সাঁওতালরা দলে দলে এলেও তারা আর নাচে না। মেলাটা অবশ্য জমে এখনও। কিন্তু রাজার রাজগি গেছে। তার ওপরে তিনি বৃদ্ধ অসুস্থ। এ উৎসবে স্বভাবতই তাঁর আর আগ্রহ নেই। তিনি অনেকদিনই এই উৎসবে আসা ছেড়েই দিয়েছেন। তবুও রেওয়াজ রাখতে হয়। তাই রাজার প্রতিনিধি হয়ে যুবরাজই আসেন ইঁদকুড়িতে ইঁদ তুলতে।

যুবরাজের মিছিল

এই বছরে যুবরাজ কেমনভাবে এলেন, সেটা এবার বলি। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীর রাত্তির। আকাশে চাঁদের আলোয় বান ডাকার কথা। কিন্তু তার বদলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। খাতড়ায় রাজবাড়ি থেকে ইঁদকুড়িতে যাবার সড়কটার পাশে ভাগ্যিস দোকানপাট ছিল। তাদেরই মিটমিটে আলো রাস্তায় এসে পড়েছিল। খাতড়ায় ইঁদ পরবে এই হচ্ছে খাতড়ার সড়কের হাল আমলের রোশনাই-এর ব্যবস্থা।

একটি পেট্রোম্যাক্সের আলোতে রাজবাড়ির মিছিলের রোশনাই-এর পিত্তিরক্ষের ব্যবস্থা। সেই আলোতেই দেখা গেল—দূরে আসছে উঁচু ঝুরি-ঝোলানো বিচিত্র ধবলছত্র—খাতড়ার ধবল রাজাদের কুললাঞ্ছন। ঝালরদার আড়ানি পাখাও দুলছে।

মিছিলের প্রথমে এলেন পালকির ভেতরে রাজাদের কুলবিগ্রহ—নাড়ুগোপাল। অবশ্য আসল কুলবিগ্রহ হচ্ছেন শ্যামসুন্দর জীউ। তিনি আসেননি। নাড়ুগোপালই এসেছে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে। পাল্‌কির গায়ে না আছে ঝালর, না আছে তার সোনা-রুপোর হাতল। উঁকি মেরে দেখলুম নাড়ুগোপালেরও মুকুট, বালা, হার, নূপুরের নাম গন্ধ নেই। তেল কুচকুচে উলঙ্গ নিরাভরণ নাড়ুগোপালের গায়ে কিন্তু পুরনো আমলের একখানা চমৎকার বেনারসি শাড়ি জড়ানো ছিল। পেট্রোম্যাক্সের আলোতে সেই অপরূপ বেনারসি শাড়িখানা একবার ঝিলিক মারলো—রাজ-সমারোহের পুরনো স্মৃতির মত।

এরপর যুবরাজ এলেন। প্রথমে রাজডঙ্কা অর্থাৎ একটি ছোট ঢাক, কোমরে বেঁধে কাঠি দিয়ে বাজানো হচ্ছে। সঙ্গে ঢোল, কাঁসি, বাঁশি। যুবরাজের মাথাতে ধরা হয়েছে ধবলছত্র, আর এক পাশে আড়ানি পাখা। তিনি একটি টাট্টু ঘোড়ার ওপরে বসে আছেন। ঘোড়াটা এত বেঁটে যে, যুবরাজকে দু'পা উঁচু করে রাখতে হয়েছে দুধারে, পাছে মাটিতে তাঁর পা ঠেকে যায়। যুবরাজের তরুণ বয়স, চেহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট। লাল মখমলের চাপকান পরেছেন। জামার গলায়, বুকে, কোমরে জরির চওড়া কারুকার্য। সিল্কের চুস্ত। মাথায় জরির কারুকার্যকরা টুপি। একেবারে রাজার ড্রেস যাকে বলে। কিন্তু রাজার ড্রেসের সঙ্গে পায়ে হকি বুট? সে তো অদ্ভুত মিশ্রণ! যুবরাজ ঐ জুতোই পরেছিলেন।

যুবরাজের পেছনে নাড়ুগোপালের পাল্কিরই মত আর এক পাল্কিতে ছিলেন তাঁর আর দুই ভাই। রাজবাড়ির ভাষায় যুবরাজের পরের ভাইকে বলা হয় 'হিকিমশাহ', আর তাঁর পরের ভাইকে বলা হয় 'বাবু-ভাই'। এঁদের পোশাক-পরিচ্ছেদে কিন্তু বাজা-রাজড়াদের আড়ম্বর ছিল না—ছিল স্রেফ ধুতি আর শার্ট।

ইন্দ্রধ্বজের পূজা

ইঁদকুড়িতে বিশাল একটা শালগাছ তোলা হল। তারও মাথায় ধবলছত্র আর তার সঙ্গে লেজের মত জুড়ে দেওয়া একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের পতাকা। যুবরাজ এই শালের ইন্দ্রধ্বজের পুজো করলেন পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের সঙ্গে, ইন্দ্রের উদ্দেশে লাজাঞ্জলি দিলেন, আর ইন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপ ইন্দ্রধ্বজের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। লোকে বলতে লাগল, স্বর্গের রাজা আর মর্তের রাজার মিলন হল।

দ্বাদশীর পরের দিন বাসি ইঁদপুজো। সেদিন দিনের বেলায় যুবরাজ আবার মিছিল করে এলেন আগের দিনেরই মত। তবে এদিন টুপির বদলে মাথায় ছিল তাঁর পাগড়ি। তিনি ইন্দ্রধ্বজকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন ঘোড়ায় চেপে, বাজনাবাদ্যি নিয়ে। সঙ্গে পাল্কিতে হিকিমশাহ আর বাবুভাইও ঘুরলেন। এই প্রদক্ষিণের নাম সাতভাউরি। তারপর যুবরাজ আবার ইন্দ্রধ্বজের সঙ্গে কোলাকুলি করে মিছিল করে ফিরে গেলেন। অতীত দিনের রাজসমারোহের ভগ্নাবশেষ নিয়ে রাজ্যহারা রাজাদের এই রাজা-রাজা খেলা যেমন বেমানান, তেমনই অবান্তর। তবুও এই লীলা দেখতে সেদিন ইঁদকুড়িতে ভিড় ভেঙে পড়েছিল।

খাতড়ার ইঁদেব মেলাটিতে কিন্তু এখনও খুব ভিড় হয়। খাতড়া, রানিবাঁধ, রাইপুর থানার তো বটেই তালডাংরা, ইন্দপুব, ছাতনা, বাঁকুড়া, এমনকি উত্তরে গঙ্গাজলঘাটি, বড়জোড়া প্রভৃতি থানার অন্তর্গত গ্রামেরও লোকরা আসে এই মেলায়। দক্ষিণে মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে মানভূম থেকেও লোক আসা বাদ যায় না। দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে খাতড়ার ইঁদের মেলাই এখানকার এ সময়কার সবচেয়ে বড় মেলা।

আদিবাসীদের ভিড়

মেলায় দেখলুম, সাঁওতাল, ভূমিজ, কুর্মি-মাহাতো, খেড়িয়া, গোপ, বাউরি—এরাই ভিড়ের শতকরা আশি ভাগ। ওরা নিজেদের হাতের তৈরি জিনিসপত্রও অনেক এনেছে বিক্রি করতে। বাঁশের চেঁচারিকে চিরে খুব সরু আর মসৃণ করে চাঁচা কাঠি দিয়ে বানিয়েছে ওরা ঢাকনাওলা সুন্দর গোলাকার বড় বড় পেটি। লোহার মজবুত কব্জা আর লোহার মত হাতলও তাতে আটকানো। সাঁওতালদের সুটকেশ, তোরঙ্গের কাজ চলে এই পেটিতে। খাতড়ার গ্রামাঞ্চলে সাঁওতাল-পল্লীতে তৈরি এ সুন্দর জিনিসটির চাহিদা খুব। অনেক গ্রাম থেকে ওরা এই পেটি নিয়ে এসেছে এই মেলায়

বিক্রি করতে। তাছাড়া ওদের হাতে তৈরি ডালা, চুপড়ি, মাছের খালুই—এসবও অনেক বিক্রি হতে দেখলুম। পাই নামে পরিচিত কাঠের তৈরি ছোট-বড় কুনকে, কাঠের পুতুলও ওরা খুব এনেছিল। পুতুলগুলোর তক্ষণে আদিম হাতের সারল্য আর সংযমের অদ্ভুত প্রকাশ। একালের তথাকথিত সভ্য-সমাজের এ্যাবস্টাক্ট আর্টের ধার ওরা ধারে না। অথচ ওদের হাতের কাজ এই শিল্পীদের রচনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

খাতড়া থানার গোপালপুর গ্রামের কালোপাথরের তৈরি বাসন-কোসন, সিমলাপাল থানার লক্ষ্মীসাগর আর বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কাঁসা-পেতলের ঘটি, বাটি, গোরে নামে অভিহিত ঘোড়ার দোকানও বসেছিল মেলায়। আর দেখলুম খুব বিক্রি হচ্ছে—সাঁওতাল মেয়েদের জন্যে ঢোকরা কামারদের তৈরি পেতলের বিচিত্র চুড়, বাজুবন্ধ, পায়ের আঙট আর বাঁকমল। বেলকাঠের তৈরি সরু সরু মালা বাঁকুড়ার একটি বিশিষ্ট শিল্প। আরও অনেক দোকান বসেছিল। শাঁখা, মাছধবার ছিপ, বড়শি, ঘুনি, খড়কের ঝাড়ুও এসেছিল অনেক। শুনলুম, খাতড়ার ইঁদ পরবেই এসব জিনিস বেশি আসে। গেরস্থরা এই মেলা থেকেই এইসব জিনিসের বার্ষিক চাহিদা মেটান। মোটকথা খাতড়ার এই মেলাটি এখনও গ্রামীণ মেলার রূপ ছেড়ে শহুরে রূপ ধরেনি। গ্রামীণ মানুষদেরই কেনাকাটা। মেলার আনন্দোৎসবে গ্রামীণ মানুষেরই ভিড়।

খাতড়ার এই ইন্দ্রোৎসবে আরও নানান বিচিত্র অনুষ্ঠান দেখেছি। রাজবাড়ির দুর্গোৎসবেও কতকগুলি বিচিত্র কৃত্য পালিত হয়।

খাতড়ার ইঁদ পরব

পুরনো সম্মান, আধিপত্যের ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে রাজাহারাদের রাজা-রাজা খেলার নমুনা দেখেছি ইঁদ পরবে বা ইন্দ্রোৎসবে—বাঁকুড়া জেলার খাতড়ায়। খাতড়ার এই উৎসবটির বিবরণ আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দিতে গিয়ে বলেছি, রাজা এর কেন্দ্রভূমিতে থাকলেও উৎসবোল্লাসের প্রায় ষোল আনা শরিকানা প্রজাসাধারণেরই। খাতড়ার ইঁদ মেলাই তার সাক্ষী। সেখানে দেখেছি, ভিড়ের শতকরা আশি ভাগই হচ্ছে সাঁওতাল, ভূমিজ, শবর, কুর্মি-মাহাতো, খেড়িয়া, গোপ, বাউরি প্রভৃতি সমাজের লোক। এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীই এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। এরাই এ অঞ্চলে চাষের পত্তন করেছে, বন কেটে বসত এনেছে। বলতে গেলে, এই অঞ্চলের মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির পত্তন এদের হাতেই হয়েছে।

সুদূর অতীতে এই সমস্ত প্রাচীন জনগোষ্ঠীরই বীর দুর্ধর্ষ পূর্বপুরুষরা ছোটনাগপুরের মালভূমির সংলগ্ন, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের মহারণ্য ভেদ করে জনপদ রচনা করেছিল। কালক্রমে তাঁদেরই মণ্ডলী-নায়কদের অনেকে সামন্তরাজাদের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই রাজমহিমা ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়ে প্রজাসাধারণের কাছে আরও বড় হয়ে উঠতে বাধ্য। এসব অঞ্চলের রাজাদের অধিকাংশই রাজপুতানার রাজপুত বংশের সঙ্গে নিজেদের উদ্ভবসূত্র যোজনা করে ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় দেন। নানান কিংবদন্তীর রহস্যজালে ঘেরা তাঁদের অভ্যুদয়ের কাহিনীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করা এখন দুঃসাধ্য কাজ। অনেক বহিরাগত ভাগ্যসন্ধানীর দল এ অঞ্চলে এসে বুদ্ধি ও বাহুবলে রাজ্যলাভ করেছেন—একথা অবশ্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তবুও সকলেই যে বাইরে থেকে এসেছেন, এ-কথা মেনে নেওয়া ইতিহাস-বিজ্ঞানের দিক থেকে কঠিন। অতিকথায় পূর্ণ বংশকাহিনী দিয়ে রাজমহিমাকে যত উজ্জ্বলই করে তোলা হোক না কেন, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর সৌসাদৃশ্য ও ঐক্যের কথা ভাবলে এদেশের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর সম্পর্কের কথা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

এসব অঞ্চলের রাজাদের মত প্রজাদেরও মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিদার। শবর, কুর্মি-মাহাতো প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকরা ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের পরিচয় দেন। সুতরাং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজায় প্রজায় মিলে শাস্ত্রীয় নৃপোৎসব ইঁদ পরব বা ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলনের অনুষ্ঠানে যে মাতবেন তাতে বিচিত্র কী!

ইঁদ পরব বা ইন্দ্রোৎসব বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলেরই উৎসব। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে ঐসব অঞ্চলে রাজারা শালকাঠের ইন্দ্রধ্বজ তোলেন, ইন্দ্রের পুজো করেন। কৃত্যটি পাঁজিতে 'শক্রোত্থান' অর্থাৎ ইন্দ্রের উত্থান নামে পরিচিত। অনেক দিনের পুরনো উৎসব এটি। মহাভারতের আদিপর্বে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, গর্গের গৃহ্যপদ্ধতিতে (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'নোটিসেস অফ স্যানস্ক্রিট ম্যানাস্ক্রিপট' এবং লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসের ক্যাটালগে উল্লিখিত), কালিকাপুরাণে, স্মৃতিকার জীমূতবাহনের কালবিবেকে, রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে এবং আরও অনেক শাস্ত্রে এই উৎসববিধির বিস্তৃত উল্লেখ আছে। রাজার শ্রী, সম্পদ, বিজয় লাভ, শত্রু নিপাত, শস্যহানিকর সমস্ত বিঘ্ন দূর, প্রজাপুঞ্জের সন্তোষে অবস্থান, রাজ্যের প্রবর্ধন—এই সমস্ত কামনা সিদ্ধির জন্যেই শাস্ত্রগুলি রাজাদের শক্রোত্থান বা ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলনের বিধান দিয়েছে।

পৌরাণিক কাহিনী

এই উৎসবটির মূলে বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, গর্গের গৃহ্যপদ্ধতি প্রভৃতিতে যে পৌরাণিক

কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, দৈত্যদের হাতে বারংবার পরাজিত হয়ে নিরুপায় দেবতারা ব্রহ্মার পরামর্শে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে ধরনা দিলে বিষ্ণু তাঁদের একটি ধ্বজা উপহার দেন। ঘণ্টা, মালা, ছত্র, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত বিষ্ণুতেজে উদ্ভূত সেই ধ্বজা নিয়ে ইন্দ্র দৈত্যদের পরাজিত করে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন এবং নির্ঝঞ্ঝাটে আবার স্বর্গে রাজত্ব করতে থাকেন।

মর্তে সেই শত্রুবিজয়ী ধ্বজাপূজার উদ্ভব কেমন করে হল মহাভারতের বনপর্বে তার আখ্যান বিবৃত আছে। চেদিরাজ উপরিচরবসু (বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপলের মতে, ইনি ভূমিষ্ঠ হয়েই স্বর্গে উঠে গিয়েছিলেন বলে এঁর নাম হয়েছিল উপরিচর।) একবার কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করলে স্বর্গরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে ছুটে এলেন। কঠোর তপস্যার বলে তাঁর ইন্দ্রত্ব বুঝি চেদিরাজ কেড়েই নিলেন, এই ভয়ে। তিনি চেদিরাজকে তপস্যা থেকে নিরস্ত করবার জন্যে খুব ভাল ভাল কথা বললেন, আর তাঁকে উপহার দিলেন, যখন খুশি স্বর্গে বেড়িয়ে যাবার জন্যে, স্ফটিকের তৈরি আকাশগামী বিশাল একটি রথ, যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষত অবস্থায় থাকবার জন্যে অম্লান পদ্মের একটি মালা আর শিষ্টলোকের পরিরক্ষক একটি বাঁশের লাঠি। অতঃপর চেদিরাজ তপস্যা ছেড়ে লাঠিখানি নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন আর প্রজাপুঞ্জকে নিয়ে মহোৎসবে সেটিকে পুঁতে ইন্দ্রের পূজা করলেন। ইন্দ্র পরম তৃপ্ত। তৃপ্ত হবারই তো কথা। চেদিরাজ আর কঠোর তপস্যার দিকে ঝুঁকে তাঁর ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেবার চেষ্টা করবেন না। ইন্দ্র আবির্ভূত হয়ে চেদিরাজকে খুব আশীর্বাদ করলেন। আর, বললেন, এবার থেকে পৃথিবীতে যে সমস্ত রাজা এইভাবে ইন্দ্রধ্বজোৎসব করবেন, তাঁদের রাজ্যের বাড়বাড়ন্ত হবে, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকবে, শত্রুরা টুঁ শব্দ করতে পারবে না, রাজ্যের শ্রী, সম্পদ আর শস্যের কোনও ভয় থাকবে না। সেই থেকেই ভাদ্র মাসে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শক্রোত্থান বা ইন্দ্রধ্বজোৎসবের প্রবর্তন হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, বিষ্ণুতেজোদ্ভব ধ্বজার সাহায্যে ইন্দ্র দৈত্যদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন এই শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত তিথিতে। তাই শাস্ত্রে এই তিথিতে ধ্বজা রোপণ করে ইন্দ্রপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানটির নাম তাই শক্রোত্থান বা ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে উত্থান।

বৃহৎসংহিতা, কালিকাপুরাণ, গর্গপদ্ধতি প্রভৃতিতে সবিস্তারে আছে কোন্ শুভ লগ্নে বনে গিয়ে কোন্ গাছ কাটতে হবে ধ্বজার জন্যে; কেমনভাবে, কখন, নগরে সেটি আনতে হবে; কোন্ পদ্ধতিতে ও অনুষ্ঠানে সেটি তুলতে হবে জনপদের মধ্যে; উৎসবে কারা কারা থাকবেন; ইন্দ্রধ্বজ কেমনভাবে সাজাতে হবে—এইসব ব্যাপার। এই ধ্বজার ওপরেই রাজা তথা রাজ্যের সমস্ত শুভাশুভ নির্ভর করছে—সুস্পষ্টভাবে একথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শত্রুনাশ, শস্যলাভ ইত্যাদি কামনায় আদিম জাদুভিত্তিক আচার-আচরণ থেকেই এই অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে।

খাতড়ার অনুষ্ঠান

খাতড়ার ইন্দ্রধ্বজোৎসবেও নানা রকম বিচিত্র নিয়মকানুন মেনে চলা হয়। রাধাষ্টমীর দিন বাউরি সর্দার যান খাতড়া থেকে পাঁচ মাইল দূরে সিমচালি নামে একটি জঙ্গলে। সেখানে তিনি শুভলক্ষণযুক্ত একটি শালগাছ বেছে নিয়ে তার পুজো করেন, তারপর তাতে কোপ বসান। জঙ্গল থেকে শালগাছটি কেটে এনে 'বাড়ই' অর্থাৎ ছুতোর (সংস্কৃত বর্ধকী শব্দ থেকে বাড়ই কথাটি এসেছে) সেটিকে চেঁচে ছুলে ইঁদকুড়িতে অর্থাৎ ইন্দ্রধ্বজ তোলার ময়দানে কাঠের হাড়িকাঠে পরিয়ে দেন। আজকাল শালগাছটি প্রায় বিশ ফুট উঁচু আর ফুট দুয়েক মোটা হয়। আগে আগে রাজাদের অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখন এর চাইতেও অনেক উঁচু আর অনেক মোটা শালকাঠের ধ্বজা তোলা হত।

রাজাদের হাত থেকে জঙ্গল চলে গেছে সরকারের হাতে। রাজারা তাই এখন বিশ ফুট উঁচু ধ্বজা জোগাড় করেই সন্তুষ্ট।

আগে আগে এই বিশাল ধ্বজাটির সর্বাঙ্গে নতুন কাপড় জড়ানো হত। এখন মাত্র নিচুর দিকেই খানিকটা নতুন কাপড়ে ঢাকা হয়। এই শালগাছের মাথায় থাকে নতুন শাদা কাপড় জড়ানো, প্রকাণ্ড শাদা নিশানওলা একটা ধবলছত্র—খাতড়ার ধবল রাজাদের কুললাঞ্ছন। লাল, সবুজ, হলুদ রঙে চোবানো বাঁশের চেঁচারি দিয়ে তৈরি অলঙ্কার ধ্বজার গায়ে পরানো হয়।

একাদশীর দিন রাত্তিরে রাজার মেজ ছেলে হিকিমশাহ নামে পরিচিত, পাল্কি চড়ে বাজনাবাদ্যি করে ইঁদকুড়িতে আসেন। তাঁর সঙ্গে কিন্তু ধবল রাজাদের কুললাঞ্ছন ধবলছত্র থাকে না। এইসব ক্ষত্রিয় রাজার বড় ছেলে যুবরাজই রাজ্যের অধিকারী। বংশের মধ্যে রাজা এবং যুবরাজ ছাড়া আর কেউই ছত্র, চামর, আড়ানি পাখার অধিকারী নন। একাদশীর দিন রাত্তিরে হিকিম শাহ শালগাছটি অন্যান্যদের সাহায্যে অর্ধেকটা তুলে দিয়ে যান। এ অনুষ্ঠানের নাম আধাগাছি। এর পর দ্বাদশীর রাত্রে রাজা অথবা যুবরাজ আসেন ধ্বজাটিকে সম্পূর্ণ তুলতে। তখনই মিছিলের সবচেয়ে বেশি জাঁকজমক, বাজনাবাদ্যি। এ বছর যুবরাজ কেমন করে এসেছিলেন মিছিল করে তার বর্ণনা পূর্বেকার প্রবন্ধে দিয়েছি।

বস্ত্র বিতরণ

দ্বাদশীর রাত্রে ইন্দ্রধ্বজটি সম্পূর্ণ তোলার পর যুবরাজ ইন্দ্রধ্বজের তলায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রের পুজো করলেন, তাঁর উদ্দেশে লাজাঞ্জলি দিলেন, আর ইন্দ্রের প্রতিভূস্বরূপ ইন্দ্রধ্বজের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর বস্ত্রপ্রদান অনুষ্ঠান চলল। এই অনুষ্ঠানে রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের সময় যাঁদের ওপর বিভিন্ন কাজের ভার থাকে, তাঁদের একে একে নাম ডেকে যুবরাজ বস্ত্র বিতরণ করলেন। বস্ত্র তো বস্ত্র। একটা বড় থান থেকে কাটা কয়েক হাত টুকরো কাপড়। সেকালের রাজবাড়ির দানছত্রের এলাহি ব্যাপার এখন কাপড়ের কয়েকটা টুকরো দানে এসে ঠেকেছে। যাঁদের এই বস্ত্রোপহার দেওয়া হল, তাঁদের নামও বিচিত্র—সর্দার, ইঁদবাড়ই, সাইনি, লাগাচ্চি, তোপদার, দিগার। এঁরা লোহার, মাঝি, বাউরি, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। বাউরি সর্দারের কাজ জঙ্গলে গিয়ে শালগাছ নির্বাচন ও তাতে প্রথম কোপ বসানো। ইঁদবাড়ই শালকাঠটিকে চেঁচে ছুলে ঠিক করে দেন। সাইনি কেশে ঘাস দিয়ে ইন্দ্রধ্বজ তোলার মস্ত মোটা দড়ি বানিয়ে দেন। লাগাচ্চি রাজডঙ্কা বাজান। তোপদারের কাজ ইঁদপুজোয় আর দুর্গাপুজোয় সন্ধিক্ষণে তোপ দাগা। এটি বন্ধ হয়ে গেলেও তোপদার পুরনো রেওয়াজ অনুসারে কাপড় পান।

রাজার শত্রুবধ

দিগারের কাজটি সবচেয়ে বিচিত্র। দুর্গাপুজোর সময় দশমীর দিন রাজাদের 'দিগ্‌বিঁধা' বলে একটি অনুষ্ঠান হয়। পুরোহিত পাঁজি দেখে শুভক্ষণ ও শুভদিক নির্ণয় করে দিলে রাজা অথবা যুবরাজ সেই অনুসারে খাতড়ার গ্রামপ্রান্তে 'যুদ্ধযাত্রা'য় বেরোন—সেজেগুজে, হাতে তীরধনুক নিয়ে। সঙ্গে থাকে রাজডঙ্কা, ধবলছত্র। সেখানে দিগার রাবণের একটি কুশপুত্তলিকা তৈরি করে রাখেন। রাজা ও যুবরাজ পুরোহিতের নির্দিষ্ট চারটি শুভ দিক থেকে চারটি তীর নিক্ষেপ করেন সেই কুশপুত্তলিকার উদ্দেশে। তারপর দিগার ছুটে দিয়ে খাঁড়া দিয়ে এক কোপে কুশপুত্তলিকার মুণ্ডটি কেটে এনে রাজা বা যুবরাজের হাতে উপহার দিয়ে আভূমি প্রণত হন।

উত্তর ভারতে বিজয়া-দশমীর দিন দশেরা উৎসবে রাবণের কুশপুত্তলিকাদাহ একটি বহুল-

পরিচিত অনুষ্ঠান। পূর্বতন দেশীয় রাজাদের রাজ্যেও এই দিন অস্ত্রশস্ত্র পুজোর রেওয়াজ ছিল। শাস্ত্রেও বিজয়া দশমীতে রাজাদের দিগ্বিজয় যাত্রার নির্দেশ আছে। বৃহৎসংহিতা, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই দিনটিতে রাজাদের 'নীরাজন' উৎসবে অথর্ববেদোক্ত অভিচারমন্ত্রে শত্রুর মৃণ্ময়মূর্তি বধ, রাজা ও রাজ্যের কল্যাণের জন্যে পুরোহিতের যজ্ঞানুষ্ঠান, হস্তী, অশ্ব, রথ পদাতিক—এই চতুরঙ্গ বলসমন্বিত রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে। আদিম জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানে শত্রুবিজয়ের এই আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম উৎসবের রূপ ধরে প্রাচীনকাল থেকে বয়ে এসেছে।

রাজবাড়িতে সোনার ইঁদ

ইঁদকুড়িতে ইন্দ্রধ্বজ তোলার সঙ্গে সঙ্গে খাতড়াব রাজবাড়িতেও দুর্গামণ্ডপে একটি শালকাঠের বস্ত্রাবৃত ছত্রযুক্ত ইন্দ্রধ্বজ তোলা হয়। সাত দিন ধরে এখানে ইন্দ্রের পুজো, হোম, অন্নভোগ ইত্যাদি চলে। এই ইন্দ্রধ্বজের গায়ে সোনার আংটা পরানো হয় ভূষণস্বরূপ। তার এর নাম সোনার ইঁদ। দুঃখের বিষয়, ইঁদের সোনার গয়নাগুলি একবছর চুরি গেছে। রাজবাড়ির সোনার ইঁদ এখন নামেই শুধু সোনা হয়ে রইল।

সাঁওতালদের ছাতা পরব

বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার দামোদরপুর, প্রতিহারপুর প্রভৃতি গ্রামে ভাদ্র মাসের শুক্লাদশমীতে সাঁওতালদের ছাতা পরব বলে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেখানেও শালখুঁটি পুঁতে তার ওপরে ছাতা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাঁওতালরা সেখানে তাদের দেবতা বোঙার পুজো করে, পাঁঠা বলি দেয় আর শালখুঁটির চারপাশে মেয়ে-পুরুষের নাচগানের আসর জমায়। সাঁওতালরা হিন্দুদের কাছ থেকে ঐ উৎসব নিয়েছে, না, এ তাদের সনাতন উৎসব, তা বলা মুস্কিল। তবে একথা ঠিক, মহাভারতই হোক্, আর বৃহৎসংহিতা, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থই হোক্—এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ ঐ সমস্ত গ্রন্থে থাকলেও আদিম যূথবদ্ধ সমাজের শত্রুবিজয়ের জন্যে জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানে বিশাল বৃক্ষপূজাই কালক্রমে শক্রোত্থান বা ইন্দ্রধ্বজোৎসবের রূপ নিয়েছে। আদিম কত না সংস্কারই রূপান্তরের পথে আমাদের ধর্মকৃত্যে বয়ে এসেছে। এও যে তাদের একটি, তাতে সন্দেহ নেই।

দেবী উত্তরবাহিনী

নীল নির্মেঘ আকাশ আর সোনার রোদ্দুর ছড়িয়ে শরৎ হাসছে। কলস্বনা কৌশিকী সেই সোনার রোদ্দুর মেখে অপরূপা কৌতুকময়ী নটিনীর মত নেচে চলেছে। কৌশিকীর ঢেউ ভেঙে দূর থেকে ভেসে আসছে একখানি নৌকা--পাল তুলে দিয়ে। নৌকার মাস্তুলে ফুলপল্লবের মালা, বিচিত্র কেতন। গলুই-এর মকরমুখে দুলছে স্বর্ণচাঁপার দোলনঝুরি। নৌকার ওপরে কারুকার্যময় সুসজ্জিত মণ্ডপের ভেতরে চলছে গীত, বাদ্য, নৃত্যের উৎসব। ধনিকের প্রমোদতরণী। কলস্বনা কৌশিকীর গান ছাপিয়ে প্রমোদতরণীর উৎসব-কোলাহল ভেসে আসছে।

একটি ষোড়শী কিশোরী ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল কৌশিকীর তীরে। দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। না আছে তার নয়নশোভন বেশবিন্যাস, না আছে মূল্যবান আভরণ। তবুও দীর্ঘ আয়ত নয়ন দুটিতে আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে ছুটে এসেছে সে তীরে—গান শুনবে বলে। নৌকা তখনও অনেক দূরে। কিশোরী দু হাত তুলে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল—মাঝিমাল্লাদের নৌকা তীরের দিকে নিয়ে আসবার জন্যে। নৌকা ভেসে আসছে—তীরের দিকেই। কিশোরী ভাবে, তারই ডাকে বুঝি সাড়া দিয়ে নৌকা আসছে কাছে। তার আয়ত চোখে খুশি উপচে পড়ে। কিন্তু তীরের দিকে এসেও তো নৌকার থামবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

"ওগো ও মাঝিরা, একবারটি নৌকা এখানে আন—আমি তোমাদের গান শুনব।"

প্রমোদতরণীর উৎসবকোলাহলে চাপা পড়ে যায় কিশোরীর কচি কণ্ঠের সেই আকুল মিনতি। কিংবা এমন তুচ্ছ ডাকে কান পাতবার দরকারই মনে করে না নৌকার আরোহীরা।

নৌকা এত কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তবুও এত অনুরোধে একবারটিও থামবে না ঘাটে! আর একবার চেঁচিয়ে ডাকে মেয়ে--"ওগো একবার তোমাদের নৌকা ভিড়াও, আমি তোমাদের গান শুনব।"

নৌকা থামল না। তর তর করে বয়ে চলল।

আবার একবার সেই কণ্ঠস্বর! নৌকো থামাবার জন্যে করুণ মিনতি! বারে বারে তিনবার।

এবার গান-বাজনার শব্দ ছাপিয়ে নৌকা থেকে কার যেন রূঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে এল : "যা, যা। এত যদি তোর গান শোনার সাধ, তবে শুনগে যা না নিজের ঘরে ফিরে।"

ধনের অহঙ্কারে স্ফীত ধনিকের দরিদ্রের প্রতি নিষ্ঠুর কটাক্ষ!

সত্যিই তো, এত পয়সা খরচ করে কিনা ধনিকের প্রমোদতরণী বেরিয়েছে কৌশিকীর ঘাটের এই দরিদ্র কন্যাকে গান শোনাবার জন্যে। কানাকড়ির মুরোদ যাদের নেই তাদের আবার শখ-সাধ!

মেয়েটির কিন্তু তবুও ফিরে যাবার কোনও লক্ষণ নেই। অচল প্রতিমার মত তীরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার নৌকা থেকে ভেসে আসে সেই কণ্ঠস্বর : "যা, যা, ফিরে যা।" এবারও নীরব, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়ে। নৌকা থেকে তৃতীয়বার পুরুষ কণ্ঠের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ছুঁড়ে দেওয়া হল : "যা যা ছুঁড়ি, এমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী আর। ফিরে যা, ফিরে যা!"

তিনবার করুণ মিনতির উত্তরে তিনবার মর্মঘাতী বিদ্রূপ। হ্যাঁ, মেয়ে ফিরিয়ে নেবে মুখ—আর ওমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। অপমানিতার আয়ত চোখ দুটিতে জ্বলে উঠল আগুন। লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল কিশোরী। নিমেষের মধ্যে আকাশে শরতের আলো নিভে গেল। বিদ্যুতের চাবুক মেরে কালো মেঘের ঘোড়া ছুটিয়ে সারা আকাশখানাতে কে যেন দাপাদাপি শুরু করল। আর, নিচে উত্তাল কৌশিকীও হিংস্র তরঙ্গবাহু বিস্তার করে

ধনিকের প্রমোদতরণীকে টেনে নিয়ে গেল অতল গর্ভে।

দুর্যোগের অবসানে লোকে সবিস্ময়ে দেখলে—কৌশিকীর তীরে দক্ষিণমুখী যে মন্দিরটি ছিল, সেটি উত্তরমুখী হয়ে গেছে। আর মন্দিরের ভেতরেও বেদীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখিনী বিশালাক্ষী দেবী উত্তরমুখিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

লোকে বলে, দর্পিত উদ্ধত ধনিকের শাস্তির জন্যেই দেবী বিশালাক্ষী দরিদ্র গৃহস্থের আয়তনয়না ষোড়শী কন্যার রূপ ধরে কৌশিকী নদীর ধারে গিয়ে ছলনার জাল পেতেছিলেন। তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর অযাচিত দাক্ষিণ্যে ধনিক সাড়া দেয় কিনা। ঔদ্ধত্যে অহংকারে অন্ধ বণিক দেবীর দাক্ষিণ্যকে চিনতে পারেনি, তিন তিনবার তাঁকে প্রত্যাখান করেছে। দেবীও তাঁর দক্ষিণমুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তার কাছ থেকে। তিনি সেই থেকে উত্তরাস্যা হয়ে আছেন। তাই তাঁর নাম হয়েছে উত্তরবাহিনী দেবী।

কিংবদন্তীর সে বাঁশ আর আসশেওড়ার জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট একটা পঙ্কিল ডোবার স্মৃতি ফেলে রেখে অনেকদিন হল অবলুপ্ত হয়েছে। ডোবাটি উত্তরবাহিনী দেবীর মন্দিরে সামনেই রয়েছে, নাম-- ডিঙ্গি ডোবা। শিয়াখালায় শারদীয়া শুক্লা একাদশীতে দেবীর বার্ষিক উৎসব দেখতে গিয়ে ডিঙ্গি ডোবার ধারে দাঁড়িয়েই এই কিংবদন্তীটি শুনে এসেছি স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকের মুখে।

দশমীতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের দুর্গোৎসবের পুজোমণ্ডপে ঢোক ঢোল থেমে যায়। নির্জন নীরব পুজোমণ্ডপে বিসর্জনের ঘটটি শুধু পড়ে থাকে সদ্যসমাপ্ত উৎসবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। কিন্তু এই দশমীর পরের দিনই একাদশীতে উৎসবের ঢাক ঢোল কাঁসি বেজে ওঠে শিয়াখালার উত্তরবাহিনীর মন্দিরে—দেবীর নবঘট পুজো উপলক্ষে। এই উপলক্ষে মন্দিরের ভেতর আর চারপাশে মেলা বসে যায়, বিপুল জনসমাগম ঘটে। সারাদিন মন্দিরের আশেপাশে আর বিশাল প্রাঙ্গণে লোক থৈ থৈ করে। মানসিকের পুজো নিয়ে লোকে দু-চার মাইল দূর থেকে তো হেঁটে আসেই। তাছাড়া মার্টিন কোম্পানির ছোট্ট রেলগাড়ি বোঝাই হয়েও অনেক লোক আসে, হাওড়া-হুগলি জেলার নানান অঞ্চল থেকে। দেবীর এটিই প্রধান বার্ষিক উৎসব। এই উপলক্ষে শিয়াখালা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। দুর্গোৎসবের সমাপ্তি দিনের পরই এই লোকউৎসব শিয়াখালাকে বিশিষ্ট করে রেখেছে।

দেবীর মূর্তি

দেবী উত্তরবাহিনীর পাষাণমূর্তিটিও বিচিত্র। উঁচুতে প্রায় পাঁচ হাত। গায়ের রং হলদে। দেবী দ্বিভুজা। দক্ষিণ হাতে খড়গ আর বাম হাতে খর্পর। দেবীর দক্ষিণ চরণ শায়িত মহাকালের বুকে আর বাম চরণ যুক্তকরে উপবিষ্ট বটুক ভৈরবের মাথার ওপরে স্থাপিত। উলঙ্গিনী নন দেবী। বিচিত্র রক্তাম্বর তাঁর পরনে। বিচিত্র কঞ্চুলিকায় তাঁর বক্ষ আবৃত। নরমুণ্ডমালিনী, ত্রিনয়না দেবী মুকুটে, কঙ্কণে, কেয়ূরে, নূপুরে সজ্জিতা। দেবীর দুই পায়ের মধ্যে দৈত্য নিশুম্ভের একটি ছিন্ন মুণ্ড।

জনশ্রুতি আছে, শিয়াখালার গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খান দেবীর প্রথম মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। আর দেবীর সেবাপুজোর জন্যে অনেক ভূসম্পত্তিও দান করেছিলেন।

গোপীনাথ বসুর কীর্তি

শিয়াখালাতেই নাকি গোপীনাথ বসুর জন্ম হয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তিনি খ্যাতিমান্ পুরুষরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের উজিরপদ তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। পুরন্দরপুর নামে একটি জায়গায় গৌড়েশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। সেই

বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ তিনি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পুরন্দর খান উপাধি লাভ করেছেন। কিন্তু শুধু রাজ্য পরিচালনায় কিংবা রণক্ষেত্রেই তিনি কুশলতার পরিচয় দেননি, কাব্যকৃতিতেও তিনি যশোভাগী হয়েছেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সবচেয়ে পুরনো রচনার যে দুটি নিদর্শন মিলেছে, তাদের একটি যশোরাজ খানেরই। গোষ্ঠপ্রত্যাগত কৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্যে রাধার ব্যাকুলতার যে রসনিপুণ বর্ণনা পদটিতে রেখেছেন কবি, তা মধ্যযুগীয় পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম রত্নরূপে আদর পাবার যোগ্য। অনেকে বলেন—এই যশোরাজ খান গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খানেরই আর এক নাম বা উপাধি। তিনিই কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা নামে পরিচিত। অবশ্য এ রচনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত, সতেরো শতকের বৈষ্ণব কবি পীতাম্বর দাসের রচিত আলঙ্কারিক রসবিচার গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'তে ব্রজবুলিতে রচিত উল্লিখিত কবিতাটি ছাড়া তাঁর কাব্যকৃতির আর কোনও চিহ্নই নেই।

পুরন্দব খানেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা কুলীনগ্রামের বিখ্যাত মালাধর বসু বা গুণরাজ খান, যাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীচৈতন্যের প্রিয় কাব্য ছিল।

গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খান শিয়াখালার চারপাশে সেকালের প্রবল প্রতিপত্তিশালী ভূম্যধিকারীরূপে সম্মানিত ছিলেন। শিয়াখালার এই খ্যাতিমান পুরুষের প্রাসাদ, উদ্যান, গড়ের সমস্ত চিহ্ন তাঁর কাব্যকৃতির মতই অবলুপ্ত হয়েছে। শুধু পুরন্দর দীঘি নামে একটি বিশাল জলাশয় তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আজও বেঁচে আছে শিয়াখালায়। উত্তরবাহিনীর যে সুরম্য মন্দির পুরন্দর খান প্রায় পাঁচশো বছর আগে তৈরি করে দিয়েছিলেন, তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পুরনো মন্দিরের ভিত আর দেওয়ালের ওপরই নতুন মন্দিরটি গড়ে উঠেছে।

লোকে বলে, এই পুরন্দর খানই প্রায় পাঁচশো বছর আগে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশের ব্রাহ্মণদের বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রাম থেকে আনিয়ে শিয়াখালায় ভূসম্পত্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণবংশের এক সাধকই দেবী উত্তরবাহিনীর পূজা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

জল থেকে আদিমূর্তির আবির্ভাব

এই সাধক নাকি প্রথম জীবনে অনেক বয়স পর্যন্ত ছিলেন গণ্ডমূর্খ। পণ্ডিত পিতার ধিক্কারবাক্যে মর্মাহত হয়ে তিনি কৌশিকী নদীতে ডুবে মরতে গিয়ে জল থেকে দেবীর ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পাষাণমূর্তি পেয়েছিলেন। দৈববাণী নাকি হয়েছিল, এঁর পুজো করলে তিনি সর্ববিশারদ হবেন। কৌশিকীর তীরে শ্মশানভূমি শিবাক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল, সেখানে তিনি তান্ত্রিক মতে পাষাণে উৎকীর্ণ বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তিটির সাধনা করে সর্বসিদ্ধিলাভ করেছিলেন, পাণ্ডিত্যলাভের তো কথাই নেই। তাঁর সাধনার পঞ্চমুণ্ডীর আসনের ওপরই নাকি দেবী উত্তরবাহিনীর বর্তমান বেদী স্থাপিত। দেবীমূর্তির পিছনে দেওয়ালে বিন্যস্ত একটি চিত্রপটে কিংবদন্তীর ধনিকছলনা আর জল থেকে দেবীর আবির্ভাবের কাহিনীদুটি চিত্রিত আছে।

এই সাধক এবং দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত। তান্ত্রিক সাধকদের এবং তাঁদের পূজিত দেববিগ্রহ নিয়ে আমাদের দেশে অলৌকিক কাহিনী-কিংবদন্তীর অন্ত নেই। রাঢ়বঙ্গের প্রাচীন তন্ত্রসাধনার অন্যতম পীঠভূমিরূপে পরিচিত শিবাক্ষেত্রের সাধক এবং তাঁর উপাস্যদেবী এই বিশালাক্ষী সম্বন্ধেও যে সেইরকম নানা বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত থাকবে, তাতে বিচিত্র কী!

আদিমূর্তি অপহৃত

দেবীর যে পাষাণমূর্তিটি এখন পূজিত হচ্ছে, সেটি কিন্তু বেশি দিনের পুরনো নয়। বাংলা ১৩৪০

সালে এই পাষাণমূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে মৃণ্ময় মূর্তিতেই দেবীর পুজো হত। শাণ্ডিল্য গোত্রের সাধকব্রাহ্মণ কৌশিকী নদীর গর্ভ থেকে দেবীর যে আদি পাষাণবিগ্রহটি পেয়েছিলেন, সেটি ছিল ইঞ্চিছয়েক লম্বা। সেই পাষাণমূর্তি থেকেই মৃণ্ময়মূর্তি তৈরি হয়ে এসেছে এবং পরিশেষে নতুন পাষাণমূর্তিটিও উৎকীর্ণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্রাকৃতি আদি পাষাণবিগ্রহটি স্বর্ণমণ্ডিত হয়ে মন্দিরে পূজিত হত। বছরখানেক আগে সেটি চুরি গেছে—সোনার লোভেই নিশ্চয়।

শোনা যায়, বর্ধমানের অধিপতি দেবীর করুণায় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে দেবীর পুজোর জন্যে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন।

শুনলুম, এই দেবীর পূজাভার এখন হড়চৌধুরী উপাধিধারী ব্রাহ্মণদের ওপরে অর্পিত। দেবীর বিশাল ভূসম্পত্তির বিরাট অংশ এঁরাই ভোগ করেন। অনেক সম্পত্তি অবশ্য অনেকদিন আগেই নানাভাবে হস্তচ্যুত হয়েছে। ডাঃ যামিনীকান্ত বল নামে স্থানীয় একজন বিশিষ্ট, সম্মানিত চিকিৎসকের পরিচালনায় 'উত্তরবাহিনী সেবা সমিতি' নামে একটি সংগঠন দেবীর দৈনন্দিন সেবা-পুজো, বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান, মন্দিরসংস্কার, নবগঠিত প্রস্তরমূর্তি স্থাপন ইত্যাদি কার্যে ব্রতী হয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, শারদীয়া শুক্লা একাদশীর দিনই জল থেকে মূর্তিটির উদ্ধার হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, উদ্ধত ধনিকের ধনদর্প চূর্ণ করেছিলেন দেবী এই দিনটিতেই। তাই প্রতি বৎসর এই দিনটিতেই দেবীর নবঘটপূজার উৎসব হয়। এই দিনটিতে শিয়াখালায় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণরাই সর্বপ্রথমে দেবীর সারা বৎসরের পূজিত ঘটটি বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট স্থাপন করে পুজো করেন। এরই নাম দেবীর নবঘটপূজা। তাঁদের পূজার পর চলে ক্রমান্বয়ে বর্ধমানের অধিপতি, পুরন্দর খাঁর বংশধর শিয়াখালার বর্তমান বসুমল্লিক পরিবার, তাজপুরের সিংহ, জনাই-বকসা গ্রামের চৌধুরী, শিয়াখালার কারকুন এবং অন্যান্য পরিবারদের পূজা। দেবীর উদ্দেশে এই পর্যায়ক্রমে বলিও পড়ে একটির পর একটি।

সারাদিন উৎসব ও মেলা

শারদীয়া শুক্লা একাদশীর দিন শিয়াখালায় সকাল থেকেই উৎসব শুরু হয়, রাত্রি অবধি তা চলে। নাটমন্দিরে, মন্দিরের সিঁড়িতে লোক থৈ থৈ করে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢাকের তালে তালে বাগদিরা এসে লাঠি খেলে। দোকানপশারে কেনা-বেচার ধুম পড়ে যায়।

মেলার পুতুল

মেলায় শিয়াখালার চারপাশ থেকে গ্রামীণ শিল্পীরা নিয়ে আসে বাঁশের চেঁচারিতে তৈরি ঝুড়ি, চুপড়ি, পেতে, খই-এর চ্যাঙারি, লোহার বঁটি, কাটারি, লাঙলের ফাল, কোদাল, নিড়েন, মাছ ধরার জাল। পোড়ামাটির পুতুল, পালকি, নৌকা, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ। আশ্চর্য লাগল দেখে, প্রাচীন লোককলার যে বিচিত্র সুন্দর ভঙ্গি আর বর্ণাবলেপনপদ্ধতি দ্রুত অবলুপ্ত হচ্ছে, শিয়াখালার পুতুল খেলনার অঙ্গে এখনও তা মুছে যায়নি। জানি না, লোকশিল্পের এই দীপ্তি এদের গায়ে আর কতদিন জেগে থাকবে এই জগাখিচুড়ি রচনার যুগে।

লোকে বলে, শিয়াখালার উত্তরবাহিনী আর এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরবর্তী হুগলি জেলার রাজবলহাটের গ্রামদেবী রাজবল্লভী দুই বোন। তাঁরও সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

জ্যোৎস্নার মায়া

মালিনী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। ভিনগাঁয়ের ষোড়শী মেয়ে। আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। ধূলিধূসর ক্লান্ত দেহ নিয়ে নিবাশ্রয়ে ঘুরতে ঘুরতে বুড়ি মালিনীর বাড়িতে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে।

মালিনীর মালঞ্চে অনেক ফুল। পদ্ম, চাঁপা, মল্লিকা, যূথী, জবা, কাঞ্চন, রঙ্গনের মেলা। নিত্য তারা ফোটে মালিনীর ভাঙা কুঁড়ের সামনে মালঞ্চ আলো করে। মালিনী গাঁয়ের দেবীমন্দিরে পুজোর ফুল জোগায়, দেবীর পুষ্পাভরণ রচনা করে পাঠায়। কিন্তু এ মেয়ের রূপের কাছে সব ফুলের রূপ যে তুচ্ছ মনে হয়। কী স্নিগ্ধ উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি! শরৎরাত্রির আকাশ থেকে সমস্ত জ্যোৎস্না কুড়িয়ে কে যেন গড়ে দিয়েছে এই রূপ। এই রূপের আভায় মালিনী দেখে—তার ভাঙা কুঁড়ে, ফুলমালঞ্চ ঝলমল আর মালিনীর বুকের ভেতরটাও অজানা এক সুখের ভারে টলমল।

বড় গরিব মালিনী। তিনকুলে তার কেউ নেই। দেবীর মন্দিরে ফুলের জোগান দিয়ে সে দিন আনে দিন খায়---ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাপড়ে দিন কাটায়। মালিনীর ধন নেই, কিন্তু মন আছে। বড় নবম মন। অনাথ আতুর এসে তার দরজায় দাঁড়ালে, সে তাদের বিমুখ করে না, তার দুখের খুদকণার ভাগ দেয় তাদের।

দুখিনীর ভাঙা ঘরে কিন্তু এমন রূপের ডালি এসে ঠাঁই নেবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার চোখ শুধু জুড়িয়ে যায়নি, তার বুকও জুড়িয়ে গেছে, সব দুঃখ অভাব জ্বালা পালিয়ে গেছে এই অপরূপের মুখখানির দিকে তাকিয়ে।

জলভরা দুচোখ তুলে মালিনী বলে : "থাকো মা, থাকো আমার ভাঙা কুঁড়ে আলো করে তুমি থাকো। তুমিই এই দুখিনীর কড়ি, এই নাচারের নড়ি। দুঃখের খুদ আমরা মায়ে-ঝিয়ে সুখে বেঁটে খাবো, এক ছেঁড়া কাঁথায় দুজনে শুয়ে সুখের নিদ যাব। তা এবার থেকে এই কালামুখীর কালো হাতে দেবীর পুজোর ফুল জোগানোর পালা শেষ হল। আমার মালঞ্চের ফুল তুমিই তুলে নিও। দেবীব জন্যে মালা তুমিই গেঁথে দিও। তোমাব ঐ হাতের পরশে দেবীর পুজোর ফুল, গলার মালা অপরূপ হয়ে উঠবে। দেবী এবার খুশি হবেন নিশ্চয়ই আমার মালঞ্চের ফুলে।"

নিরাশ্রয়া ষোড়শী মালিনী মায়ের ঘরে আশ্রয় পেয়ে খুশি হয়েছিল। মালিনীর ফুল-মালঞ্চে শরৎরাত্রির জ্যোৎস্নার শুভ্রকান্তি নিয়ে সে অপরূপা কন্যা বিরাজ করতে লাগল।

মালিনীর মালঞ্চের পাশে নদী কংসাবতী। তার বুক দিয়ে আনাগোনা করে সদাগরদের নৌকা বাণিজ্যের বেসাত নিয়ে। ঘাটে ঘাটে তাদের বিকিকিনি, হাটে হাটে তাদের বাণিজ্য। রত্নমাণিক্য, ধনদৌলতে বাণিজ্যের তরী বোঝাই করে ধনপতি সদাগররা কংসাবতী নদীতে পাড়ি জমায়।

একদিন এমনই এক ধনপতি বাণিজ্যের বেসাত আর ধনদৌলতে ভরা সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে যাচ্ছে কংসাবতীর বুক দিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাঝি-মাল্লারা রাত্তিরটায় বিশ্রামের জন্যে ডিঙা বেঁধেছে মালিনীর মালঞ্চের ঘাটে। সারি সারি ডিঙা বাঁধা। ছয় ডিঙার পরে সপ্তম ডিঙায় বসে আছে সদাগর।

ধনদৌলতেব ভারে ধনপতির সপ্তডিঙা টলমল, কিন্তু তার মনে ভরা কুবাসনার হলাহল। ললনা-লালসার সাপ তার বুকে অহর্নিশি ছোবল মারে। ঘাটে ঘাটে সে বাণিজ্যের ডিঙা বেঁধে বিকিকিনি করে। সেই সঙ্গে ছলে, বলে, কৌশলে স্বর্ণপেটিকার স্বর্ণমুদ্রায় সুন্দরী নারী সংগ্রহ করে সে লালসা মেটায়। তার সপ্তডিঙা জনপদবাসিনী কুলাঙ্গনাদের বিভীষিকা।

মালিনীর মালঞ্চেব ঘাটে সেদিন সন্ধ্যায় সপ্তডিঙা বেঁধে বসে আছে যখন সদাগর, তখন মালিনীর মেয়ে জল নিতে নেমে আসছে ঘাটে, একটি পিদিম হাতে নিয়ে। এ কী ব্যাপার! অন্ধকার ঘাটের মাঝখানে শরতের জ্যোৎস্না যেন ফুটে উঠল। হাতে চোখ কচলিয়ে সদাগর বার বার দেখছে।

ভাবছে, এ কী দৃষ্টিবিভ্রম, না, স্বপ্নের কুহেলিকা? ও কে? মানুষ, না মায়াবিনী?

শরতের জ্যোৎস্না ততক্ষণে ঘট ভরে ঘাট থেকে চলে গেছে। বিস্ময়বিমূঢ় সদাগর ডিঙির ওপরে বসে আছে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে কামনার ছোবলে অস্থির হয় পাপিষ্ঠ। পেটিকা থেকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বার করে সদাগর লোক পাঠায় মালিনীর মালঞ্চে—শরতের আকাশের জ্যোৎস্নাকে ধরে আনবার জন্যে। প্রথমে স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভনে, তা ব্যর্থ হলে বলপ্রয়োগে ধরে আনবার নির্দেশ দেয় সদাগর।

লোক গিয়ে দাঁড়ায় মালিনীর মালঞ্চে। মালিনী সদাগরের বার্তা শুনে চমকে ওঠে। দু হাত কানে চেপে সে চেঁচিয়ে ওঠে—না, না, কিছুতেই না। প্রাণ থাকতে সে শরতের জ্যোৎস্নাকে এমনভাবে কালো করে দিতে পারবে না।

স্মিতমুখী মেয়েই বেরিয়ে এল কুঁড়ে থেকে। বললে : "চলো তোমাদের সদাগরের নায়ে আমাকে নিয়ে চলো। আর, দিয়ে যাও স্বর্ণমুদ্রা আমার মায়ের হাতে।"

মালিনী হতভম্ব। প্রসন্নমুখী ষোড়শী শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত রূপের আভা ছড়িয়ে সদাগরের মাঝিমাল্লার সঙ্গে চলেছে।

ওদিকে ডিঙার ওপরে বসে আছে সদাগর—মূর্তিমান পাপের মত। দূর থেকে সেই রূপের ছটাকে আসতে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে। স্বর্ণমুদ্রায় জয় করে আনছে সে আকাশের জ্যোৎস্নাকে। পাশে ছিল স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ পেটিকা। তার ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নেয় ধনান্ধ ধনপতি। কুমারীর অনাঘ্রাত সৌন্দর্য, সতীর সতীত্ব সবই সে চিরদিন কিনে আসছে—এই স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। এবারও ব্যর্থ হল না।

সদাগর দেখে—অন্ধকার ঘাট আবার জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছে। কংসাবতীর জলে সেই জ্যোৎস্নার কুহেলিকা-অঞ্চল কাঁপছে। চারধারে আলোর আভা। মাঝখানে শুভ্রা, জ্যোতির্ময়ী, প্রসন্নবদনা কন্যা নদীর উঁচু তীর থেকে নেমে আসছে।

লোকলস্করে, বাণিজ্যের বেসাতে, ধনদৌলতে ভরা, পাশাপাশি রাখা ছখানি ডিঙির ওপর দিয়ে কন্যাকে উঠে আসতে হবে সদাগরের সপ্তম ডিঙিতে।

সপ্তম ডিঙিতে দাঁড়িয়ে সদাগর এ কী দেখছে। প্রথম ডিঙি পার হয়ে কন্যা যেই দ্বিতীয় ডিঙিতে পা দিয়েছে, অমনি প্রথম ডিঙি ডুবে গেল। এমনি করে দ্বিতীয় ডিঙি গেল, তৃতীয় গেল। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ডিঙিও নিমেষের মধ্যে ডুবে গেল—মাঝি-মাল্লাদের হাহাকারের মধ্যে। এবার সপ্তম ডিঙির পালা। জ্যোতির্ময়ী শুভ্রাঙ্গী এবার পা দিয়েছে সপ্তম ডিঙায়। প্রসন্ন হাসিটুকু তখনও তার মুখে লেগে আছে।

আর দেরী করেনি সদাগর। বুঝতে পেরেছিল, শরতের জ্যোৎস্নার আড়ালে সাক্ষাৎ মৃত্যু এগিয়ে আসছিল তার দিকে, দুষ্টাত্মার অমোঘ পরিণতিস্বরূপ।

স্বর্ণমুদ্রায় ভরা পেটিকা ফেলে রেখে ধনপতি দৌড়ে এসে লুটিয়ে পড়েছিল সেই আশ্চর্য মেয়ের পায়ে—মহাদেবী বলে চিনতে পেরে। অনুতাপের চোখের জলে সে তাঁর করুণা ভিক্ষা করেছিল করযোড়ে। শরণাগতবৎসলা মহাদেবীর পদ্মচরণের পরশে কলুষমুক্ত সদাগর তাঁর পুজো করেছিল।

প্রাচীন কিংবদন্তী এটি। এর কেন্দ্রভূমির নায়িকা—শরৎরাত্রির জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধরূপময়ী সেই আশ্চর্য কন্যা আজও গ্রামদেবীরূপে পূজিতা হচ্ছেন হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রামে। নাম তাঁর রাজবল্লভী দেবী। শুভ্র তাঁর অঙ্গবর্ণ। কিন্তু সরস্বতীর মত শুভ্র নয়। ঈষৎ হরিদ্রাভ শুভ্র। 'শরৎ জ্যোৎস্নাপ্রভা দেবী' রূপে তাঁর ধ্যান করা হয়। শারদীয়া নবমীতে হয় দেবীর মহোৎসবে পূজা। তখন নানা অঞ্চল থেকে অনেক লোক আসে সেই উৎসবে। দেবীর সম্বন্ধে নানা মাহাত্ম্যসূচক কিংবদন্তী কাহিনী লোকের মুখে ফেরে। বিভিন্ন লোকের কাছে উল্লিখিত কিংবদন্তীটিরও অনেক শাখা-পল্লবিত অনেকরকম চেহারা পেয়েছি। যে কাহিনীটি শুনেছি, সেখানকার এক অশীতিপর বৃদ্ধ পূজারীর মুখে, সেটিই বিবৃত করেছি এখানে।

ডিঙি ডোবানোর অনুষ্ঠান

কে এই সদাগর, কোথায় তার বাস ছিল, কোন্ যুগের ঘটনা এটি—এসব সম্বন্ধে বাস্তব তথ্য খুঁজতে যাওয়া আজ বৃথা। কিন্তু কিংবদন্তীর সেই ঘটনাটির স্মৃতি আজও দেবীর উৎসবে ডিঙি ডোবানোর অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে লোকমনে বেঁচে আছে। দেবীর শারদীয়া উৎসবে সন্ধিপূজা আরম্ভের ঠিক পূর্বমুহূর্তে দেবীব পূজারী কাঠের তৈরি সাতটি ছোট ছোট ডিঙি নিয়ে দেবীমন্দিরের সামনের পুকুরে যান। সেখানে ডিঙিগুলো পুজো করে তিনি ছটি ডিঙি জলের তলায় ডুবিয়ে দেন, আর সপ্তমটি জলে ভাসিয়ে রাখেন।

মাটির তৈরি মূর্তি

দেবীর মূর্তি মাটির তৈরি। উঁচুতে প্রায় চার-পাঁচ হাত। দ্বিভুজা দেবী। দক্ষিণ করে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, বাম করে পানপাত্র। দেবী দক্ষিণপদ শবরূপী শিবের বুকের ওপরে, বামপদ করযোড়ে উপবিষ্ট 'সিদ্ধ'-শীর্ষে স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন। ত্রিনয়না, স্মিতমুখী দেবী। বস্ত্র ও অলঙ্কারে দেবীমূর্তি সজ্জিত। শুনেছি, বস্ত্রের নিচে দেবীর বুকের ওপরে মালার আকারে বিন্যস্ত সাতটি নরমুণ্ড, আর, কটিতে সাতটি হাতের মেখলা থাকে। বিশ-পঁচিশ বছর অন্তর দেবীর নবকলেবর হয়। এবার শারদোৎসবের পর মূর্তিটির বিসর্জন হয়েছে। এখন নতুন মূর্তি তৈরি করার কাজ চলছে। গর্ভমন্দিরের বাইরে বেদীর ওপরে দেবীর ঘট স্থাপন করে এখন দৈনন্দিন পূজা হচ্ছে।

প্যাঁচ-মোষ-গাড়োল-পাঁঠা

দেবীর শারদীয় উৎসব হয় প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নটি দিন ধরে। প্রতিপদ থেকে চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি শুরু হয়। সবচেয়ে বেশি ধুম হয় নবমীর দিন। তখন বলি পড়ে অনেক। বলতে গেলে দেবীর এই নবমীর পুজো বলি-উৎসবই। বিচিত্র সে বলির পদ্ধতি। লোকমুখে নামও তার বিচিত্র—'প্যাঁচ-মোষ-গাড়োল-পাঁঠা'। অর্থাৎ সর্বপ্রথমে একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। খাঁড়ার প্যাঁচ দিয়ে। খাঁড়া উঁচু করে দু হাত ধরে এক কোপে পশুর মুণ্ডচ্ছেদ করাই বলির পদ্ধতি। এখানে প্রথম বলিতে পাঁঠার ঘাড়ে খাঁড়া রেখে এক প্যাঁচে কাটা হয়। এর নাম প্যাঁচের বলি। এর পর চলে ক্রমান্বয়ে মোষ, ভেড়া আর পাঁঠার বলি। এই বলিই নবমীর দিনের প্রধান বলি। তারপর রাজবলহাটের বিভিন্ন পরিবারের আর নানা স্থানের অধিবাসীদের বার্ষিক পুজোর বলি চলে, ক্রমান্বয়ে বলিদাতাদের নাম ডেকে। রক্তে তখন দেবীর বিশাল প্রাঙ্গণ ভেসে যায়। বিরাট জনসমাগম হয় সেই বলি দেখতে।

নীল-সরস্বতী পুজা

বৎসরে আর একটি দিন দেবীর মন্দিরে পাঁঠা বলি হয়। সেটি শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পুজোর দিন। দেবীকে সেদিন নীল-সরস্বতীরূপে পুজো করা হয়। এবং সেই উপলক্ষে এই বলির বিধান। নীল-সরস্বতী তান্ত্রিকদের আরাধ্য দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বিদ্যা তারারই একটি ভিন্ন রূপ। তারা, নীল-সরস্বতী, উগ্রতারা, একজটা এঁরা এসেছেন, আরও অনেক তান্ত্রিক দেব-দেবীর মত।

প্যাঁচের বলির পিছনকার কাহিনী

'প্যাঁচের বলি'র পিছনেও আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেটি হচ্ছে বাংলার কিংবদন্তীখ্যাত বীরাঙ্গনা রানি রায়বাঘিনীর সম্বন্ধে। এই রায়বাঘিনীর সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিতর্কমূলক বহু আলোচিত সে বিষয়ে প্রবেশ না করে যে কিংবদন্তী শুনেছি, সেটি এখানে বলি।

দক্ষিণ রাঢ়ের প্রাচীন বিখ্যাত ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণা ব্রাহ্মণ রাজবংশের মহিমায় স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। হুগলি জেলার বর্তমান ভুরসুট গ্রাম সেই প্রাচীন রাজ্যের নামস্মৃতি বহন করেছে বলে অনেকের ধারণা। গড়-ভবানীপুরের এই রাজবংশের রাজা রুদ্রনারায়ণের বীর পত্নী ছিলেন রানি ভবশঙ্করী। রাজার মৃত্যুর পর রানি তরোয়াল হাতে পাঠান সেনাপতির সঙ্গে লড়াই করে দিল্লীর মোগল-বাদশা আকবরের কাছ থেকে রানি রায়বাঘিনী উপাধি পেয়েছিলেন।

এই রায়বাঘিনী বিবাহের পূর্বে পণ করেছিলেন, তিনি বীর ছাড়া আর কারও গলায় বরমালা দেবেন না। রাজা তখন বৃদ্ধ, আর ভবশঙ্করী তাঁরই এক প্রজার কন্যা। একদিন রাজা দেখলেন, ভবশঙ্করী একটি ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন আর বর্শা দিয়ে দুর্দান্ত মহিষ বধ করেছেন। মুগ্ধ রাজা এই মহিষমর্দিনীকে বিয়ে করতে খুব ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু ভবশঙ্করীর পণ, বীরত্বের পরীক্ষা আগে চাই। একে রাজা বৃদ্ধ, তাতে প্রজার মেয়ে। তাই আপোস হল রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরে এক কোপে দুজনে একই সময়ে বলি দিতে পারেন কিনা, তারই পরীক্ষা হোক। সেই অনুসারে রাজবল্লভীর মন্দিরে হল পাশাপাশি দুটি জায়গায় বলির ব্যবস্থা। দুটি মোষ, তাদের মাঝখানে একটি ভেড়া পাশাপাশি বেঁধে রাখা হল রাজার জন্যে। আর ভবশঙ্করীর জন্যেও ঠিক ঐভাবে আরও দুটি মোষ আর একটি ভেড়া রাখা হল। বলিদানের সময় রাজা আর ভবশঙ্করী এসে একই সঙ্গে তরোয়ালের এক প্যাচে বলির পশুগুলির মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। পরীক্ষায় সসম্মানে রাজা উত্তীর্ণ। ভবশঙ্করী তাঁকে বিয়ে করলেন। এই ঘটনার স্মৃতিতেই নাকি প্যাচের বলি চলছে।

রাজবল্লভী ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজাদেরও উপাস্যা দেবী ছিলেন। অনেক ভূসম্পত্তি তাঁরা দান করেছিলেন। কিংবদন্তী আছে, তিনি এক শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পরেছিলেন, আর দীঘির জল থেকে শাঁখা পরে দীঘিতে হাত তুলে রাজাকে দেখিয়েছিলেন। সেই দীঘি এখনও আছে রাজবলহাটে। রাঢ়দেশে দেবীর শাঁখা পরে দীঘিতে হাত তুলে দেখানোর কাহিনী একটি প্রিয় জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। তাই এই একই কাহিনী বহু অঞ্চলে কী রকম প্রচলিত আছে, তা ক্ষীরগাঁয়ের যোগাদ্যার প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

দুই বোন

লোকে বলে, শিয়াখালার দেবী উত্তরবাহিনী আর রাজবলহাটের দেবী রাজবল্লভী দুই বোন। এঁদের মূর্তিও প্রায় একই রকমের। উত্তরবাহিনী তন্ত্রসারে উল্লিখিত বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যানে পূজিত হন। যদিও সে ধ্যানের সঙ্গে দেবীমূর্তির মিল বিশেষ নেই। রাজবল্লভীর যে ধ্যানে পূজা হয়, তার সঙ্গে তাঁর মূর্তির সম্পূর্ণ মিল আছে। রাজবল্লভীর ধ্যান এখানকার প্রাচীন পুরোহিতকুলেরই রচনা বলে মনে হয়, কোনও তান্ত্রিক কিংবা পৌরাণিক গ্রন্থে সে-ধ্যানের সন্ধান মেলেনি। সে যাই হোক, একই ধরনের মূর্তির দু জায়গায় পুজো দেখে মনে হয়, কোনও প্রাচীন তান্ত্রিক-সাধক থেকেই প্রবর্তিত হয়েছে এটি। লোকস্মৃতিতে সে-সাধক অবলুপ্ত হয়েছেন, কিন্তু দুই দেবী দুই সহোদরার সম্বন্ধে একসঙ্গে বাঁধা পড়েছেন লোকমনে।

দক্ষিণ রাঢ়ের হাওড়া-হুগলি জেলার এই অংশটি প্রাচীনকাল থেকেই তান্ত্রিক দেব-দেবীর পূজাপীঠে যে পরিণত হয়েছিল, তার দূরাগত পরিচয় এইসব অঞ্চলে বিশালাক্ষী, উত্তরবাহিনী, রাজবল্লভী ইত্যাদি বহু দেবীর বিচিত্র মূর্তি গঠনে, পুজো-পদ্ধতিতে, উৎসব-অনুষ্ঠানে আজও রয়ে গেছে। আজও রাজবলহাটের পাশের গ্রাম গুলিটায় বার্ষিক তারা পুজো হচ্ছে। রাজবলহাটে শুধু রাজবল্লভী নন, নীল-সরস্বতীও আজও পূজিত হচ্ছেন। বহু পুরাতন এই সমস্ত তান্ত্রিক দেবী গ্রাম-দেবীতে পরিণত হয়ে লোকচিত্তে নানা কিংবদন্তীর সূত্রে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

চোটখণ্ডের জগৎগৌরী

মেমারি স্টেশন থেকে মাইল তিনেক পূর্ব-দক্ষিণে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর লোক থৈ থৈ করছে। মেলা বসে গেছে—অনেক দূর থেকে লোকজন আসছে। সেই মেলা আর লোকের ভিড় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে চোটখণ্ড গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। অনেকখানি—জগৎগৌরীর মন্দিরের আশে-পাশে।

মেলা বসেছে চোটখণ্ডের গ্রামদেবী জগৎগৌরী-মনসার ঝাঁপান উপলক্ষে। জন্মাষ্টমীর দিনছয়েক পরে শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে। এই পঞ্চমী পাঁজিতে ঋষিপঞ্চমী, রক্ষাপঞ্চমী, ষট্‌পঞ্চমী—এই তিনটি নামে চিহ্নিত। লোকমুখে কিন্তু এর নাম বগা-পঞ্চমী। সমস্ত রাঢ়দেশটা জুড়ে গ্রামে গ্রামে মনসাপুজো সাধারণত শুরু হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরায়; আর তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে এক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অনুষ্ঠিত হতে হতে উৎসবটি শেষ হয় এই বগা-পঞ্চমীতে এসে। বর্ধমান জেলার মেমারি থানার চোটখণ্ডের জগৎগৌরীর ঝাঁপান এই বগা-পঞ্চমীতেই অনুষ্ঠিত হয়। এই পঞ্চমীর নাম কেন বগা-পঞ্চমী, তা জানি না। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ কিন্তু বলতে পারেননি।

সেদিন মন্দিরের চারপাশে মেলায় তখন খুব হৈ হৈ চলছে, তখন মন্দিরের পাশে দেবীর অন্যতম প্রবীণ বৃদ্ধ সেবাইত শ্রীগৌরচন্দ্র ঘোষাল তাঁর বাড়ির দাওয়ায় বসে আমাকে দেবীর মাহাত্ম্যকাহিনী শোনাচ্ছিলেন সবিস্তারে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন ছিল না, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্যরক্ষারও তাগিদ ছিল না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কল্পনানির্ভর একটি কাহিনী ভক্তি আর বিশ্বাসের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে পুরুষানুক্রমে বয়ে আসছে; তবে সূত্রটি হয়তো একেবারে অবাস্তব নয়। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার চকদীঘির জমিদার সিংহ-পরিবারকে কেন্দ্র করে দেবীর মাহাত্ম্য কেমন বিস্তৃত হল, সেটি এখন বিবৃত করছি।

সিংহ পরিবারের এক ছেলের মৃত্যু হয়েছিল সাপের কামড়ে। অনেক বৈদ্য, ওঝা, গুণিনের চেষ্টাতেও ছেলে বাঁচল না। মৃতদেহ নিয়ে শোকাতুর আত্মীয়স্বজনরা যাচ্ছিলেন ত্রিবেণীতে সৎকারের জন্যে। তাঁদের পথে পড়ল এই চোটখণ্ড গ্রাম। এই গ্রামে একটি কিশোরী এসে দাঁড়াল তাঁদের সামনে। ছেলেটির কী হয়েছে, আর কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমনি করে, মেয়েটি তা জানতে চাইল। একটা ছোট্ট মেয়ের কথায় কেউ তখন কান দেয়নি। তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে সবাই চলে যাচ্ছিলেন। মেয়েটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। শবযাত্রীদের সঙ্গে যেতে যেতে বার বার জিজ্ঞাসা লাগল—ছেলেটির কী হয়েছে। তখন শবযাত্রীরা বিরক্ত হয়ে বল্লেন : "বার বার কেন জিজ্ঞাসা করছিস। ওর কাটিঘায়ে মৃত্যু হয়েছে, ত্রিবেণীতে যাচ্ছি ওকে দাহ করতে।"

ঠাট্টার সুরেই তাঁরা বললেন আবার : "অত জিজ্ঞাসা করছিস কেন, বাঁচাতে পারবি একে?"

গ্রামাঞ্চলে লোকে সাপের কামড়ে মৃত্যুকে কাটিঘায়ের মৃত্যু বলে।

কাটিঘায়ের মৃত্যুর কথা শুনে মেয়েটি উঁচু হয়ে একবার শবের মুখটা দেখে নিল। তারপর হো হো করে হেসে উঠে, হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলে উঠলো : "তোমরাও যেমন বোকা। এ ছেলে মোটেই মরেনি, বেঁচে আছে।"

পাগলি নাকি? বলে কিনা মরেনি এ ছেলে! তবুও সবাই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দেখে। নাঃ, জীবনের কোনও চিহ্ন তো নেই দেহে। তাঁরা আবার জোরে জোরে চলতে শুরু করলেন—এখনও পথ অনেক বাকি, এই পাগলির সঙ্গে অনর্থক বকবক করে সময় নষ্ট করে দরকার নেই।

মেয়েটি কিন্তু তাদের সঙ্গ ছাড়েনি। ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করে দিয়েছে। খানিকবাদে শবযাত্রীরা বেশ ধমক দিয়েই বললেন : "যাচ্ছিস কোথায় আমাদের সঙ্গে? যা, এখনই বাড়ি ফিরে যা।"

হাসতে হাসতে মেয়েটি এবার বললেন : "আচ্ছা, আমি ফিরে যাচ্ছি, তবে দেখো আমার কথা সত্যি কিনা। ত্রিবেণীতে যখন গঙ্গায় ওকে স্নান করাবে, দাহ করার আগে, তখন দেখবে, ও জেগে উঠেছে। তখন কিন্তু আমাকে ভুলো না যেন। আমি এই গ্রামেই থাকি। আমার নাম জগৎগৌরী।"

শবযাত্রীরা আর কোনও উত্তর দেননি। সবাই ধরে নিয়েছিলেন— এ মেয়ে প্রগল্‌ভা, উন্মত্তা, অকারণে কৌতুকময়ী।

মেয়েটি ফিরে গেল। শবযাত্রীরাও চলে গেলেন।

ত্রিবেণীতে গিয়ে কিন্তু শবযাত্রীরা দেখলেন মেয়েটির কথাটি অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। ত্রিবেণীর জলে মৃতদেহ স্নান করাবার সময় ওর দেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। ঘুমভাঙা সুস্থ মানুষের মত উঠে বসেছে ছেলেটি।

দারুণ বিস্ময় আর আনন্দের পালা তারপর। কিন্তু ও মেয়ে কে, এমন করে প্রতিটি কথা যার সত্য হলো!

চোটখণ্ডে ফিরে এসে সবাই তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন জগৎগৌরীকে। কিন্তু ও গ্রামে একটি পর্ণকুটিরের মধ্যে দেবী জগৎগৌরীর মূর্তি ছাড়া আর ও নামের কোনও মেয়ে হদিশ মিলল না। সবাই তখন ভক্তিবিগলিত চিত্তে ধরে নিলেন, দেবী জগৎগৌরীই কিশোরীর মূর্তি ধরে শবযাত্রীদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর তাঁর অহেতুক করুণাই মৃতের প্রাণসঞ্জীবনী হয়েছে।

কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ধনী সিংহ-পরিবারের কর্তা দেবী জগৎগৌরীর পর্ণকুটিরবাস তখন ঘুচিয়ে সুন্দর মন্দিরবাসের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সুরম্য মন্দির, নাটমন্দির, সেবা-পুজোর ঢালাও ব্যবস্থায় তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন। সেই পুরনো মন্দির, নাটমন্দির অনেকদিনই ধূলিসাৎ হয়েছে। তার জায়গায় এখনকার মন্দির এবং নাটমন্দির তৈরি হয়েছে। এ মন্দিরের অবশ্য স্থাপত্যসৌন্দর্য বলে কিছুই নেই। নাটমন্দিরটিও সাদামাটা—থামের ওপরে একটা টিনের চালা তোলা শুধু।

কিন্তু এই মন্দির আর নাটমন্দিরের সামনে সেদিন দেখেছি, সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত লোক থৈ থৈ করছে, অবিরত পাঁঠা বলি চলছে, মানসিকের প্রদত্ত পূজার উপকরণে গর্ভমন্দির ভরে উঠেছে।

যুক্তিবাদীরা বলবেন : সাপের কামড়ে মৃত বলে ঘোষিত মানুষ দীর্ঘকাল পরে বেঁচে উঠেছে— এমন ঘটনাও অনেক ঘটেছে দেখা গেছে। এযুগেও মৃতের পুনঃ জীবনপ্রাপ্তির ঘটনা একেবারে বিরল নয়। শ্মশানে চিতার ওপরে মৃতদেহ উঠে বসেছে জীবন্ত হয়ে—এমন ঘটনা এখনও ঘটছে। জীব-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞানও বলে মানুষের দীর্ঘকাল স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড নানা কারণে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। উল্লিখিত ক্ষেত্রেও হয়তো অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল, নিছক কৌতূহলেই হয়তো একটি মেয়ে শবযাত্রীদের মৃতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এই মূল বাস্তব ঘটনাটির ওপরে কালক্রমে ভক্তি, বিশ্বাস, অলৌকিকতার আচ্ছাদন পড়েছে, আর রূপান্তরিত হয়েছে এটি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দেবীর মাহাত্ম্যকাহিনীতে।

কিন্তু যুক্তিবাদীদের কথায় কী আসে যায়। এই কাহিনীই হাওয়ায় ভর করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে আর আমাদের দেশের গ্রামীণ দেবমাহাত্ম্যসূচক অসংখ্য কিংবদন্তীর সংখ্যাকে পরিপুষ্ট করেছে। গ্রামগ্রামান্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষকে দেবীর চরণে প্রণত করেছে।

চোটখণ্ডের মন্দিরের ভেতরে সিংহাসনে দেবী জগৎগৌরী, মনসা আর শীতলার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জগৎগৌরী মনসারই নামান্তর। নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। জগৎগৌরী মনসা হওয়া সত্ত্বেও চোটখণ্ডে একটি মনসাও তাঁর পাশে বসেছেন। দুজনকেই দেখতে ঠিক একই রকমের। পাথরের তৈরি। আকৃতি ঘটের মত কেবল ওপরের অংশটাতে মুখ উৎকীর্ণ—

চোখ, নাক, কান, অধরওষ্ঠ সমেত। হাত পা কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। দেবীরা থাকেন কাপড়ে ঢাকা সোনার মুকুট, হারে ভূষিত। শীতলার মূর্তিও সিঁদুর মাখানো একটি পাষাণখণ্ড। লোকে বলে এঁরা তিন বোন। এঁরা তিনজনে একসঙ্গে পুজো নেন। ঝাঁপান-উৎসবে তিনজনকেই নিয়ে নানা কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

স্বপ্নাদ্য আবির্ভাব-কাহিনী

এঁদের স্বপ্নাদ্য আবির্ভাব-কাহিনীও ঘোষালমশাই শুনিয়েছিলেন। সে কাহিনীটি বিবৃত করছি।

হুগলি জেলার গুড়প গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দক্ষিণে পলাশীতে নাড়ুরদহ নামে একটি জলাভূমিতে এক জেলের জালে দেবী জগৎগৌরী আর মনসা উঠেছিলেন। জেলে সামান্য পাষাণখণ্ড ভেবে তাঁদের একপাশে ফেলে রেখে দিয়েছিল। এক মুচি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই মূর্তি-দুটি তাঁর বাড়িতে কুড়িয়ে এনে খুব ধুমধামে পূজার্চনা করল দিনকয়েক। বোধ হয় তথাকথিত অন্ত্যজের হাতে পুজো নিতে দেবীদের বড় মন খুঁত খুঁত করছিল। তাই দেবীরা মুচিকে স্বপ্নাদেশ দিলেন ওঁদের পুরোহিতবাড়িতে তাঁদের রেখে আসতে। হুগলি জেলার কোনান গ্রামে পুরোহিতবাড়িতে দেবীদের নিয়ে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, দেবীরা তখন আবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে মুচিকে বল্লেন, তাঁরা কোনান গ্রামে যাবেন না। বর্ধমান জেলায় শশীনাড়া গ্রামে ওদের কুটুম্বদের যে পুরোহিত আছেন, তাঁর বাড়ি তাঁরা যেতে চান। শশীনাড়া মেমারি থানার ভেতরেই চোটখণ্ড থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। ঐ কুটুম্বদের পুরোহিতরা কিন্তু শশীনাড়া গ্রামে থাকতেন না, থাকতেন আমাদপুরে—চোটখণ্ড থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। মুচি তখন দেবীদের আমাদপুরে পুরোহিতদের বাড়িতে নিয়ে এল। দেবীরা সেই পুরোহিতদের বাড়িতে এসে তাঁকে আবার স্বপ্নে জানালেন, তাঁরা ঐ গ্রামে নয়, চোটখণ্ডে থাকবেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জানালেন, তাঁর তো সঙ্গতি নেই, তিনি কী করে দেবীদের ওখানে নিয়ে গিয়ে সেবাপুজো চালাবেন। দেবীরা অভয় দিয়ে বললেন, কোনও ভয় নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অতঃপর দীঘাপতিয়ার রাজাকে স্বপ্নাদেশ তাঁদের পূজার্চনার ব্যবস্থা করে দিতে আর ভাদ্র মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে অর্থাৎ বগাপঞ্চমীতে তাঁদের ঝাঁপান-উৎসবের আয়োজন করতে। স্বপ্নাদিষ্ট দীঘাপাতিয়ার অধিপতি দেবীদের আদেশ পালন করে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেছেন। সেই ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে সেবাইতরা দেবীদের সেবার্চনা, উৎসবাদি আয়োজন করে আসছেন, বংশপরম্পরাক্রমে।

স্বপ্নাদ্য ওষুধ

শুধু স্বপ্নাদ্য আবির্ভাব কাহিনীতেই দেবীদের মাহাত্ম্য জমে ওঠেনি—তাঁদের স্বপ্নাদ্য ওষুধেরও অনেক নামডাক। জগৎগৌরীর স্ত্রীরোগের আর শীতলার মূর্ছারোগের ওষুধ নিতে আসে লোকে দূর দূর অঞ্চল থেকে। বগাপঞ্চমীতে কেবলমাত্র কাটিঘা থেকে অর্থাৎ সাপে কামড়ানো থেকে বেঁচে যাওয়ার জন্যে নয়, ঐ সব রোগগ্রস্তরাও আসে দেবীর বার্ষিক পুজোর মানসিক শোধ দিতে। সুতরাং সেবাইতদের প্রভাবপ্রতিপত্তি যে বেশ জমে উঠবে, এতে বিচিত্র কী। গ্রামদেবতা নিঃসহায়, দরিদ্র, নিরুপায় গ্রামীণ মানুষদের রোগে, বিপদে একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে আছেন—আমাদের দেশের এ অনেকদিনের ধারা। এই বিশ্বাসের আদিসূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে, আদিম মানুষের ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতরা।

এবার দেবীদের উৎসবের কথা বলি। বগাপঞ্চমীতে দেবীর বার্ষিক উৎসবটির নাম ঝাঁপান হলেও, বেদে, ওঝা, গুনিনদের মাচার ওপরে দাঁড়িয়ে সাপখেলানো, পরস্পরকে মন্ত্রতন্ত্রে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের কেরামতি দেখানো—সেই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের পাট চোটখণ্ড থেকে অনেকদিনই উঠে

গেছে। এখন কোনও কোনও বছর দু-একজন সাপুড়ে শুধু সাপ নিয়ে এসে খেলা দেখায়। কোনওবার তাও হয় না।

দেয়াশিনীদের কোলে চড়ে গ্রামভ্রমণ

এই বার্ষিক উৎসব শুরু হয় জন্মাষ্টমীর পরের দিন নবমীতে— নন্দোৎসবের দিন। সেদিন দুলে, খয়রা প্রভৃতি জাতের তিনটি মেয়ে দেবী তিনজনকে কোলে নিয়ে গ্রামপ্রদক্ষিণে বেরোয়। ঢাক, ঢোল, কাঁসি বাজে। লোকে লাঠি নিয়ে নাচে। ঐ মেয়ে তিনটিকে বলে দেয়াশিনী, দেবাংশিনী শব্দের অপভ্রংশ। ওদের ওপরে দেবীদের ভর হয়। দেবীরা ওদের মুখ দিয়ে নিজেদের সেবাত্রুটির কথা, শরণাগতদের প্রশ্নের উত্তর জানান। তথাকথিত অন্ত্যজ হলেও ওদের উদ্দেশে তখন উঁচু জাতের মানুষদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নমস্কার জানাতে কিছুমাত্র দ্বিধা আসে না। এই দেয়াশিনীদের কোলে চড়ে দেবীরা ঐ দিন গ্রামের নির্দিষ্ট বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পুজো গ্রহণ করে।

এই নবমীর দিন থেকে পরবর্তী শুক্লাচতুর্থী মোট এগারো দিনের ভেতরে অমাবস্যা বাদ দিয়ে মোট দশটি দিন দেবীরা এইভাবে প্রত্যহ শুধু চোটখণ্ড নয়, আশেপাশের ৩০/৩৫টি গ্রামে ঘোরেন এবং সেখানকার বাড়িতে বাড়িতে পুজো পান। একে বলে দেবীদের গ্রামবেড়ানি। প্রাগ্বিভক্ত আদিম মানবগোষ্ঠীর যৌথ কৃত্য পালনের সুদূরাগত ছায়া আমাদের দেশের গ্রামদেবতাদের কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কৃত্য পালনের মধ্যে এসে পড়েছে—নারকেলডাঙ্গার গ্রামদেবী জগৎগৌরীর গ্রামবেড়ানির প্রসঙ্গে সে-বিষয়ের আলোচনা করেছি। দেবীদের এই গ্রামবেড়ানিই সকলকে আসন্ন উৎসবের ইঙ্গিত দেয় এবং সকলকে উৎসবের জন্যে যেন আমন্ত্রণ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট প্রণামীও দেবীর তহবিলে সংগৃহীত হয়। এটিও আজকের দিনে খুব সামান্য কথা নয়। এই বার্ষিক প্রণামী কুড়ানোর কাজ দেবীদের নিজেদের অংশগ্রহণে বেশ সাফল্যমণ্ডিতই হয়।

সয়লা ও বনভোজনের উৎসব

ঝাঁপানের আগের দিন অর্থাৎ চতুর্থীর দিন রাত্তিরে সয়লা উৎসব। তার আগের দিন রাত্তিরে বনভোজন। বর্ধমান জেলার গ্রামদেবতাদের বিশেষত জগৎগৌরী, মনসা, শীতলা ইত্যাদির বার্ষিক উৎসবের আগের দিন বাজি পোড়ানো, নানা আমোদপ্রমোদের রেওয়াজ, নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরীর সয়লা-উৎসবেরও বিবরণ পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দিয়েছি।

বনভোজনের দিন রাত্তিরে মেয়েরা দেবীদের চোটখণ্ডের সিদ্ধেপুকুরের পাড়ে নিয়ে গিয়ে দেবীদের সামনে সকলে মিলে ফলার খান, দিনান্তের উপবাসের পর। এই সয়লা-উৎসবে, বনভোজনে সকলের অংশগ্রহণে একটি নিবিড় সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আবেদন আছে। আদিম যৌথ জীবনচর্যার রেশই যে এই কৃত্যগুলির মধ্যে রয়ে গেছে, সেটি অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

বাম হাতে বলি প্রদান

পঞ্চমীর দিন সেবাইতরা ষোড়শোপচারে দেবীদের পুজোর পর বলি আরম্ভ করেন। প্রথমে জমিদারের নামেই পুজো ও তিনটি পাঁঠা বলি হয়। বলিদানের পদ্ধতিটিও বিচিত্র। ব্রাহ্মণ-সেবাইত নিজের হাতে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত একটি পুরনো খগ দিয়ে পাঁঠা তিনটির মুণ্ডচ্ছেদ করেন—ডান হাত দিয়ে নয়, বাম হাতের কোপ মেরে। শাস্ত্রীয় নির্দেশ যাই থাকুক না কেন, গ্রামদেবতাদের বলির ব্যাপারে কত বিচিত্র অনুষ্ঠানই না গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে। রাজবলহাটে একটি পাঁঠা পেঁচিয়ে

কাটা হয়। আরও নানান গ্রামে নানান বিচিত্র পদ্ধতি দেখেছি। এইসব থেকেই বেশ বোঝা যায়, শাস্ত্রনির্দেশ রচিত হবার অনেক আগে থেকেই এইসব অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে সমাজে এবং গ্রামদেবতাদের অনেকেই পুরাণের চেয়ে পুরনো।

এই তিনটি বলির পর গ্রামের আর সবাইদের বলি শুরু হয়। তারপর অনেক রাত্তির পর্যন্ত এই বলিপর্ব চলে। নাটমন্দিরের সামনে রক্তের ঢেউ বয়ে যায়। গ্রামগ্রামান্তর থেকে লোক আসে বাঁশের থাকার ওপরে নৈবেদ্য সাজিয়ে, বলির পাঁঠা নিয়ে, ঢাক-ঢোলের সঙ্গে নাচতে নাচতে। অনেকে ব্যান্ড বাজিয়ে, আলোকসজ্জা করেও আসে। আকণ্ঠ সুরাও পান করে অনেকে। গোলমাল বেঁধে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয় পদে পদে। পুলিশ প্রহরীদের সদাসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়—কখন কী অঘটন ঘটে যায়। আগে আগে এই থাকাগুলোর সঙ্গে পৌরাণিক পুতুলের সাজসজ্জাও থাকতো। এখন সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। মোষবলিও উঠে গেছে।

কিন্তু এই ঝাঁপান উপলক্ষে যে মেলা বসে চোটখণ্ডে শুধু মেমারি থানার ভেতরে নয়, সারা বর্ধমান জেলার মধ্যে এটিকে বৃহত্তম মেলা বলে যেতে পারে। গাছপালা, হাঁড়িকলসী, মাছধরার জাল, ধামা, চুপড়ি, মনিহারি জিনিসপত্রের স্তূপ নিয়ে আসে দোকানিরা। বর্ধমান আর হুগলি জেলা, এমনকি কি নদীয়া জেলা থেকেও অনেক দোকানি-পশারি আসে পণ্য নিয়ে, বর্ধমান জেলার এই বৃহত্তম মেলাটিতে। আর দিনসাতেক ধরে এই মেলায় বিপুল জনসমাগম চলতে থাকে।

খড়দহের রাস

নামটা গোষ্ঠবিহার। কিন্তু যুগটা তো বৃন্দাবনী নয়। তাই কোথায় মিলবে সেই রাখাল ছেলের দল মুখে যাদের অলকা-তিলকা আঁকা, মাথায় চুল ময়ূরপাখা দিয়ে চূড়ো করে বাঁধা, গলায় বনফুলের মালা, কাঁধে ছাঁদনদড়ি, হাতে বেত্র, বেণু, বিষাণ। কোথায় তাদের মধ্যমণি ললিতকান্তি কানাই বলাই। কোথায় বা মিলবে নধরদেহ শ্যামলী, ধবলী, পিয়ালীর পাল—যাদের পিছনে পিছনে হৈ হৈ ছুটেছে ব্রজের দুরন্ত দামাল রাখাল ছেলেরা।

গোখুর ধূলি উছলি তরু অম্বর
ঘন হাম্বা হৈ হৈ রাব।
বেণু-বিষাণ-রথ বেয়াপিত দশদিগ
রঙ্গে সঙ্গে সহচর ধাব।।

খড়দার রাসের শেষে সেদিন গোঁসাইদের মন্দিরের বিগ্রহ শ্যামসুন্দরকে নিয়ে যে গোষ্ঠযাত্রার মিছিল বেরিয়েছিল, তাতে ব্রজের রাখাল ছেলে আর শ্যামলী-ধবলীদের অভাব থাকলেও মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধুলো আর আকাশে টিটাগড়, ব্যারাকপুর, পলতা, ইছাপুর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়ার সারি সারি কলকারখানার চিমনির উগরে দেওয়া, বাতাসে ভেসে আসা কালির অভাব হয়নি। গোঁসাইরা দল বেঁধে বৃন্দাবনের কানাই বলাই-এর গোষ্ঠবিহারের গান গেয়ে চলেছিলেন। খোল-করতালের সঙ্গতে তাঁরা কোরাসে গাইছিলেন ·

শ্রীকরে বলয় পাঁচনি
মুখে আবা আবা ধ্বনি
নেচে নেচে ত্রিভঙ্গগমন..........

ঢিমে তাল শেষ করে গান যখন দুনের মাতনে এসে পৌঁছোচ্ছিল, তখন তাঁদের উদ্দণ্ড নাচে পায়ের দাপে রাস্তার ধুলোও উড়ে উড়ে চারধারে যেন পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছিল। ব্রজের ধেনুচরানো বেণুবাজানো রাখালছেলেরা নিপাত্তা হলেও খড়দহের গোষ্ঠবিহারে ব্রজরেণুর অভাব হয় না -- মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধুলোয় আর চিমনির ধোঁয়ার কালিতে।

গোঁসাইদের সঙ্গে প্রবীণ, নবীন—সব বয়সেরই লোক ছিলেন। প্রবীণদের পরনে ধুতিচাদর, কেউ কেউ গরদ আর রঙিন বেনারসি জোড়ও পরেছিলেন। তিলক, কণ্ঠী নামাবলীর ভূষণও তাঁদের ছিল। ছেলে ছোকরারা জরিপাড়ের ধুতির সঙ্গে শুধু গেঞ্জি কিংবা তার ওপরে আদ্দির পাঞ্জাবি চড়িয়ে হাজির হয়েছিলেন। পায়জামা-পাঞ্জাবি কিংবা ফুলপ্যান্ট-বুশশার্টও কারও কারও অঙ্গশোভা বর্ধন করছিল। বৈষ্ণবের তিলক-মালার সাজ নবীনদের মধ্যে দুর্লভ। স্কুল-কলেজের পোড়ো ছাত্র কিংবা আপিসে-কলকারখানায় চাকরি করা এই গোস্বামীসন্তানরা বছরের এই একটা দিন খড়দার রাস্তায় ঠাকুর নিয়ে ব্রজরাখালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং গোষ্ঠবিহারের গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে পথ পরিক্রমা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ কিংবা তাঁর পুত্র বীরভদ্রের আমল থেকে খড়দার শ্যামসুন্দরের রাসযাত্রা উপলক্ষে এই গোষ্ঠবিহারের রেওয়াজ চলে আসছে এবং গোস্বামীসন্তানরা আজও তার হেরফের করেননি। খড়দার রাসযাত্রা শুরু হয় পূর্ণিমায়। দিনতিনেক উৎসবটির মেয়াদ। এই কদিন প্রতিদিন রাত্রে খড়দার বিখ্যাত শ্যামসুন্দর ও রাধার বিগ্রহকে মন্দির থেকে বার করে গঙ্গার ধারে রাসমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার ভোর বেলায় তাঁদের মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হয়।

সতেরো চুড়োর রাসমঞ্চ

সতেরোটি চুড়োর রাসমঞ্চ। পুরনো রাসমঞ্চ বীরভদ্রের আমলের বলে কথিত, সেটি গঙ্গার ধারে লালুপালের বাঁধাঘাটের ওপরে রাস্তার পূর্বদিকে ছিল। সেটি এখন বিধ্বস্ত। তার বদলে তৈরি হয়েছে এই নতুন রাসমঞ্চ। এর বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছরের কিছু বেশি হবে। এর গায়ে পঙ্খের অঙ্গলেপের যে মসৃণ শুভ্রদ্যুতি ছিল, বারবার মোটা চুনকামে এখন তা ঢাকা পড়ে গেছে। সারা বছর এখানে গোরু ছাগল, আর ছেলেপিলেদের আড্ডাখানা জমে। রাসযাত্রার দিনকতক আগে কয়েক পোঁচ কলিচুনের অঙ্গরাগ পড়ে এর গায়ে। আগে আগে রাসমঞ্চের চারধারে দুলত জরির পরদা। কাঁচের বেলোয়ারি চিমনির ভেতরে জ্বলত মোমবাতির নরম আলো। শোলার তৈরি কদমঝাড়ে, শাপলায়, পদ্মফুলে, টিয়া, কাকাতুয়া, ময়ূর, হাঁস, পানকৌড়ি, বাঁদরের মেলায় বৃন্দাবনের রাসরঙ্গ-ভূমি রচিত হত। এই রাসমঞ্চের ভেতরে কালো কষ্টিপাথরের তৈরি সুঠাম, সুদর্শন শ্যামসুন্দর আর অষ্টধাতুর রাধা কিংখাবের বসনে, সোনার গয়নায়, বেলোয়ারি আলোয় ঝলমলানি তুলে রাসনিশি যাপন করতেন। এখন বেলোয়ারির দিন গত। তার বদলে নিওন আর ইলেকট্রিকের আলোর জমকালো মালা রাসমঞ্চের গায়ে জড়ানো। বৃন্দাবনের বনসজ্জা এখন শোলার তৈরি গোটাকতক কদমফুলে আর পাখিতে এসে ঠেকেছে।

পূর্ণিমা থেকে শুরু করে করে দিনতিনেক প্রতিদিন রাত্তিরে শ্যামসুন্দর বাজনাবাদ্যি করে আলোর রোশনাই এ চারধার ভরিয়ে রাসমঞ্চে এসে ওঠেন। গোস্বামীরা এই মিছিলে রাসের গান গাইতে গাইতে আসেন। মন্দির থেকে রাসমঞ্চ মিনিট আষ্টেকের পথ। কিন্তু এই গানের মিছিল আসে নানা জায়গায় থামতে থামতে। সুতরাং বেশ দেরিই হয়ে যায় রাসমঞ্চে এসে পৌঁছতে। রাসমঞ্চের সামনে যখন তাঁরা এসে পৌঁছন তখন রাসমঞ্চের চারধার ঘিরে, আর গঙ্গার ধারে রাসমেলার দোকান পাট জমে গেছে। হাঁড়িকুড়ি, পোড়ামাটির পুতুল, ধামা, চুপড়ি, লোহার বঁটি কাটারির দোকানে লোক গিস্‌গিস্ করছে। রাসমেলায় পাঁপরভাজা আর তেলেভাজা বেগুনির দোকানেও যথারীতি ভিড়। চা-এর স্টলে এ্যামপ্লিফায়ারে বাজছে রেকর্ডের গান তারস্বরে। ওদিকে গোস্বামীদের কাঁধে চতুর্দোলার ওপরে আপাদমস্তক সোনার গহনায় ঝলমল শ্যামসুন্দর-রাধার বিগ্রহ। আর গোস্বামীরা বেহাগে ঝুমুর গাইছেন :

> শ্যাম চলু রাসবিহারী
> রাসনিকুঞ্জে বসি
> শ্যাম আমার বাজায় বাঁশী।
> মুখে মৃদু মৃদু হাসি
> চলে কালো পূর্ণশশী
> দেখি ঐ রূপরাশি
> গোপী ঘরে রইতে নারে
> চলু রাসবিহারী

তারপর শুরু হয় রাসমঞ্চের সিঁড়িতে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি। পুজোর সন্দেশের ডালা আর পয়সা পড়ে বেশ। সারা রাত্তির রাসরঙ্গে কাটিয়ে ভোর থাকতে থাকতে ক্লান্ত শ্যামসুন্দর মন্দিরে ফিরে আসেন।

গোষ্ঠবিহারের মিছিল

এইভাবে তিনটি রাত্তিরের উৎসবের শেষে চতুর্থ দিন অর্থাৎ তৃতীয়াতে শ্যামসুন্দর আর ভোর

বেলায় মন্দিরে যান না। এই রাসমঞ্চেই থাকেন অনেক বেলা পর্যন্ত। তারপর গোস্বামীরা আসেন তাঁকে গোষ্ঠবিহারে নিয়ে যেতে। গোষ্ঠবিহার সকাল বেলারই লীলা। কিন্তু রাসমঞ্চ থেকে ঠাকুরকে নিয়ে মিছিল করে বেরোতে বেরোতে গোস্বামীদের দুপুর আড়াইটে বেজে যায়। খড়দার রাসযাত্রায় এই শেষদিনেই যাত্রীদের সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে। রাসমঞ্চে ঠাকুর যতক্ষণ, যাত্রীদের প্রণামীও পড়বে ততক্ষণ। ভক্তদের প্রণাম আর প্রণামীর ঠেলায় ভক্ত বৎসল ঠাকুরের গোষ্ঠে গোচারণে যেতে দেরি হয়ে যায়।

এই গোষ্ঠবিহারের মিছিলে ব্যান্ডে, ব্যাগপাইপে একালের হিট রেকর্ড সঙ্গীত বাজে। ঢাক ঢোল তো আছেই। তাদের পেছনে গোস্বামীরা গোষ্ঠের গান ধরেন :

বেলা হল গোচারণে যাই- -
অঙ্গনে দাঁড়ায়ে সবাই
শিঙাতে ডাকিছেন দাদা বলাই ...

চতুর্দোলায় গোস্বামীদের শ্যামসুন্দর। চতুর্দোলার পাশে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড ছাতা। গোষ্ঠে যেতে প্রখর রবির কিরণে শ্যামের চাঁদমুখ পাছে শুকিয়ে যায়, সেই জন্যে মাথায় ছাতা ধরার ব্যবস্থা বোধহয়।

দরজায় দরজায় শ্যামের ভোগ

শ্যামের শ্রম দূর করবারও ব্যবস্থা আছে। এই মিছিলের পথের ধারে বাড়ির দরজায় দরজায় শ্যামের জন্যে ভোগ সাজিয়ে বসে থাকেন গৃহস্থরা। ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, চন্দ্রপুলি, মালপো, ফলমূলের নৈবেদ্যের ভার। সারা সকাল থেকে মা যশোদার দল শ্যামসুন্দরের জন্যে এইসব সুস্বাদু ভোগ তৈরি করে রাখেন। সদর দরজায় চাঁদোয়া খাটিয়ে, আমের পল্লবে আর আলপনায় সাজিয়ে সবাই অপেক্ষা করেন। শ্যামসুন্দরের চতুর্দোলা ঐ সমস্ত গৃহস্থদের বাড়ির সামনে ঘুরিয়ে দাঁড় করানো হয়। তারপর সেই সমস্ত ভোগ নিবেদন করা হয় তাঁকে। আরতি, প্রণাম ইত্যাদি সারা হলে, শ্যামসুন্দর আর এক বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। এইভাবে রাসমঞ্চ থেকে মন্দিরের মিনিট আষ্টেকের পথে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি বাড়ির ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, মালপো খেতে খেতে তাঁর সন্ধে হয়ে যায়।

ভোগলুট পর্ব

তারপরে মন্দিরে গিয়ে ঢোকেন শ্যামসুন্দর। এখানেও এক প্রকাণ্ড ভোগের ব্যাপার। এর নাম 'মহা বিরাট ভোগ'। এই 'মহা বিরাট ভোগলীলায়' সেদিন যে কাণ্ডটি দেখেছি, তা কোনও দিন ভুলবো না। সেই কথাটি বলি এবার।

মন্দিরের নাটমন্দিরের ভেতরে একটা প্রকাণ্ড পেতলের তৈরি গাড়ি। লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৭ ফুট আর গভীরতায় ৪ ফুট। এই পেতলের প্রকাণ্ড গাড়ি খিচুড়িতে ভর্তি। গাড়ির সামনে রাখা মালসাতে সরায় মিষ্টি খাবার, ফলমূল ইত্যাদি। নাটমন্দিরে চারধারে লোকে-লোকারণ্য। তাদের হাতে হাঁড়ি, বালতি, কড়া, টিফিন ক্যারিয়ার, ঝুড়ি, চুপড়ি, কাঁচের গলাভাঙা বোতল, বাটি, গেলাস, ঠোঙা, মাটির ভাঁড়—যে যেমন পাত্র পেরেছে নিয়ে এসেছে। ভলান্টিয়াররা লাইন বেঁধে হাতে হাত দিয়ে সেই বিরাট ভিড়কে প্রতিহত করে রেখেছে। শ্যামসুন্দর মন্দিরে এসে পৌঁছনো মাত্র তাঁকে কোলে করে সেবাইতরা এই ভোগের সামনে যেই এসে দাঁড়ালেন, অমনি সেই বিশাল ভিড় বাঁধভাঙা হুমড়ি খেয়ে পড়ে খিচুড়ি তুলে নিতে লাগল। আগুন লাগলে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে

নিয়ে লোক যেমন দৌড়োয়, এও সেই রকম ব্যাপার। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। একসঙ্গে যত রাজ্যের হাঁড়ি, কড়া, বাটি, বালতি, ধামা, চুপড়ি সব ঐ চৌবাচ্চায় চুবিয়ে খিচুড়ি ভর্তি করে নিয়ে লোক পালাচ্ছে। সেই হুড়োহুড়িতে কত বালতি খিচুড়ি মার্বেল পাথরের মেজেতে পড়ে গেল। কত লোকের মাথায় বালতির চোট লাগল। কতজন মেয়েপুরুষকে হাঁড়িভর্তি খিচুড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে পা পিছলে সেই মেঝেতে দড়াম করে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দেখলুম। কয়েকজনের কপাল কেটে রক্তও ঝরতে লাগল খুব। সকলের জামায় কাপড়ে আপাদমস্তক এমন কি মেয়েদের খোঁপার খাঁজে খাঁজে পর্যন্ত ছিটকিয়ে পড়া খিচুড়ি লেপটে রয়েছে। নাটমন্দির থেকে বাইরে এসে দেখি—সেখানেও খিচুড়িতে পিছল হয়ে গেছে। লোকে দড়াম দড়াম করে আছাড় খাচ্ছে তার ওপরে। এর নাম ভোগলুট। এই ভোগলুট পর্ব খড়দার রাসযাত্রার এক প্রসিদ্ধ ব্যাপার। অনুষ্ঠানটি কিন্তু খুব পুরনো নয়--বছর ৭০/৭৫ বৎসর ধরে চলছে।

খড়দহ বৈষ্ণবের শ্রীপাট, নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যজীবনযাত্রার পুণ্যভূমিরূপে পূজিত। শ্রীচৈতন্যের পরামর্শে তিনি বিবাহ করে এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা আর জাহ্নবীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র বসুধার গর্ভজাত পুত্র। বীরভদ্র নিত্যানন্দেরই মত অতি উদার, দয়ালুহৃদয় এবং অ-ছুঁৎমার্গী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বারোশো নেড়া আর তেরোশো নেড়িকে ভেক দিয়ে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত করেছিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্মের শাসনপাশে বদ্ধ, স্মৃতিশাসিত প্রাণহীন শুষ্ক সমাজকে কৃষ্ণভক্তির সুধারসে সঞ্জীবিত করে শ্রীচৈতন্য যে নতুন জীবনপ্রবাহ বাংলাদেশে এনেছিলেন ষোড়শ শতকে, নিত্যানন্দ "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়" জাতি বিচারের ধার ধারতেন না। আনন্দময়, সরলপ্রাণ, ক্ষমাসহিষ্ণু নিত্যানন্দ বাংলার প্রেমধর্ম প্রচারব্রতী ছিলেন। তাঁর পুত্র বীরভদ্রও পিতার মত দয়াপ্রবণ, উদার হৃদয়, মনস্বী ছিলেন। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর জাহ্নবী দেবী আর বীরভদ্রই খড়দহের শ্যামসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর সময় থেকেই নিত্যানন্দের স্মৃতিপূত খড়দহ বৈষ্ণবের শ্রীপাটের মর্যাদায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নবদ্বীপ যেমন শ্রীচৈতন্যের, শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতের, খড়দহ তেমনি শ্রীনিত্যানন্দের বিহার-ভূমিরূপে বৈষ্ণবদের কাছে পূজিত। বাংলাদেশের সর্বত্র অদ্বৈতবংশের মত নিত্যানন্দবংশেরও গোস্বামীদের পুরুষানুক্রমে বহু শিষ্যগোষ্ঠী আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক ধনী ভক্তেরও অভাব নেই। ধনী দরিদ্র সকল ভক্তের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির, দেবসেবা, উৎসব, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে। তাই খড়দহের রাসযাত্রায় যে এত ভক্ত সমাগম হবে, তাতে বিচিত্র কী।

নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমায় যে সমস্ত বিশালকায় শক্তিমূর্তির পূজা হয়, তার পরদিন তাদের বিসর্জনের আড়ং-এর এবং শান্তিপুরের ভাঙা রাসের মিছিলের যেমন বিশেষ ধুম, খড়দহের রাসযাত্রার শেষে গোষ্ঠবিহারের তেমনই ধুম। এই রাসযাত্রা আর গোষ্ঠবিহারই খড়দহের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। দলে দলে লোক যায় খড়দহের রাসে ট্রেনে, বাসে, নৌকায়, পায়ে হেঁটে। মাঘীপূর্ণিমায় শ্যামসুন্দরের আর একটি উৎসব হয়। তাতেও কম যাত্রী সমাগম হয় না।

বড়িশার চণ্ডীর মেলা

ঢোল, কাঁসি, বাঁশির সঙ্গে এখনও জমছে তর্জা গানের আসর। আসরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত বসে লোক। আপাদমস্তক চাদরে মুড়ে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে শীতের রাত্তিরটা তাদের নিমেষের মধ্যে যেন কেটে যায় আড়াআড়ি তর্জার আসরে।

আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক আমদানি বিচিত্রানুষ্ঠান। তার আয়োজন বাদ দিলে তো আজকালকার কোনও উৎসবই উৎসব নয়। এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আসরেই তো সবচেয়ে বেশি ভিড়। সুতরাং তারও আয়োজন আছে। ফিল্মের প্লে-ব্যাক গাইয়েরা এসে এই আসর জমান। তাঁদের কণ্ঠে আধুনিক প্রেমসঙ্গীতের কাতর আর্তি থেকে শুরু করে ভক্তিমূলক গানের গদ্গদ আকুতি কিছুই বাদ যায় না। মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সে গানে কখনও তৃষ্ণা মেটে না। এক গান শেষ হতে না হতেই আর এক গানের ফরমাস রাখতে নোটেব্‌ল সিঙ্গারদের প্রাণান্ত হবার জোগাড় আর কী। তাছাড়া আজকাল 'কীর্তনকলানিধিদের' ছড়াছড়ি। তাঁরাও এসে পদাবলীর আসর জমান। আর আসর জমান-- ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ডে বেঙ্গলী ফোক মিউজিকের ধ্বজা ওড়ানো নোটেব্‌ল আর্টিস্টরা। ফ্লোরেসেন্ট আলোয় আলোকোজ্জ্বল, ডেকরেটারদের বিচিত্র কাপড়ে সাজানো মঞ্চের মাঝখানে বসে তাঁরা "ও বিদেশী বন্ধুরে—নাও বাইয়া যাও কোথাও, পান খাইয়া যাও" কিংবা "আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাবো না" বলে গান ধরেন। লোকের ভিড় ভেঙে পড়ে এই পল্লীগানের আসরে।

কলকাতার উপকণ্ঠবর্তী বড়িশায় বার্ষিক চণ্ডীপূজা উপলক্ষে যে সমস্ত লোকরঞ্জনকারী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়, এগুলি তারই নমুনা। এখানকার পল্লীতে পল্লীতে চলতে পুকুর, বাগান, মেঠোপথ, এন্তার ঝোপ-জঙ্গল নজরে পড়ে। আবার হরদম যানবাহনের সংযোগে কলকাতার লাগোয়া এই জনপদ জনবহুলও। অনেক ঘরবাড়ি, ইলেকট্রিক আলো, কলের জল, সিনেমা, ইস্কুল, কলেজে এর শহুরে চেহারাও কলকাতার সঙ্গে নিকটসম্পর্ক জানিয়ে দিচ্ছে। তাই এর উৎসবসূচীতে গ্রামীণ পুতুলনাচ, তর্জা, গান ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে শহুরে আবহাওয়ার বিচিত্রানুষ্ঠানও এসে ঢুকেছে।

কলকাতার আদিপর্বে বড়িশা

বড়িশা, চলিত কথায় বড়শে বা বঁড়শে কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার বাইরে হলেও, কলকাতারই অঙ্গ বলতে হয় তাকে। শুধু একালেই নয়, প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগে ইংরেজরা যখন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে কলকাতায় এসে সাম্রাজ্যের পাকাপোক্ত গাঁথুনি শুরু করেছিল, সেই আমল থেকেই বড়িশা কলকাতার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। আজ থেকে ২৬৩ বছর আগে, ইংরিজি ১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে ইংরেজরা এই বড়িশার জায়গিরদার সাবর্ণ চৌধুরিদের বংশের কয়েকজনের কাছ থেকে সুতানুটি, কলকাতা আর গোবিন্দপুর—এই মৌজা তিনটি কিনে নিয়েছিল, মাত্র তেরোশো টাকায়। বনবাদাড়ে গ্রাম কলকাতার ভোল ফিরিয়ে আধুনিক শহর কলকাতার চেহারা এনে দিয়েছে ইংরেজরাই—নিজেদেরই স্বার্থে অবশ্য। শহর কলকাতার ইতিহাসের আদিপর্বে সাবর্ণ চৌধুরিদের সেই বিক্রয় কোবালা আজও লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে। সাবর্ণ চৌধুরিদের বংশধররা শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অনেক বাড়ি ঘর তৈরি করে আজও বড়িশায় বাস করছেন। বড়িশায় এখন তিনশো-সাড়ে তিনশো সাবর্ণ চৌধুরি পরিবার আছেন। বিচিত্র তাঁদের পরিবারের কিংবা বাড়ির নাম; যেমন, মহেশ চৌধুরির বাড়ি, নতুন বাড়ি ইত্যাদি।

সাঁঝের আটচালার দুর্গামণ্ডপেই বসে নাকি ইংরেজদের সঙ্গে সাবর্ণ চৌধুরিদের সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর কেনার কথাবার্তা আর বিক্রয়ের দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আটচালায় ঢাকা সে দুর্গামণ্ডপের চেহারা আজ অন্যরকমের। আটচালা অন্তর্হিত। তার জায়গায় অন্য ধরনের ছাদ। কিন্তু এখনও মণ্ডপটির নাম আটচালা। এর সামনের ছাদ ধ্বসে পড়া, নাটমন্দিরের থামগুলোর কয়েকটা জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও মাটিতে গড়াগড়ি দিতে বোধহয় বেশি দেরি নেই। সেই দুর্গামণ্ডপে সাঁঝের আটচালা বাড়ির দুর্গোৎসব আজও হয়, ভাঙা নাটমন্দিরে পাঁঠা আর মোষ বলি পড়ে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিক্রয়-কোবালা আর এই চণ্ডীমণ্ডপ ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের আসর-সাজানোর দুটি মূক সাক্ষী হয়ে আছে।

চণ্ডীর মাঠে মেলা

এই আটচালারই অদূরে বড়িশার চণ্ডীর মাঠে চণ্ডীদেবীর বার্ষিক পূজোৎসব হয় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী আর নবমী তিথিতে। পুজো ছাড়া পুতুল নাচ, যাত্রা, কীর্তন, তর্জা, আর আধুনিককালের বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর্ব চলে দিনসাতেক ধরে। তার সঙ্গে মেলা—বাংলার বার্ষিক পল্লী-উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। দোকানপাট বসে যায় পাশাপাশি, পূজামণ্ডপের চারধারে। বেহালা, বড়িশা প্রভৃতির সংলগ্ন, ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আজও আসে কামার, কুমোর প্রভৃতি গ্রামীণশিল্পীরা, মাটির হাঁড়ি, কুঁড়ি, পুতুল, খেলনা, বঁটি, কাটারি, কড়া, খুন্তির স্তূপ নিয়ে। তাছাড়া মনিহারি দোকানও বসে যায়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, খেলনা বিক্রি করতেও অনেকে আসে। তেলেভাজা বেগুনি, পাঁপড়, ঘুগনি, চা-এর দোকানগুলি যথারীতি জমজমাট হয়। নাগরদোলা আর ম্যাজিকের তাঁবুতেও বড়িশার চণ্ডীর মেলা দিনসাতেক গুলজার হয়ে থাকে। বড়িশার আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে লোক আসে মেলায়, কলকাতা থেকেও অনেকে যায়। সুতরাং কলকাতার অদূরবর্তী বড়িশার চণ্ডীপুজোর মেলা ভালই জমে প্রতি বৎসরে। এটিই এ-অঞ্চলের একটি বৃহত্তম মেলা।

চণ্ডীদেবীর বার্ষিক পূজাটির আয়োজনও বেশ পুরনো। ১৬৯ বছর ধরে এই পূজাটি হয়ে আসছে।

বার্ষিক পুজোর মৃণ্ময়মূর্তি

বার্ষিক পুজো উপলক্ষে পুজো মণ্ডপে দেবী চণ্ডীর একটি মৃণ্ময়মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়নী, রক্তবর্ণা, রক্তবসনা। পাঁচটি নরমুণ্ডের আসনে দেবী বসে আছেন। তাঁর গলায় নরমুণ্ডের মালা। চার হাতে জপমালা, পুস্তক, বর আর অভয়মুদ্রা। চন্দ্রকলা তাঁর মুকুটে সংন্যস্ত। মূর্তির গড়নে, অলঙ্করণে অবশ্য প্রাচীন সাবেকি রীতির বদলে আধুনিক রীতিরই অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

সপ্তমী আর অষ্টমীতে দু-দিন ধরে যোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, বলিদান ইত্যাদি পর্ব যথারীতি চলার পর দশমীতে দেবীর ঘটবিসর্জন হয়। দিনসাতেক পরে খুব ধুমধামে মূর্তিটি আদি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়।

সত্যাগ্রহে মোষবলি বন্ধ

আগে আগে মোষবলিও পড়ত। ছোটখাট নয়, একটি বিশালাকার, বলিষ্ঠ মোষ। এক কোপেই বলিদানের শাস্ত্রীয় বিধি এবং সে বিধির তিলমাত্র ত্রুটি হলে তাকে ভয়ানক অশুভের ইঙ্গিতবাহী বলে শাস্ত্রও অভিহিত করেছে। কিন্তু বড়িশার বলি পর্বে বিশালাকার মোষটাকে ৫০/৬০ কোপ

দিয়ে কাটা হত। মোষবলি বাংলার গ্রামীণ শক্তিপূজায় ও উৎসবে একটি বহুলপ্রচলিত কৃত্য। অর্থনৈতিক অবনতিতে বাংলার গ্রামীণ উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা অঙ্গের কাটাই ছাঁটাই হয়েছে। অনেক জায়গায় মোষবলি অনুষ্ঠানের পাটও সেইভাবেই উঠে গেছে। ভালই হয়েছে। বলিষ্ঠ একটা মোষকে বলি দিয়ে লোপাট করার চাইতে গাড়ি লাঙল টানানো ইত্যাদি কাজেই জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার বেশি হয়। রুচির পরিবর্তনেরও কথা আছে। বলি অনুষ্ঠানের পিছনে আদিম জাদুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানের দূরাগত সূত্র যতই লুকিয়ে থাকুক না কেন, এবং এর ওপরে শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যতই আরোপিত হোক না কেন, আধুনিক সমাজে এ তাৎপর্যহীনই বটে। এই বীভৎস অনুষ্ঠানের পিছনে তাই জনসমর্থন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে উঠে গেছে শুনলুম। সাবর্ণ চৌধুরি বংশেরই এক দয়াপ্রবণ যুবকের সত্যাগ্রহের ফলে বড়িশার চণ্ডীদেবীর বার্ষিক উৎসবে মোষবলি প্রথা বর্জিত হয়েছে।

বড়িশার এই বার্ষিক উৎসবটির সূচনাকারী রূপে সাবর্ণ চৌধুরি বংশের মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরির নাম উল্লিখিত হয়। ইনি সাবর্ণ চৌধুরি বংশের প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার থেকে অধস্তন নবম পুরুষ। লক্ষ্মীকান্ত মোগল আমলে বড়িশা প্রভৃতি গ্রামের জায়গিরদারি পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে সাবর্ণগোত্রের বেদগর্ভই লক্ষ্মীকান্তের পূর্বপুরুষ। লক্ষ্মীকান্তের বংশে অধস্তন চতুর্থ পুরুষে কেশবরাম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে রাজস্ব আদায়কারীরূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে রায়চৌধুরি উপাধি আর অনেক জায়গিরদারি পেয়েছিলেন। সেই থেকে বড়িশার সাবর্ণগোত্রভুক্ত ব্রাহ্মণরা সাবর্ণ চৌধুরি বলে পরিচিত। অর্থে, প্রতিপত্তিতে বাংলাদেশের প্রাচীন ভূস্বামীদের মধ্যে এঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলকাতার আদিপর্বে কালীঘাটের মন্দির তৈরিতে, সেখানকার সেবাইত ব্রাহ্মণদের ভূমিদানে, নানা ধর্মক্রিয়ায় এঁদের ঢালাও অর্থব্যয়ের অনেক ইতিহাস আছে। পুরনো তায়দাদ ইত্যাদি ঘাঁটলে এঁদের দান-ধ্যানের অনেক পরিচয় মেলে। ইংরেজরা এঁদের সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর---এই মৌজা তিনটি কিনলেও, এর পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হতে পারেনি। সাবর্ণ চৌধুরিদের আর তাঁদের প্রজাদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীরূপেই তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত আর সাবর্ণ চৌধুরিদের সেরেস্তায় বার্ষিক ১২৮১ টাকা ১৪ আনা নিজেদের মালগুজারি দিত। পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইংরেজরা সাবর্ণ চৌধুরিদের এই মালগুজারি দিয়ে এসেছে। তারপরই ইংরেজরা এদেশে সমস্ত আধিপত্য কায়েম করে আর সাবর্ণ চৌধুরিদের সেরেস্তার দোর মাড়ায়নি।

আভিজাত্যের আঘাতে উৎসব শুরু

এই সাবর্ণ চৌধুরি বংশের মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরি আজ থেকে ১৬৯ বৎসর আগে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বড়িশার চণ্ডীদেবীর বার্ষিক উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। এই উৎসব প্রবর্তনের মূলে নাকি ছিল তাঁর আভিজাত্যের ওপরে আঘাত। পাশের সরসুনা গ্রামের এক জমিদারের আয়োজিত এক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নাকি যথোচিত মর্যাদা পাননি। আহত মহেশচন্দ্র সেই জমিদারকে শিক্ষা দেবার জন্যে এই উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর দু-হাতে টাকা খরচ করে অভ্যাগত আমন্ত্রিতদের এমন সংবর্ধনা করেছিলেন যে শুধু বড়িশায় নয়, সেদিনকার কলকাতার উঠতি জমিদার মহলেও খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। ২৪ পরগণার গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিনকার বড়লোকদের পুজো-পার্বণ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেওয়াজ ছিল। অঢেল হাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দান, কাঙালি-খাওয়ানো, নাচ, গান, যাত্রা, পুতুল নাচ, কীর্তন—লোকসমাজে

সেদিনকার প্রচলিত সবরকম আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজনে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ ভিড় করতো বড়িশায়। মহেশচন্দ্রের পরে তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্রও এই উৎসব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কালক্রমে উৎসবটি পারিবারিক গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বারোয়ারিতে পরিণত হয়েছে। বড়িশার দেবী চণ্ডী আর কেবলমাত্র সাবর্ণ চৌধুরিদেরই পারিবারিক দেবতা নন, বড়িশার সমস্ত অধিবাসীদেরই গ্রামদেবীতে পরিণত হয়েছেন এবং গ্রামদেবীর বার্ষিক উৎসবে প্রাপ্য মানসিক পূজা-অর্চনাদি লাভ করেছেন। সেইজন্যে সেখানকার বার্ষিক চণ্ডীপুজোয় এত ধুমধাম, এত ভিড়।

মহেশচন্দ্র আর তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্রের নামে দেবী চণ্ডীকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তীও শোনা যায়। চণ্ডীর মাঠের পুকুর থেকে একটি তামার ঘট পাওয়া যায়। দেবী চণ্ডী নাকি স্বপ্নে জানান, তিনি ঐ ঘটে অধিষ্ঠিত আছেন। মহেশচন্দ্রের বাড়িতে ঐ ঘট আজও পূজিত হচ্ছে এবং বার্ষিক পুজোর আগে, ঐ ঘটের পুজো আগে হয়। হরিশ্চন্দ্র সাধক ছিলেন। তিনি নিজের বাড়িতে দুর্গোৎসবের আয়োজন করতেন। দেবী দুর্গা নাকি ঝমঝম করে নূপুর বাজিয়ে তাঁর সারা বাড়িখানা ঘুরে বেড়াতেন।

ধপধপির দক্ষিণেশ্বর

শীতের নিশুতি রাত। কনকনে ঠাণ্ডা। আকাশে শুক্লা দশমীর চাঁদ থাকলে কী হবে! মাঠে ঘাটে কুয়াশার ঘেরাটোপে চাঁদের আলো ঘষা কাঁচের মত আবছা। অন্যদিন এমন সময় ছোট্ট ধপধপি গাঁখানা ঘুমের কোলে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে। আজ কিন্তু এত রাত্তিরেও এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার ভেতরে সে দিব্যি জেগে আছে। ধপধপির দক্ষিণেশ্বরতলায় লোকের ভিড়। হ্যাজাক, অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো জ্বলছে সেখানে। কর্মব্যস্ত পুরুত-সেবাইতদের হাঁকডাকে, ঢোল কাঁসি ঘড়ি কাঁসর পেটানোর শব্দে আর ভক্তদের 'বাবা' 'বাবা' বোলে গাঁয়ের ও-তল্লাটটা বেশ সরগরম হয়ে আছে। আজ পয়লা মাঘ ধপধপির গ্রামদেবতা দক্ষিণেশ্বরের জাঁতাল পুজো। জাঁতাল কথাটির মানে কী, তা কিন্তু বলতে পারে না কেউ। এটি ওঁর বার্ষিক উৎসব। নিশুতি রাত্তিরেই উৎসবটি করণীয়। সেই উপলক্ষেই ধপধপি এত রাত্তির অবধি জেগে আছে।

ভক্তরা এসেছে অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে। দিন থাকতে থাকতেই সবাই হাজির হয়েছে। না হলে এত রাত্তিরে এই ঠাণ্ডায় আসাই তো দায়। নাটমন্দিরে ঠাঁই নিয়েছে সবাই। কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে কেউ কেউ বসে আছে, কেউ কেউ শুয়ে আছে গুটিসুটি মেরে। বাঁধাকপির তরকারি, টম্যাটোর টক। নিশুতি রাত্তিরে দক্ষিণেশ্বরের পুজোর পর সমাগত ভক্তদের সকলের সেই প্রসাদ খেতে খেতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

চব্বিশ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের এই ছোট্ট গণ্ডগ্রামখানা বারুইপুরেরই লাগোয়া। কলকাতা থেকে মাত্র মাইল কুড়ি দূরে বারুইপুর। জংশন স্টেশন। কলকাতা থেকে বাসও যাতায়াত করে। সুতরাং বারুইপুর এখন বেশ বড় শহরে পরিণত। বারুইপুর থেকে মাইল চারেক দূরে ধপধপি স্টেশন। বারুইপুরের তুলনায় কত ছোট্ট ধপধপি। কিন্তু ধপধপির নামডাক বারুইপুরের থেকে কম নয়। এই ছোট্ট স্টেশনে প্রতি শনি-রবিবারে কম লোকে নামে না। ধপধপির সব আকর্ষণ কিন্তু ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেরই জন্যে। দক্ষিণেশ্বরকে কেউ কেউ দক্ষিণরায়ও বলে, কেউ কেউ শুধু বাবা বলে ডাকে। বাবা নাকি সাক্ষাৎ কল্পতরু। ভক্তরা বলে, বাবার কাছে যা চাইবে তাই মিলবে। আর বাবা নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও। পৃথিবীতে হেন রোগ নেই যা বাবার দয়ায় ভাল হয় না। শিবের অসাধ্য রোগ, ডাক্তার বদ্যিরা সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। সেইসব রুগী বাবার চন্নামের্তো, তেলপড়া, জলপড়া, গাছগাছালির নিংড়ানো রস খেয়ে, মালিশ করে একেবারে ভালো হয়ে গেছে। এসব লোকের মুখে মুখেই রটনা। ধপধপি কথাটা বললেই চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলের লোকরা তাই কপালে হাত ঠেকিয়ে বাবাকে প্রণাম জানায়। ঐ তামাম তল্লাটটা জুড়ে ধপধপির বাবার জয়জয়কার। প্রতি মাসের শনি-মঙ্গলবার লোকে তাই ওষুধ নিতে, পুজো দিতে আসে ধপধপিতে।

যাত্রীদের ভিড় কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত। কলেরা-বসন্তের মরশুম ওটা। তখন চব্বিশ পরগণার মা শীতলা, ওলাবিবি, বিবি-মায়েদের সমস্ত থানে আর পীরেদের দরগায় যাত্রীদের সবচেয়ে ভিড় যেমন জমে, ধপধপির দক্ষিণেশ্বরতলাতেও ঠিক তেমনটি দেখা যায়। শুধু চব্বিশ পরগণারই লোক নয়, বাংলাদেশের অন্য অন্য জেলারও লোক এসে ধপধপির এই দেবতাটির কাছে ধরনা দেয়। খাস কলকাতা থেকে বড়লোকরাও আসে মোটর হাঁকিয়ে, ডাক্তারের জবাব দেওয়া রুগিদের জন্যে ওষুধ আনতে। পয়লা মাসের জাঁতাল পুজোতেও এইরকম অনেককে দেখা যায়। লোকের মানসিকের পুজো পড়ে খুব। সওয়া পাঁচ আনা থেকে দুশো-পাঁচশো টাকা দামের পুজো। কাপড়চোপড়, সোনা-দানা, ফলমিষ্টি—যার যেরকম সাধ্য সে সেরকম ঢালে বাবার পায়ে। বাবার মতো মাটির মূর্তি গড়েও অনেকে মন্দিরে দেয়। তাদের

বলে বাবার 'ছলন-মূর্তি'। 'ছলন-মূর্তিতে' মন্দির বোঝাই হয়ে যায়। জাঁতাল পুজোর দিন পুরনো ছলন-মূর্তিগুলো জলে যায়। আবার সেদিন থেকে নতুন ছলন-মূর্তিরা এসে জমা হতে থাকে। কেউ কেউ সোনা-রুপোর মূর্তিও দেয়। সর্বরোগহর এই দেবতাকে প্রদত্ত সব জিনিসই সেবাইত-পুরুতদের প্রাপ্য। সুতরাং তাঁদের দিন যে বেশ ভালোই চলে বাবার কৃপায়, তাতে সন্দেহ কী! আমাদের দেশে ডাক্তার, বদ্যি, হাসপাতালের চাইতে "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্"-এর ওপরে মানুষজনের কম ভরসা নয়। অতএব ধপধপির বাবা দক্ষিণেশ্বর বসে থাকবেন এখনও, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

আদিতে বাঘের দেবতা

ধপধপির দক্ষিণেশ্বর কিন্তু গোড়াতেই রোগ-আরামের দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঘের দেবতা। লোকে বাঘের ভয়েই তাঁর পুজো দিত। সুন্দরবনে যারা যায় কাঠ কাটতে, মধু, মোম সংগ্রহ করতে, মাছ ধরতে—তাদের নাম বাওয়ালি কিংবা মধুমৌলি। পৃথিবীর বিখ্যাত রয়াল বেঙ্গল টাইগার - গায়ে কালো ডোরাকাটা কেঁদো বাঘের বাসভূমি এই সুন্দরবন অঞ্চল। সুন্দরবনের জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ, সাপ। জীবন বিপন্ন করে বাওয়ালিরা সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ করে আনে। বন কেটে সুন্দরবনে বসত বানিয়েছে ওদেরই দল। কুমির, বাঘের পেটে ওরা কম যায়নি। তাদের সঙ্গে লড়াই করে ওরাই বন হাসিল করেছে, জনপদ বসিয়েছে, আবাদ করে ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। অগম্য সুন্দরবনের ধান, মধু, মোম, কাঠ, মাছের সম্পদ দেশ পেয়েছে ওদের হাতেই। বিনিময়ে ওদের অধিকাংশই আজও নিঃস্ব ভূমিহীন, দারিদ্র্যপিষ্টের দল বৃদ্ধি করেছে। এই অবস্থার মানুষরাই সেদিন সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর দুর্মদ বাসিন্দা বাঘেদের সম্মুখীন হয়ে বাঁচবার সংগ্রামে বাঘদেবতার কল্পনা করেছে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে মনে বল আর ভরসা এনে মৃত্যুপুরীতে ঢুকেছে। দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায় এইভাবেই আবির্ভূত হয়েছেন ধপধপিতে। আবাদে যাবার সময় বাওয়ালিরা ধপধপির দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরকে পুজো দিয়ে যায়। নিরাপদে ফিরে এলে আবার এখানে এসে পুজো দেয়। শুধু ধপধপিতেই নয়, চব্বিশ পরগণার সমস্ত দক্ষিণাধটা জুড়েই এই দেবতার প্রাধান্য। গ্রামে গ্রামে ঝোপ জঙ্গলের মাঝখানে মাটির বেদী কিংবা স্তূপের ওপরে দক্ষিণরায়ের মাটির তৈরি মুণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। লোকে ভক্তিভরে সেখানে পুজো দেয়—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ধপধপির দেবতাটিও এইভাবেই লোকমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু বন হাসিল হতে হতে আজ বনের সীমানা ধপধপির অনেক দক্ষিণে চলে গেছে। আজ বারুইপুর থানার কথায় বাঘের ভয়ের কথা শুনতে পাওয়া যায় না। অতএব বাঘের দেবতা হিসাবে ধপধপির দক্ষিণরায়ের দামটা কিছু কমেই গেছে। তিনি তাই অন্য আর এক রূপে লোকের মনে আসন গেড়ে বসেছেন। বাঘের দেবতা ধন্বন্তরির কাজ নিয়েছেন। এখনও বনে যাবার সময় বাওয়ালিদের কেউ কেউ ধপধপিতে বাবা দক্ষিণরায়ের কাছে এলেও, এখন প্রধানত রুগীদেরই মস্ত ভিড় নিয়ে বাবা পশার জমিয়ে বসে আছেন।

বন্দুকধারী বিশাল বীরের মূর্তি

ধপধপির এই দেবতাটির মূর্তিও বিচিত্র। প্রায় আট ফুট উঁচু বন্দুকধারী এক বীর শিকারীর মূর্তি। ডান পাটি মাটিতে মুড়ে বাঁ পাটি সামনে এগিয়ে রেখে তিনি বসে আছেন। গায়ের রং শাদা। দীর্ঘ আয়ত চোখে মস্ত বড়ো গোঁফে মুখখানায় আত্মপ্রত্যয়ী বীর শিকারীর ভাব পরিস্ফুট। তাঁর বেশভূষাও রীতিমত শিকারীর মত। তবে আধুনিক শিকারী আর পৌরাণিক বীরের সাজসজ্জার সমন্বয়। হলদে রঙের আঁটসাঁট ব্রিচেসের ওপরে হলদে রঙের বেনিয়ান পরা। তার ওপরে হাফহাতা গলাবন্ধ

কালো পিরান। পিরানের গায়ে সোনালি ফুলের বিচিত্র চিত্রণ। পায়ে নীল রঙের মোজা আর কালো রঙের ফিতে বাঁধা হান্টিং বুট। দুহাতে বন্দুক ধরা। বীরের মাথায় পাগড়ি, কণ্ঠা, কানে কুণ্ডল বীরবৌলি, হাতে বালা, আঙুলে আংটি, গলায় সোনার হার, কপালে সিঁদুরের মস্ত বড় ফোঁটা। মূর্তির দুপাশে তীর, ধনুক, তূণীর, ঢাল, তরোয়াল, কুড়ুল, বল্লম, ত্রিশূল, সড়কি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের সজ্জা। দক্ষিণরায়ের হাতে বন্দুক। মন্দিরের ভেতরে ভক্তদেব দেওয়া অশ্বারোহী, বন্দুকধারী আরও অনেক ছোট বড় 'ছলনমূর্তি'র মাঝখানে এই বিশাল বিচিত্র বীর মূর্তি দেখলে মানুষ তো কোন ছার, বাঘেদেরও বোধ হয় হৃৎকম্প হবার জোগাড়।

আসল মূর্তি পাথরের টুকরো

মাটির তৈরি এই মূর্তিটি কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি হচ্ছে সিঁদুর মাখানো এবড়ো-খেবড়ো পাথরের একটা টুকরো। সেটি দক্ষিণেশ্বরের মূর্তির সামনে পূজিত হয়। সুদূর অতীতে যখন ধপধপি ছিল বনাঞ্চলে ঢোকার প্রবেশপথ, তখন ঐ পাথরের টুকরোটিতেই বাওয়ালিরা বা মৌলিরা প্রণাম জানিয়ে যেত, ওখানেই পুজো দিত। কালক্রমে সেই পাথরের টুকরোয় জায়গায় দক্ষিণেশ্বরের মাটির তৈরি এই জাঁদরেল বীরের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারুইপুরের জমিদার রায়চৌধুরিদের জমিদারির মধ্যেই ছিল ধপধপি। তাঁরাই দেবতার মন্দির ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছেন। অনেক দেবোত্তর জমিও তাঁরা দিয়েছিলেন। সব দেবোত্তরের যেমন দশা, তেমনই দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তরেরও দশা। এখন যৎসামান্য জমি দেবোত্তরে আছে, বাদবাকি উধাও হয়েছে অনেকদিনই।

গণেশের মুণ্ড ও বারাঠাকুর

সমাজের তথাকথিত নিচুস্তরের মানুষদের হাত দিয়ে এই দেবতার প্রথম পুজো শুরু হলেও, কালক্রমে ব্রাহ্মণরা তাঁকে তুলে নিয়েছেন তাঁদের মন্দিরে। কোনও শাস্ত্রে পুরাণে দক্ষিণেশ্বরের পুজোর বিধি নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। ব্রাহ্মণরা নিজেদের উদ্ভাবিত মন্ত্রতন্ত্রেই দেবতাটির পুজো করেন। সে মন্ত্রতন্ত্র তাঁরা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন না। কেউ বলেন, তিনি সাক্ষাৎ ক্ষেত্রপাল—শিবের মূর্তি। কেউ বলেন, তিনি গণেশ। কাহিনীও তাঁরা তৈরি করে নিয়েছেন। গণেশের জন্মের পর শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়ে গেলে সেই কাটামুণ্ডই দক্ষিণেশ্বরের মুণ্ডুতে পরিণত হয়েছে। চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায়ের যে আর এক মূর্তি ধড়বিহীন মুণ্ডুর পুজো হয়, সেটি গণেশেরই মুণ্ড। এর নাম বারাঠাকুর। পৌষ সংক্রান্তিতে, কোথাও বা মাঘ মাসের বিভিন্ন দিনে বিশেষত শনি-মঙ্গলবারে বারাঠাকুরের পুজো হয়। বারাঠাকুরের রং শাদা। বড় বড় চোখ, মস্ত গোঁফ। মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট। কোথাও দস্তুর মূর্তি, কোথাও বা ঠোঁট বোজানো মুখ তৈরি হয়। গাছের তলায় মাটির স্তূপের ওপরে বারাঠাকুরের মূর্তি বসিয়ে পুজো করা হয়, ফলমূল নৈবেদ্যের সঙ্গে কাঁকড়া, শোল মাছ, মদ দিয়ে। দিনের বেলায় নয়, রাত্তিরেই বারাঠাকুরের পুজো করণীয়।

কাঁকড়া, শোল মাছ, মাংস, মদের ভোগ

ধপধপিতেও বারাতলা আছে। সেখানেও পয়লা মাঘ রাত্তিরে গাছের তলায় মাটির স্তূপের ওপরে বারাঠাকুরের পুজো আগে হয়। তার পরে মন্দিরে শুরু হয় দক্ষিণেশ্বরের জাঁতাল পুজো বা বার্ষিক উৎসব। এই জাঁতাল পুজোতেও ঠাকুরের ভোগে কাঁকড়া, শোল মাছ পোড়া, মাংস আর মদ দেওয়া

হয় বলে শুনেছি। সমাজের তথাকথিত নিচু থাকের ধ্যান-ধারণা ব্রাহ্মণ সমাজের উঁচু থাকে উঠে এসেছে। সেই স্তরের অনেক অব্রাহ্মণ্য, অশাস্ত্রসম্মত লোকাচারের কাছেও যে উঁচু থাককে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, তার অনেক প্রমাণের মধ্যে এটি অন্যতম।

বাঘের গন্ধে বাঘের দেবতা অস্থির

ধপধপির দক্ষিণেশ্বরের বাহন নিয়েও ব্রাহ্মণদের মুখে অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। বাঘের অধীশ্বর দেবতা বলে আগে নাকি ইনি বাঘের পিঠেই ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু বাঘের গায়ের গন্ধ সহ্য না হওয়ায় তিনি ঘোড়সওয়ার হলেন। কিন্তু তাও মনঃপূত হলো না তাঁর। সিংহাসনে বসার তাঁর সাধ হলো। তাই তিনি বীরাসনে সিংহাসনে বসেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে গরদের জোড়ও পরানো হয়। জাঁতাল পুজোর দিনে তিনি মাথায় রজনীগন্ধার মুকুট পরেন, গলায় গাঁদাফুলের মালার বোঝা চাপান। জাঁতাল পুজোয় দূর দূর অঞ্চল থেকে আসা মেয়েপুরুষের দল মন্দিরের সামনে বাবাব পুকুরে চান করে দণ্ডী খাটতে খাটতে মন্দিরের সামনে গিয়ে এই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পাঁঠা, হাঁস মানত করে, ওষুধ নেয় সেবাইতদের হাত থেকে।

মুকুটরায়ের সেনাপতি দক্ষিণরায়

সম্পূর্ণ লৌকিক দেবতাই দক্ষিণেশ্বর। কেউ কেউ বলেন, দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায়, ব্রাহ্মণনগরের মুকুটরায়ের সেনাপতি ছিলেন। দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে লেখা কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল কাব্য', 'কালুগাজী ও চম্পাবতী' প্রভৃতি মুসলমান গাথা-সাহিত্য প্রভৃতির নায়ক গাজি সাহেব বা বড়খাঁ গাজি বাঘের পাল নিয়ে ব্রাহ্মণনগর অধিকার করে মুকুটরায়ের কন্যা চম্পাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। মুকুটরায়ের সেনাপতি বীর দক্ষিণরায় গাজিকে বাধা দিতে গিয়ে হেরে যান। তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের দিকে। পরে গাজির সঙ্গে দোস্তানি করে তিনি সুন্দরবনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেছিলেন। বাঘ মারতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুন্দরবনের সেই ব্যাঘ্রহন্তা বীরই কালক্রমে সুন্দরবন অঞ্চলে বনদেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন।

গাজির সঙ্গে সংঘর্ষ ও সৌহার্দ্য

বারাঠাকুরের মুণ্ডুকে গণেশের মুণ্ডু ব্রাহ্মণরা বলতে পারেন। কিন্তু লৌকিক দেবতাটিকে নিয়ে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের কবি কৃষ্ণরাম দাস যে 'রায়মঙ্গল' লিখেছেন, তাতে এর অন্য কারণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।
একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়।।
এমন প্রকার পূজা কেন হয় হেথা।
জান যদি কহ শুনি দুই এক কথা।।

* * * *

শুন বড়খাঁ গাজি পরতেক পির।
ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠার ভাটির।।
দুইজনে দোস্তানী হইয়াছিল আগে।
তারপর হুড়োহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে।।

দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী।
পড়িয়া উঠিল রায় বলে মায়া বাজী।।
বড়খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাহার।
মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার।।
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।
তারপর দোস্তানী পাইল দোঁহে বর।।
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।
কোনখানে দিব্যমূর্তি ব্যাঘ্রের উপরে।।

হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব আর সৌহার্দ্যের কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে দক্ষিণরায় আর গাজির সংঘর্ষে। এই দুজনেই দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। শুধু এঁরা নন, বনবিবি---যিনি সুন্দরবনের বাঘের রাজত্বে অসহায় বাওয়ালিদের একমাত্র নির্ভর, মুন্সি বয়নুদ্দিনের রচিত 'বনবিবির জহুরানামা'য় যাঁর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে---তাঁরও বনাঞ্চলে দাপট কম নয়। 'বনবিবির জহুরানামা'য় তিনি আশ্বাস দিয়েছেন :

আঠার ভাঁটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না।।
সংকটে পড়িয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না করিবে।।

সে আশ্বাসবাণী শুনে দক্ষিণরায় বনজননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন :

রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার।।
বনেতে আসিয়া যেবা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রভীত মানুষের কাছে দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজি, বনবিবির সমান আদর। দক্ষিণবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এঁদের কাছে মাথা নত করে। বনাঞ্চলের মানুষরা এঁদের নিয়ে বিচিত্র সব অনুষ্ঠান করে সাক্ষাৎ যম বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। জাদুভিত্তিক সেসব অনুষ্ঠানের দাম ওরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। সাক্ষাৎ যমের মুখে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে যে মনের জোর, সাহস আর আত্মপ্রত্যয়ের দরকার, ঐসব অনুষ্ঠানই তা এই অসহায় মানুষদের জোগায়।

মুরগি পীরের মেলা

সারা মাঘ মাসটা ধরে পিকনিক চলে—আগড়পাড়া স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মের পাশেই। সারি সারি ইঁট পেতে উনুন তৈরি। তার ওপরে মাটির হাঁড়ি কিংবা কলাই করা ডেকচি চাপানো। ভাত আর মুরগির মাংস রান্না হয়। খানার খোশবুতে সারা তল্লাটটা মাত হয়ে যায়। সে খোশবু অনুকূল বাতাসে স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকেও ভেসে আসে। ট্রেনের জন্যে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা কুক্কুটমাংস-প্রিয় তাতে তাঁদের জিভে জল আসবারই কথা বটে।

এ কিন্তু শীতের দিনে ছুটি-বিলাসী দলের শৌখিন পিকনিক নয়। রীতিমত ধর্মীয় আচার-আচরণে অনুষ্ঠিত ব্রতবিশেষ। মুসলমান সমাজেরই কৃত্য এটি। আগড়পাড়া স্টেশনের পাশেই যে পীরের আস্তানা আছে, তারই পাশে এই খানা তৈরি হয়, পীরের বার্ষিক উৎসবকে কেন্দ্র করে।

উৎসবটি শুরু হয় ১লা মাঘ, শেষ হয় মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন। এই একটি মাস ধরে নানা জায়গা থেকে দলে দলে মুসলমান নর-নারী, ছেলে-বুড়ো এসে এই খানা তৈরি করে। পীরের আস্তানার পেছনে সারি সারি উনুন জ্বলতে থাকে। খানা তৈরিতে সবাই মেতে যায়। কাছেই পীরের পুকুর—নাম তারাপুকুর। সেই পুকুরে চান করে, এঁটো-কাঁটার বিচার করে, শুদ্ধাচারে ভাত আর মুরগির মাংসের খানা পাকাতে হয়। কারণ মানসিকের খানা এ। খানা তৈরি হবার পর তার অগ্রভাগ পীরকে নিবেদন করতে হয়। সেইজন্যে শুদ্ধাচারে খানা তৈরি করার বিধি। খোলা জায়গায় রান্না করতে হয় বলে উড়ন্ত পাখিতে কিংবা অন্য আর কিছুতে অঘটন ঘটারও ভয় আছে। তাই সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সমস্ত রান্না মানসিককারীর নিজের হাতেই করণীয়, অন্য কোনও অঘটন ঘটলে সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে, আবার চান করে নতুন হাঁড়িতে নতুন করে খানা চড়াবার নিয়ম।

মুরগি-পিছু একটি করে ঠ্যাং পীরের প্রাপ্য। হিন্দুদের জোড়া পাঁঠার মত এদের কারও কারও জোড়া মুরগিরও মানসিক থাকে। তখন দুটি ঠ্যাং পীরের ভাগে পড়ে। কেউ কেউ তারও বেশি সংখ্যায় মুরগি মানসিক করে। খানা পাকানো শেষ হলে মানসিককারী একটি ডিশের ওপরে একজনের খাবার মত ভাত আর মানসিকের মুরগির ঠ্যাং নিয়ে পীরের আস্তানায় চলে যায়। সেখানে পীর-বাবাকে তা নেওয়াজ করে আসে। অতঃপর সকলে মিলে খানার সদ্ব্যবহার করে। অনেকে ফকিরদেরও খাওয়ায়।

মুরগির মানসিক দেওয়া থেকে সাধারণের কাছে এই পীরের নাম হয়ে গেছে মুরগি পীর, মেলার নাম হয়েছে মুরগি পীরের মেলা। পীরের আসল নাম অনেকে বলতেই পারে না। কিন্তু শুধু মুসলমানইরাই নয়, হিন্দুরাও এসে দলে দলে এই পীরকে পুজো দেয়। সকলেরই কাছে তিনি পীরবাবা বা বড় পীর সাহেব নামে পূজিত। হিন্দুরা অবশ্য ভাত বা মুরগির মাংস ভোগ দেয় না। তারা দেয় দুধ, ঘি, চিনির বাতাসা, কদমা, চিনির মুড়কি, এলাচদানা, চিঁড়ে প্রভৃতি। ধূপ, চেরাগ, ফুলের তোড়া, আতরও দেয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই-ই দেয় বাবাকে এই সিন্নিরই নেওয়াজ। উপরন্তু মুসলমান মানসিককারীরা দেয় ভাত-মুরগির ভোগ। সারা মাঘ মাস ধরে চলে এই উৎসব। অনেক যাত্রী আসে সারা মাস ধরে। মাঘ মাসের পয়লা তারিখটি আর এই মাসের রবিবার কটাতেই সবচেয়ে বেশি ভিড় জমে।

উৎসবের সূচনা হয় পৌষসংক্রান্তির আগের দিনে—সেদিন পীরবাবার স্নানপর্ব। ফুলেল তেল, আতর, গোলাপজল নিবেদন করা হয় তাঁর উদ্দেশ্যে, স্নানের জন্য। পৌষসংক্রান্তির দিন বাজনাবাদ্যি করে তাঁর 'সুন্দল' আনা হয়। এটিতে পীরের জন্য ফুলের তোড়া, ফুলের মালায় গাঁথা ঝালর,

গোলাপজল ইত্যাদি দেওয়া হয়। পীরের বাঁধানো সমাধির ওপরে সেগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ১লা মাঘ থেকে সমাধির সামনে চেরাগ, ধূপ ইত্যাদি আর ফলমূলও বাবাকে নিবেদন করা হয়। পীরের মাটির ঘোড়া তো আছেই। আস্তানার সামনে রেলিং-এ ঝুলতে থাকে দাঁড়াতে বাঁধা ইঁটের টুকরো—মানসিককারীদের মানসিকের চিহ্ন।

চালের মেলা

মুরগি পীরের উৎসব উপলক্ষে চারধারে একটা বড় মেলাও বসে যায়। এক মাস ধরে তা চলে। মেলায় সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চালের দোকান। বস্তা বস্তা ধামা ধামা চাল আসে মেলায়। কামিনী, গোলাপসরু, কমলভোগ, কাটারিভোগ প্রভৃতি সুগন্ধি চাল। মোটা চালও আসে। কিন্তু সুগন্ধি চালের পরিমাণই বেশি। মানসিককারীরা নিজেদের অর্থসামর্থ্য অনুসাবে এই চাল কিনে পীরের জন্যে রান্না করে। তা ছাড়া আসে চিঁড়ে, কদমা, বাতাসার স্তূপ। হাঁড়ি, কলসীও আসে এন্তার। গোরুর গাড়ি বোঝাই করে এইসব মাল আসে, এক মাস ধরে বিক্রি হয়। লোহার বঁটি, কাটারি, কড়া, খুন্তি, হাতা, বেড়ির দোকানগুলোও মুরগি পীরের মেলায় গিন্নীদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। এর সঙ্গে ধামা-চুপড়ি, কুলো, ধুনুচির দোকানও বাদ যায় না। ষণ্ডাগণ্ডা পালোয়ানদের কেনবার জন্যে আসে শক্ত মজবুত তেল চকচকে লাঠি। বাচ্চাদেব জন্যে মনিহারি দোকান, নাগরদোলা, ঘোড়ার চরকি তো আসেই। সবশুদ্ধ প্রায় শ-দেড়েক দোকান এখনও বসে। আগে আগে এর চার-পাঁচগুণ বেশি দোকান বসত। মেলার আগেকার মত জলুজৌলুস এখন না থাকলেও তবুও মুরগি পীরের মেলা এ-অঞ্চলের মধ্যে এখনও সবচেয়ে বড় মেলা হয়ে আছে।

পীরের আস্তানার ওপরে তৈরি হয়েছে এক-গম্বুজওলা ছোট্ট একটি দরগা। এটি নাকি সখী বেওয়া নামে কলকাতার চিৎপুরের এক রমণীর তৈরি। তাঁর নাম দরগার দরজায় আরবি ভাষায় লেখা আছে।

পীরের আসল নাম কি তা কিন্তু যাত্রীদের অধিকাংশই ঠিকভাবে বলতে পারে না। কেউ কেউ বলে, এঁর নাম মায়াদ্দিন জিলানী দস্তগীর। মায়াদ্দিন চিস্তিয়া—এই নামও কেউ কেউ বলেন। অনেকে বলেন, আরব দেশ থেকে যে ১২ জন আউলিয়া বা সাধুপুরুষ বাংলাদেশে এসেছিলেন, ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এঁদের সবাই বাংলাদেশে রয়ে যান। কেবল এই পীরই এদেশ থেকে স্বদেশে ফিরে যান। পথিমধ্যে বাগদাদে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আগড়পাড়ায় তাঁর আসন রয়েছে। সেই আসনকেই কেন্দ্র করে দরগা তৈরি হয়েছে। ১লা মাঘ নাকি তাঁর মৃত্যুদিন। সেই স্মরণেই এই উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে।

পীরের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী

অনেক অলৌকিক কাহিনীও তাঁর নামে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি পুত্রশোকাতুরা এক রমণীর মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। খড়ম পায়ে দিয়ে তিনি নদী পার হতেন। প্রতিদিন এখান থেকে মক্কায় গিয়ে নামাজ পড়ে আসতেন। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীরা তাঁর করুণায় আরোগ্য লাভ করত। অপুত্রকের পুত্র, নির্ধনের ধন, অন্ধের চক্ষু ইত্যাদি দানে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই আগড়পাড়াতে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় ছিল তাঁর আস্তানা। সেই আস্তানাই এখন দরগাতে রূপান্তরিত।

তাঁর তারা শাহ নামে এক শিষ্যেরও অলৌকিক কেরামতি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী হচ্ছে—গোয়ালাদের ঘরচাপা গোরুর উদ্ধারের সম্বন্ধে। গোয়ালাদের একটি

গোয়ালঘর ধ্বসে পড়ে গোরুর পাল চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় তারা শাহ এক বৃদ্ধের ছদ্মবেশে তাদের কাছে গিয়ে একটু ঘি আর দুধ চাইলেন। এই রকম বিপদের সময়ে কে আর ঘি-দুধ দেবে! গোয়ালারা বিরক্ত হয়ে তাঁকে চলে যেতে বললে। তিনি কিন্তু লাঠির খোঁচা দিয়ে গোয়ালঘরের চালা তুলে দিলেন। তখন গোয়ালারা তাঁকে অলৌকিক শক্তিশালী দেবতা বলে বুঝতে পেরে তাঁব পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। তিনি তাদের আদেশ দিলেন তাঁর সঙ্গে দুধ আর ঘি নিয়ে তাঁর সঙ্গে ডেরায় আসতে। গোয়ালারা দুধ-ঘি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আসতে আসতে যেই বটতলায় পীরের আস্তানার কাছে এসেছে, অমনি তারা শাহ অন্তর্ধান করলেন। সেই থেকেই নাকি পীরের এই আস্তানায় দুধ, ঘি, সিন্নির নেওয়াজ দেবার রেওয়াজ হয়েছে।

ব্রাহ্মণ শিষ্যকন্যা তারা

এই তারা শাহের নাকি এক ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের তারা নামে এক মেয়ে ছিল। ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে মেয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তারা শাহের হাতে সমর্পণ করে যান। এই নিয়ে লোকনিন্দা রটলে তারা নাকি পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তারা শাহও তার পিছনে পিছনে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। তারপর দুজনেই অদৃশ্য হলেন। সেই থেকে নাকি ঐ পুকুরের নাম আর সমস্ত তল্লাটটার নাম হয়েছে তারাপুকুর।

পুকুরের বাসনকোসন দান

ঐ পুকুরের মাহাত্ম্য-কাহিনীও মুরগি পীরের মেলার যাত্রীদের মুখে শোনা যায়। আগে আগে নাকি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাজেকর্মে বাসনকোসনের দরকার হলে, সে সমস্ত জিনিস পুকুরে নামলে পাওয়া যেত। উৎসবাদির শেষে আবার সে-সমস্ত জিনিসপত্র পুকুরে ডুবিয়ে দিয়ে আসা হত। ঘোব অনাচার, অবিশ্বাসের যুগ বলে নাকি এখন ওসব আর পাওয়া যায় না।

না শরিয়তি, না ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রসম্মত

বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মুসলমান পীর, ফকির, সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে নানান অলৌকিক কাহিনী রচিত হয়েছে। পীরের পুজোতে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুরাও শরিক হয়েছে। বাংলাদেশে এই সম্মিলিত পুজোর আধিক্যটা যেন বেশিই। পীরের পুজো না শরিয়তসম্মত, না ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রসম্মত। বাংলাব লৌকিক দেবতারা শাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মকানুনের পবোয়া করেননি, নিজেদের প্রবল শক্তিতে লোকমানসে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তেমনই মুসলমান সমাজের পীররাও লৌকিক দেবতাদের মত পবম শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন বাংলার আপামর সাধারণ মানুষের কাছে। রোগে, শোকে, বিপদে, দুঃখে, দারিদ্র্যে অসহায় সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম্যদেবতাদেব মত পীররাও নিকট-আত্মীয়ের মত নির্ভরস্থল হয়ে আছেন, তাঁদেরই সবাই আঁকড়ে ধরে পরম বিশ্বাসে।

ইসলাম এদেশে যে সংঘর্ষের পথে এসেছিল, কালক্রমে তাকে সে পথ ছেড়ে সমন্বয়ের পথ অনেকখানি ধরতে হয়েছে। রূপান্তরিতও হয়েছে সে কিছুটা। পীর প্রভৃতির পুজো তারই চিহ্ন। হিন্দু গুরুবাদ, পুজো-অর্চনার ভাবভঙ্গি পীরের অর্চনার মধ্যে যে রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমন্বয়েরই পথ ধরে বাংলার হিন্দু-মুসলমান লোকমানসে আবির্ভূত হয়েছেন সত্যপীর, মানিকপীর, গাজি সাহেব, বনবিবি প্রভৃতি পরিচিত দেবতাবৃন্দ। কোরানে-পুরাণে, রামে-রহিমে সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশের লোকগীতি-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির রচয়িতার দল বন্দনাগান গেয়েছেন। সেই উদার

মানসিকতার পরিবেশেই 'পীর বাতাসী'র পালা গানের আসরে মুসলমান গায়েনের মুখে বন্দনা গানে শোনা গেছে :

সভাজনে বন্দিয়া ভাই হিন্দু-মুসলমান।
মক্কা মদিনা বন্দুলাম কাশী গয়া থান।

(ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্কলিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৪)

'নূরন্নেছা ও কবরের কথা'-পালার গায়েন গেয়েছে :

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর দড়ি।
কেহ বলে আল্লা রছুল, কেহ বলে হরি।।
বিছমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গেয়ান।
দোহার করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান।

(ঐ, পৃষ্ঠা ৯৪)

মুসলমান ফকিরের দল হাতে চামর নিয়ে আজও হিন্দুদের বাড়িতে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যকথা শুনিয়ে মুস্কিল আসান করে বেড়ায়। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, রূপরাম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা দিগ্‌বন্দনায় মান্দারনের পীর ইসমাইল, পাণ্ডুয়ার শুভি খাঁ পীর, ত্রিবেণীর দরাফ খাঁ গাজির চরণ বন্দনা করতে একটুও হেলা করেননি। গ্রামে কলেরা-বসন্ত লাগলে আজও হিন্দুদের সঙ্গে অনেক মুসলমানও ওলা-বিবি, মা শীতলার থানে পুজো পাঠায়। ওলাবিবি নামটাই তো হিন্দু-মুসলমানী মিশ্র নাম। হিন্দুরাও পীরের আস্তানায় গিয়ে নতুন গাইয়ের প্রথম দুধ দিয়ে আসে, ছেলেপিলের অসুখের জন্যে জলপড়া, তেলপড়া চায়, মাটির ঘোড়া মানসিক করে, বাতাসা, এলাচদানার সিন্নি চড়ায়, ধূপ, চেরাগ জ্বালায়। আর বাড়িতে ব্রাহ্মণদের দিয়ে সত্যনারায়ণ তথা সত্যপীরের পুজো তো আছেই।

তিন ভাই—তিন ঠাঁই

লোকে বলে, ওঁরা তিনজন তিন ভাই।

কিন্তু ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। হাঁড়ি আলাদা, বাড়ি আলাদা। বিষয়-সম্পত্তি সবই আলাদা। তাও কাছে পিঠে নয়, থাকেন ওঁরা অনেক দূরে দূরে—তিনজনে তিনমুল্লুকে। অনেকদিন হয়ে গেল—ওঁরা পৃথক হয়েছেন এতদিন, যে লোকের আর তা ভাল করে মনে পড়ে না।

যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। পৃথক বিষয়-আশয় নিয়ে দূরে দূরে অনেকদিন থাকতে থাকতে নিকটসম্পর্কটা ভোলবারই কথা। নৈকট্য ওঁদের না থাকুক কিংবা পারিবারিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিঁড়েই যাক, লোকে কিন্তু ওঁদের তিনজনের ভেতরে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কটা ভুলতে পারেনি। তাই বছরের মধ্যে একটা দিন সবাই দল বেঁধে যায় তিনমুল্লুকে, তিনজনকে দেখতে যাওয়াতে ওঁদের নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অনুভূতি জাগে কিনা, তার আঁচ না পেলেও, দর্শনার্থীদের কাছে সেটাই কিন্তু খাঁটি সত্য হয়ে ওঠে।

ওঁরা তিনজন হচ্ছেন বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দার শ্যামসুন্দর আর সাঁইবোনার নন্দদুলাল। জনশ্রুতি, এই দেববিগ্রহতিনটি নাকি একই কষ্টিপাথরের টুকরো থেকে তৈরি, একই জননীর গর্ভসম্ভূত তিন সহোদরের মত। তাই ভক্তসাধারণের কাছে ওঁরা তিনজন তিন ভাই, মাঘীপূর্ণিমার দিন তিনজনকে দর্শন করা মহাপুণ্যকর্ম, কারণ এ দিনটিতে নাকি তিনটি দেববিগ্রহের উদ্ভব কিংবা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। লোকে তাই ঐ দিনটিতে দলে দলে যায় তিনঠাকুর দর্শনে। বল্লভপুর মানুষের সমাগমে গমগম করে ওঠে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, প্রধানত এই কটি অঞ্চলের লোক তো আসেই এই উৎসবে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি থেকেও লোক আসা বাদ যায় না। কারণ খড়দহ বা খড়দা শ্রীনিত্যানন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যশ্রীপাট। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবা দেবী আর জ্যেষ্ঠা পত্নী বসুধার গর্ভজাত পুত্র বীরভদ্রের সময় থেকে বাংলাদেশের মধ্যে খড়দা আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষাগ্রহণকারীদের অন্যতম বিখ্যাত গুরুপাটরূপে সুপরিচিত। অর্থাৎ মোটামুটি চারশো পনেরো-ষোলো বছর ধরে খড়দার গোস্বামীদের বংশপরম্পরাক্রমে শিষ্যবিস্তারের ধারা চলে আসছে বলা যায়। সুতরাং নানা উৎসবে, পার্বণে এখানে বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকেই লোক আসার মাত্রাটা আজও কমেনি। খড়দার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ওপারে হুগলি জেলার মাহেশ, বল্লভপুর, চাতরা প্রভৃতি পাশাপাশি জনপদগুলোও শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশিষ্ট পার্ষদ, ভক্তের শ্রীপাটরূপে জমে উঠেছে। রথযাত্রা, রাসযাত্রা, ঝুলন ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে ওসব অঞ্চলের ভিড়ের কথা সুবিদিত। মাঘীপূর্ণিমাতেও তিনঠাকুর দর্শনের হিড়িকে এখানে খুব ভিড় জমে। সেই হিড়িকে কিন্তু বল্লভপুর, খড়দা আর তাদের সঙ্গে সাঁইবোনা—এই তিনটি দূর বিচ্ছিন্ন অঞ্চল যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। হাজার হাজার যাত্রীর একই দিনে এই ত্রিতীর্থপরিভ্রমণে মনে হয় যেন তীর্থকটির কেউই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, ওরা বিরাজ করছে যেন একই চত্বরের মধ্যে পাশাপাশি গলাগলি করে। আর তিন বিগ্রহের মধ্যে তিন ভাই-এর সম্পর্কটাও যেন মনে হয়, নিছক লোককল্পনা নয়, বাস্তব সত্য।

একই দিনে তিনটি জায়গায় ঘোরা চারটিখানি কথা নয়। বল্লভপুর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে—গঙ্গার কাছেই। সেখানে রাধাবল্লভকে দেখে যাত্রীরা নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে পূর্বপারে যায় খড়দার শ্যামসুন্দরদর্শনে। শ্যামসুন্দরকে দর্শনের পর তারা যায় সাঁইবোনায়—শ্যামসুন্দরের মন্দির থেকে মাইল ছয়েক উত্তরপূর্বদিকে।

সাঁইবোনায় কাঁচা গ্রাম্যপথ

বল্লভপুর, খড়দা আর সাঁইবোনার মধ্যে শেষেরটিতেই যাওয়া সবচেয়ে বেশি কষ্টকর। তার কারণ ও রাস্তাটার অধিকাংশটা আগেও কাঁচা গ্রাম্যপথ ছিল, শুকনোর সময়ে হাঁটুভর ধুলো, বর্ষাকালে হাঁটুভর কাদা। সঙ্কীর্ণ বিপজ্জনক পথ। নিয়মিত বাস বা রিক্সা প্রভৃতি চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র মাঘীপূর্ণিমার দিনই যাত্রীবহনের জন্য খান দশ-বারো লরি কিংবা বাস চালানো হত— বি টি রোড থেকে সাঁইবোনা পর্যন্ত। ছাগল ভেড়ার মত যাত্রীতে বোঝাই হয়ে ওরা সাঁইবোনার কাঁচা পথ দিয়ে যাতায়াত করত। চাকায় চাকায় ধুলোর মেঘ উড়ত। ধুলোর পাউডারে যাত্রীদের সর্বাঙ্গ চর্চিত হত। দুপাশে বাঁশ আর সেওড়াবনের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে টাল খেতে খেতে ঐ বাস কিংবা লরি কখানি বছরের মধ্যে ঐ একটি দিনই সকলের সাঁইবোনাতে নন্দদুলাল দর্শনের সাধ মেটাত। অনেক সাধ্য-সাধনায় বি-টি রোড থেকে দু-একজন রিক্সাওয়ালাকে সাঁইবোনায় নিয়ে যেতে রাজি করালেও, তার আরোহীদের ধুলোভরা সঙ্কীর্ণ রাস্তাতেই ধাবমান লরি কিংবা বাসের ধাক্কায় নন্দদুলাল প্রাপ্তি যে হত না সে বিষয়ে কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারত না। এ ছাড়া গোরুর গাড়ি নয়তো পায়ে হাঁটা ছাড়া নন্দদুলাল দর্শনে গত্যন্তর ছিল না। যাঁরা বারাকপুর স্টেশনে নামতেন তাঁরা নীলগঞ্জ (মাথারাঙ্গি) পর্যন্ত প্রায় সওয়া তিন মাইল সরকারি পাকারাস্তায় বাসে করে যেতে পারতেন। বাদবাকি সওয়া মাইল কাঁচারাস্তা কষ্ট করে সকলকে পেরোতে হতো সাঁইবোনাতে যেতে। বারাসাত স্টেশন থেকেও পাকাপথ পাবার পর কিছুটা কাঁচাপথের ঝক্কি সামলাতে হতই। সুতরাং একদিনে তিনঠাকুর দর্শনের পুণ্যলাভের জন্যে সকলকে বিষম ধকল যে সইতে হত আগে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একদিনে তিনঠাকুর দর্শনে কতরকমের যানবাহনেই না চাপতে হত। ট্রেন, নৌকা, তাছাড়া লরি, রিক্সা, বাস। এখন অবশ্য রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে, যানবাহন চলাচলও হচ্ছে। আগেকার মত পথের দুর্গমতা এখন আর নেই।

মেয়েযাত্রীদের আধিক্য

বলা বাহুল্য, এই তীর্থযাত্রীদের শতকরা আশিভাগই মেয়ে—থুড়থুড়ে বুড়ি থেকে শুরু করে কাঁকালে বওয়া পুঁচকে বোন পর্যন্ত সব বয়সের মেয়ে। আর এদের মধ্যে সেইসব মেয়েদের সংখ্যাধিক্য—যারা নেহাৎ গরিব, প্রতিদিন সংসারের চাপে পিষ্ট ক্লিষ্ট, নিরুপায় হয়ে সহিষ্ণু অন্ধের মত ভাগ্যের পায়ে আত্মসমর্পিত। যারা ট্রেনে, নৌকায়, লরিতে হুড়মুড় করে ওঠে, আবার ঐভাবেই নামে। পথেঘাটে অবোধশিশুর মত আচরণ করে, ঝগড়া করে, আবার সকলের সঙ্গে গা মিশিয়ে তীর্থদেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে পথ ভাঙে। মন্দিরের সামনে মাথা খুঁড়ে ওরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বহুকষ্টে সঞ্চিত আঁচলে বাঁধা দু-চার পয়সা তীর্থদেবতার চরণে পরমভক্তিতে উৎসর্গ করে—জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার থেকে একটু মুক্তি পাবার আশায়।

শ্রীরামপুরের মাহেশের পাশে বল্লভপুর, বি-টি রোডের ধারে খড়দা। দুটিই অনেকদিনের বিখ্যাত শহর। কলকারখানায়, দোকানপাটে, লোকজনে ওরা সর্বদাই জমজমাট। বলতে গেলে ওরা বৃহত্তর কলকাতারই অঙ্গ। বিশাল, বিস্তৃত, বাঁকাচালের বাংলা ঢঙের সুরম্য মন্দির ওদের। প্রকাণ্ড নাটমন্দির, চত্বরে চারপাশে গড়ে ওঠা বিস্তৃত গৃহপুঞ্জে রাধাবল্লভ আর শ্যামসুন্দরের মন্দিরের তল্লাটটা ছোটখাট জনপদে পরিণত হয়েছে যেন।

ঠাকুরের জড়োয়ার গহনা সোনার হাতঘড়ি

রাধাবল্লভ আর শ্যামসুন্দরের ধনদৌলতও কম নয়। স-রাধা ঐ বিগ্রহ দুটি দামি পোশাকে আপাদমস্তক

জড়োয়ার গহনায় মোড়া। মাঘীপূর্ণিমার দিন মন্দিরের সামনের চাতালের ওপরে রুপোর প্রকাণ্ড সিংহাসনে ওঁরা বসে দরবার করেন। ধনদৌলতের অভাবই বা হবে কেন? বল্লভপুর আর খড়দার সেবাইতদের তো ধনী ভক্তের অভাব নেই। বহুদিন থেকে তাঁরা দেববিগ্রহদের উদ্দেশে রত্ন-আভরণ আর বিবিধ বহুমূল্য উপায়ন উৎসর্গ করে আসছেন। ঠাকুরদের গহনাপত্রের ঝলমলানি দেখে হাঁ হয়ে যেতে হয়। লোকে বলে, রাধাবল্লভ আর শ্যামসুন্দরের সিন্দুক সোনার বালায়, সোনার মুকুটে, সোনার বাঁশিতে, সোনার নূপুরে নাকি ভরে গেছে। মাঘীপূর্ণিমার উৎসবের দিনে রাধাবল্লভ তো শ্যামসুন্দরকেও টেক্কা দিয়েছেন দেখা গেল। রাধাবল্লভ জড়োয়ার চুড়ি বালা রতনচূড়ের সঙ্গে হাতে পরেছেন সোনার ব্যান্ডশুদ্ধ হ্যামিলটনের বাড়ির সোনার রিস্টওয়াচ। আত্মবৎসেবার্থী ধনীভক্তের নিবেদিত রিস্টওয়াচ ভক্তবৎসল ঠাকুর প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি।

নির্জন বনছায়ায় ঢাকা সাঁইবোনা

বল্লভপুর আর খড়দার সঙ্গে কিন্তু সাঁইবোনার তুলনা হয় না। দূর-দুর্গম পথপ্রান্তে অবস্থিত সাঁইবোনা তো ছোট্ট গণ্ডগ্রাম। লোকসংখ্যা খুবই কম। নির্জন বনছায়ায় ঢাকা। তার পাশে ছিল একদা নদী লাবণ্যবতী, লোকমুখে নাউই। লাবণ্যবতী এখন পানাভর্তি শুকনো ডোবায় পরিণত, তার সব লাবণ্য মুছে গেছে।

আগে নাকি এখানে অনেক শমীগাছ বা সাঁইগাছ ছিল। সেই থেকেই এর নাম হয়েছে সাঁইবনা বা সাঁইবোনা। 'প্রেমবিলাস' নামে বৈষ্ণব গ্রন্থটিতে এর স্বামীবন নাম পাওয়া যায়।

শ্রীনন্দদুলাল মূর্তি রহে স্বামীবন।
বল্লভপুরে বল্লভজী অধিষ্ঠিত হন।।

স্বামীবন থেকেও সাঁইবোনা নাম হওয়া বিচিত্র নয়। তবে সাঁইবোনায় এখন আর শমীগাছ চোখেই পড়ে না। তার বদলে দেখা যায় নিম, সেওড়া, বাঁশ, শেয়াকুলের ঝোপ-জঙ্গলই জাঁকিয়ে বসেছে। আর আছে অজস্র আমগাছ। মাঘীপূর্ণিমার উৎসবের হাজার হাজার যাত্রীর যাতায়াতে সাঁইবোনার রাস্তায় ধুলোর ঘেরাটোপ তৈরি হয়। সেই ধুলোর গন্ধ ভেদ করেও কিন্তু দুপাশের আমগাছের মুকুল সাঁইবোনার দুর্গম পথকে সুরভিত করে রাখে।

একটি দিনের বিরাট মেলা

কিন্তু অজ পাড়াগাঁ হলে কী হবে, মাঘীপূর্ণিমার দিন বল্লভপুর আর খড়দায় যে মেলা দুটি বসে তারা সাঁইবোনার মেলার কাছে একেবারে নিষ্প্রভ। এই তিনঠাকুর দর্শনের দিনে সাঁইবোনার মেলাই অন্য দুটি জায়গার মেলাকে টেক্কা দেয়। নির্জন বনচ্ছায়ায় অবগুণ্ঠিত সাঁইবোনার মন্দিরের সামনে বিরাট মেলা বসে যায় মাত্র একটি দিনের জন্যে। মাটির হাঁড়িকুড়ি, লোহার বাসনপত্র, ধামা, কুলো, চুপড়ি, খেলনা, ছবি, মনিহারি দোকানে এসে জমা হয় হাজার হাজার মানুষ। আর বসে অজস্র খাবারের দোকান—মুড়ি, তেলেভাজা, বেগুনি-পাঁপড়, মিষ্টির দোকান। বল্লভপুর আর খড়দার ঠাকুর দর্শনের পর নন্দদুলাল দর্শনই সাধারণ রীতি। কারণ বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর আর সাঁইবোনার নন্দদুলাল যথাক্রমে বড় মেজ আর ছোট ভাই। অবশ্য প্রামাণিক-অপ্রামাণিক কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থেই তিনঠাকুরের বড়-ছোট এই ক্রম সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। তাতে কিন্তু লোকমনের কাছে কিছু আসে যায়নি। তারা আপন গার্হস্থ্য কল্পনাতে তিনজনের মধ্যে যেমন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তেমনই তিনটি বিগ্রহের আকৃতিতে বড়-ছোটর তারতম্যে কে বড় কে মেজ আর কে বা ছোট ভাই তাও ঠিক করে নিয়েছে। নন্দদুলাল আকৃতিতে সবচেয়ে

ছোট বলে, নন্দদুলালই ছোট ভাই। উপবাসিনী ধর্মার্থিনীরা বড় দুজনকে দর্শনের পর ছোটকে দর্শন করে উপবাস ভঙ্গ করে। সেই জন্যে সাঁইবোনাতে এত খাবারের দোকান। মেয়েরা দলে দলে সেখানে সারাদিনের উপবাসের পর খাবার কিনে খায়।

শুধু দোকানপাট লোকের মেলাতেই নয়, খোল-করতালে হরিনাম-গানেও সাঁইবোনা মুখর হয়ে থাকে মাঘীপূর্ণিমায়।

উৎসবে সারাদিন বৈষ্ণব বাবাজীরা সমস্বরে হরিনাম গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ান। কী মন্দিরে কী মেলায় পিঁপড়ের সারির মতো লোক চলে। নন্দদুলালের রথযাত্রা, রাসযাত্রা ইত্যাদি পর্ব থাকলেও সেগুলি নমো নমো করেই অনুষ্ঠিত হয়, মাঘীপূর্ণিমার মত এত জনসমাগম হয় না সেগুলোতে। সারা বছর ঘুমন্ত বনভূমি বছরের এই একটা দিনই যেন হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে জেগে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে।

ট্রাস্টিদের হাতে নন্দদুলাল

মন্দিরের বিশালতায় কিংবা গঠনসৌন্দর্যে, মূল্যবান্ আবরণে কিংবা জড়োয়ার আভরণে, বিষয়বৈভবের আড়ম্বরে কিংবা উৎসবের পারিপাট্যে নন্দদুলাল বড় মেজ ভাই দুজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারেন না। তাঁর মন্দিরের ভিত্তিতল ভক্তের দানে পাথরে বাঁধানো থাকলেও মন্দিরের গড়ন সাদাসিধে ধরনের সমতল ছাদের ঘরের মতন। সাম্প্রতিক সংস্কারে অবশ্য জীর্ণ নাটমন্দির, রাসমঞ্চ ইত্যাদি নব কলেবর ধারণ করেছে। ঠাকুরের গায়েও অলঙ্কারের প্রাচুর্য নেই। দূর দুগম বনপ্রান্তে অবস্থিত এই দেববিগ্রহকে সোনাদানায় মুড়ে দেবার মত ধনী ভক্তদের আধিক্যের অভাব স্বভাবতই ঘটবারই কথা। ঠাকুরের সেবাপুজো চলাই দুর্ঘট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ অমূল্যধন মুখার্জি প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ওপরে সেবাইতরা ঠাকুরের সমস্ত স্বত্বাধিকার ও সেবাপুজোর ভার অর্পণ করেছিলেন। সেই ট্রাস্টি বোর্ডই জীর্ণ মন্দির, সাঁইবোনার রাস্তা ইত্যাদি সংস্কার, যথোপযুক্তভাবে ঠাকুরের নিয়মিত সেবাপুজো, উৎসবাদির অনুষ্ঠান, দেবসেবার ও জনকল্যাণে দেবোত্তর সম্পত্তিটির সদ্ব্যবহারের জন্যে সচেষ্ট রয়েছেন এখনও। অর্থ ও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশের এই প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থপীঠটি দ্রুত বিলুপ্তির পথে যাচ্ছিল। ট্রাস্টিদের হস্তক্ষেপে এটি রক্ষিত হয়েছে।

বল্লভপুর, খড়দহ, সাঁইবোনার তিনঠাকুরের উদ্ভব ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে বিচিত্র কাহিনী উল্লিখিত আছে। লোকমুখেও নানা কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে।

পাথরের কান্না

পাথর কেঁদেছিল। ছল করেই সে কান্না—ভক্তের সাধ পূর্ণ করার জন্য ভগবানের ছলনায় জাল পাতার ইতিকাহিনী।

গৌড়ের বাদশার প্রাসাদের দ্বারশীর্ষে গাঁথা কষ্টিপাথরের ফলক—কুচকুচে কালো, মসৃণ, আলো পড়লে মণির মত ঝলমল করে ওঠে। ভক্ত রুদ্রপণ্ডিতের বড় পছন্দ হল পাষাণফলকটিকে। এই পাথর দিয়েই তো তাঁর ধ্যানের দেবতা কালো কানাই-এর মোহন মূর্তি গড়তে হয়। সারা দেশ তিনি ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছেন, উপযুক্ত পাথরের জন্যে। আর এখানে প্রাসাদতোরণে রয়েছে তাঁর ঈপ্সিত ধন। কিন্তু দেবমূর্তি তৈরির জন্যে মূর্তিবিদ্বেষী মুসলমান শাসকের প্রাসাদদ্বার থেকে পাষাণফলক খুলে আনাও যা সিংহের মুখ থেকে একটি দাঁত খসিয়ে আনাও তা। উপায় কি! ভক্ত রুদ্রপণ্ডিত অন্নজল ত্যাগ করে প্রাসাদের তোরণের কাছে পড়ে রইলেন—দিনের পর দিন। তিনি দেখবেন, তাঁর প্রাণে সাধ যিনি দিয়েছেন, তিনি তা পূর্ণ করবেন কি না।

অতঃপর ভগবানকে তো গলতেই হবে। সুতরাং তিনি ভক্তের জন্যে ছলনার জাল পাতলেন। বাদশার এক হিন্দু মন্ত্রীর নজরে পড়লেন উপবাসী রুদ্রপণ্ডিত। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, রুদ্রপণ্ডিতকে পাথরখানি পাইয়ে দিতে। এদিকে বাদশাও রাত্তিরে এক অশুভ স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর প্রাসাদদ্বারের তোরণশীর্ষের পাষাণফলক যেন অবিরত কাঁদছে। পাথর ভেদ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আর, কে যেন তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, ও পাথর অবিলম্বে খুলে না ফেলে দিলে তাঁর আদরিণী বেগমের কঠিন রোগ তো সারবেই না, উপরন্তু সমস্ত রাজ্যের আশু বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। পাথরের কান্না দেখে ভয়ে এক গা ঘেমে বাদশার ঘুম ভাঙল। তার পরদিন সকালে উঠেই তিনি তোরণে গিয়ে দেখলেন—সত্যিই কালো পাথরখানা থেকে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ছে। হিন্দু মন্ত্রীও সায় দিলেন, বড় অলক্ষুণে ও পাথর। বাদশা হুকুম দিলেন, অবিলম্বে পাথর খুলে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হোক। খড় দিয়ে ভাল করে অলক্ষুণে পাথরটিকে মুড়ে জলে ভাসিয়ে বাদশা নিশ্চিন্ত হলেন।

এদিকে পাথর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে শুনে রুদ্রপণ্ডিত হায় হায় করতে লাগলেন। কিন্তু রাত্রে তাঁর প্রাণের কানাই স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে অভয় জানালেন, তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি অবিলম্বে যেন বল্লভপুরে ফিরে যান।

ফিরে এলেন রুদ্রপণ্ডিত হুগলি জেলার বল্লভপুরে। আর গঙ্গার ঘাটে আপনিই এসে ভিড়ল তাঁর ঈপ্সিত ধন—খড়ে মোড়া কষ্টিপাথর—গৌড়ের নবাবের প্রাসাদের দ্বারের সেই কালো কুচকুচে ঝলমলে পাষাণফলক।

ভক্ত রুদ্রপণ্ডিত এই কালো কষ্টিপাথর দিয়ে গড়লেন তিন ঠাকুর—রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর আর নন্দদুলাল। বল্লভপুরের পূর্বপারে খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের বাস। বীরভদ্রের বড় পছন্দ হল শ্যামসুন্দরকে। কিন্তু পরমভক্ত রুদ্রপণ্ডিত ছাড়বেন না শ্যামসুন্দরকে। বীরভদ্রও যে সে ব্যক্তি নন। স্বয়ং নিত্যানন্দের পুত্র, তার ওপরে বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয় অবতাররূপে তাঁর আবির্ভাব। সুতরাং দুই মহারথীর মধ্যে বাধল আবার আর এক লড়াই। আর এক ছলনার জাল পাতার কাহিনী। রুদ্রপণ্ডিত একদিন তাঁর বাড়িতে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে বসেছেন, এমন সময় আকাশে ঘনিয়ে এল ভীষণ মেঘ, রুদ্রপণ্ডিতের পিতৃশ্রাদ্ধ বুঝি পণ্ড হয়ে যায়। বীরভদ্র উপস্থিত ছিলেন সেই শ্রাদ্ধসভায়। তিনি বিভূতিবলে বর্ষণোন্মুখ মেঘকে স্তম্ভিত করে রাখলেন শ্রাদ্ধমণ্ডপের ওপরে। অবাক হয়ে সবাই দেখলেন, শ্রাদ্ধমণ্ডপটুকু ছাড়া আর সর্বত্র প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞ রুদ্রপণ্ডিতের কাছ থেকে বীরভদ্রের এবার শ্যামসুন্দর মূর্তি পাওয়া কঠিন হল না। তিনি

খড়দহে নিয়ে গেলেন তিনঠাকুরের অন্যতম শ্যামসুন্দরকে। সেখানে শ্যামসুন্দর আজও পূজিত হচ্ছেন। বল্লভপুরে রয়ে গেলেন রাধাবল্লভ। আর রুদ্রপণ্ডিতের ছোটভাই লক্ষ্মণ পণ্ডিত সাঁইবোনাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন নন্দদুলালকে। মাঘীপূর্ণিমার দিন নাকি এই তিনঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাই এদিন এই তিনঠাকুর দর্শন করা মহাপুণ্যের কাজ। বল্লভপুরে রাধাবল্লভকে দেখতে যাওয়া হাজার হাজার ভক্ত পুণ্যার্থীর কাছ থেকে তিনঠাকুরের এই আদিকথা শুনতে পাওয়া যাবে।

স্বভাবতই অলৌকিকতা আর অতিরঞ্জনে পরিপুষ্ট এসব কাহিনী। সুদূর অতীতের একটি বাস্তব ঘটনার মূলসূত্র লোকমুখে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। তার ওপরে লোককল্পনার বিচিত্র রঙ পড়তে পড়তে একটি আধ্যাত্মিক কাহিনী রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যযুগে বাংলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যখন জনমনের রাজপথ দিয়ে জয়যাত্রায় অগ্রসর হচ্ছিল, সেদিন প্রথম প্রথম দেশের মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে প্রবল বিঘ্ন এলেও, পরে এর ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি থেকে মুক্তির উদার প্রাঙ্গণে মুসলমান সমাজেরও বেশ কিছু লোক এসে হাজির হয়েছিলেন। এইসব ভক্তের অনেক কাহিনী বৈষ্ণব গ্রন্থে গাঁথা আছে। স্বেচ্ছায় যাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা তো বৈষ্ণব গ্রন্থে আদরে আসন পাবেনই। এইসব কারণে সেদিনকার জয়যাত্রায় উৎসাহিত হয়ে অনেক নিরঙ্কুশ বৈষ্ণব আখ্যায়িকা রচয়িতা মুসলমান শাসকদেরও বৈষ্ণব ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়েছেন। শুধু 'চৈতন্য চরিতামৃত' কিংবা 'চৈতন্য-ভাগবতে' কাজী দলনের কথা নয়, 'প্রেমবিলাস', 'ভক্তি-রত্নাকর', 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশচরিত' প্রভৃতিতেও বীরভদ্র প্রমুখ বৈষ্ণব ধর্মাচার্যদের নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুসলমান শাসকদের মন হরণ করার অনেক কাহিনীর উল্লেখ আছে। এসব কাহিনীতে অতিরঞ্জনের আড়াল থাকলেও সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করে কিছুটা মৈত্রীর ভাবে আর সহানুভূতির চোখে যে পরবর্তীকালের অনেক মুসলমান শাসক হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা বেশ বোঝা যায়। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার অনেক চিহ্ন রয়েছে বৈষ্ণবদের মঠ-মন্দির ইত্যাদি তৈরিতে আর সংরক্ষণে শাসকদের ভূমি, অর্থাদি দিয়ে আনুকূল্য সাধনের ব্যাপারে। বাংলাদেশের তিনঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ রাধাবল্লভ, শ্যামসুন্দর আর নন্দদুলালের শ্রীপাটগুলিতেও মুসলমান শাসকদের সাহায্যদান সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই তিনঠাকুরের মূর্তিনির্মাণের আদি-উপকরণ কালো কষ্টিপাথরটি দিয়ে হয়তো সেকালের বাংলার কোনও উদারনৈতিক মুসলমান শাসক সাহায্য করেছিলেন, সেই বাস্তব ঘটনা কালক্রমে লোকমুখে পল্লবিত হয়ে বর্তমান কাহিনীর রূপ ধরেছে।

কে পাথর এনেছেন?

কিন্তু এই কাহিনীরও অনেক রকমফের আছে। খড়দহের গোস্বামীদের মতে বল্লভপুরের রুদ্রপণ্ডিত নন, শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্রই গৌড়ের বাদশার তোরণদ্বার থেকে কষ্টিপাথর এনে ঐ তিনঠাকুর গড়িয়েছিলেন। তাঁরা তার প্রমাণস্বরূপ নিত্যানন্দ দাসের রচিত 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের নজিরের কথা উল্লেখ করেন। 'প্রেমবিলাসে'র চতুর্বিংশ বিলাসে আছে, বীরভদ্র একদিন গৌড়ের বাদশার কাছে গেলে,

"সব বোলে, হুজুর এ তো পণ্ডিত সুধীর।
জানে বড় ফকিরালী বড়ই ফকির।।
পাৎসাহ তাঁরে অতি যতন করিয়া।
বসিতে আসন দিলা হর্ষযুক্ত হৈয়া।।
পাৎসাহ বোলে তুমি ফকির সুজন।
আমার গৃহেতে আজি করহ ভোজন।।

শুনিয়া বীরভদ্র প্রভু মৃদু মৃদু হাসে।
যবনের গৃহে খাইলে হিন্দুর জাতি নাশে।।
তবে যদি তোমা সবার খানা দেহ মোরে।
খাইব নিশ্চিত এই কহিল তোমারে।।
পাৎসাহ শুনিয়া হাসিল তখন।
বাবুর্চি খানা শীঘ্র কর আনয়ন।।
আদেশ পাঞা বাবুর্চি আনে উত্তম খানা।
পরিষ্কার কাপড়েতে করিয়া বন্ধনা।।
গোসাঞি বোলে শীঘ্র খানার খোলহ বন্ধন।
খোলিল বাবুর্চি, পাৎসা দেখে পুষ্পগণ।।
জাতি, যূথি, মালতী, বেল, বকুল।
চন্দনে চর্চিত গোলাপ আসে অলিকুল।।
এইরূপে তিনবার খানা আনাইল।
নানাবিধ ফুল তাহে দেখিতে পাইল।।
পাৎসাহ বোলে গোসাঞি ফকির প্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান।।
গোসাঞি বোলে বহুমূল্য তেলুয়া পাথর।
তোমার দ্বারেতে শোভে করে ঝলমল।।
গোসাঞি বোলে ইহা নিতে আমার আগ্রহ।
ইহা দিয়া গড়াইব সুন্দর বিগ্রহ।।
পাৎসাহ পাথব খোলি বীরচন্দ্রে দিল।
পাথর লইয়া বীর খড়দহে গেল।।
সেই পাথরে গড়াইল শ্যামসুন্দরের মূর্তি।
দেখিযা সকল লোকের গেল সব আর্তি।।
মহা-মহোৎসব কৈল বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ।
সকল চৈতন্যগণ কৈল আগমন।।
অদ্বৈত-পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাশয়।
মূর্তির প্রতিষ্ঠাভিষেক কৈল দয়াময়।।
শ্যামসুন্দব গড়ি অবশিষ্ট সে পাথর।
তাহা দিয়া গড়িল দুই মূর্তি মনোহর।।
শ্রীনন্দদুলাল মূর্তি রহে স্বামীবন।
বল্লভপুবে বল্লভজী অধিষ্ঠিত হন।।

কিন্তু ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশে'র বিংশ অধ্যায়ে এবং বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তারে'র প্রথম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ প্রভুকেই খড়দহের শ্যামসুন্দর মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর 'বৈষ্ণবাচার দর্পণে'র (নৃত্যলাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮২৩ শকাব্দ) ৩২১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, বীরভদ্রই গৌড়ের বাদশার কাছ থেকে পাথর এনে শ্যামসুন্দর মূর্তি তৈবি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার ঐ বই-এরই ৩৩৩ আর ৩৩৪ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে বলা হয়েছে বল্লভপুরের রাধাবল্লভ ঠাকুর রুদ্রপণ্ডিতের স্থাপিত বিগ্রহ। হান্টারের 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাকাউন্টে' (১৮৭৫ সাল) আর ওম্যালির ২৪ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, বল্লভপুরের রুদ্রপণ্ডিতই পাথর এনেছিলেন, গৌড় থেকে। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'লিস্ট

অফ এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস্ ইন বেঙ্গল'-এর ১৫ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণের সংগৃহীত তথ্যে 'প্রেমবিলাসের'ই কাহিনীরই অল্পবিস্তর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

'প্রেমবিলাস', 'অদ্বৈত-প্রকাশ', প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিতরা তো সন্দিহান। 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার'ও 'চৈতন্য-ভাগবত'-রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের রচনা নয়, উনি অন্য বৃন্দাবনদাস এবং অর্বাচীন বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। সুতরাং এ মূর্তি তিনটির প্রতিষ্ঠাতার সঠিক পরিচয় স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। তবে খড়দহের শ্যামসুন্দর বীরভদ্রেরই স্থাপিত—এই অনুমান অমূলক নয় বলেই মনে হয়। যদি নিত্যানন্দ প্রভু এর স্থাপয়িতা হতেন, তবে 'চৈতন্য ভাগবত', 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ইত্যাদি প্রাচীন প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর খড়দহে বীরভদ্রেরই আমলে যে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 'প্রেমবিলাসে' অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠাভিষেকের কথার উল্লেখ থেকে সে কথা অনুমান করা যায়। নিত্যানন্দ প্রকট অবস্থায় থাকলে তাঁর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতির কথা নিশ্চয়ই উল্লিখিত থাকত। অবশ্য 'প্রেম-বিলাসে'র প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যখন সন্দেহ আছে, তখন এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

প্রভাবশালী বীরভদ্র

তবে গৌড় থেকে বাদশার প্রাসাদের পাথর আনার গৌরব বীরভদ্রকে যাঁরা দিতে চান, বীরভদ্রের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা স্মরণ রাখলে তাঁদের কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতির তিরোধানের পর বীরভদ্র এবং তাঁর প্রভাবশালী বিমাতা জাহ্নবা দেবীর ওপরেই বাংলাদেশের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বভার মুখ্যত অর্পিত হয়েছিল। বীরভদ্র পিতা নিত্যানন্দেরই মত উদারহৃদয়, মনস্বী পুরুষ ছিলেন। সহজিয়া, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকাচারী প্রভৃতিদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে 'নেড়া-নেড়ী' সম্প্রদায় সৃষ্টি তাঁরই কীর্তি বলে কথিত হয়। হিন্দু-মুসলমানের প্রতি তাঁর উদার, সমভাবাপন্ন ব্যবহারের কথাও সুবিদিত ছিল।

হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করে পতিত জন।
হিন্দু-মুসলমান কিছু না করে গণন।।

অপ্রামাণিক হলেও 'প্রেমবিলাসে'র এ উক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমসাময়িক মুসলমান শাসকদেরও ওপরে তাঁর প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সমস্ত বিচার করেই—বীরভদ্রই গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে কষ্টিপাথরটি এনেছিলেন—এই মত যাঁরা পোষণ করেন, বোধ হয় তাঁরা খুব ভুল করেন না।

খড়দহে গঙ্গার ধারে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের একটি কালো কষ্টিপাথরের টুকরো 'ডহরকুমারী' নামে পূজিত হয়। খড়দহের গোস্বামীরা বলেন, এটি নাকি সেই 'ঝলমল তেলুয়া পাথরে' তিন ঠাকুর তৈরির পর অবশিষ্টাংশ, শিবলিঙ্গের মত এটি নাকি নিত্য ক্রমবর্ধমান।

যেই ও পাথর এনে থাকুন, বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর আর সাঁইবোনার নন্দদুলালের বিগ্রহ তিনটি বাংলাদেশের প্রায় সওয়া চারশো বছরের পুরনো পাষাণভাস্কর্যকলার অপরূপ নিদর্শন। ত্রিভঙ্গিম-ঠাম পরম লাবণ্যময় এই বিগ্রহ তিনটির আবেদন শুধু ভক্ত ভাবুকের কাছে নয়, শিল্পরসজ্ঞেরও কাছে যথেষ্ট আছে।

অবশ্য বল্লভপুরের গৌরাঙ্গভক্ত রুদ্রপণ্ডিতও একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহান্ত ছিলেন। কবি কর্ণপুর তাঁর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তে তাঁকে ব্রজলীলার বরূথপ সখা বলে সাব্যস্ত করেছেন। শ্রীরামপুরের চাত্‌রায়—বল্লভপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে তাঁর মামা গৌরাঙ্গভক্ত কাশীশ্বরের কাছেই তিনি প্রতিপালিত হন এবং উত্তরকালে তিনি গঙ্গার ধারে রাধাবল্লভ মূর্তির সেবা করতেন।

রাধাবল্লভের নাম থেকেই অঞ্চলটির বল্লভপুর নাম হয়েছে বলে অনুমিত হয়। রুদ্রপণ্ডিত ছিলেন চিরকুমার। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্তের বংশধররাই পুরুষানুক্রমে রাধাবল্লভের সেবা করে আসছেন।

গঙ্গার ধারে পরিত্যক্ত মন্দির

রাধাবল্লভের বর্তমান মন্দিরটি ১৭৬৪ সালে নির্মিত। বাংলা স্থাপত্য রীতিতে গড়া পুরনো মন্দিরটি কিন্তু আজও রয়েছে বল্লভপুরের খেয়াঘাটের পাশে, শ্রীরামপুরের জলের কলের ধারে। নদীর ভাঙনের জন্যে সে মন্দির পরিত্যক্ত। কিন্তু বিশাল সে মন্দিরের গম্ভীর প্রাচীন রূপ দেখলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয়। সুরকি আর কাদা-মাটিতে গাঁথা মজবুত বিশাল খিলানের গড়ন আজও অনেকখানি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বাঙলার প্রাচীন ঢং-এর স্থাপত্যকলার এই নিদর্শনটি সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বলে শোনা গেলেও এর ওপরে যে প্রকাণ্ড অশথ আর বটগাছ জন্মেছে, তাতে আমাদের সরকারের প্রত্নবস্তু আদর করে রাখার চেষ্টার সাক্ষাৎ নমুনা পাওয়া যায়। ঐ মন্দিরটির ভেতরে একটি পাথরের ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে---১৮০৬ সালে মিসনারি হেনরি মার্টিন এই মন্দিরটি দখল করেছিলেন। 'লিস্ট অফ এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস ইন বেঙ্গল'-এ দেখা যায়, মন্দিরটি একদা খ্রিস্টানদের ভজনালয়ে পরিণত হয়েছিল। তারপরের পরিণতি হচ্ছে, এখানে মদের ভাটিখানা স্থাপন। এবং এখানকার তৈরি মদ প্যাগোডা ডিস্টিলারী ব্র্যান্ডের মদ নামে বিখ্যাত ছিল। প্রথমে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, তারপর খ্রিস্টানদের ভজনালয়, তারপর মদের ভাটিখানা, আর এখন সেটি জলকলের শ্রমিকদের বিশ্রামাগারে পরিণত। বাংলার একটি পুরনো মন্দিরের কালানুক্রমিক এই পরিণতি অদ্ভুত বটে!

পীর গোরাচাঁদের মেলা

বকুল গাছের তলায় গোল করে বাঁধানো প্রকাণ্ড বেদীটার ওপরে বাউল-ফকিরদের গানের আসর বসেছে। চারপাশে ভিড় জমে গেছে খুব। বক্স ফকির গান ধরেছে :

বল সূর্য, বল আকাশ
বল চন্দ্র, বল বাতাস
দাও বলে কোথায় গেলে
পাব আমি তারে......

বক্স ফকির অন্ধ। চব্বিশ পরগণার ভাঙড় থানার নারায়ণপুর গ্রামে তার বাস। বাপের নাম নেয়ামত মোল্লা। ছোট বেলা থেকেই বাউল-ফকিরদের আড্ডায় ঘুরতে ঘুরতে এখন তাদের ধর্ম পাকাপাকি নিয়েছে। বয়স এমন কিছু বেশি নয়, তিরিশের ভেতরেই। লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি। আলখাল্লা পরনে। ডান হাতে একতারা আর বাঁ হাতে প্রেমজুড়ি বাজিয়ে গান করে। এক জোড়া কাঠের সঙ্গে পেতলের ছোট ছোট খঞ্জনী লাগানো—এই হচ্ছে প্রেমজুড়ি। এরা মাসুকের অর্থাৎ প্রেমিকের গানে ভরপুর। তাই প্রেমজুড়ি এদের উপযুক্ত বাজনা। ডান হাতে ধরা একতারার গুঞ্জনের সঙ্গে প্রেমজুড়ির ঝনাৎঝন্ তাল দিয়ে দিয়ে বক্স ফকির গেয়ে চলেছে :

জনম বিফলে গেল
পড়ে ঘোর আঁধারে—
দাও বলে কোথায় গেলে
পাব আমি তারে।
আর কোথায় স্বর্গ কোথায় মর্ত
কোথায় ফেরদৌস জান্নাত
বল তার শাহি তখ্ত
কোথায় বিরাজ করে রে।

বক্স ফকিরের জিজ্ঞাসার জবাব দিলে বুড়ো রহিম ফকির।
একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে সে গাইলো :

ওরে মেলে তার,
খোঁজগে আপন এই দেহ মন্দিরে।
সে জুয়োচুরি জানে বিলক্ষণ,
বাইরে দেয় না দরশন
আকারশূন্য তবু জগৎজোড়া
জগৎ জীবন।।
দেখ নাভি-পদ্মে স্থিতি।
নাই তার গতি
পলকে প্রলয় করে
ওরে খোঁজগে আপন দেহ-মন্দিরে।

বুড়ো রহিম ফকির গানের জবানিতে আরও বলে যায় নেচে নেচে :

তার আপনায় আপুনি
চেনো আপুনি

চ্যাতন দিবারজনী—
তবেই যদি কেরপা করে
সেই গুণমণি।
যাদুবিন্দু বেটা বুদ্ধি মোটা
গোঁসাই কৃবিবকে চিনতে নারে—
ওরে মেলে তারে খোঁজগে আপন
এই দেহ-মন্দিরে।

গানের আসর শুধু বকুলতলাতেই নয়। ওধারে পীরের মাজারের সামনেও বসেছে গানের আর একটা আসর। সেখানে মাতলার বাগমারি গ্রামের কোরবান ফকির গান জুড়েছে :

বলি যায় যাবে কুল আমার
আমি গৌর যদি পাই।
গৌর আমার জপের মালা গো
জপি সর্বদাই।
ওরে গৌর বলে কেঁদে বেড়াব
কুলে দিয়ে ছাই।

চারপাশে মন্ত্রমুগ্ধ জমাট ভিড়। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়েরই লোক। গোপীযন্ত্র বাজিয়ে চক্রাকারে নাচতে নাচতে গৌবকলঙ্কিনী কোরবান ফকির গেয়ে চলেছে :

আমার অঙ্গে গৌর সঙ্গে গৌর
গৌর জগৎময়—
গৌর আমার নয়ন তাবা গো
পলকে হারাই।
গোঁসাই বলে নারান ক্ষেপা
বসে ভাব তাই
যদি গৌর চিনতে পার
শমনের ভয় নাই।

নয়ানচাঁদ গোঁসাই, ললিতা বোষ্টুমী, মতি বাউল, আনন্দ ফকির, আউলে সোনাই আরও কত আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ হাজির হয়েছে পীব গোরাচাঁদের মাজাব শরিফের সামনে। প্রকাণ্ড মুসাফিরখানাটা ভরে গেছে। সামনের বারান্দাটাতেও বসেছে তারা কাঁথা-কম্বল বিছিয়ে, ঝুলি-ঝোলা, গোপীযন্ত্র, একতারা নিয়ে।

সারা রাত বাউল-ফকিরের গান

খালি গান আর গান। ভাবের গান, রসের গান। দেহতত্ত্ব মারফতি, সহজিয়া গানের মরমী গায়ক আর শ্রোতাদের সমাবেশ। পীর গোরাচাঁদের মাজার-শরিফের সামনে অশথ, বকুল, কামিনী গাছের ঝাড়। তার তলায় তলায় জমেছে গানের আসর। দিনের বেলাতে মাজার-শরিফের সামনে পীরের পুজো দিতে আসা নরনারীদের জমাট ভিড়। সেই ভিড়ের ভেতরেও গানের আসর দিব্যি জমে গেছে। আর রাত্তিরে তো কথাই নেই। তখন পূজার্থীদের ভিড় থাকে না। নির্ঝঞ্ঝাটে গানের আসর জমাবার ভাল সময়। সারা রাত্তির ধরে তখন গান চলে। গায়কদের মধ্যে যেমন জাতপাতের ভেদ নেই, শ্রোতাদেরও মধ্যে নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি করে গান শোনে তন্ময় হয়ে।

চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলা উপলক্ষে এই গানের আসর। প্রতি বছর পীরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই ফাল্গুন তারিখে এই মেলা বসে, চলে তিন দিন। এই তিন দিন পর গোরাচাঁদের সমাধির সামনে আউল, বাউল, ফকির, দরবেশের সমাবেশ হয়। নানান অঞ্চলের নানান ভাবের মানুষ এরা। নিজেদের মরমী সাধন পন্থার কথা, গানে গানে ঠারে ঠোরে এরা ব্যক্ত করে। গানেতেই প্রশ্ন, গানেতেই জবাব। একজনের গান শেষ হলে আর একজন গান করে। সে গানেতে সুফী সাধনপন্থা যেমন, তেমনই কৃষ্ণানুরাগিণী গোপীর রাগমার্গের ভজন কথারও আভাস-ইঙ্গিত আছে। কিন্তু তবুও সেসব গান শুনলে মনে হয়, এরা না খাঁটি ঐস্লামিক, না খাঁটি হিন্দু। ইসলামি আর হিন্দুয়ানি—এই দুই ভাবের মধ্যে চলাফেরা করলেও তাদের চৌহদ্দি যেন এদের ধরে রাখতে পারে না। আরও কোথাও এক বিশাল জগতে যেন এরা চলে যাচ্ছে, একটি অখণ্ড মানব-সত্তার অনুভূতিতে---যেখানে জাতপাত, পথের সমস্ত বিভিন্নতা অবলুপ্ত। আউল, বাউল, ফকির, দরবেশদের এই উদার গানের আসরই পীর গোরাচাঁদের বার্ষিক মেলার একটা বড় আকর্ষণ।

বসিরহাটের বৃহত্তম মেলা

এই মেলাটি মুসলমান পীরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলেও, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার মানুষ এতে এসে হাজির হয়। প্রকাণ্ড মেলা বসে যায়। দোকান-পাটে, সার্কাসে, পুতুল নাচে, নাগর দোলায় হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলা তিন দিন জমজমাট হয়ে থাকে। তিন দিন ধরে চব্বিশ পরগণার নানান জায়গা থেকে লোক আসে এ মেলায়। প্রায় হাজার পঞ্চাশ-ষাট লোক জমে। বসিরহাট মহকুমার ভেতরে ঠিক এত বড় মেলা আর নজরে পড়েনি।

লোকশিল্পের নিদর্শন

এই মেলাতে গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি ঘর-গেরস্থালির দরকারি কয়েকটি অতি সুদর্শন জিনিসপত্র বিক্রি হতে দেখেছি। শিকায় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে চিত্রিত মাটির হাঁড়ি তাদের মধ্যে অন্যতম। দ্রুত অনায়াস গতিতে তুলির নিপুণ টানে আঁকা মাছ আর ফুল-পাতায় বিচিত্র সেই হাঁড়িগুলো। ডিজাইন সেন্টারদের ফরমাস-মাফিক তৈরি হওয়া হাল আমলের এদেশী কলারসিকদের ড্রইংরুম-আশ্রয়ী লোকশিল্প থেকে সেগুলো কিন্তু একেবারে আলাদা।

লোকমুখে প্রচলিত নানান কিংবদন্তী আর ইসলামি পুঁথি-কেতাব ছাড়া পীর গোরাচাঁদ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। স্বভাবতই এই সমস্ত ইসলামি পুঁথি-কেতাবে এই দেশে ইসলামের অতিরঞ্জিত কাহিনীই আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বাস্তব সত্য ঘটনাকে। কিংবদন্তীগুলিই এই ধরনের। তবুও চব্বিশ পরগণার একাধিক অঞ্চলে, এমন কি বর্ধমান জেলারও গ্রামাঞ্চলে পীর গোরাচাঁদের অনেক দরগার অস্তিত্ব থেকে বুঝতে পারা যায় বাংলাদেশে একসময় তিনি জনমানসে বিশাল প্রভাব বিস্তার করে বিরাজ করতেন। জনশ্রুতি, এদেশে যে বারোজন আউলিয়া বা জ্ঞানী ইসলাম-প্রচারক এসেছিলেন, পীর গোরাচাঁদ তাঁদের অন্যতম। তাঁর আসল নাম হচ্ছে হজরত শাহ সৈয়দ আব্বাস আলি, ওরফে পীর গোরাচাঁদ গোরাই বা গোড়াই গাজি। গৌর অঙ্গকান্তির জন্যেই নাকি তাঁর নাম হয়েছিল গোরাচাঁদ। এই গোরাচাঁদ নাম থেকেই হিন্দু-জনমানসে তাঁর প্রভাব বিস্তারের পরিচয় রয়েছে। তাঁর প্রকাণ্ড ইসলামি নামটার চাইতে পীর গোরাচাঁদ এবং তা থেকে গোরাই বা গোড়াই গাজি নামটিই জনমানসের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত। এই গোরাই গাজির হাড় এখানে সমাধিস্থ করা হয় বলেই নাকি এই জায়গাটির নাম হয়েছে হাড়োয়া।

তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান

বারোই ফাল্গুন তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব। উৎসবটি এগারই ফাল্গুন রাত্রে শুরু হয় এবং চলে তিন দিন। এগারোই ফাল্গুন রাত্তিরে মহফিলে সমবেত হন ভক্তরা গান-আবৃত্তির আসরে। এই দিন রাত্তির থেকেই পীরের মাজারশরিফের সামনে গাছতলায় বসে বাউল, ফকির, দরবেশের গানের আসর। আর সমস্ত মাজারটি বাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে।

মণ মণ দুধে পীরের স্নান

বারোই ফাল্গুন সকালবেলা হাড়োয়ার কাছাকাছি গ্রাম থেকে হিন্দু গোয়ালারা নিয়ে আসে ভারে ভারে দুধ। পীর গোরাচাঁদের মাজারশরিফ বা সমাধিস্থানটির আদি মাহাত্ম্য হিন্দু গোয়ালাদেরই কেন্দ্র করে নাকি ব্যাপ্ত হয়েছে। সেই থেকে এখনও পীরের মৃত্যু-বার্ষিকীর দিন সবার আগে হিন্দু গোয়ালারাই আনে দুধ। কাশীর বিশ্বনাথের মত হাড়োয়ার গোরাচাঁদের সমাধিস্থলটিকেও সেই মণ মণ দুধে স্নান করানো হয়। গোয়ালাদের পর মাজারেব খাদেমদাররা বা সেবাইতরা এবং অন্যান্য ভক্তবা পীরবাবাকে দুধে স্নান করান। সেই মণ মণ দুধ সমাধিকক্ষের নর্দমা দিয়ে বাইরে এসে পড়ে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে পীরের স্নানপূত সেই পবিত্র দুধ ঘটি বাটি ভরে নিয়ে যায়। পরম ভক্তিতে সেই দুধ পান করে নয়তো তাই দিয়ে সিমাই-এর পায়েস রেঁধে খায়।

স্নানের পর পীরবাবার সমাধির ওপরে চন্দন, আতর, গোলাপজলের ধারা পড়তে থাকে। ফুলে ফুলে ভরে যায় ঘব। চারধারে দীপ জ্বলতে থাকে আর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তরা সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত বাতাসা, কদমা, এলাচদানা, নানা মিষ্টির সিন্নি চড়ায়। তাছাড়া বাজনাবাদ্যি করে গান গাইতে গাইতে মিছিল করে সোন্দল নিয়ে আসে লোকে দলে দলে। সোন্দল হচ্ছে পীরবাবার জন্যে চন্দন আনা। শুধু চন্দন নয়, গোলাপজল, আতর, ফুল, মিষ্টি, খাবারের নৈবেদ্যও আসে সেই সঙ্গে। চলমান চাঁদোয়ার তলায় সেই নৈবেদ্য মাথায় করে আনাই রীতি। পাছে কিছু অঘটনে নৈবেদ্য অপবিত্র হয় এইজন্যে চাঁদোয়ার ব্যবস্থা।

কৃত্যাদির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হচ্ছে সারাদিন ধরে মুসলমান নরনারীদের ভাত আর মুরগি কিংবা খাসির মাংস রান্না করে পীরবাবাকে তা নিবেদন করে খাওয়া। এখানে কিন্তু গোমাংস নিষিদ্ধ। পীরবাবার কাছ থেকে নানা রোগের দাওয়াই নেওয়ারও খুব ধুম পড়ে যায়। খাদেমদাররাই শিশি ভরে জলপড়া, তেলপড়া বিলোন আর মানসিকের পুজো নেন।

বলাবাহুল্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান না খাঁটি শরিয়তসম্মত, না ব্রাহ্মণ্য-আচারসম্মত। কিন্তু এদেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ পরস্পরের নিকট সংস্পর্শে নিজেদের ধর্মীয় আচার-আচরণাদিও পরম লৌকিক করে নিয়েছে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের ধার না ধেরেই, এসব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দুদেরই মত দুগ্ধস্নান, পুজা-নৈবেদ্য অর্পণ, এমনকি আভূমি হত হয়ে প্রণাম করা—মুসলমানরাও গ্রহণ করেছেন। মাজারশরিফের সামনে সমবেত ফকির-দরবেশদের পায়ে মাথা রেখে মুসলমান ভক্ত নরনারীদের প্রণাম করার ভঙ্গি দর্শনীয়। আবার দলে দলে হিন্দু নরনারীও মুসলমান ভক্তদেরই মত বিভিন্ন কৃত্যে পীরবাবাকে পুজো করছেন। শত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রচার সত্ত্বেও বাংলার গ্রামীণ জনমানসে এই মিলন আর সমন্বয়ের রূপ এখনও টিকে আছে। বাংলার লোকোৎসবগুলিতেও তারই সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়। হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলাও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়।

গোড়াই গাজির ইতিকথা

কানু ঘোষ, কিনু ঘোষ—হাড়োয়ায় এদের কোনও স্মৃতি-চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। গোরুর রাখালি করা এই সাধারণ মানুষরা সুরম্য প্রাসাদবাসী ছিল না। অতএব আজ অনেককাল পরে প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে কিংবা ঐশ্বর্যের কোনও ভাঙা টুকরাতে তাদের অতীত জীবনের সাক্ষী খুঁজে পাবার কথা ওঠে না। কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত উত্তরপুরুষেও তাদের কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই। হাড়োয়ার আশেপাশের কোনও গোপবংশই কানু ঘোষ, কিনু ঘোষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের সম্পর্ক দাবি করে না আজ। তবে কি তাদের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না? সে কথা আজ বলা শক্ত। কিন্তু হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ কিংবা গোরাই বা গোড়াই গাজির সম্বন্ধে যে লোককাহিনী প্রচলিত আছে, তাতে বারগোপপুরের কানু ঘোষ, কিনু ঘোষ প্রভৃতি গোপজানপদদের কুশীলবের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল, কি ছিল না—এই নিয়ে কেউ আজ মাথা ঘামায় না। কারণ, কাহিনীর অলৌকিকতায় অভিভূত লোকমনের কাছে বাস্তব-অবাস্তব, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখাকে মেনে চলার প্রশ্ন একেবারে অবান্তর।

বাংলাদেশে মুসলমান পীর আর হিন্দু সাধু-সন্তদের আস্তানার অভাব নেই। শত সাম্প্রদায়িকতাবোধের উগ্র উস্কানি দেওয়া সত্ত্বেও সেসব জায়গায় আজও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এসে মিলিত হয় শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে। চব্বিশ পরগণার হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ বা গোড়াই গাজি এমনই এক মুসলমান পীর। স্বভাবতই অনেক অলৌকিক কাহিনী রচিত হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করে। সেই অলৌকিকতায় পরিপুষ্ট কাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই যে সমস্ত লোক কুশীলবের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, কানু ঘোষ, কিনু ঘোষ প্রভৃতি তাঁদেরই শরিক।

বাইশ আউলিয়ার নেতা

গোড়াই গাজির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিবরণ না পাওয়া গেলেও লোকমুখে এবং বাংলায় রচিত কিছু ইসলামি পুঁথি-কেতাবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কোনও কোনও মুসলমান ধর্মগ্রন্থ প্রণেতার মতে যে বাইশজন আউলিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন পীর গোরাচাঁদ ছিলেন নাকি তাঁদের নেতা; তাঁর আসল নাম ছিল হজরত সৈয়দ আব্বাস আলি; গৌরবর্ণ অঙ্গ-কান্তির জন্যে জনসাধারণ নাম দিয়েছিল তাঁর পীর গোরাচাঁদ। ঐ নাম ভেঙেই তাঁর নাম দাড়িয়েছে গোরাই বা গোড়াই গাজি। ঐসব ধর্মগ্রন্থ প্রণেতাদের মতে তাঁর জীবনকাল খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা পীরের যে জন্মকাল নির্ধারণ করেছেন, তাতে দেখা যায় তিনি বয়সে শ্রীচৈতন্যের চাইতে প্রায় দুশো বছরের বড় ছিলেন। এসব তথ্যের ভিত্তিতে কিন্তু বিশেষ কোনও দৃঢ় ঐতিহাসিক প্রামাণ নেই। লোকশ্রুতি আর আর কিছু ইসলামি পুঁথি-কেতাবই এদের মূল ভিত্তি। পীরের গোরাচাঁদ নামটিই স্পষ্টভাবে সূচিত করছে তিনি কিছুতেই শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ববর্তী হতে পারেন না। ইসলামি পুঁথি-কেতাবগুলোতেও কাহিনীর খুব গরমিল রয়েছে। এবং স্বভাবতই সেগুলো ধর্মপ্রচারকদের কল্পিত, অতিরঞ্জিত, অলৌকিক কাহিনীতে ভরপুর।

চন্দ্রকেতুকে ইসলাম কবুলের চেষ্টা

লোকমুখে আর 'গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা' নামে বাংলায় লেখা ইসলামি পুঁথিতে গোড়াই গাজির যে কাহিনী পেয়েছি আমি সেটি বিবৃত করছি।

চব্বিশ পরগণার হাড়োয়ার থেকে মাইল ছ'সাত উত্তরে দেউলিয়া বলে একটা জায়গা আছে।

সেটি ছিল বালাণ্ডা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্য। 'মহাবুজর্গ' অর্থাৎ অসীম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী গোড়াই গাজি তাঁর সাথী সোন্দলকে (ইসলামি বাংলা-বানানে ছোন্দল) নিয়ে সেখানে এলেন চন্দ্রকেতুকে ইসলাম কবুল করাতে। প্রথমে অনেক 'কেরামতি', 'বুজর্গি' ইত্যাদি দেখিয়ে রাজাকে তিনি তাক লাগাবার চেষ্টা করলেন। একটা লোহার ডাণ্ডাকে চক্ষের নিমেষে একটা পাকা পুরুষ্টু কলা করে ছাড়লেন। বাড়ির গাছের শুকনো ডালপালায় তৈরি বেড়াতে চাঁপা ফুল ফুটিয়ে দিলেন। তবু ভবী ভোলবার নয়। চন্দ্রকেতু ইসলাম কবুল করলেন না। ক্রুদ্ধ পীর তাঁকে অভিশাপ দিতে দিতে দক্ষিণে হাতিয়াগড়ে গেলেন।

হাতিয়াগড়ে যুদ্ধ

সেখানে রাজা মহীদানন্দের দুই মহাবীর ছেলে অকানন্দ আর বকানন্দ রাজত্ব করতেন। ইসলামি পুঁথি 'গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা'য় বলা হয়েছে, তাঁরা নাকি রোজ মানুষ ধরে ধরে খেতেন। যাক, গোড়াই গাজি তো সেখানে গিয়ে হাজির হলেন ইসলাম প্রচারের জন্যে। তিনি সেখানে শুনলেন, রাজার বার্ষিক কালীপুজো উপলক্ষে নরবলির জন্যে লোক সংগ্রহ করা হচ্ছে প্রজাদের মধ্য থেকে। গোড়াই গাজি সেই দুর্গত প্রজাদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন তখন। অকানন্দ আর বকানন্দের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ বেধে গেল তাঁর। তাতে নিহত হলেন বকানন্দ।

গলাকাটা পীরের যুদ্ধ

ভাই-এর মৃত্যুতে শোকাহত অকানন্দ শিবের কাছের ধরনা দিয়ে এক ভয়ঙ্কর চক্রবাণ পেলেন। আবার দারুণ যুদ্ধ শুরু হল। অকানন্দের শিবদত্ত চক্রবাণে গোড়াই গাজির মুণ্ডুটি ধড় থেকে আধখানা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘাড়ের ওপরে ডানদিকে ঝুলতে লাগল। তবুও পীরের এমন কেরামতি যে, তিনি সেইভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাফের নিধন করে চললেন। 'পীর গোরাচাঁদের কেচ্ছা'য় আছে যে

"গোড়াই চড়িয়া ঘোড়ে, যেন বাওগতি উড়ে, রাক্ষস উপরে যেন তাজি। ডাহিন দিকে দোলে ছির কাফেরে কাটেন পীর, এলাহি আলমিন হইল রাজি। ডাহিন বামে নাহি চায়, কাফের কাটিয়া যায়, সুমুখে যতেক জন আইসে। দেখিয়া পীরের জঙ্গ সবে দিল রণে ভঙ্গ, চারিদিকে পালায় তরাসে।"

অবশেষে সেই ভীষণ যুদ্ধে অকানন্দও পীরেব হাতে অক্কা পেলেন।

কিন্তু পীরেব ঘাড়েব ওপরে মুণ্ডুটা আধখানা ঝুলছে। এভাবে তিনি কতক্ষণ আর থাকতে পারেন! এবার তিনি নিজের ওপরে কেরামতি দেখাবার চেষ্টা করলেন। পান খেয়ে কাটামুণ্ডু ধড়ে জোড়া দেবার জন্যে তিনি তাঁর সাথী সোন্দলের কাছ থেকে পান চাইলেন। বিধি কিন্তু বাম। বাটার পান নিঃশেষ। সোন্দল পান দিতে পারলেন না। তখন "এয়ছাই শুনিয়া পীর কহে ছোন্দলেরে। আশু পাকা ইঁটগুড়ি আন শীঘ্র করে। তদ্বির করিব আমি এক যে তাহাতে। তবে তো আমার ছির লাগিবে কান্ধেতে।।"

সুরকি দিয়ে কাটা মুণ্ডু ধড়ে বসাতে চাইলেন পীর। তাও মিলল না। লোকশ্রুতি, হাতিয়াগড়ে পীরের জন্যে পান না পাওয়ায় সেই থেকে ওখানে নাকি পান আর জন্মায় না।

কপিলা গাই-এর দুধে স্নান

যাহোক, আধখানা কাটা মুণ্ডু ঘাড়ের ওপর দোলাতে দোলাতে পীর ঘোড়ায় চড়ে দিল্লির পথে উত্তর মুখে এগোতে এগোতে বালাণ্ডা পরগণার বারগোপপুরে এসে হাজির হলেন। অবসন্ন দেহে তিনি

সেখানে এক নির্জন জায়গায় পড়ে রইলেন। বারগোপপুরের গোপনন্দন কানু ঘোষ, কিনু ঘোষদের কপিলা গাই তাঁকে সেখানে চুপি চুপি দুধে স্নান করিয়ে যেত। সাত দিন এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে দুধে স্নান করলে তাঁর কাটা মুণ্ডু আবার জোড়া লাগত। কিন্তু 'আল্লাব ফর্মানে' সাত দিন কাবার হবার আগেই কানু ঘোষ কিনু ঘোষ গোরুর অনুসরণ করতে করতে এসে সব দেখে ফেলল। গোড়াই গাজির প্রাণরক্ষা আর হল না। কাটা মুণ্ডু নিয়ে পীর এইভাবে পড়ে আছেন, দিব্যি কথা বলছেন। গোয়ালারা বুঝতে পারলে মহাশক্তিশালী পীর ইনি। পীরও তাদের অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে গোয়ালারা তাঁর মৃতদেহ হাড়োয়ায় নিয়ে এসে কবর দিলে, গোড়াই গাজির হাড়ের কবব থেকেই নাকি জায়গাটির নাম হল হাড়োয়া।

কানু ঘোষরা হিন্দু হয়ে মুসলমানকে কবর দিয়েছে। সুতরাং খুব ফ্যাসাদে পড়ল তারা। আত্মীয়স্বজনরা একঘরে করে দিলে। এই নিয়ে একদিন ঝগড়ার মুখে কানু ঘোষের হাতে তার এক আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটল। তার পরিণতিতে কানু ঘোষ, কিনু ঘোষ প্রভৃতিকে হত্যার দায়ে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিনের দরবাবে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল। ঘোষের মেয়েরা কান্না জুড়ে গোড়াই গাজির কবরে গিয়ে ধরণা দিল। করুণাময় পীর কবর থেকে উঠে আধখানা কাটা মুণ্ডু ধড়ে ঝুলন্ত অবস্থাতেই গৌড়ে গিয়ে সুলতানকে আদেশ দিলেন কানু ঘোষদের মুক্তি দিতে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুলতান বন্দিদের মুক্তি দিলেন। কানু ঘোষ, কিনু ঘোষরা ফিরে এসে গোড়াই গাজির প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল। তখন শুধু তারা নয়, বারগোপপুরের সমস্ত গোপনন্দনরা গোড়াই গাজির পুজো করতে লাগল। তাঁর সমাধিটা পাকা করে বাঁধিয়ে, তাতে প্রত্যহ ধূপ ধুনো দীপ জ্বালিয়ে তারা খুব ভক্তিনিষ্ঠাসহকারে সমাধিটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর সুলতান পীরের কবরের ওপরে সমাধিমন্দিরটি তৈরি করে দিলেন এবং অনেক বিঘা নিষ্কর জমিও দিলেন। পীরের সেবা আর সেই থেকে আজও ১২ই ফাল্গুন তারিখে পীরের মৃত্যুবার্ষিকীতে হাড়োয়ার পাশাপাশি গ্রামের গোয়ালারা ভারে ভারে দুধ এনে গোড়াই গাজির মাজার বা সমাধিটিকে স্নান করায়, পীরের পুজো কবে। তাদেব স্নান-পুজোর পরেই তবে অন্যান্যরা পুজোর অধিকার পায়।

সপরিবারে আত্মঘাতী চন্দ্রকেতু

কাহিনীর কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রাজা চন্দ্রকেতুকে হারাতে পেরে গোড়াই গাজি গৌড়েব সুলতানকে আবার স্বপ্নে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পীরশাহ বলে আব একজনকে পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে। তখনকার দিনে রাজাদের কাছে শাদা আর কালো রং-এর দুটি পায়রা থাকত। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করলে শাদা পায়রাটি ছেড়ে দিতেন। সেটি জয়বার্তা বহন করে আনত রাজপ্রাসাদে। আর রাজা পরাজিত কিংবা নিহত হলে তাঁর অনুচররা কালো পায়রাটিকে ছেড়ে দিত। চন্দ্রকেতু যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুচররা নাকি ভুলক্রমে কালো পায়রাটি ছেড়ে দিয়েছিল। চন্দ্রকেতুর মৃত্যুবার্তা পেয়ে অন্তঃপুরবাসিনীরা দীঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন, শত্রুর হাত থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যে। বিজয়ী চন্দ্রকেতু রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে সেই দুঃসংবাদ পেয়ে নিজেও জলে ডুবে আত্মহত্যা করলেন।

যেখানে শুকনো বেড়ায় গোড়াই গাজি চাঁপা ফুল ফুটিয়েছিলেন, সেখানকার নাম হয়েছে বেড়াচাঁপা। হাড়োয়া থেকে অল্প দূরেই বেড়াচাঁপা। সেখানে গড়-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। সেগুলি রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলে কথিত। এখানে গুপ্তযুগের কিছু কিছু প্রত্নবস্তুও পাওয়া গেছে। নিঃসন্দেহে জায়গাটিতে খুবই প্রাচীন এক রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কিন্তু এটি কাহিনীর চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোনও দৃঢ় প্রমাণ নেই।

কিন্তু গোড়াই গাজি বা পীর গোরাচাঁদ যে একজন বিশেষ প্রভাবশালী মুসলমান ধর্মপ্রচারক

ছিলেন, তা শুধু চব্বিশ পরগণার হাড়োয়াতেই নয়, এই জেলার আরও অন্য স্থানে তাঁর আস্তানার অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয়। বর্ধমান জেলার সাতশইকা পরগণার রাইগাঁতেও পীর গোরাচাঁদের আস্তানা আছে। কথিত আছে, এখানে যখন তিনি একদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, সেই সময় তাঁর মুর্শেদ বা গুরু তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি যখন শুনলেন গুরুর ডাকে তিনি সাড়া দিতে পারেননি, তখন তিনি নিজের অপরাধে কান দুটি কেটে ফেলেছিলেন। গুরুর প্রসাদে অবশ্য তাঁর পুনরায় কর্ণলাভ হয়েছিল এবং সেই কর্তিত কর্ণযুগলকে রাইগাঁতে সমাধিস্থ করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, রাইগাঁয় গোরাচাঁদের আস্তানাটি সেনযুগের আদিবরাহমূর্তিধারী বিষ্ণুর বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপরে স্থাপিত। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী 'মহাসামন্তচূড়ামণি' বটুদাস আদিবরাহমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, কাইগাঁতে স্থাপিত আদিবরাহমূর্তিটি তুরকি অভিযানের মুখে বিধ্বস্ত এই রাইগাঁরই আদিবরাহমূর্তি।

গোড়াই গাজির কাহিনীতে যত 'কেরামতি', 'বুজর্গীর' কথা থাকুক না কেন, এটাও বেশ বোধগম্য হয় যে, অন্যান্য ইসলামধর্ম প্রচারকদের মত তাঁকেও সহজে নয়, বেশ সংঘর্ষ এবং সংগ্রামের পথেই এদেশে ধর্মপ্রচার করতে হয়েছিল। কিন্তু গোড়াই গাজির কাহিনীতে সেদিনকার হিন্দুসমাজেরও একটা ছবি বেশ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে, সেদিনকার ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-শাসিত হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিচু স্তরের মানুষদের কথা—সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে লাঞ্ছিত-পিষ্ট হতে হতে এদেশে যাদের বেশ কিছু অংশ ইসলামের আগমনে তার দিকে ঝুঁকছিল। অবশ্য আধ্যাত্মিক প্রেরণায় কিংবা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক তারতম্যের বিচারে যত না হোক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈষয়িক সুখসুবিধা লাভের প্রত্যাশাতেই যে তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকছিল, সেদিনকার হিন্দুসমাজের পটপ্রেক্ষায় তা বেশ বোঝা যায়। অতএব গোড়াই গাজির মাহাত্ম্য-প্রচারের কাহিনীতে কানু ঘোষ, কিনু ঘোষরা যে গাঁথা থাকবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ঘেঁটু যায়—খোস পালায়

ঠাকুর আসেন পাল্কিতে চড়ে। পাল্কির বাহকরা নেহাৎ কচি-কাঁচার দল। গেরস্থদেব বাড়িব দরজায় তাদের কচি গলার শ্লোগান শোনা যায়। একদল বলে : "ঘেঁটু যায়।" অমনি তার পিঠে আব একদল চেঁচায় : "খোস পালায়।" বাড়ির দরজা বন্ধ থাকলে গেরস্থকে দরজা খুলে দিতে হয়। দরজা খোলা থাকলে তো কথাই নেই। সেই কচি-কাঁচার ফৌজ হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাড়িতে নেহাৎ খিটখিটে বুড়ি থাকলে তাদের তখন বাধা দেয় না। কারণ, খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, দাদের সাক্ষাৎ দেবতা ঘেঁটুঠাকুর বাড়িতে এসেছেন। বাড়িতে তাঁকে ঢুকতে না দিলে রক্ষে নেই। তিনি বিমুখ হলে, ছেলেপুলে তো বটেই বুড়োবুড়িরাও কণ্ডুরোগ থেকে রেহাই পাবে না- এই হচ্ছে সকলেব বিশ্বাস। সুতরাং কেউই উপদ্রব বলে মনে করে না বালবাহিনীব এই অভিযানকে। সবাই হাসিমুখেই তাদের বরণ করে নেয়।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই ছেলেরা ছড়া কাটতে শুরু করে দেয়। ছড়া কাটার মধ্যে কিন্তু শৃঙ্খলা বেশ আছে। একজন হবে মূল ছড়াদার—কীর্তন-পাঁচালির মূল গায়েনের মত। এক-এক ছড়া সুব করে সে বলে যাবে। তার পেছনে অন্যরা সমস্বরে সেই ছড়াব দোয়ারকি কববে। ধরনটা পাঠশালায় নামতা পড়ার মত।

ছেলেরা সুর করে ছড়া কাটতে শুরু করে দেয় :

ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় ঐ রঙ্গিনী।
কোথায় গো মা ঘরের গিন্নী।।
ঘেঁটু এলো বুঝে-সুঝে।
ভবানীপুরের হাট বুঝে।।
ভবানীপুরের কালাপানি।
বাপকে ছেড়ে ব্যাটাকে টানি।।
ও বুড়ি তোর ভাঙলো দাঁত।
কেমন করে খাবি ভাত।।
কাটফাটানো চৈত্তোর মাস।
বুড়ি করলো উপবাস।।
বুড়ির গলা শুকলো।
ফুলবনে ফুল লুকলো।।
ও বুড়ি তুই কোথায় যাবি।
পান্তাভাত কোথায় পাবি।।
পান্তাভাতে কে দেবে নুন।
সুজ্জিমামা রেগেই খুন।।
নারকোল গাছের মিষ্টি বাতাস।
ঠাণ্ডা ডাবের মিষ্টি শাঁস।
পদ্মপুকুরে পাতি হাঁস।
চান করে আর খায় মাছ।।
চৈত্তোর মাসে চতুর্দশী।
ঘেঁটুর কপালে চন্নোন ঘষি।।

ও বুড়ি তোর কটা ব্যাটা।
বুড়ি বল্লে সাত ব্যাটা।।
সাত ব্যাটার নাম সাতুড়ে।
বুড়ে ব্যাটার নাম মালুড়ে।।
মালুড়ে ভাই মালুড়ে ভাই।
চলো তোমার ফুলবনে যাই।।
আমরা ফুল তুলতে যাই।
ফুলের তলায় কী কী পাই।।
ছ-কড়ি ন-কড়ি পাই।
দু-দশ গণ্ডা আদা পাই।।
আদা ধরে মারলুম টান।
দাওগো মায়েরা ঘেঁটু দান।।.....

ছড়ায় টুকরো টুকরো ছবি

ছড়াব মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না। এক কথা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে আর এক কথায় চলে যাওয়া। কিন্তু ছড়াব যা চিরকেলে ধর্ম—টুকবো টুকরো চলমান বাস্তব ছবিকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে একটা লম্বা বিচিত্র মালা তৈরি করা—সে ধর্ম থেকে এ ছড়াও বিচ্যুত নয়। একটানা সুরের প্রবাহে ভেসে আসা টুকবো টুকবো কথার ছবি উপভোগ করা যায়। চোত মাসের আকাশে প্রখর সূর্য জ্বলছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কাঠফাটা রোদ্দুবে। এমন সময় মাঝে মাঝে নারকেল গাছের মাথায় মাথায় ঝর্‌ঝর্‌ আওয়াজ তুলে বাতাস বইছে, তপ্ত দেহ জুড়োচ্ছে, তপ্ত সূর্যও যেন একটু জুড়োচ্ছে মনে হচ্ছে। তপ্ত দুপুরের এই এক টুকরো ছবির সঙ্গে আরামের ঠাণ্ডা আমেজ নিয়ে এসেছে—ডাবের ঠাণ্ডা জল, মিষ্টি শাঁস, ছায়াচ্ছন্ন পদ্মপুকুরে পাতিহাঁসের ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ খাওয়া আর ঘেঁটুঠাকুরের কপালে চন্দনের সুবাসিত সুখ-স্পর্শ পাবার ছবি। বলাবাহুল্য সব ছড়ার মত ঘেঁটুঠাকুরেরও অধিকাংশ ছড়া-গানের রচয়িতাদের নাম-ধাম-গোত্র-পরিচয় হারিয়ে গেছে। যারা রচনা করেছে, তারা নিজেদের শীলমোহরে এঁটে এদের আটকে রাখেনি; সমাজের বিশাল মনভাণ্ডারে এদের গচ্ছিত রেখে তারা নির্ভর নিশ্চিন্ত হয়েছে। সমাজই রক্ষণাবেক্ষণ করেছে তাদের জিনিস। ঘেঁটুঠাকুরের ছড়াও এইভাবে বয়ে আসছে, কিশোরদের মুখে মুখে। কেবল ছড়া নয়, অনেক গানও গায় ছেলেবা। ঘেঁটুর জন্ম-কাহিনী, ঘেঁটুর চেহারা, ঘেঁটুর বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে তারা নানাবকম মজাদার গান গায়, সুর করে। এসব গানেরও রচয়িতাদেব কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। অনেকের বাড়িতে পুরনো গানের খাতা আছে। তাই দেখে দেখে ছেলেরা গায়। বুড়োরাও আবার অনেক দলের গান বেঁধে দেয়। সেইসব গান নানান সুরে গেয়ে বেড়ায় এরা। বটতলার ছাপানো গানের বই-ও দুষ্প্রাপ্য নয়। বলাবাহুল্য স্থূল রসিকতায় ভরা সেসব গান।

বনভোজনের সামগ্রী সংগ্রহ

ঘেঁটুঠাকুবের ঐ ছড়াকাটার আসল উদ্দেশ্যটি কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে উদ্ধৃত ছড়াটির শেষ লাইনে : "দাওগো মায়েরা ঘেঁটুর দান।" ঘেঁটুঠাকুরের জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করা। পরবর্তী উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই সমস্ত সংগৃহীত দান নিয়ে কিশোরবাহিনীর বনভোজনের আয়োজন করা। তারা তাই ছড়া কেটে বলে চলে :

চাল থাকতে যে দেয় না চাল।
সে খাবেগো গালাগাল।।

ডাল থাকতে যে দেয় না ডাল।
তার ব্যাটারা ইঁদুরের পাল।।
কলা থাকতে যে দেয় না কলা।।
তাদের বৌ-এর বড্ডো নোলা।
লঙ্কা থাকতে যে দেয় না লঙ্কা।
তাদের বৌরা তে-বঙ্কা।।
ভাঁড় ভরে যে দেবে না তেল।
তার ন্যাড়া মাথায় পড়বে বেল।।
আলু থাকতে যে দেয় না আলু।
তার মাথায় নেইকো ঘিলু।।
নুন থাকতে দেয় না নুন।
কেউ গাইবে না তাদের গুণ।।
যে দেবে গো বাটি বাটি।
তার হবে সাত বেটা-বেটি।।
যে দেবে গো থালা থালা।
তার হবে সোনার বালা।।
যে দেবে গো কাঁসি-কাঁসি।
তার হবে গো মোটা মাসি।।
যে দেবে গো কাপ কাপ।
তাব হবে মোটা বাপ।।
যে দেবে ধামা ধামা।
তার হবে মোটা মামা।।
যে দেবে গো হাত ভরে।
সে বেড়াবে হাতি চড়ে।। ইত্যাদি ইত্যাদি

কিশোরদের বর্ণিত দানমাহাত্ম্য, আর না দান কবার বিপত্তির এই লম্বা ফিরিস্তি আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত দানমাহাত্ম্যকেও হার মানিয়েছে। বাড়ির গিন্নিরা তাই ছড়া শুনে হাসিমুখেই ছেলেদের সঙ্গে আনা ধামা, চুপড়ি, হাঁড়ি, ভাঁড় ভরে চাল, ডাল, তেল, আনাজ ইত্যাদি দেন। এইরকম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নানা রকম ছড়া কাটতে কাটতে ছেলেরা বনভোজনের জন্যে প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী সংগ্রহ করে ঘেঁটুঠাকুরকে উপলক্ষ করে। তারপর একদিন দেখা যায়, কোথাও কারও বাগানে আমগাছের তলায়, কোথাও বা নদী বা পুকুরের ধারে ছেলেরা মহোৎসাহে রান্না-বান্না জুড়ে দিয়েছে। খাওয়া দাওয়ার বেশ পর্ব জমেছে।

বাঘাই-এর বরাত ও চকচান্দা

ছেলেদের এইরকম গান গেয়ে, ছড়া আবৃত্তি করে বনভোজনের উপকরণ সংগ্রহ করা পূর্ববঙ্গের মৈমনসিং প্রভৃতি নানা অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। সেখানে পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে চাষীদের ছেলেরা 'বাঘাই-এর বয়াত' নামে এরকম ছড়া আবৃত্তি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ডাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে। বিহারে ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্র উপলক্ষে ছেলেরা দুহাতে দুটো রঙিন লাঠি বাজাতে বাজাতে 'চক-চান্দা' বলে একরকমের গান গাইতে গাইতে বাড়ি বাড়ি ঘোরে আর বনভোজনের সামগ্রী সংগ্রহ করে।

হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণার উৎসব

ঘেঁটুপুজো উপলক্ষে ছেলেদের এই উৎসব পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলাতেই বেশি প্রচলিত। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন ভোরবেলাতে ঘেঁটুর পুজো নির্দিষ্ট। ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় ছেলেরা ছোট্ট একটি পাল্কি তৈরি করে তার ভেতরে ঘেঁটুর গোবরের মূর্তি আর ঘেঁটুর উপাস্য দেবতা শিবের ছবি কিংবা মূর্তি বসিয়ে, ছড়া-গানের দল বার করে। কেউ কেউ আবার একটি পুঁচকে মেয়েকে ঘেঁটুর কনে সাজিয়ে নিয়েও বেড়ায়।

গ্রামাঞ্চলেই এর রেওয়াজ বেশি থাকলেও হাওড়া শহর কিংবা কলকাতার উপকণ্ঠেও উৎসবটি খুব চোখে পড়ে। কলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়া, যাদবপুর প্রভৃতি এলাকা আর হাওড়ার বাতাইতলা, রামবাজাতলা, সাঁতরাগাছি, কদমতলা, ব্যাঁটরা, শালকিয়া, বেলুড় প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চল ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যেবেলায় ছেলেদের ছড়ায়, গানে মুখর হয়ে ওঠে। সাধারণত আট-দশ বছর থেকে শুরু করে ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেরাই উৎসবটির আসল পাণ্ডা। ওদের চাইতে আরও একটু বড় যারা তারা শিবদুর্গা ইত্যাদি সেজে সঙের মিছিল বার করে। তারা ঘেঁটু রাজার বিয়ে উপলক্ষে 'বাসরঘরে রসের গান' গেয়ে সকলের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। আগে আগে হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বুড়োরাও ঘেঁটুর গানে কম মাততেন না। রথ বা দোলের গানের মত ঘেঁটু সংক্রান্তির সন্ধ্যেবেলাতেও তাঁরা হার্মোনিয়াম, ক্ল্যারিওনেট, মন্দিরা ইত্যাদি বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘেঁটুর গান গেয়ে বেড়াতেন। এখন অবশ্য তাঁদের গানের দল আর বেরোচ্ছে না।

সাধারণত একটু অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই উৎসবটির প্রচলন থাকলেও, উৎসবের জোয়ারের মুখে উঁচু শ্রেণীর লোকেরাও এসে তাতে কম জমে না। ভদ্র মধ্যবিত্তঘরের ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদেরও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। আগে আগে হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে শুধু ফাল্গুন মাসে সংক্রান্তির দিনটিতেই নয়, চৈত্র মাসের প্রায় প্রথম সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলায় এইরকম গানের মিছিল বেরোত। কোনও কোনও জায়গায় বৃষ্টি না পড়া পর্যন্ত এই গান চালিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল। এখন অবশ্য উৎসবটি একটি দিনেই এসে ঠেকেছে।

কানে ঘণ্টা বাঁধা পিশাচ

শাস্ত্রীয় মতে ঘেঁটুঠাকুর হচ্ছেন ঘণ্টাকর্ণ—শিবের গণনামে পরিচিত অনুচরদের তিনি অন্যতম। ঘণ্টেশ অথবা ঘণ্টেশ্বর নামেও তিনি পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে তাঁর কুলজি-বর্ণনায় দেখা যায়, বরাহরূপী বিষ্ণু আর পৃথিবীর মিলনে মঙ্গলগ্রহের আর মঙ্গলগ্রহ ও মেধার মিলনে ঘণ্টেশ্বরের জন্ম হয়েছে। ঘণ্টেশ্বর বা ঘণ্টাকর্ণ তাই বিষ্ণুর নাতি। ঐ পুরাণেরই ব্রহ্মাখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে শিবের অন্ধকাসুর বধের সময় মহাবীর ঘণ্টাকর্ণের বীরত্ব প্রদর্শনের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁর বীরত্বের আরও পরিচয় রয়েছে বামনপুরাণের ৫৭তম অধ্যায়ে।—যেখানে দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দের সেনাপতিত্ব গ্রহণকালে শিব সাহায্যস্বরূপ স্কন্দের হাতে তাঁকে অর্পণ করছেন। এ-ছাড়া স্কন্দপুরাণের আরও নানান জায়গায়, মহাভারতের শল্যপর্ব ইত্যাদিতে মহাবীর ঘণ্টেশ্বরের উল্লেখ রয়েছে। শিবপুরাণে তাঁকে শিবের 'অতিবল্লভ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মহাবীর আর ব্রণ, বিস্ফোটক রোগদাতা—তাঁর এই পরিচয় পুরাণে বহু উল্লিখিত।

হরিবংশের কাহিনীতে দেখা যায় এই শিবভক্তটি নাকি ভয়ানক বিষ্ণুবিদ্বেষী ছিলেন। বিষ্ণুর নাম যাতে কানে না যায়, তিনি তার জন্যে দু-কানে ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন। তাই তাঁর নাম ঘণ্টাকর্ণ। কারও কারও মতে তাঁর কান দুটো ঘণ্টার মত ছিল বলেই ঐ নাম হয়েছে। বিষ্ণুবিদ্বেষের ফলে তিনি পিশাচত্ব প্রাপ্ত হন। শেষে শিবের উপদেশে বদরিকা আশ্রমে বিষ্ণুর উদ্দেশে ঘোরতর তপস্যা করে মুক্তি পান তিনি। এই কাহিনীটিই ছেলেরা ঘেঁটুপুজোর ছড়ায় বর্ণনা করে শোনায়।

রঘুনন্দনের বিধান

'কৃত্যচিন্তামণি' এবং 'গুণিসর্বস্ব' নামে দুটি প্রাচীনতর স্মৃতিগ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে ষোড়শ শতকের স্মৃতিকার রঘুনন্দনও তাঁর 'তিথিতত্ত্বে' ঘণ্টাকর্ণের পুজোর বিধান দিয়েছেন। সেখানে সুহীমূলে অর্থাৎ মনসাগাছের তলায় ঘণ্টাকর্ণের পুজো করতে বলা হয়েছে। তাঁর পুজোর এই মন্ত্রটি সেখানে দেওয়া হয়েছে : ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধিবিনাশন। বিস্ফোটকভয়প্রাপ্তি রক্ষ রক্ষ মহাবল।

গাড়োয়ালে ঘণ্টাকর্ণের পুজো

খালি বাংলাদেশেই নয়, হিমালয়ের গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলেও চর্মরোগ বিনাশক দেবতারূপে ঘণ্টাকর্ণের ঘটে পুজো খুব প্রচলিত আছে। (উইলিয়াম ক্রুকের 'দি পপুলার রিলিজিয়ন এ্যান্ড ফোকলোর অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া'র প্রথম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এ্যাটকিন্‌সন্ তাঁর 'দি হিমালয়ান্ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অফ নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস্'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৮১৬ পৃষ্ঠায় ঘণ্টাকর্ণের সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। ঐ বইটিতে দেখা যায়, গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলে এই দেবতাটির ১১টি মন্দির রয়েছে। এইসব মন্দিরে ঘটেই তাঁর অর্চনা হয়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর লোকরাই তাঁর পুজো করে। ফসল কাটার সময় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও এই গ্রামদেবতার পুজো করতে দেখা যায়। এই অঞ্চলে তাঁকে কোথাও শিবের, কোথাও বা বিষ্ণুর অনুচর হিসেবে গণ্য করা হয়। কেউ কেউ আবার তাঁকে গণেশের রূপান্তর বলেও মনে করে। গাড়োয়ালের অনেক মন্দির-দ্বারে দৌবারিকরূপে ঘণ্টাকর্ণের প্রতিষ্ঠার কথাও এ্যাটকিন্‌সন্ উল্লেখ করেছেন। তিনি এই ঘণ্টাকর্ণ আর নেপালী বৌদ্ধদেবতা 'বীতরাগ অজ্রপাণি'কে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গে লোকসমাজে প্রচলিত ঘণ্টাকর্ণের পুজোর পদ্ধতি রঘুনন্দনের প্রদত্ত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন রকমের। এখানকার পদ্ধতি হচ্ছে : ভোরবেলায়, সূর্যোদয়ের আগে বাড়ির বাইরে খোলা জায়গায়, সাধারণত তেরাস্তার মোড়ে কৃত্যটি করণীয়। একটা ভাঙা কুলোর ওপর ধোঁয়ার কালি-মাখানো মাটির হাঁড়ি উপুড় করে রাখা হয়। তার ওপরে দু-ডেলা গোবর আর ঘেঁচি কড়ি দিয়ে বানানো হয় দুটি চোখ। একখানা নতুন কাপড়ের টুকরো বা গামছা হলুদে ছুপিয়ে তাই দিয়ে ঘেঁটুঠাকুরের বেশ-বাস। বাড়ির বর্ষীয়সী গিন্নী এসে পুজো করেন। পুজোতে ফলমূল, চালের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও খেঁসারির ডাল—যেটি দেবভোগ্য বলে পরিচিত নয়, তারও নৈবেদ্য দেওয়া হয়। কয়েকটি গৃহস্থবাড়ি সম্মিলিতভাবে এই কৃত্যটির আয়োজন করেন। পুজোর আর একটি প্রধান উপকরণ হচ্ছে ভাটকেল বা ঘেঁটুফুল—যার দুর্গন্ধের কথা সুবিদিত। ডান হাতে নয়, বাঁ হাতে ঘেঁটুর পুজো করণীয়। তিনবার ঘেঁটুফুল দিয়ে হাঁড়ির ওপর পুজো করতে না করতেই ছেলেরা এসে লাঠি মেরে হাঁড়িটি ভেঙে ফেলে। কোথাও কোথাও ছেলেরা চোখে কাপড় বেঁধে 'কাণামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলার মত ঘুরতে ঘুরতে এসে লাঠি মেরে হাঁড়ি ভাঙে। কোনও কোনও অঞ্চলে ব্রাহ্মণেও ঘেঁটুর পুজোয় পৌরোহিত্য করেন।

রাতে ছেলেরা যে পাল্কি নিয়ে বেরোয়, তাতে অন্যান্য সজ্জার মধ্যে ঘেঁটুফুল অবশ্য-দেয় উপকরণ। পাল্কির ভেতরে ঘেঁটুর উপাস্যদেবতা শিবের মূর্তি বা ছবির সঙ্গে থাকে ঘেঁটুফুলে ঢাকা গোবরের ঘেঁটু। যারা ঘেঁটুরাজের বৌ বার করে তাদেরও হাতে থাকে থালায় ঘেঁটুফুলের উপায়ন।

পুজোর পর ভাঙা হাঁড়ির টুকরো আর হলদে কানির ফালি সকলে সযত্নে, আগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, ফোড়া ইত্যাদি রোগ নাকি ঐসব জিনিস দেখে পালায়, কাছে ঘেঁষে না। চোখ উঠলে সেই হলদে কানিও ব্যবহার করা হয় ওষুধের মত।

কঙ্কালীতলা

মাথার ওপরে চৈত্রসংক্রান্তির দুপুরের জ্বলন্ত আকাশ, নিচে পায়ের তলায় বীরভূমের জ্বলন্ত পথ। রাঙা মাটি আর শক্ত কাঁকরের ঢেউ খেলানো আদিগন্ত মাঠ। জলহীন, শষ্যহীন। ক্বচিৎ দীর্ঘ তাল বা খেজুর গাছ। নয়তো মাথায় আগুনের মতো রাঙা ফুলের পশরা নিয়ে কৃষ্ণচূড়া দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড বট কিংবা অর্জুনগাছ শূন্য তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে রোদ্দুর আর ছায়ার ছকও কেটে রেখেছে। শূন্য প্রান্তর একা একাই খেলাতে মত্ত—দমকা জ্বলন্ত বাতাসে লাল ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে ধুলোটের উৎসব জমিয়েছে।

এমন প্রচণ্ড দুপুরে কেউ একটা বড় বেরোয় না বাইরে। কিন্তু আজ চৈত্রসংক্রান্তির দিনে তার ব্যতিক্রম। উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো মাঠের ওপর দিয়ে, লাল কাঁকরের খোয়াই-এর পাড় ধরে লোক চলেছে আজ দলে দলে কোপাই নদীর ধারে কঙ্কালীতলার মেলায়।

মেলায় যাওয়া সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। এই খর দুপুরেও তার বিরাম নেই। ঢাক বাজিয়ে পুজোর উপকরণ আর বলির পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছে সবাই কঙ্কালীতলায় পুজো দিতে। দারুণ রোদ্দুরে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ, সারা দেহ তেতে আগুন। জ্বলন্ত মাটিতে একটানা চলাই দায়। তবুও কাছে পিঠের তো বটেই, বেকসুর দশবারো মাইল পথ ভেঙে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ চলেছে কঙ্কালীতলায়। বোলপুর থানার উত্তর-পূর্ব দিকে কোপাই নদীর দক্ষিণ তীরে কঙ্কালীতলা। বোলপুর থানার তো আছেই, এর লাগোয়া সাঁইথিয়া, লাভপুর, নানুর, ইলামবাজার, এমনকি সিউড়ি থানারও বিভিন্ন গ্রামের মানুষ যাচ্ছে কঙ্কালীতলায় পুজো দিতে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ হাঁটছে তো হাঁটছেই। মাথায় ছাতা, নয়তো গামছা চাপানো। গাছের ছায়া যেখানে মিলছে, হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে গিয়ে লোকে একটু বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। ক্বচিৎ একটা-আধটা পুকুরও মিলছে পথিমধ্যে, তালগাছে ঘেরা উঁচু পাড়। জল কিন্তু একেবারে নিচুতে। জলের চাইতে পাঁক আর মাটিই তাতে মেলে। তবুও এই জলে তপ্ত পা দুটো ডুবিয়ে একটু দাঁড়াতে কী আরাম! মুখে চোখে এই জলের ঝাপটা দিতে কী সুখ! বলির পাঁঠাকেও জল খাওয়ায় লোকে। আহা, কেষ্টোর জীব তো বটে! অবশ্য খানিক বাদে কঙ্কালীতলায় হাড়িকাঠে তার ছাগলজীবনের শেষ হবে!

টাল খেতে খেতে যাত্রী বোঝাই ছই তোলা গোরুর গাড়ি, সাইকেল রিক্সা আর শেয়ারে ভাড়া খাটা দু-চার খানা ট্যাক্সিও চলেছে, সারা রাস্তায় লাল ধুলোর মশারি খাটিয়ে। আগে আগে শুকনোর সময়ে বোলপুর থেকে লাভপুর হয়ে গনুটিয়া পর্যন্ত খানকতক বাস চলাচল করত। গত বছর থেকে খারাপ রাস্তার অজুহাতে ঐ বাস চলাচল সেই যে বন্ধ হয়ে গেছে, আবার তা শুরু হবার কোন নামগন্ধ নেই। অতএব এবার বোলপুরের যাত্রীদেব কঙ্কালীতলায় যেতে পাক্কা পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিতে সাইকেল রিক্সাই প্রধান ভরসা হয়েছে। এই মওকায় বোলপুরের সাইকেল রিক্সাওয়ালারাও বেশ মোটা ভাড়া কবুল করিয়ে তবে যাত্রী নিয়েছে। যাদের তা দেবার সামর্থ্য নেই, তারা চরণজুড়িই সম্বল করে এগিয়েছে।

কঙ্কালীতলার মেলা সন্দর্শনার্থী কেউ যদি রেল কোম্পানির মান্ধাতা আমলের 'পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ' কিংবা হাল আমলের বীরভূম জেলার সরকারী হ্যান্ডবুককে গাইড বলে ভেবে ইস্টার্ন রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের কোপাই স্টেশনে নামেন, তবে তাঁরা বড়ই মিস্‌গাইডেড্ হবেন। ঐ বই দুটিতেই, বিশেষত হ্যান্ডবুকখানিতে কঙ্কালীতলার হদিশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ওটি নাকি কোপাই স্টেশনের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। বাস্তবে ওটি নির্ভেজাল ভুল। কোপাই স্টেশন থেকে কঙ্কালীতলা অন্তত চার মাইল দূরে। তার ওপরে পথিমধ্যে কোপাই নদী পেরোতে হয়। কোপাই

স্টেশনে সাইকেল-রিক্সা তো দূরের কথা, মেলার সময়েও গোরুর গাড়ি পর্যন্ত মেলে না। এর চাইতে বোলপুর স্টেশনে নামা অনেক সুবিধের। অন্তত খর দুপুরে পায়ে হাঁটার হাত থেকে বাঁচার জন্যে বোলপুর থেকে সাইকেল রিক্সা ইত্যাদি সহজে জোগাড় করা যায়, যদিও এখান থেকে কঙ্কালীতলার দূরত্ব কমপক্ষে মাইল পাঁচেক।

রুক্ষ শূন্য প্রান্তরের প্রান্তে ঘন সন্নিবিষ্ট বট, অশথ, অর্জুন, নিম, বাঁশ-বনের একটা জমাট সবুজ টুকরো দূর দিগন্ত থেকে কঙ্কালীতলার ইশারা। দূরাগত ঢাকের শব্দ, জনকোলাহল জানান দেয়, সেই ছায়ান্তরালে কঙ্কালীতলার চৈত্রসংক্রান্তির মেলা জমে উঠেছে। তাকে লক্ষ্য করেই যাত্রীরা এগোয়।

বোলপুর থানাকে দু-আধখানা করে চিরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যে লুপ লাইন চলে গেছে, তার ডান পাশেই পড়ে কঙ্কালীতলা কোপাই নদীর দক্ষিণ তীরে। বীরভূম জেলার পশ্চিম থেকে পূর্বমুখে আসতে আসতে কোপাই এই লুপ লাইনের কাছ থেকেই উত্তরবাহিনী হয়ে বক্রেশ্বর নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই কোপাই-এর পাড়েই বীরভূমের অন্যতম প্রসিদ্ধ শাক্ত পীঠভূমি কঙ্কালীতলা। লোকে বলে শিবস্কন্ধ-বিচ্যুত সতীর কঙ্কাল নাকি এখানে পড়েছিল। সেই থেকে লোকমুখে এর নাম হয়েছে কঙ্কালীতলা। কাছেই মহাশ্মশান। পূজারী, সেবক ইত্যাদির কয়েকঘর ছাড়া এ-তল্লাটে বিশেষ জন- বসতি নেই। মাঝে মাঝে শ্মশানযাত্রী আর শনি-মঙ্গলবারে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর আগমনে এই নির্জন নীরব তীর্থভূমির একটু ঘুম ভাঙে। সে আর কতক্ষণই বা। যাত্রীদের প্রস্থানে আবার গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে যায় কঙ্কালীতলা।

বছরে একবার জাগরণ

শুধু বছরে একবার এই চৈত্রসংক্রান্তির মেলা উপলক্ষে কঙ্কালীতলা গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। দূরদূরান্তর থেকে যাত্রীরা তখন আনে পুজো। ঢাক বাজে। কঙ্কালীতলার যে কুণ্ডের জলের ভেতরে সতীর কঙ্কাল ডোবানো আছে বলে লোকের বিশ্বাস, তার চারপাশ ঘিরে শত শত পাঁঠা ভেড়া বলি পড়ে। রক্তে মাটি ভিজে যায়। দলে দলে লোক এসে কুণ্ডের ভেতরে পুজোর উপচার ঢেলে দেয়। অনেক দোকানপাট বসে। নাগরদোলা ঘোরে। আর বাগদি, বাউরি, কাহার ভক্তরা বোতল বোতল কারণ-বারি উজাড় করে ঢাকের তালে তালে বলির পাঁঠা নিয়ে নাচতে নাচতে আসে।

আকণ্ঠ কারণ-বারি পান করা চোখ-রাঙা সাঁইথিয়ার এক বাউরি মোড়ল বেশ ভক্তিগদগদ ভাবে আমাকে যা বুঝিয়ে দিলে তার মর্মার্থ হচ্ছে : এই একটা দিন মা কঙ্কালী জেগে ওঠেন, ভক্তের সারা বছরের মানসিকের পুজোর হিসেব-নিকেশ নিতে। কঙ্কালীতলার মাটি যা তা নয় সাক্ষাৎ মা। এই মাটিতে যেখানে এক ফোঁটা রক্ত পড়ে তা মায়ের জিভেই পড়ে। মায়ের সারা বছরেব তৃষ্ণা মিটলে তবেই গাঁয়ের মঙ্গল। তবেই গাঁয়ের ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দ সবাই ভাল থাকবে। আলাই- বালাই পালাবে। হাজায়-শুকোয়, নদীর বানে-ঢলে মাঠের ফসল নষ্ট হবে না। গাই-বাছুর বাঁচবে। ঘরে সুখ-সোয়াস্তি থাকবে। বছরে মায়ের এই একদিনের জাগরণে ছেলেদের মায়ের কাছে আসতে হবেই বৈকি!

বাউরি মোড়লের এই অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পেছনে তাদের বহু প্রাচীন জাদুভিত্তিক ধ্যান- ধারণার স্পষ্ট তাৎপর্য বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু শুধু তারাই তো নয়, সমাজের উঁচু জাতের মানুষেরাও তো আসছে দলে দলে এই পীঠস্থানে। তার কারণ, আমাদের বহু পুরনো সামাজিক গঠন-বিন্যাসে আদিম ধারা যে আজও বয়ে চলেছে প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে। রূপান্তর অবশ্য তার অনেক হয়েছে—আধ্যাত্মিক পরিমার্জনায়, উচ্চকোটির মননশীলতায়, দার্শনিকতায়। তাই ভয়েই হোক, ভক্তিতেই হোক, মা-কঙ্কালীর নামে কপালে হাত ঠেকায় না, বীরভূমের গাঁ-ঘরে বোধ হয়

এমন কেউ নেই। শুনেছি, কিছু কিছু মুসলমানও কঙ্কালীতলার পুজোয় পাঁঠা এনে ছেড়ে দিয়ে যায়। কারণ, গাঁয়ে ওলাওঠা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী বাধলে আঁচ তাদেরও গায়ে কম লাগে না। ফসলহানিতে তাদেরও ক্ষতি হয়। অতএব সকলের সমাগমে বছরে এই একদিন কঙ্কালীতলা জেগে ওঠে। পুজোর পর্বটা প্রধানত চৈত্রসংক্রান্তিতেই সম্পন্ন হলেও পরদিনও তার কিছু রেশ চলে। মেলাটাও দিনদুয়েক বেশ জোর থাকে, তারপর সব ফাঁকা হয়ে যায়। কঙ্কালীতলা আবার গাছের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে।

সতীর কঙ্কাল ডোবানো ডোবা

এবার পীঠস্থানটির কথা বলি। আগেই বলেছি, লোকের বিশ্বাস এখানে সতীর কঙ্কাল পড়েছিল। একটি ডোবার ভেতরে সেটি নাকি লুকানো আছে। কেউই তা দেখতে পায় না। অবশ্য কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। এমন সব ভাগ্যবানদের মুখে শোনা থেকে কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছে, দেবীর সেই কঙ্কালটি নাকি প্রস্তরীভূত। মূলাধার, স্বাধিকার, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ মেরুদণ্ডের সর্বনিম্নভাগ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত এই পঞ্চযোগচক্রসমন্বিত সতীকঙ্কাল কঙ্কালীতলার ঐ যোগকুণ্ডে ডোবানো আছে। বহুদিন আগে একবার ঐ ডোবার জল শুকিয়ে গেলে সেই প্রস্তর-পঞ্জরের সাক্ষাৎ নাকি কেউ কেউ পেয়েছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার জলরাশিতে ডোবাটি পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেটি লোকলোচন থেকে অদৃশ্য হয়েছে। এর দক্ষিণ পাড়ে পাথরে বাঁধানো দুটি বেদীর ওপরে যাত্রীরা প্রাথমিক পুজো দেয়। শোলার চাঁদমালার সঙ্গে কাগজের নৌকা, পাল্কি, ছেলেদের খেলনার শোলার ফুলঝাড় ইত্যাদি সেই বেদীর ওপরে ঝোলানো। মানসিকের জিনিস এসব। নৌকাডুবি, পাল্কি-বিভ্রাট, শিশুর ফাঁড়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ায় ঐসব জিনিস দিয়ে দেবীর কাছে মানসিক পুজোর চিহ্ন এসব। এই বেদীর সামনেই পুরোহিতরা বসে দেবীর উদ্দেশে দক্ষিণা কালিকার মন্ত্রে ফুল, ফল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি সমস্ত উপচার নিবেদন করছেন; তারপর ভক্তরা সেইসব জিনিসের কিছু কিছু অংশ কুণ্ডে ফেলছেন। কয়েক হাজার ভক্তের নিবেদিত চিনি, বাতাসা ইত্যাদিতে কুণ্ডের জলের স্বাদও নাকি মিষ্টি হয়ে যায়। এক ভক্ত বুড়ি আমাকে সবিস্তারে শোনালেন, আগে আগে লোকের যখন অবস্থা খুব ভাল ছিল, তখন নাকি এত চিনি বাতাসা ঐ জলে পড়ত যে, তার জল আর চিনির পানার আস্বাদের মধ্যে কোনও প্রভেদই পাওয়া যেত না।

দেবীর কোনও মন্দির নেই। তবে কুণ্ডের দক্ষিণ ধারে জগদীশবাবা নামে এক সাধু সম্প্রতি একটি মন্দির তৈরি করাচ্ছেন। মন্দিরটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ওখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দুটি ভৈরব

পীঠস্থান যেখানেই শক্তির, সেখানেই ভৈরবও থাকবেন। এখানেও ভৈরব আছেন। তবে একটি নন, দুটি। একটির নাম রুরু, আর একটির নাম কাঞ্চীশ্বর। কাঞ্চীশ্বরেরই সেবা-পুজোয় বেশ পারিপাট্য আছে বলে মনে হল। মন্দিরটিও তাঁর বেশ বড় এবং প্রশস্ত। মন্দিরের ভেতরে প্রায় চার ফুট ব্যাসের, দেড় ফুট গভীর একটি কুণ্ড। তার ভেতরে গাঁথা ইঞ্চিদশেক উঁচু, দেড় ফুট ব্যাসের শিবলিঙ্গ। কালো কষ্টিপাথরে তৈরী। খাঁজকাটা, পলতোলা, কিন্তু শীর্ষভাগ একবারে চ্যাপ্টা। মনে হয় কোনও ভগ্ন পাথরের থাম কিংবা ভগ্ন শিবলিঙ্গের নিম্নভাগ এটি। ইনি নাকি স্বয়ম্ভু এবং অনাদিলিঙ্গ। রুরু ভৈরবের মন্দিরটি কিন্তু খুব ছোট্টো। ইনিও কাঞ্চীশ্বরের মত কালো পাথরের ভগ্নাংশ তবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

কঙ্কালীতলার কিছু দূরে তালতোড় নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সেখানকার ঘোষবাবুরা বাংলা ১৩৪১ সালে 'ধরণীধর কঙ্কালী ট্রাস্ট' নামে একটি সম্পত্তি গড়েছেন। সেই ট্রাস্ট থেকে প্রতিদিন দেবীর পুজো, অন্নভোগ ইত্যাদির ব্যবস্থা চলছে; শনি মঙ্গলবার দেবীর ভোগে মাছও দেওয়া হয়। ঐ ট্রাস্ট থেকেই দেবীর সেবার জন্যে জনাদুয়েক পুরুত, লোকজন, গোরু ইত্যাদি রাখা হয়েছে। ঐ ঘোষবাবুরাই কাঞ্চীশ্বর, রুরু ভৈরবের পুরনো মন্দিরের সংস্কার করেছেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাত্রে তাঁরা প্রায় হাজার দুয়েক ভক্তকে দেবীর প্রসাদে তৃপ্ত করেন।

ভারতবর্ষের শাক্তপীঠসমূহের পরিচয়বাহী বলে প্রসিদ্ধ 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠনির্ণয়ে' বলা হয়েছে : ''কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরু নামকঃ। দেবতা দেবগর্ভাখ্যা।।'' অর্থাৎ কাঞ্চীদেশে সতীর কঙ্কাল পড়েছে; সেখানকার ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ভা। 'শিবচরিত'-এর মতে পীঠদেবীর নাম বেদগর্ভা। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আছে :

কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
দেবগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম।।

কাঞ্চী বলতে সাধারণত দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ কাঞ্চীপুরম্ বা কাঞ্জীভরম্ কিংবা কাঞ্জীবরম্‌কেই বোঝায়। শাস্ত্রে যে সপ্তমহাতীর্থ মোক্ষপ্রদ বলে অভিহিত, কাঞ্চী তাদের মধ্যে অন্যতম। ''অযোধ্যা মথুরা গয়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।।'' (স্কন্দপুরাণ)। মধ্যযুগের শেষভাগে রচিত 'বৃহন্নীলতন্ত্রে' কাঞ্চীতে কনককাঞ্চী দেবী বিরাজিত বলে উল্লেখ আছে : ''কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাং অবন্ত্যাম্ অতিপাবনী।'' (পঞ্চম পটল)। রুদ্রযামল, তোড়লতন্ত্র প্রভৃতিতেও কাঞ্চীদেশের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া মহাভারতের ভীষ্মপর্বের নবম অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ৭০ ও ৭৪ সংখ্যক অধ্যায়েও প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি কাঞ্চীর কথা রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চীপুরম্ শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামে দুটি ভাগে বিভক্ত। শিবকাঞ্চীতে আছেন একাম্রনাথ শিব আর কামাক্ষী দেবী। সেখানে দেবী বেদগর্ভাও নেই, রুরু ভৈরবও নেই।

বাংলাদেশে কিন্তু বীরভূম জেলার কোপাই নদীর তীরবর্তী কঙ্কালীতলাকেই ভারতের ৫১ পীঠের অন্যতম ঐ কাঞ্চীভূমি বলে মনে করা হয়। পীঠনির্ণয়ে বা মহাপীঠনির্ণয়ের উল্লিখিত রুরু ভৈরবেরও অস্তিত্ব এখানে রয়েছে। যদিও বেদগর্ভা বা দেবগর্ভা দেবী এই নাম কেউ বলে না। কঙ্কালী মা নামেই তিনি পরিচিত।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনির্ণয়ের রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগ কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ। (দি শাক্ত পীঠস্—জার্নাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল)। অন্নদামঙ্গলের রচনাকালও অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশক বলে অনুমিত। বাংলাদেশের অনেক গ্রাম্য দেব-দেবী অর্বাচীনকালে রচিত বিভিন্ন শাক্তপীঠতালিকার মধ্যে যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর উল্লিখিত রচনায় তা বেশ ভালভাবে দেখিয়েছেন। পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনির্ণয় কিংবা অন্নদামঙ্গলও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের রচনা। অতএব কঙ্কালীতলার গ্রাম্য দেব-দেবীরা ঐভাবে শাক্তপীঠতালিকার অন্তর্ভুক্ত যে হননি, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। বাংলাদেশের অনেক তন্ত্রসাধনার প্রাচীন পীঠভূমি দূর অতীতের এইরকম আদিম ধর্মসাধনাক্ষেত্রেই উদ্ভূত হয়েছে। আদিম কৌম অনেক ধর্মকৃত্যের সঙ্গে জড়িত দৈবতকুল বা 'থান' কালক্রমে আধুনিক অর্থে শিবশক্তিতে কিংবা তাঁদের পীঠভূমিতে যে পরিণত হয়েছেন, আমাদের দেশের বহু প্রাচীন লোকায়ত ধর্মচর্যার ইতিকথায় বিশেষজ্ঞরা তা অনুমান করেছেন। তন্ত্রসাধনার দেশ বিচিত্র ভূখণ্ড বীরভূমের তারাপীঠ, নলহাটি, লাভপুর প্রভৃতির মত কঙ্কালীতলাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে ভারতের একান্ন পীঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মৃৎশিল্পীদের বিচিত্র শিল্প-মনীষা : সরস্বতী

একদা সরস্বতী নদীর উভয় তীরে আর্যভারতের শুভ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বেদগানে ধ্বনিততীর শুভ্রজলতরঙ্গিণী এই নদী কালক্রমে বীণাবাদিনী দেবী সরস্বতীরূপে আবির্ভূতা হলেন পৌরাণিক ভারতেব মানস-নয়নে। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে মনের জড়তা নাশ করেন তিনি,—তিনি দেন জ্ঞান-বিদ্যার আলোক-আশীর্বাদ, তাই তিনি শুক্লরূপা। শুধু তাই নন, তিনি পৌরাণিক ভারতের চতুঃষষ্ঠী কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি বাক্, বাণী, মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতি। ব্রহ্মা তাঁর বেদ-বহন করেন, বিষ্ণু তাঁকে বক্ষে ধারণ করেন, শিব তাঁর চরণে প্রণতি জানান। সরস্বতী নদী। মানস সরোবরজাত বলে পুরাণাদিতে অভিহিত। মানস সরোবরের সঙ্গে শ্বেত হংস আর পদ্মদামের বিজড়িত থাকাব কাব্যপ্রসিদ্ধি রয়েছে, তাই দেবী সরস্বতীও শ্বেতকমলাসনা এবং মরালবাহিনীরূপে ভক্তের পূজা গ্রহণে রত হলেন। পৌবাণিক ভারতের ধ্যানকল্পনার এই দেবী বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও প্রবেশ করেছেন এবং সেখানেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানবিধাত্রীরূপে পূজিতা হয়েছেন।

দেবী সরস্বতীর রূপপরিকল্পনার উদ্ভব ও বিকাশ এবং বসন্তপঞ্চমী অথবা শ্রীপঞ্চমীতে তাঁর অর্চনার প্রচলন সম্বন্ধে সুধীসমাজ যথেষ্ট আলোচনা করেছেন এবং আজও করছেন। বাংলাতেও এই দেবী অতি লোকপ্রিয়া। তাঁব পূজার আদর এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। তবে মূর্তি গড়ে সরস্বতী পূজার ধুম এখন যতটা, ৬০।৭০ বৎসর আগে কিন্তু ততটা ছিল না। বই, পুঁথি, মাটির দোয়াত, শরের কলম প্রভৃতি সারস্বত প্রতিনিধিকে সামনে রেখে আমের মুকুল, শাদা ফুল আর আবির দিয়ে পূজা করার রেওয়াজটাই তখন বেশি ছিল। টোলের অধ্যাপক এবং পাঠশালার পণ্ডিত মশাইরাই প্রতিমা গড়িয়ে পূজা করতেন। কালক্রমে প্রতিমায় সরস্বতী পূজার বহুল প্রচলন হয়েছে এবং এখন প্রায় প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনে, ছাত্রাবাসে, গ্রন্থাগারে, সম্মেলনে, সভা ও সমিতি গৃহে এবং গৃহস্থদের বাড়িতেও প্রতিমা এনে পূজা প্রচলিত হয়েছে। এক কলকাতা শহরেই এখন আনুমানিক ৫০।৬০ হাজারেরও বেশি সরস্বতী প্রতিমার পূজা হয়। সরস্বতী পূজা এখন বাংলার শিশু ও কিশোর মহলের বার্ষিক উৎসব এবং যুবজনের সাম্বৎসরিক প্রমোদে পরিণত। বাংলার এই লোকপ্রিয়া দেবীর মূর্তি গঠনে যে বৈশিষ্ট্য এবং দ্রুত সাময়িক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাংলায় অন্যান্য দেবদেবীর মত সরস্বতীরও প্রতিমা নির্মাণে একটা সাবেকি ঢং ছিল—যে ঢং আজ অন্তর্হিত-প্রায় বললেই চলে। প্রতিমাশিল্পীদেব কাছে প্রতিমা-নির্মাণের ঐ সাবেকি রীতি বাংলা রীতি বলেই পরিচিত। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, বাঙলার কলাকুশল মৃৎশিল্পী প্রতিমা নির্মাণে যে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা ভারতের অন্যত্র শিল্পীর রচনায় পাওয়া যায় না। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশও প্রাচীনকালে পাষাণ ও মৃত্তিকাতে প্রতিমা-নির্মাণে যথেষ্ট নৈপুণ্য লাভ করেছিল, তাব প্রমাণ রয়েছে পাহাড়পুরে, পোখরণায়, বাণগড়ে। পালযুগে ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল নামে প্রখ্যাতনামা শিল্পীদ্বয় বাংলা ও মগধের মূর্তিকলায় অভিনব 'গৌড়ীয় রীতির' প্রবর্তন করছিলেন—ইতিহাসে ঐ কথারও উল্লেখ পাই। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি শিল্পীর রূপবিদ্যায় নিপুণতা যে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তা প্রাচীন 'গৌড়ীয় রীতি' ও 'বাংলা রীতি' এই দুটি অভিধা থেকেই সুস্পষ্ট। ভারতের প্রতিমা নির্মাণের মধ্যে যে ভাবুকতা, ধ্যানভাব ও বসদৃষ্টির সুপরিণত বিকাশ ঘটেছিল, বাংলার রূপকলাও সেই মৌলিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। বাঙালি শিল্পীও মূর্তিকে অতিক্রম করে অমূর্তকে, দেহকে পার হয়ে আত্মাকে, বহিরঙ্গকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্তরঙ্গকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রতিমাতে তদনুযায়ী রূপকল্পের

প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু তবুও যে শৈলীধারা সর্বভারতে প্রবাহিত বাংলায় তা দেখা দিয়েছে বিশেষ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়ে। বিশেষত মৃত্তিকা-শিল্পে বাঙালি অনন্যসাধারণ, একথা অত্যুক্তি নয়। বাংলা রীতিতে তৈরী সরস্বতী প্রতিমার মুখে সেই বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। এই রূপকল্পে রচিত মুখের আকৃতিতে কৌণিক প্রকাশ খুব সমুজ্জ্বল। মুখের গড়ন উর্ধ্বদিকে মুকুটের সঙ্গে ত্রিভুজাকারে আয়ত। চিবুক সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণাগ্র। নাসিকা শুকচঞ্চুর ঈষৎ বক্রভাবে এবং অগ্রভাগে সুক্ষ্মরূপে প্রকাশিত। বরবটির বীজের মত গঠিত নাসারন্ধ্রের দুই পাশের স্ফীতাংশে মুখের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। নাকের অব্যবহিত তলায় অতি ক্ষীণ অথচ সুদৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ ঈষৎ বক্র অধরোষ্ঠ---এতে হাসির ক্ষীণ আভাস রয়েছে, অথচ উচ্ছলতা নেই। বাংলা রীতিতে চোখের গড়নে অসামান্য রুচি আর রসের ব্যঞ্জনা। বাঁশপাতার মত দুপাশে দীর্ঘায়ত এবং বঙ্কিমভাবে সংস্থাপিত আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, শেষভাগ তার ক্রমশ ক্ষীণাকার হয়ে মিলিয়ে গেছে। চোখের প্রান্তভাগে মণিস্থাপনায় নাসাগ্রসম্বদ্ধ যোগদৃষ্টির আভাস। এই চোখ, ভ্রূ, নাক, চিবুক---সবারই অগ্রভাগে তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়ঋজু গড়নে এবং ঠোঁটের চাপা হাসিতে সারা মুখে অসামান্য শাণিত-দীপ্তি আর রহস্যময় শক্তি ও ভাবরূপের সৃষ্টি করে। এ মুখ যে পুতুলের নয়—এ মুখ যে মানবীর নয়, এ যে ধ্যানলোকের ভাবময়ী দেবীর তা মুখের অসাধারণ রচনানৈপুণ্যে প্রকাশিত। একদা বাংলায় অন্য দেবদেবীর মূর্তির মত সরস্বতীরও মূর্তি এই পদ্ধতিতেই রচিত হয়েছে। 'বাংলা' পদ্ধতিতে গড়া প্রতিমার মাথায় পাঁচকল্কা বিরাট মুকুট, কানে ঘাড়বেণী, মকরমুখ, কানবালা আর 'চৌদান', হাতে বালা, চুড়ি, রতনচূড়, বাজু, ঝাঁপা, বুকে চন্দ্রহার, দুপাশে শাড়ির আঁচল আর পায়ে গুজরীপঞ্চম আর পাঁয়জোড় প্রভৃতি খুব আড়ম্বরপূর্ণ আভরণ পরানো হয়, যাতে অপ্রাকৃত ও অসামান্য দৈব বৈভবের ব্যঞ্জনা আসে। পদ্মের উপরে দাঁড়ানো, হাতে বীণা ধরা, মাটি, শোলা কিংবা ডাকের জাঁকজমকপূর্ণ অলঙ্কার পরা এই সরস্বতী প্রতিমায় যে সংযত রূপলাবণ্য ও সুদৃঢ় শক্তিমত্তার পরিচয়, তাতে যেন ভারতের ধ্রুপদ সঙ্গীতের বীর্যবিভূতিময় সংযত রসলাবণ্যই প্রকাশিত।

ধ্রুপদের কঠোর-ঋজু ভাব খেয়াল এবং ঠুংরীর লালিত্যে ও উচ্ছ্বাসে যেমন ভেঙে পড়ে, ঠিক তেমনই বাংলার মৃৎশিল্পীদের হাতে 'বাংলা পদ্ধতি' কালক্রমে 'দোভাসী' এবং 'মানষেরা' পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। 'দোভাসী' কথাটির অর্থ দুরকমের আভাস---অর্থাৎ এ ধরনের প্রতিমায় বাংলা পদ্ধতির কিছু ভাব রইল, আবার আর একটু অন্য আভাসও রইল। 'বাংলা' মুখে যে কৌণিক তীক্ষ্ণতা এবং ঋজু-কঠোর ভাব ছিল 'দোভাসী'তে তা খানিকটা অন্তর্হিত। 'দোভাসী'তে প্রতিমার দুই গণ্ডে-চিবুকে ঈষৎ মাংসলভাবের প্রকাশ হয়েছে, ফলে মুখের মধ্যে ঈষৎ গোলাকার ভাবে পেলব লাবণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে নাকের বঙ্কিম এবং তীক্ষ্ণাগ্র ভাবও ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। চোখও আর তত বিস্তৃত নয় এবং অধরোষ্ঠে স্মিতহাস্যের দীপ্তিতে সমস্ত মুখখানি লাবণ্যের প্রবাহে রুচির ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। 'দোভাসী'র পরে আসে 'মানষেরা পদ্ধতি'। 'দোভাসী'র মধ্যে 'বাংলা'র যতটুকু তীক্ষ্ণতা ও কঠোরতা ছিল, 'মানষেরা'র মুখ থেকে তা একেবারেই অন্তর্হিত হল। 'মানষেরা'তে মুখ হয়েছে প্রায় গোলাকার ও মাংসল, চোখের টান আর তীক্ষ্ণ নয়, মানুষেরই মত তা পক্ষ্মযুক্ত হয়েছে এবং চোখের মণি সমস্ত ক্ষেত্রে চোখের কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপিত নয়, চোখের উর্ধ্ব কিংবা নিম্নরেখার সঙ্গে বিশেষ করে যুক্ত থাকে, ফলে দৃষ্টি হয়েছে কোমল এবং সংবেদনশীল। ভ্রূর লোম দেখাবার চেষ্টায় দেবীর ভ্রূ প্রায় মানুষের ভ্রূর রূপ ধারণ করেছে। নাক বেশ সরল হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু চ্যাপ্টা ভাবও ধারণ করেছে। অধর এবং ওষ্ঠ 'বাংলা' বা 'দোভাসী'র মত ক্ষীণ এবং দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। ওষ্ঠের তুলনায় অধর কিছু বেশি স্থূলভাব ধারণ করেছে। উভয় গণ্ড ও চিবুকের মাংসলভাবে এবং বিস্তৃত অধর-ওষ্ঠের উচ্ছল হাস্যধারায় 'মানষেরা'র মুখ মানুষেরই মত কোমল, স্নিগ্ধ ও পেলব হয়ে পড়েছে। এই 'মানষেরা' পদ্ধতিতে গড়া সরস্বতী

প্রতিমা প্রায়ই পদ্ম অথবা বেদীর উপরে সমাসীনা এবং তাঁর একটি চরণ পদ্মের উপর ন্যস্ত। পরনে চিত্র-বিচিত্র বাসন্তী শাড়ি। বুকে গোলাপী ওড়না, তারই অবগুণ্ঠন মাথায় তোলা। দুপাশে কালো চুলের রাশ। কণ্ঠাভরণের বাহুল্য নেই এবং মাথায় যে মুকুট দেওয়া হয়, তার ঠাট 'বাংলার' প্রতিমার মুকুটের মত আড়ম্বরপূর্ণ ও উঁচু নয়। দেবীর এক হস্তে বীণা ও অপর হস্তে পুস্তক। দেবীর হাস্যবঞ্জিত মুখ থাকে কখনও কখনও একপাশে বাঁকানো। পায়ের তলায় তাঁর রাজহংস। সরস্বতীর এই ধরনের প্রতিমা শিল্পীদের কাছে 'ছবিয়ানা' নামে পরিচিত। রবি বর্মার ধরনে আঁকা 'চোরবাগান আর্ট স্টুডিও' থেকে লিথোয় ছাপা জ্বলজ্বলে রঙের এই সরস্বতীর ছবির একসময়ে বহুল প্রচার ছিল। সেই ছবির অনুকরণে শিল্পীরা এই মূর্তি তৈরি করতেন বলে, এই মূর্তি 'ছবিয়ানা' নামে এদের কাছে পরিচিত। আজকাল এই 'ছবিয়ানা' মূর্তির সংখ্যাও বেশ হ্রাস পাচ্ছে, প্রতিমার নবরূপকল্পের আবির্ভাবে।

এই নবরূপকল্প দেখা দেয় সর্বপ্রথম কলকাতায় প্রকাশ্যভাবে ১৯২৭ সালে—গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য রীতির অনুধ্যানে ও অনুশীলনে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের একদল ছাত্র এক সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করেন। যদিও এই সরস্বতী প্রতিমায় ভারতীয় ভাস্কর্য ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ ততটা ঘটেনি, এবং 'মানষেরা' রীতিরই অনেকাংশ রয়ে গিয়েছিল সেদিন, তবুও নতুন পথে যাত্রার জন্য বাঙালি শিল্পীর শিল্পমনীষা যে সেদিন অধীর হয়ে উঠেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নবরূপকল্প 'প্রাচ্যরীতি' নামে প্রখ্যাত হল। শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত, শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ তদানীন্তন উদীয়মান ছাত্র শিল্পীরা প্রাচ্যরীতিতে প্রতিমা নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর পর কয়েক বৎসর গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রাচ্যরীতির অনুসরণে মূর্তি তৈরি হতে লাগল। ১৯২৮ সালে তদানীন্তন অন্যতম উদীয়মান শিল্পী শ্রীনিতাইচরণ পালও শ্রীনন্দলাল বসুর একখানি চিত্রের অনুসরণে নিবেদিতা স্কুলে প্রতিমা গড়েন। ১৯৩১ সালে শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য কলা সমিতির উদ্যোগে প্রাচ্যরীতিতে প্রতিমা নির্মিত হয়। বাংলার শিল্পরসজ্ঞদের কাছে এই নতুন মূর্তিকলা যে সেদিন নতুন আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিল, তার প্রমাণ দেখি, হিন্দু হোস্টেল, বিদ্যাসাগর কলেজ, ক্যানিং হোস্টেল প্রভৃতিতে এই রীতির প্রতিমা নির্মাণে। ১৯৩১ সালে শ্রীনিতাই পাল এই ধরনের প্রায় তিন-চার শ মূর্তি গড়ে এক বাণীমূর্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনীতে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান অতিথির আসন পরিগ্রহ করেন। পরলোকগত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিশিষ্ট সুধী ও বিশেষজ্ঞগণ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন এবং এই শিল্পরসজ্ঞদের প্রেরণায় কলকাতায় প্রাচ্যরীতির অনুসরণে সরস্বতী প্রতিমা নির্মাণ ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেল। কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে মৃৎশিল্পীরা নতুনভাবে মূর্তি গঠনে মনোযোগী হলেন।

ভুবনেশ্বর, কোণারক, খাজুরাহ, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি শিল্পতীর্থক্ষেত্রে এবং দক্ষিণ দেশেও ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যকলার যে অনবদ্য সাধনার পরিচয় রয়েছে তারই অনুসরণে প্রতিমা নির্মাণের এই নবরূপকল্পের অভ্যুদয় সেদিন ঘটেছিল। এই সমস্ত প্রতিমাতে প্রাচীন ভারতের ধ্যানময় লাবণ্যরুচির এবং মনোরম আভরণময় ও মণ্ডনের রীতির অনুসরণ চলল। কিন্তু শীঘ্রই অক্ষম ও অজ্ঞ শিল্পীদের হাতে এই রীতির যে বেদনাদায়ক পরিণতি হয়েছে, তা অনিবার্য। যেখানে শিল্পীর সহজাত প্রতিভা আছে এবং রসজ্ঞতাও আছে সেখানে নতুন শৈলী সার্থক হয়েই দেখা দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেখানে শুধু প্রাণহীন অনুকরণ ছাড়া শিল্পীর হাতে আর কোনও শক্তির পুঁজি নেই, সেখানে এই নতুন শৈলী যে কী নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিয়েছে, তা আজকের এই 'তথাকথিত' প্রাচ্যরীতিতে গঠিত সরস্বতী এবং অন্যান্য মূর্তিতেও ভয়াবহভাবে প্রকট। প্রাচ্যরীতির নামে মূর্তিশিল্পে যে বিভ্রান্তিকর এবং কুরুচিপূর্ণ ধারা আজ পুরোদমে চলেছে, তাকে শিল্পের ব্যভিচার বললে অত্যুক্তি

হয় না। এই কুরুচির ক্ষতিকর পরিণাম সম্বন্ধে আজ দেশবাসীর অবিলম্বে অবহিত হবার দিন এসেছে। প্রাচ্যরীতির প্রকৃত ধারা যে ধ্যানমগ্ন, গভীর, সংযত ও সুসমঞ্জসরূপে সার্থক, তার প্রকাশ অতি অল্প কয়েকজন মাত্র শিল্পীর হাতেই যে হয়েছে একথা প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞমাত্রেই উপলব্ধি করেন। খানিকটা প্রাচীন ধরনের অলঙ্কার সজ্জা অথবা নগ্ন এবং ক্ষীণ কলেবরমাত্র রচনাতেই 'প্রাচ্যরীতির' প্রকাশ ঘটে বলে যাঁরা মনে করেন, সেই সমস্ত অজ্ঞ শিল্পী ও হুজুগপ্রিয় কুরুচিপূর্ণ লোকের হাতে শিল্পলক্ষ্মীর প্রতিদিন অমর্যাদা ঘটছে। নতুন শৈলীতে নতুন সৃষ্টিতে অগ্রসর হবার স্বাধীনতা শিল্পীর সব সময়েই আছে—এই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। জাতির শিল্পের ধারাকে সঞ্জীবিত ও বেগময় রাখতে হলে নতুন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণেরই ত প্রয়োজন। কিন্তু যে প্রতিমা সম্পূর্ণরূপে ভাবময়, ভিত্তি যার সম্পূর্ণরূপে ধ্যানাবেগ ও আধ্যাত্মিক রসের উপর সংস্থাপিত, সেখানে অশোক স্তম্ভের উপর সরস্বতী স্থাপন করে কিংবা রিয়ালিস্টিক এফেক্টের নামে ক্রোটন, নিয়ন আলো, ঘূর্ণায়মান জ্যোতিশ্চক্র, প্রতিমার মুখে লাল নীল আলোক প্রক্ষেপণ প্রভৃতি অদ্ভুত বস্তু ও রীতির আমদানী করলে, সে আর যা কিছু হোক, ধ্যানের প্রতিমা গড়া হয় না। তাই নৌকার মধ্যে সরস্বতী, বিরাট রাক্ষুসে পদ্মের উপর নানা ভঙ্গিতে বসা সরস্বতী, অশোক স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো সরস্বতী যত অভিনব হোক না কেন, তা পুতুলের পর্যায়ে গিয়েই দাঁড়ায়—প্রাণময়ী হয়ে সে মূর্তি হৃদয়কে ধ্যানের রসে স্নিগ্ধ করে না। যে রূপ দেখতে দেখতে হৃদয়ে অরূপের ব্যঞ্জনা জাগে না, যে রূপ মনকে প্রশান্ত ব্যাপ্তিতে টেনে নিয়ে যায় না, যেখানে রং আর আলো, নানা কায়দা আর মণ্ডনের সমারোহে সংযত সৌন্দর্য সৃষ্টি অন্তর্হিত, তা ভারতের প্রতিমাতত্ত্বে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

পরিশেষে আর এক নবপ্রবর্তিত মূর্তিগঠনধারার উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করব। মাটির ও কাঠের তৈরি পুতুল এবং পট প্রভৃতি বাংলার লোকায়ত শিল্পপদ্ধতির অনুসরণে যে মুষ্টিমেয় শিল্পী প্রতিমা নির্মাণের নতুন শৈলী আবিষ্কার করেছেন এবং ধ্যানময়ী প্রতিমা নির্মাণে সার্থকভাবে যাঁরা সেই শৈলীর প্রয়োগে রত, তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান্ শিল্পী শ্রীসুনীল পালের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এঁর প্রেরণায় রচিত আরও কয়েকজন তরুণ শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি রসিকসমাজকে যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে।

লক্ষ্মীসরা

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্তিরে পূর্ব বাংলার ঘরে-ঘরে পোড়ামাটির সরাতে লক্ষ্মীর মূর্তি এঁকে পুজো করা এক অতি পরিচিত লোকোৎসব। এই লোকোৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীসরা চিত্রণে পূর্ব বাংলার শিল্পীরা আশ্চর্য সুন্দর এক লোকশিল্পের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে বিচিত্র বর্ণজালে আর রেখার বন্ধনে টেনে এনে মাটির সরার ওপরে তাঁকে বেঁধে রাখার অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করেছেন পুরুষানুক্রমে। সে কৌশলে জটিলতা নেই, তার উপকরণে দুর্লভতাও নেই। নিজেদেরই হাতে মাটিতে তৈরি আর পোড়ানো সরার পিঠে, ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি করা তুলিতে অতি সাধারণ কটা রঙ নিয়ে তাঁরা লক্ষ্মীকে বাঁধার বিচিত্র বন্ধন-ডোর আবিষ্কার করেছেন কোন্ সুদূর কালে, কে তা জানে! পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত ধারায় সেই প্রয়োগ-কৌশল পরিবারে-পরিবারে বয়ে এসে শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে যেন একীভূত হয়ে গেছে—এখন তার প্রয়োগে আর কঠিন আয়াসের কোনও দরকার হয় না।

এই লোকশিল্পীরা সাধারণত রুদ্রপাল বলে নিজেদের পরিচয় দেন। হাঁড়ি, কলসী, জালা, সরা, সান্‌কি প্রভৃতি গেরস্থর নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা তাঁদের কাজ। এঁদের মধ্যে অনেকে পুজোর প্রতিমা ও শিশুর খেলার পুতুল তৈরিতেও সিদ্ধহস্ত। আর কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীসরা তৈরিতে তো এঁদের বিশেষ নৈপুণ্য। এক-একটি শিল্পী দু'-দশখানা নয়—আঁকেন হাজার হাজার সরা। বাড়ির মেয়েরাই নিজেদের হাতে মাটি ছেনে, মাখনের মত নিখিঁচ মোলয়েম করে তা দিয়ে ময়দার রুটি লুচির মত বড় বড় নেচি তৈরি করেন। সেই নেচি ওজনে দেড় সের দু-সের থেকে একপো পর্যন্ত ওজনের হয়। মেয়েরাই কাঠের 'পিটনি' দিয়ে পিটিয়ে নেচিগুলোকে সরার আকার দেন। তারপর রোদে শুকিয়ে পোনে পুড়িয়ে সরাগুলোকে ছবি আঁকার উপযুক্ত করা হয়। এই হাজার হাজার সরা গড়ার কাজ মাঘ-ফাল্গুন মাস থেকে শুরু হয়ে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত চলে। তারপব সরার ওপবে পুরুষদেব আঁকাব কাজ শুরু হয়।

অধিকাংশ পরিবারে সম্মিলিতভাবেই আঁকার কাজ চলে। কেউ সরার মুড়িগুলো এঁকে দেন, কেউ দেব দেবীর গায়ের হলদে নীল রঙ মাখান, কেউবা তাতে লাল রঙের কাপড় ও অন্যান্য রঙের আভরণ পরান। সবার শেষে মেয়ে-পুরুষে মিলে প্রথমে সরাগুলোর ওপরে তেঁতুলবিচির আঠা মাখিয়ে তার ওপরে একটা পালিশ মাখিয়ে সরাখানাকে ঝক্‌ঝকে করে তোলেন। বিরজা, ধুনো, তার্পিন তেল এবং আরও দু'একটা জিনিস দিয়ে এই ঝক্‌ঝকে পালিশ তৈরি হয়। এই ঝক্‌ঝকে পালিশ দেবার আগে তেঁতুলবিচির আঠা না মাখালে ঐ পালিশে সমস্ত রঙ কালো হয়ে যায়। রঙও গোলেন এঁরা জলের সঙ্গে তেঁতুলবিচি, বেল কিংবা গঁদের আঠা দিয়ে। সাধারণত তেঁতুলবিচিই এঁদের বহুলব্যবহৃত উপকরণ।

লক্ষ্মীই লক্ষ্মীসরার মূল উপজীব্য বিষয়। তবুও অন্যান্য দেব-দেবীদেরও লক্ষ্মীর সঙ্গে সরায় টেনে আনতে শিল্পীরা দ্বিধা করেন না। গোলাকার সরাখানাকে প্যানেলে প্যানেলে ভাগ করে এই সব দেবদেবীদের ঠাঁই করে দেওয়া হয়। লক্ষ্মী-সরস্বতী, গণেশ-কার্তিকের সঙ্গে সিংহবাহিনী দশভুজাই অধিকাংশ সরায় থাকেন। রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ কিংবা রাম-সীতাও সদলবলে কখনও কখনও প্যানেলে প্যানেলে ঠাঁই পান। কিন্তু সমস্ত সরার নিচেকার প্যানেলটির সর্বস্বত্ব লক্ষ্মীরই জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। তিনি সেখানে দুহাতে ধানের ছড়া নিয়ে, চুল এলিয়ে বসে থাকবেন। পাশে থাকবে গোলচোখো পেঁচা আর তুলির ক্ষিপ্র টানে আঁকা আর্শি, চিরুনি, সিঁদুর কৌটো, শাঁখ-কড়ি। কখনও কখনও দুপাশে সখী কিংবা ভক্তও থাকে।

শাক্ত, বৈষ্ণবদের রুচির চাহিদা মেটাতেই ঐ দুর্গাসরা, কৃষ্ণসরার উদ্ভব হয়েছে। পারিবারিক রীতি অনুসারে পুরুষানুক্রমে গৃহস্থরা নিজেদের নির্দিষ্ট সরা কিনে পুজো করেন। কিন্তু শুধু দেব-দেবীর নির্বাচনেই নয়, দেব-দেবীর এবং লক্ষ্মীর কেমন রূপে পুজো হবে তা-ও পরিবারে পরিবারে নির্দিষ্ট আছে এবং কোনও বছরই তার পরিবর্তন ঘটে না। কোনও পরিবারে একচোখো দুর্গা ও একচোখো লক্ষ্মী অর্থাৎ প্রোফাইল-ফেসের মূর্তি পুজোর বিধান। সেই পরিবার চিরদিন একচোখো সরাই কিনবে। কোথাও বা দুটি চোখওলা অর্থাৎ পূর্ণ মুখের মূর্তির পুজো করার বিধান। তারা দুচোখো সরাই কিনবে। শিল্পীরাও সেইভাবে একচোখো-দুচোখো সরা আঁকেন এবং ঐ নামেই তাঁরা সরাগুলোকে অভিহিত করেন। একই জাতির ভেতরে আদিম বিভিন্ন কৌম-সমাজের বিভিন্ন ধর্মচর্যার রীতির রেশটুকুই এইসব ব্যাপারে রয়েছে।

ভারতের ক্ল্যাসিক্যাল গানে যেমন বিভিন্ন অঞ্চল আর বিভিন্ন প্রতিভাবান শিল্পীকে সূত্র করে বিভিন্ন ঘরানার, শিল্পরূপায়ণের বিভিন্ন রীতি, বিভিন্ন মেজাজ, বিভিন্ন সৃষ্টিপ্রকরণের উদ্ভব হয়েছে, লক্ষ্মীসরাতেও ঠিক সেই রকম বিভিন্ন ঘরানার অস্তিত্বের সন্ধান মেলে।

পূর্ব বাংলার লক্ষ্মীসরায় মূলত চারটি ঘরানার সন্ধান আমি পেয়েছি। (১) সাধারণ ফরিদপুরী, (২) সুরেশ্বরী, (৩) আচার্যী বা গণকী এবং (৪) ঢাকাই।

পূর্ব বাংলার মধ্যে ফরিদপুরেই সবচাইতে লক্ষ্মীসরার বেশি প্রচলন। তাই এখানে বহু শিল্পীর বসবাসে এক বিশিষ্ট পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। হয়তো গানের জগতের মত এ জগতেও খুব প্রাচীনকালে প্রতিভাধর কোনও নিপুণ চিত্রশিল্পীর উদ্ভব হয়েছিল এবং কালক্রমে তাঁর প্রতিভার আলোতে অনুরঞ্জিত হয়ে তাঁর ঘরানার পত্তন ও তার বিস্তৃতি ঘটেছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা এখন সর্বজনের মধ্যে প্রসারিত— তাই তার মৃত্যু ঘটল না—সর্বজনের মিলিত চেতনাতে সে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রইল। লোকশিল্প সমষ্টিগত চেতনায় চিরদিন বিধৃত—তাই সে সকলের বোধ্য, সকলের উপভোগ্য। ওপরতলার বৈঠকখানার কৃত্রিমতা তাতে নেই।

ফরিদপুরী সরার মধ্যে সাধারণত যেগুলি বড় সরা, সেগুলোকে বাঁদিক থেকে ডানদিক পর্যন্ত তুলির মোটা টানে প্যানেলে প্যানেলে ভাগ করে নেওয়া হয়। তারপর সরার ওপরের প্যানেলে দুর্গা কিংবা রাধাকৃষ্ণ কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি আঁকা হয়। মাঝের প্যানেলে বিচিত্রভঙ্গি গোপাঙ্গনাদের নিয়ে কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের এবং সরার নিচেকার প্যানেলে লক্ষ্মীর চিত্র। ফরিদপুরী সরায় এই প্যানেল ভাগ কখনই ওপর থেকে নিচে অর্থাৎ ভার্টিক্যালে হয় না---সর্বদা হরাইজেন্টালেই চলে। সাধারণত লাল, সবুজ, নীল, হলদে আর খয়েরী রঙে মূর্তিগুলো আঁকা হয়। অকম্পিত কুচ্‌কুচে কালো রেখায় আঁকা দেহের সীমাবন্ধন---ইস্পাতের তারের মত সুদৃঢ়, সবল। শিল্পীর অকুতোভয় হাতের ইচ্ছানুসারে চালিত এই ইস্পাতের তার এঁকে বেঁকে সমস্ত রঙের গড়নকে অদ্ভুত ছন্দোময় রূপ দেয়। ফরিদপুরী সরাতে লাল রঙ গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে হয়। ছবির কালো কালির রেখা সে লাল রঙে ঢাকা পড়ে না। এ লাল রঙকে এঁরা বলেন খুনি রঙ---রক্তের মতই টক্‌টকে লাল আর জীবন্ত যেন সে রঙ। এই খুনী রঙের মণ্ডনই এই সরার বৈশিষ্ট্য। এই সরার আর একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরাতে তুলির এক টানে আঁকা লতামণ্ডনই হোক আর সরার চারপাশের বর্ণবেষ্টনীই হোক, কিংবা মূর্তির গঠনে, বেশবিন্যাসেই হোক, কোথাও আতিশয্য নেই---সর্বত্র কঠিন সংযমের বন্ধনে সমগ্র ছবিকে বেঁধে রেখেছে। অথচ কী অদ্ভুত প্রাণময় রূপের গড়ন! কী দুর্বার শক্তিগর্ভ তারা!

সুরেশ্বরী সরা

ফরিদপুর জেলার সুরেশ্বর গ্রামের শিল্পীদের থেকে এ ঘরানার উদ্ভব। এখানে গোলাকার সরাটিকে ভার্টিক্যাল প্যানেলে ভাগ করে নেওয়া হয়। সবুজ, হলদে, কালো, নীলের পোঁচে এবং খুনী লালের

মণ্ডনে এক একটি প্যানেল কাটা। আবার একঘেয়েমি যাতে না আসে, ভার্টিক্যালের সঙ্গে হরাইজেন্টালে এবং বৃত্তাকারেও মণ্ডনের মিশ্রণ আছে। এই সরার সবার ওপরের প্যানেলে থাকেন ষাঁড়ের পিঠে শিব; অন্য অন্য প্যানেলে দুর্গা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা। এই প্যানেলের তলায় আবার হরাইজেন্টাল প্যানেলে লক্ষ্মী--সরার অধিষ্ঠাত্রী মূল দেবী। যে সমস্ত রঙ এই সরাতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি দিয়ে সবার ওপরের দিকে এক বিচিত্র গোলাকার মণ্ডন রচনা করা হয়। এই মণ্ডন কিন্তু সবার শেষে রচিত নয়। সবাতে যে রঙটির পর যে রঙটি ব্যবহার করা হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে এই মণ্ডনেও তাদের ব্যবহার করা হয়। এ যেন রঙের নোট রাখা। বাংলার প্রাচীন তাসেও রঙের এই ধরনের মণ্ডনের রেওয়াজ ছিল। এই সুরেশ্বরী সরায় সমস্ত মূর্তির ও মণ্ডনের বেশ জমজমাট ভাবই একটা বিশিষ্ট স্টাইল। অথচ এই জমাট বিন্যাসের কোনও মূর্তি অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে না এমনই আশ্চর্য এর চিত্রণ নৈপুণ্য। দুঃখের বিষয় এই সুরেশ্বরী সরার প্রচলনও খুব কমে আসছে—মুখ্যত নিপুণ শিল্পীর অভাবের জন্যে, দ্বিতীয়ত এর নির্মাণে যে বহু সময় আর শ্রম ব্যয়িত হয়, আর্থিক দুরবস্থার দিনে তার দাম ওঠে না বলে।

আচার্যী বা গণকী সরা

আচার্য ব্রাহ্মণ বা গণক ব্রাহ্মণের দ্বারা এ-সরাতে সাধারণত ব্যাক-গ্রাউন্ড হয় লাল রঙের এবং তার ওপরে সমস্ত দেব-দেবীরই কাপড় হয় সাধারণত কালো রঙের। এই কালো রঙের ওপর সাদা খড়িমাটির নানা অলংকরণই এই সরার বৈশিষ্ট্য। শুধু দেব-দেবীর আবরণ আর আভরণ নয়—সবার ওপরে, নানা লতামণ্ডন ও সোজা সূক্ষ্ম রেখাসমষ্টি সাদা খড়িমাটিতে আঁকা হয়। এটিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সরাতে দুর্গার হাতে অস্ত্র-শস্ত্রও দেওয়া হয় এবং ঠোঁটে, হাতে লাল রঙের প্রয়োগ আছে।

ঢাকাই সরা

ঢাকাই সরার একটি একক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে--এক চারপাশের কানা উঁচু করে গোলাকার গড়া হয়। এই সরার পিঠের ওপরে ছবি আঁকা হয়, তা উঁচুতেও আর সকলকে হার মানায়—ঠিক কচ্ছপের খোলার মত সে উঁচু। এই সরার চিত্রণে আদিম শিল্পরূপের বেশ আভাস আছে। মূর্তির দেহের গড়নে, অলংকারে একটা অবাস্তব ছন্দ। দেহকাণ্ডের ওপরে বসানো মাথাটিই অন্যান্য অঙ্গের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু এই আকারের অসামঞ্জস্য দাঁড়ানো ও বসার অপরূপ ভঙ্গিতে এবং অন্যান্য মূর্তির সঙ্গে ছন্দোময় বিন্যাসে মিলিয়ে সমস্ত ছবি এক আদিম রহস্যপূর্ণ রূপ-প্রকল্পের পরিচয় বহন করে। ঢাকাই সরায় লক্ষ্মী ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে থাকেন, বণিকের মূর্তিময় সম্পদ যেন। ব্যবসায়ে বাণিজ্যে শ্রীময় প্রাচীন ঢাকার আঞ্চলিক প্রভাবে এই ময়ূরপঙ্খী নায়ে চড়া লক্ষ্মীর সৃষ্টি।

কলকাতার কুমারটুলি সরা

পশ্চিমবঙ্গের কুমারটুলির শিল্পীরাও এখানকার পূর্ববঙ্গীয়দের পুজোর জন্যে লক্ষ্মীসরা অনেকদিন থেকেই আঁকছেন। সাধারণ ব্যবহার্য সরা কিম্বা মাটির তৈরি চ্যাপ্টা ধরনের রাঁধবার আংটাওয়ালা কড়ার পেছনে নীল রঙের পটভূমিকায় লক্ষ্মী আঁকা হয়। কৃষ্ণনগর এবং কুমারটুলির শিল্পীরা যে স্টাইলে দুর্গাঠাকুরের চলচিত্র আঁকেন—এও সেই স্টাইলে আঁকা। প্রাচীন পটশিল্পের সুদূরাগত সৌন্দর্যের রেশ এখনও এ ছবি থেকে একেবারে মুছে যায়নি। শ্রীময় কোমল মুখাবয়ব ও সুডৌল

গড়ন এ ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের ফিরিঙ্গি-বঙ্গ কলকাতার বাবুকালচারের প্রতিমাতে বিন্যস্ত ঘাগরাপরা পরী এই সরাতে লক্ষ্মীর সখীরূপে এখনও আছে।

বলরাম পালের কিষাণ-কিষাণী সরা

ফরিদপুরের লক্ষ্মীসরা-শিল্পী বলরাম পালের (বলাই পাল নামেও খ্যাত) শিল্পকর্মকৃতির যশ এখন অনেকখানি বিস্তৃত। এই সিদ্ধহস্ত গ্রামীণ শিল্পী সাবেকি আঁকার অপরূপ ঢং, মেজাজ আর শিল্পচেতনা নিয়ে লক্ষ্মীসরাতে শুধু দেব-দেবীর ছবি নয়—সেখানে কিষাণ-কিষাণীর কর্মময় জীবনের আলেখ্য তৈরিতেও নেমেছেন। নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুরনো লোকশিল্পের পদ্ধতি প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি ব্যাপৃত। তাঁর এই সাধনা এদেশে বেশ আদর পেয়েছে— শিল্পরসিক মহলে। শুধু এদেশে নয়, তাঁর আশ্চর্য শিল্পকর্ম বিদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের কাছেও পাঠিয়েছেন তাঁর গুণগ্রাহীরা। বলরাম পালের এ-সাধনা একদিন লক্ষ্মীসরার আর একটা নতুন ঘরানার সৃষ্টি করবে -এ তাঁর গুণগ্রাহীরা কামনা করেন।

কিন্তু এ বিষয়ে একটা বড় রকমের বিপদও দেখা দিয়েছে। বলরাম পাল এবং আরও সব নিপুণ শিল্পী অতি দরিদ্র, নিঃস্ব, উদ্বাস্তু। দেশ ছেড়ে এসে এখানে মানুষের অযোগ্য বাসভূমিতে একহাঁটু পাঁকে কাদায়, ভাঙা বস্তিতে কলকাতার বুকে, উপকণ্ঠে শিল্পীরা বাস করছেন। পাইকাররা তাঁদের অভাবের সুযোগ নিয়ে লক্ষ্মীসরা আঁকান। তাঁদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তা তাঁদের প্রাপ্যের পরিমাণ থেকে অনেক নিচে। তবুও পেটের দায়ে এঁরা পাইকারের কাজ করে দেন। পাইকার তা ভালোদামে বিক্রী করে বেশ দু-পয়সা রোজগার করেন। তার ওপরে শিল্পদৃষ্টিহীন ব্যবসায়সর্বস্ব পাইকার বাজারে নতুন নতুন চাকচিক্যময় জিনিসের কাটতি বেশি হবে এই আশায় শিল্পীদের হুকুম দিচ্ছে—লক্ষ্মীসরার ছবিকে সস্তা ক্যালেন্ডারের অনুকরণে, আধুনিক প্রতিমার ঢঙে আঁকতে। 'ইংলিশলতা', (এ উদ্ভট কথা আমি নিজে এক পাইকারের মুখে শুনেছি) সাবেকি মণ্ডনের বদলে সিনসিনারি আঁকতে তারা হুকুম দিচ্ছে। সুতরাং লক্ষ্মী-সরা থেকে শিল্পের মহৎ ঐশ্বর্য তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে। পেটের দায়ে শিল্পীকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই উদ্ভট হুকুম তামিল করতে হচ্ছে--এ আমি একাধিক শিল্পীর মুখে শুনেছি। এই শিল্পীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে এঁরা স্বাবলম্বী হতে পারেন, নিজেদের ব্যবসায় ও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু হায়, দেশ বিভাগের বলি হয়ে অনেক অমূল্য প্রাণ আজ কত নষ্ট হচ্ছে, কে তার ধার ধারে। শেয়ালদা স্টেশনে এসে ঠাঁই নেওয়া, মাত্র চারদিন আগে ছেলেমরা ফরিদপুরের উদ্বাস্তু বলাই পাল 'সুরেশ্বরী সরা' আঁকতে আঁকতে যদি দুর্ভাগ্যের নিঃশ্বাস ফেলে তবে তাতে কলকাতার কার কী এসে গেল!

প্রতিমামণ্ডনে শোলার সাজ

গঙ্গা, দামোদর, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, যমুনা—আরও কত নদ-নদীর মালাজড়ানো সাগরসম্ভবা আমাদের মৃত্তিকাময়ী বাংলা। কত নদ-নদীর স্নেহসঞ্চিত পললমৃত্তিকায় এর অঙ্গ গঠিত! উত্তর ভারতের কঙ্করের কাঠিন্য নেই, ননীর মত নরম এ মাটিতে। এ মাটিকে হাতে তুলে নিয়ে, লোফালুফি করে—যেমন ইচ্ছে তেমন গড়ন দিয়ে এতে রূপ সৃষ্টি করা যায়। তাই বাংলার রূপদক্ষ শিল্পীর হাতে বাংলার মাটি কত না বিচিত্র রূপ ধরে কলা-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিসম্পাতে ধন্য! আজও তাই পোড়ামাটির ইঁটে তৈরি বাংলার বিচিত্র ধরনের মন্দির-মসজিদের গায়ে ফুল-পল্লবের সুচারু কর্ম এবং জীবজন্তু, নর-নারী, দেব-দেবীর লীলায়িত রূপায়ণের চিহ্ন রয়েছে।

বাংলার প্রতিমা নির্মাণ-শিল্পও এই মাটিকে মাধ্যম করেই এক সুচারু বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের ক্ল্যাসিক্যাল রূপকর্মের অনুকরণ বা অনুসরণের নিশানা এইসব মাটির মূর্তিতে মিলবে না। কিন্তু বাংলার শিল্পীমনের নিজস্ব ধ্যানধারণা স্বাধীন চিন্তা আর প্রয়াসের বিচিত্র পথে রূপায়িত হয়ে উঠেছে এই সমস্ত মূর্তিতে, অনেক দিন ধরেই।

বাঙালি মৃৎশিল্পী দুর্গা, অসুর, সিংহ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক—সকলকে নিয়ে একই 'চালচিত্রে'র তলায় যে মূর্তি রচনার পরিকল্পনা করেছে, তাতে তার চিন্তার অনুপম বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য সৃষ্টির সার্থক প্রয়াস এবং শিল্পরসিক চিত্তের ভাব-বৈভবের সুন্দর স্বাক্ষর দেখতে পাই। গৃহসম্বদ্ধ, স্নেহসরস বাঙালি শিল্পীর ধ্যানে স্বর্গের দেবতা একটা পরিতৃপ্ত গৃহনীড়ের আবেগবন্ধনে পুত্র-কন্যা সমন্বিত হয়ে দেখা দিয়েছেন। অগ্নিবর্ণা, অসুররুধিররঞ্জিতা, ভীষণদর্শনা, দশপ্রহরণধারিণী অসুরদলনী দশভুজা বাঙালি শিল্পীর হাতে করুণাময়ী জননীরূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর মুখে প্রচণ্ড কোপের সঙ্গে আছে করুণহাসির ব্যঞ্জনা। এই হাসিটুকুর পিছনে বাঙালি শিল্পীর কি গভীর ভাবুকতা আর মধুর রস প্রেরণার ইঙ্গিত রয়েছে! মহিষাসুর যত অত্যাচারী, অনাচারীই হোক না কেন—বলদর্পে দর্পিত হয়ে বিপথচারী সন্তান জননীকে যত অস্বীকার করুক না কেন, সে যে জগদ্ধাত্রী জগন্মাতারই পুত্র এবং জননীকে অন্য সন্তানদের এই অত্যাচারী সন্তানের হাত থেকে রক্ষার জন্যই যে স্বহস্তে পুত্রবধ করতে হচ্ছে, তারই বেদনা—তারই গ্লানি আর দুঃখটুকু যেন জননীর ক্রোধ আরক্তিম মুখের অধরপল্লবে করুণহাসিতে ব্যঞ্জিত। একসঙ্গে এই রুদ্রমধুর কঠোরকোমল ভাবকল্পনা বাঙালির হাতে গড়া মূর্তিতে ছাড়া আর কোথাও ধরা পড়েছে কিনা জানি না।

প্রতিমাসজ্জার পরিকল্পনাও কুশলী বাঙালি শিল্পীর হাতে অভিরাম রুচি বিমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়ে এসেছে। মাটির সাজ, ডাকের সাজ, আর শোলার সাজ সাধারণত এই তিন রকম সাজেই বাঙালি শিল্পীরা এতদিন প্রতিমা সাজিয়ে এসেছে। ডাকের সাজের এক সময় খুবই প্রাবল্য ছিল—জরি, রাংতা, চুমকি দিয়ে তৈরি উজ্জ্বল আর আড়ম্বরপূর্ণ সাজে বাঙালির চণ্ডীমণ্ডপ আলো করে থাকত তার ধ্যানের প্রতিমা! এই সাজ তৈরিতে শিল্পীর কুশলী হাতের পরিচয় থাকলেও, এই সাজের সাজ-সরঞ্জাম—জরি, রাংতা প্রভৃতি উপকরণ আসত সাগরপারের ইউরোপীয় দেশ থেকে। তাই আর সমস্ত বিদেশী জিনিস বর্জনের সঙ্গে একদিন এই সমস্ত উপকরণ বর্জনেরও পালা যখন আসে, তখন ডাকের সাজের প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমে আসে—তার ওপর যুদ্ধকালে এই সমস্ত জিনিসের অগ্নিমূল্য হওয়ায়, এই সাজের চলনও ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে গেছে।

কিন্তু সৌন্দর্যপিপাসু বাঙালি শিল্পীর প্রতিভা এই বিদেশী জিনিসের অপেক্ষায় বসে থাকেনি। স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যসাধনার শক্তিবলে বাঙালি শিল্পী কলা-লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করে তাঁর পদ্মচরণসম্পাতে চিরদিনই অসামান্য করে তুলে ধরেছে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত সহস্র সামান্য বস্তু।

তাই ডাকের সাজের উপকরণ যখন দুষ্প্রাপ্য—বাঙালি শিল্পী সামান্য শোলা দিয়ে দেবী-প্রতিমার নয়নাভিরাম আবরণ ও আভরণ রচনার চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টা নতুন বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মরসবৈদগ্ধ আর মৌলিক চিন্তাধারার সঙ্গে কারুকুশলতায় সার্থক হয়ে উঠেছে।

দেবী-প্রতিমার মাথার মুকুট থেকে আরম্ভ করে চরণপ্রান্তের নূপুর পর্যন্ত সমস্ত আভরণ এবং কল্কাদার আঁচল আর শাড়ি—এই সর্বাঙ্গীণ সজ্জা শিল্পী সামান্য শোলা দিয়ে তৈরি করে। সমগ্র 'চালচিত্র'টিও দেবীর সাজ-পোশাকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুঠাম কারুকলায় মণ্ডিত করা হয়।

এই মণ্ডনশিল্পে অসীম ধৈর্য আর শক্তির পরিচয়। অথচ শিল্পীরা কত ক্ষিপ্রতা আর সুচারুতার সঙ্গে এই অভিরাম কারুকর্ম করে চলেছে, তা দেখলে অবাক হতে হয়।

লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী সাধারণত এই চার রঙের কাগজ বা কাপড়ের উপর শোলার বিচিত্র কারুকার্য দিয়ে দেবীর শাড়ি তৈরি হয়। এই শাড়িতে নানা ধরনের নক্সা দেওয়া হয়। শাড়ির জমি আর পাড়ে সূক্ষ্ম ফুল-লতা-পাতার বিচিত্র কারুকার্য থাকে। নরুন, কাঁচি, ছুরি এই কটি যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পীরা অমরলোকের দিব্য আভরণ তৈরি করে।

প্রতিমার বুকের উপরে শাড়ির যে অংশটি থাকে, তাকে সাজ-শিল্পীরা নাম দিয়েছে 'ত্রিগুণ'। বাঙালি মেয়েদের কাপড় পরবার ধরন থেকেই এই পরিকল্পনা নেওয়া। প্রথমে এক প্যাঁচ কাপড় ঘুরিয়ে বুকের ওপর এক প্যাঁচ জড়ান হয়। তাই বক্ষ-লগ্ন শাড়ির এই অংশের নাম 'ত্রিগুণ'। এই ত্রিগুণেরও পাড় আর জমিতে সূক্ষ্ম কাজ থাকে। শাড়ির ওপরে বিন্যস্ত থাকে নয়নাভিরাম 'মালা' আর কণ্ঠ বেষ্টন করে থাকে 'চিক'। দুই কানে 'বেণীমকর', 'দুল' আর 'চৌদান'। এই মকরাকৃতি 'বেণীমকর' অলঙ্কারে যে আড়ম্বরপূর্ণ সজ্জারূপটি থাকে, তাতেই প্রতিমার মুখমণ্ডলে দিব্য ঐশ্বর্যের দীপ্তি যেন এনে দেয়। এই 'বেণীমকরে' কত যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় থাকে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। হাতে 'বাজু', 'বিছু', 'শাঁখা', 'চুড়ি', 'রতনচূড়', 'আংটি', 'ঝুমকো' প্রভৃতি অলঙ্কার। মাথায় বিরাট মুকুট!—এই মুকুটই বাংলার দুর্গাপ্রতিমার এক বিরাট বিশিষ্ট আভরণ। প্রতিমার কপাল বেষ্টন করে, প্রধান কর্ণাভরণ 'বেণীমকরে'র পাশ দিয়ে উঁচুতে উঠে গেছে বিশাল 'মুকুট'। এই মুকুট দুই ভাগে বিভক্ত। নিচেকার অংশটিকে বলা হয় 'মুকুট', উপরের 'কল্কাকে' বলা হয় 'কিরীট'। 'মুকুট' আর 'কিরীটের' উচ্চতা, প্রসার আর সূক্ষ্ম কারুকলায় মণ্ডিত বিচিত্র ঠাটই দৃষ্টিকে মুখ্যত আকর্ষণ করে। এই দিব্য শিরোভূষণ যুধ্যমানা দেবীর ভাবগম্ভীর মুখ যেন বীর্যবিভূতির সঙ্গে দিব্য লাবণ্যদ্যুতিতে ভরিয়ে তোলে।

শাড়ির দু'পাশ দিয়ে—'বেণীমকরে'র নিচে থেকে প্রতিমার একেবারে নিচে নেমে এসেছে 'কল্কাদার আঁচল'। এই আঁচলের কল্কার কী আশ্চর্য বাহার! বাংলার মন্দিরে, চিত্রে, শাড়িতে, কাঁথায় আলপনায়, অলঙ্কারে—সব জায়গাতেই কত বৈচিত্র্যপূর্ণ 'কল্কার' প্রাচুর্য। বারাণসী শাড়ি কিংবা কাশ্মীরের শাল-দোশালার চাইতে এই কল্কার সূক্ষ্মশিল্পকার্যের সৌন্দর্য কিছু কম নয়। সামান্য শোলা দিয়ে এই শুভ্র সুন্দর সজ্জারচনায় যে সূক্ষ্ম পারিপাট্য দেখা যায়, তা সত্যি মনকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে তোলে। শিল্পীর রসজ্ঞান যে কত সুন্দর ও সুপরিণত, তা দেখা যায় সমস্ত বসন ও আবরণের মধ্যে যে একটা সুপ্রসারিত শুভ্রতা রয়েছে, তাকে প্রীতিকর করে তোলার জন্যে স্থানে স্থানে লাল, নীল, সবুজ বাংতার বিন্দু-আকারের আভাসরচনার দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসে। এই বিন্দু রচনার নাম দিয়েছে এরা 'রংখোঁচ'। এই ছোট ছোট বিভিন্ন আর বিচিত্র বর্ণের প্রক্ষেপে সমগ্র সজ্জায় শুভ্রশুচিময় রূপটি যেন আরও শতগুণে বেড়েছে।

প্রতিমা সজ্জার পরে আসে 'চালচিত্র'। দুর্গা প্রতিমার এই 'চালচিত্রে' বাঙালি শিল্পীর গভীর ভাবুকতা, চিত্ররচনানৈপুণ্য আর সুউচ্চ পরিকল্পনার পরিচয়। অর্ধচন্দ্রাকার 'চালচিত্র'টিতে তারকাবিমণ্ডিত অসীম নীলাকাশের রূপব্যঞ্জনা। নানা দেবতার সমাবেশ হয়েছে সর্বদেব-তেজসম্ভূতা

মহাশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করতে। অর্ধচন্দ্রাকার এই 'চালচিত্রে' মহাগগনের আভাস—এই রূপকল্পনা কী আশ্চর্য ভাবুকতার পরিচয় বহন করছে!

মণ্ডনশিল্পী এই 'চালচিত্র'কে চতুর্দিক থেকে সাজায় শোলারই তৈরি নানা 'কল্কা'য়, 'পটি'তে আর পুষ্পপল্লবের সমারোহে। চালের প্রথমেই থাকে 'পানপটি'—পানের মত পাতার সঙ্গে লতার তরঙ্গভঙ্গ। এই 'পানপটি'র পরে থাকে 'লতাকোলঠিক্রে',—আর এক রকম লতার মনোজ্ঞ বক্রছন্দ। তার পাশেই থাকে 'কোলঠিক্রে'—এতেও এক সুচারু লতাছন্দের ব্যঞ্জনা। তারপর দেওয়া হয় 'আধগোলা'—অর্ধচন্দ্রাকৃতি অলঙ্কার। 'আধগোলা'র পাশেই থাকে 'কল্কা'—এই 'কল্কা'ই চালচিত্রের শেষ সীমান্তিক ভূষণ। কল্কার মাথার উপরে সারি সারি পাখি—কল্কার মাঝখানে প্রস্ফুটিত পদ্ম—তার উপরে ভ্রমর। এই রম্য শিল্পকার্যে মণ্ডিত বিরাট 'চালচিত্র'টি দর্শকের চিত্তকে ভাবগম্ভীর ভক্তিরসে ভরিয়ে তোলে।

এই শোলার অলঙ্কারে কত রকম লতার বাহার—কত ফুলের প্রাচুর্য। বাংলার আলপনায়-বাংলার কাঁথায়—বাংলার মন্দিরে, মসজিদে- বাংলার কলসে, হাঁড়িতে, সরার গায়ে—সর্বত্রই এই সমস্ত লতা-ফুল-পাতার অলঙ্করণ। প্রতিমা সজ্জাতেও তাই এই লতা-পাতার ছড়াছড়ি। 'পদ্মলতা', 'কলমীলতা', 'শুষণীলতা', 'চন্দ্রলতা', 'শঙ্খলতা'—মণ্ডনশিল্পের আরও কত বহুপরিচিত ও অপরিচিত ডিজাইনের লতাপল্লবের মনোরম ভঙ্গিতে বাংলার শিল্পীরা এই শোলার সাজ তৈরি করেছে।

'আজ বাংলার চতুর্দিকে নানা দুর্যোগ-দুর্ভাগ্যের ঘোর অন্ধকার। আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সংস্কৃতি সভ্যতা, শিল্প সাহিত্য, ধর্ম-নীতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ—সব কিছুই আজ যেন একটা অনির্দিষ্টলক্ষ্য অন্ধকারময় পথে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পুরাতনকে ছেঁটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার স্থানে নতুন সৃষ্টিরও ক্ষমতা নেই। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে আজ মরুভূমির শূন্যতা ও ব্যর্থতা যেন ঘিরে আছে!

আমাদের দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণে আর মণ্ডনেও আজ পুরাতনকে বর্জন করবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। নতুনের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে যুগে যুগে পুরাতনকে বিদায় নিতে হয়েছে—এর জন্যে আপশোশ নেই। এ ত ইতিহাসেরই অমোঘ সত্য। কিন্তু যে পুরাতন জাতির প্রাণরসে নিত্য সঞ্জীবিত এবং যে পুরাতন জাতির সমগ্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জাতিকেই আবার প্রাণরসে পরিপুষ্ট করে তুলছে, তার পরিবর্তনে ও ধ্বংসে সমগ্র জাতির কাঠামোটাই ধ্বংস পাবে। আজ দেব-দেবীর প্রতিমা নির্মাণে আর মণ্ডনে এই কথাটাই বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

'প্রাচ্যরীতি'র নাম দিয়ে আজ প্রতিমা নির্মাণে যে নতুন ঢং এসেছে, তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে নবীন শিল্পীদের প্রতিভা, শিক্ষাসুমার্জিত নৈপুণ্য এবং প্রাচীন ভাবতের রূপ বিদ্যার প্রতি আবেগময় শ্রদ্ধাভাবের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু 'প্রাচ্যরীতি'র নামে আজ একদল হুজুগপ্রিয়, (হুজুগ যখন, তখন আমাদের দেশে এদের সংখ্যা নগণ্য নয় মোটেই) অজ্ঞ ও শিল্পরুচিহীন প্রতিমা নির্মাণে ও সজ্জায় এক অদ্ভুত, সঙ্গতিহীন ও রুচিগর্হিত রীতির আমদানী করছে। বাংলার সাবেককালের শিল্পরসোত্তীর্ণ, সুসংযত, সুসংহত, ভাবসমৃদ্ধ রীতি এদের বীভৎস শিল্পচর্চার ভিড়ে অবহেলিত হয়ে আজ কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। 'প্রাচ্যরীতি'র অনুধাবনের শিক্ষা, পরিমার্জন ও অনুশীলন যে এদের নেই—এ কথা এদের বীভৎস সৃষ্টি থেকেই প্রকট।

আর একটি দলেরও উদ্ভব হয়েছে আজ, যারা জাতীয় শিল্পে বস্তুগত (realistic) ধারা প্রবর্তনে ইচ্ছুক। রূপ থেকে অরূপে, প্রত্যক্ষ থেকে অগোচরে, সান্ত থেকে অনন্তে চলে যাবার যে প্রয়াস প্রাচ্যরীতির মর্মকথা, সে হারিয়ে যাচ্ছে আজ প্রতিমানির্মাণে এই বস্তুগত ধারার প্রবর্তনে। তাই realistic touch দিতে গিয়ে—দেবীপ্রতিমার পিছনে আজ রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট এসেছে, ক্রোটন আর নানা পাতাবাহারের গাছও দিতে ভোলা হচ্ছে না। দুর্গা, সিংহ, অসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ,

কার্তিক সকলকে একই কাঠামোর ভিতরে নিয়ে বাঙালি শিল্পী প্রতিমা নির্মাণে যে একটা জমজমাট ঘনসংবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন আজ তা নেই। আজ আমাদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার যুগে দেবসমাজও বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তাই লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক আজ নতুন শিল্পীদের হাতে দূরে দূরে প্রসৃত। তার ওপরে আছে 'নিয়ন' আর বৈদ্যুতিক আলোর কেরামতি। দেবীর মুখমণ্ডলে সাবেক কালের শিল্পীরা যে কৌশলে ও ভঙ্গিতে বীর্য-বিভূতি আর জ্যোতির আভাস দেবার চেষ্টা করে এসেছে, আজ realistic ধারার খোঁচায় তা অপসৃত। তাই আজ দেবীর পিছনে ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক আলোকচক্র দিয়ে দেবীকে জ্যোতির্ময়ী করার প্রয়াস! আজকের দিনের অধিকাংশ দুর্গা প্রতিমার নির্মাণ আর সাজসজ্জায় বিগত দিনের সেই ভাবগত, ধ্যানগত, মনের মুকুরে ভক্তি আর আবেগ দিয়ে দেবীকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস বর্জিত। তাই আজকের প্রতিমা যত realistic হবে, ততই তা চিত্তের প্রাকৃত পৌত্তলিকতাকেই উৎকটভাবে প্রকটিত করবে।

শোলার সাজে বাংলার শিল্পীর যে ভাবুকতা, শিল্পচাতুর্য, নয়নাভিরাম সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা রয়েছে, আধুনিক সাজসজ্জাতে তার সন্ধান নেই বললেই চলে। শরতে বাংলার চরে চরে হাঁস আর বকের শ্বেত সমারোহ—পথে প্রাঙ্গণে কাশফুল আর শিউলির শুভ্র হাসি—নীল আকাশের বুকে বর্ষণক্লান্ত লঘুচঞ্চল শ্বেত মেঘের আনাগোনা। বাঙালি শিল্পী শরৎকালে শাবদার বসনেও শোলার সাজের ভেতর দিয়ে সেই অনুপম স্নিগ্ধ শুভ্র দ্যুতিকে ধরবার চেষ্টা করেছে। শরৎকালীন উৎসবের সঙ্গে প্রতিমার এ সজ্জা সুসঙ্গত এবং কাব্যভাবপ্রকাশক। বাঙালি এই শিল্পের পোষণ করে বাংলার শিল্প আর বাঙালি শিল্পীর মান রাখুক, প্রকৃত সৌন্দর্যরুচির পরিচয় দিক—এই কামনাই আজ করি।

এক পটুয়াশিল্পীর জীবনকাহিনী

জীবনী নয়। তবে কী?

কেবলই একটি মানুষের কথা। অথবা বলতে পারেন এক শিল্পীর সৃষ্টিকে পরতে পরতে উন্মোচনের কাহিনী। এমনই এক শিল্পী, বলাই পাল। যাঁর জীবন ওই সৃষ্টির সঙ্গেই কিভাবে যেন একাত্ম হয়ে গেছে।

কবি বিষ্ণু দে একবার বলাই পাল সম্পর্কে লিখেছিলেন—'প্রথম যেদিন তাকে দেখি, ছিল সেদিনও সে শ্রাবণের ভরা নদী।' আর আমার প্রথম পরিচয়ের দিনটিতে দেখি শ্যামবর্ণ বছর ২৫-৩০-এর এক যুবক। পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলায় বাড়ি। বিঘেখানেক ধানি জমি। আর সংসার বলতে মা, স্ত্রী ও ১৫-১৬ বছরের একটি ছেলে। সুন্দর রঙ করার হাত ছিল বলাইয়ের। ধনী বাড়িতে রঙ করার কাজ করতেন। আর আঁকতেন অসাধারণ সব লক্ষ্মীসরা। তবে এত মসৃণ, ওঠানামাহীন জীবন বোধহয় কোন শিল্পীর জন্যই নয়। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের যে বিপুল স্রোত এ বঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল—পথেঘাটে, হাটে-বাজারে, নদী অথবা খালপাড়ে—তেমনই এক সবহারাদের আস্তানায় নিঃস্ব, রিক্ত বলাই পাল সপরিবারে আস্তানা পাতলেন মানিকতলা খালধারে।

সে প্রায় ৫৪-৫৫ বছর আগের কথা। তখন আমি যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার। সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আমাকে বললেন, মানিকতলার যে বস্তি বাড়িতে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষরা সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতেন তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে। সেখানে গিয়ে দেখি বেলেঘাটা খালের সঙ্গে একটা ছোট্ট খাল এসে মিশেছে। নাম উল্টোডাঙা খাল। তারই পাড়ে খোড়ো ছাউনির ঘরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা দরিদ্র মানুষরা তাঁদের আস্তানা গড়ে তুলেছেন। উল্টোডাঙা খাল পার হয়ে ছিন্নমূল ওঁদের বাসস্থানের সামনে গিয়ে দেখলাম অদ্ভুত দৃশ্য। কয়েকজন মহিলা খালপাড়ের কাদামাটির স্তূপ থেকে খড়কুটো বাছছেন। কৌতূহলী আমি জানতে চাইলাম, কী হবে এ দিয়ে? সারল্য আর বিষাদ মাখামাখি হয়ে যাওয়া মুখটি নিয়ে তাঁরা বললেন, এ দিয়ে তো আমরা লক্ষ্মীসরা বানাবো। ছয় থেকে বারো ইঞ্চি ব্যাসের হাঁড়িকে উপুড় করে, তার কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু অংশটিতে পরিষ্কার মাটির তাল হাতে দিয়ে লেপন করলেই তা সরার চেহারা পায়। এক চিলতে ঘরের মাচার তলায় রেখে শুকিয়ে ফেলার পর আবার পোড়ানো হয় আগুনে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ চলে সরা তৈরির কাজ। আর বর্ষায় তারই ওপর ছবি আঁকা। পুরোটাই শিল্পীদের অসাধারণ নৈপুণ্যে 'সৃষ্টি'।

এঁদেরই একজন হয়ে, আলোর আড়ালে, খুব সাধারণ হয়ে থেকে যেতে পারতেন বলাই। প্রতিভার আলো কিন্তু বিচ্ছুরিত হলো। শুরু হলো সরার ওপর রঙে-রেখায় পৌরাণিক চরিত্র, দেবদেবী আর সাধারণ জীবন ফুটিয়ে তোলার কাজ। আঁকা তো নয়, লোকশিল্পীদের ভাষায় 'লেখা'। তুলির ভাষায় লেখা অবয়ব, চোখ, মুখ, চিত্রাবলী। বলাইয়ের লক্ষ্মীসরার রঙ-রেখার জাদু কলকাতার পাইকারদের বিস্মিত করল। উত্তর কলকাতার হাতিবাগান, শ্যামবাজার, বাগবাজার, বেলগাছিয়া, টালা, দমদম, বারাসাত, এমনকি দক্ষিণে যাদবপুর, টালিগঞ্জ, গড়িয়ার যেখানেই বাজার এবং পূর্ববাংলার বাস্তুচ্যুত মানুষের কলোনি, সেখান থেকেই পাইকাররা এসে বলাইকে লক্ষ্মীসরার বরাত দিয়ে যেতেন। কিভাবে ফুটে ওঠে তুলির প্রতিটি আঘাতে এত নৈপুণ্য? জানব বলে যেদিন গেলাম সেদিন শুনলাম, তিনি উধাও।

কোথায় গেলেন মানুষটি? অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানলাম বারাসতের পাইকার চন্দ্রকান্ত রুদ্রপাল বলাইকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেছেন। মুগ্ধ রুদ্রপাল চান, বলাই তাঁরই বাড়িতে থাকুক,

লক্ষ্মীসরা তৈরি করুক। বিনিময়ে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। আমায় কি তখন নেশায় পেয়েছে! অনেক রাস্তা, অনেক খোঁজা বাকি। চিত্রগ্রাহক প্রতিনিধি শ্যামলকান্তি বসুকে নিয়ে উপস্থিত হলাম চন্দ্রকান্তের বাড়িতে। সেখানেও বলাই তেমনই, বিষ্ণু দে যেমন বলেছিলেন '...তখনও সতেজ সুনীল মেঘের রৌদ্রের আভা।' রঙে-রেখায় পরের পর লক্ষ্মীসরা বানিয়ে চলেছেন। কী করে লেখেন এমন সরা? বলাই নিজেই বললেন, 'কাঁচামাটি দিয়ে তৈরির পর সরা পোড়ানো হলো আগুনে। জলে সাদা চুন গুলে সরার কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু জায়গায় মাখিয়ে একটা সাদা জমি তৈরি করা হয় তারপরে। এবার ছবি লেখার কাজ।' প্রথমে সরার একেবারে মাথার দিকে রঙের গোলাকার পার লেখার জন্য সবাটাকে একটা হাঁড়ির মাথায় এমনভাবে বসানো হয়, যাতে সরার উঁচু দিকটা ওপর দিকে থাকে। এবার হাঁড়িটাকে ঘোরানো হয় বাঁ হাতে। আর লাল, নীল, সবুজ, কালো, হলুদ—যেসব রঙে ছবি আঁকা হবে সে রঙের তুলি ডান হাতে ধরা থাকে। হাঁড়ি আর সরা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেসব রঙের পার তৈরি হয়ে যায়। ছবিতে কী কী রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, এ যেন তারই হিসাব দেওয়া। এতই নয়নসুখকর তাঁর ছবি, এত সূক্ষ্ম রঙের ব্যবহার, দেখে অবাক হতে হয়। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে বলাই পালের ভাবনাচিন্তাও অভিনবত্বের দাবি রাখে। সরাতে লক্ষ্মী আছেন। অথচ একই সঙ্গে আঁকা হয়েছে এমন সব বিচিত্র ঘটনা, যার সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্পর্ক স্থাপন প্রায় অসম্ভব। সেইসব ঘটনার চিত্রায়নে কখনও জমিদার-জোতদারের অত্যাচারের কথা, কৃষক-শ্রমিককে শোষণের ছবি, আবার কোথাও লেঠেল নিয়ে জমিদার চলেছে ধান লুঠ করতে, বাধা দেওয়ার জন্য কাস্তে হাতে ছুটে আসছে কৃষক-কৃষকবউ, তার ছেলে। তারই নিচের প্যানেলে বিজয়িনী নারীরা হাতে ধানের গোছা নিয়ে ফিরে চলেছেন। গোটা ঘটনায় বিচিত্র চলমানতা।

আর এক সরায় চলমান এক সুদৃশ্য নৌকা। কোথাও আবার পরস্পরের হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কৃষক আর শ্রমিক। বলাই পাল গ্রামীণ শিল্পী। গ্রামের বাতাসের ঢেউ খেলানো ধানখেত তাঁর ছবিতে, কৃষকের ধান কাটা, মাথায় কাটা ধানের বোঝা নিয়ে কৃষকবউয়ের গোলার দিকে যাওয়া। এক হাতে মঙ্গলঘট, অপর হাতে ধান নিয়ে নারী—নৈপুণ্য আর মমতার মিশ্রণে বলাই পালের ছবিতে স্বাভাবিকভাবেই অপূর্ব গতিসঞ্চার হয়েছে।

শুধু লক্ষ্মীসরাই বা কেন? সাদা কাগজ বা শক্ত কার্ডের ওপর রঙ পেন্সিল আর সরু তুলির টানে তিনি সৃষ্টি করেছেন সমসাময়িক ঘটনাবলী। যেমন ১৯৬৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন। বেতন বৃদ্ধি ও অন্যকিছু দাবির প্রেক্ষিতে রাজভবনের সামনের রাস্তায় বসেছিলেন শিক্ষকরা। প্রায় দিন দশ-বারো। শেষে এক রাতে তখন কংগ্রেসী সরকার পুলিশবাহিনী আর গাড়ি পাঠিয়েছে তাঁদের হটিয়ে দেবার জন্য। দশ দিনের আন্দোলন পুলিশ দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে আর সেই সংগ্রামের মুহূর্ত বেঁচে উঠছে বলাই পালের ছবিতে, পরতে পরতে। তাঁর আঁকা এমনই সব ছবি, যা শুধুমাত্র ছবি হয়েই থেকে যায়নি, ক্রমে অনন্য শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে, তা কিন্তু যথার্থ সম্মান বা দক্ষিণা কিছুই পায়নি পাইকারদের কাছ থেকে। চন্দ্রকান্ত রুদ্রপালও তার ব্যতিক্রম নয়। ৬ ইঞ্চি থেকে এক দেড় ফুট ব্যাসের সাত-আটশো সরার জন্য বলাই পাল হাতে পেতেন মাত্র ২০০টি টাকা। উল্টোডাঙা থেকে যে যত্ন আর সম্মানে তিনি বলাই পালকে বারাসাতে নিয়ে এসেছিলেন, কাজ ফুরোলে তাঁরই হাতে একটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে এই অসামান্য শিল্পীকে বিদায় করলেন তিনি। চন্দ্রকান্ত কিন্তু হাতিবাগান, কালীঘাট, কুমারটুলিতে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ঐসব শিল্পকর্ম বিক্রি করেছেন। বিস্ময়ের কোন অবকাশই নেই! অসহায়-দরিদ্রের ওপর ধনী আর সবলের শোষণ এবং অন্যায় অবিচারের এই ঐতিহ্য এখনও চলেছে। অন্য শিল্পীদের আঁকা সরার পাশে সাজিয়ে রাখা বলাইয়ের সরা মুগ্ধ ক্রেতা কিনে নিয়ে গিয়েছেন চড়া দামে, এ আমার নিজের চোখে দেখা। অথচ

যাঁর শিল্প শোভিত হয়েছে ঐসব ক্রেতার কোন সুসজ্জিত কক্ষে, তিনি উল্টোডাঙার ৬ ফুট বাই ৮ ফুটের মাটির ঘরে সামান্য কয়েকটি টাকায় দিন গুজরান করেছেন।

বলাই পাল অসাধারণ শিল্পী, তাঁর প্রতিভার বিস্তার হয়তো পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। খোঁজা হয়নি, তবে আশা এটুকুই কালের গর্ভে তাঁর ছবি হারিয়ে যায়নি। সে শিল্প সীমাবদ্ধ থাকেনি শুধু এপার বা ওপার বাংলাতেও। শিল্পের অসাধারণ সমঝদার অধ্যাপক-কবি বিষ্ণু দে-র রিখিয়ার (দেওঘরের কাছে) বাড়িতেও বলাই পালের শিল্পকীর্তি পরম যত্নে ঠাঁই পেয়েছিল। মৌলানা আজাদ কলেজে অধ্যাপনা করার সময় কবি প্রায় প্রতিদিনই আমার বাড়িতে আসতেন। সে সময় বলাইও এখানে বসে সরা আঁকতেন। তা থেকেই কয়েকটি তিনি মুগ্ধ বিষ্ণুবাবুকে দিয়েছিলেন। বিষ্ণুবাবু যোগ্য মূল্যেই তা কিনতে চেয়েছিলেন। বলাই তা নেননি। আর, এক শিল্পীর আশ্চর্য শিল্পকলা অপর এক শিল্পীর মুগ্ধতায় সিক্ত হলো, স্বীকৃত হলো। সরাগুলির কয়েকটি কবি রাখলেন তাঁর যামিনী রায়ের চিত্রসম্ভারের মধ্যে, কিছু রিখিয়ার বাড়িতে।

সমস্ত জীবন প্রতিকূলতার মধ্যে কাটানোর পরে বলাই পাল শেষ জীবনও কাটিয়েছিলেন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে। উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলায় একটি ছোট কুঁড়েঘরে তাঁর মৃত্যু হয়। সুদূর ফরিদপুর থেকে উত্তর ২৪ পরগনার এক গ্রাম। জীবন বোধহয় এভাবেই ভাসমান, বিশেষ করে কোন শিল্পীর জীবন। ভাসতে ভাসতে কখনও এ বন্দরে নোঙর ফেলা। সেখানকার মাটির স্বাদ-গন্ধ চেখে, মানুষের জীবনযাত্রার আশ্চর্য সব কাহিনী আত্মস্থ করে আবার ভেসে পড়া। জানি না, বলাই পাল এমনই এক জীবন চেয়েছিলেন কিনা। তবে তাঁর সৃষ্টি যে তাঁকে নির্মল আনন্দ দিয়েছিল জীবনভর, সততা দিয়েছিল, বিশাল এক হৃদয়ও—তা সন্দেহাতীত। উত্তর ২৪ পরগনার ছোট্ট ঘর, উল্টোডাঙা, বারাসাত—এইসব জায়গাতেই আসলে তিনি রয়ে গিয়েছেন।

আজ বন্ধুবর বিষ্ণু দে নেই, শ্যামলকান্তি নেই, বলাই পাল নেই। আমি, এই ৯০ বছর বয়সে স্মৃতির সরণি বেয়ে তাঁদের অম্লান ছবি দেখছি। জীবন চলমান, আনন্দের, কখনও বিষাদমাখা সব ছবি। কবির ভাষায় ভাব প্রকাশের ধৃষ্টতা এ বয়স আর করতে পারল না। তাই শিল্পীবর বলাই পালকে নিয়ে কবি বিষ্ণু দে-র লেখা কবিতাটি থেকেই বলি—'...রামধনু ভাঙবে সে ছড়াবে সে সাতরঙ। আজকে বস্তিতে কাল নতুন শহরে জীবনের প্রতি ঘরে ঘরে।'

প্রকাশ-বিবরণ

শেষদিকের তিনটি (১৯৫১, ১৯৫০ ও ২০০৫-এ প্রকাশিত) বাদে সব লেখাই 'বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প' রচনামালার অন্তর্ভুক্ত। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উল্লিখিত তিনটি বর্তমান গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। শেষ রচনাটি বাদে অন্যগুলি 'যুগান্তর' দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬, ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সালে। ১৯৫৬-র লেখাটি এবং ১৯৬০-এর গোড়ার কয়েকটিতে লেখকনাম হিসেবে স্টাফ রিপোর্টার ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী সব লেখাই বজ্রমিত্র ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০-এর লেখাটি ছিল স্বনামে, ১৯৫১-র লেখা নিভাস্থ কলা সমালোচক-এর রচনা হিসেবে মুদ্রিত।

শিবের বিয়ে, ৩০ চৈত্র ১৩৬৬, বুধবার, ১৩ এপ্রিল ১৯৬০।
শিবের নাচ, ৫ মে ১৯৬০, বৃহস্পতিবার।
উলাইচণ্ডীর জাত, ১৬ মে ১৯৬০, সোমবার।
বল, বল, কে তুমি ছলনাময়ী? ২ জুন ১৯৬০, বৃহস্পতিবার।
একটি লাবণ্যের ফুল, ২৫ জুন ১৯৬০, শনিবার।
আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে, ৯ জুলাই ১৯৬০, শনিবার।
বৃষ্টি দাও, ধান দাও, সুখ দাও, ৩ আগস্ট ১৯৬০, বুধবার।
আহা রে নয়নসুখ কী বিচিত্র শোভা! ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০, শনিবার।
কত বিচিত্ররূপিণী! ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০, শনিবার।
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা, ২৯ অক্টোবর ১৯৬০, শনিবার।
শান্তিপুরের ভাঙা রাস, ১০ নভেম্বর ১৯৬০, বৃহস্পতিবার।
কার্তিকের লড়াই, ২৪ নভেম্বর ১৯৬০, বৃহস্পতিবার।
ধানের ভার না সহে ধরণী, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬০, বুধবার।
পুরাণের চেয়েও পুরাণো, ৬ এপ্রিল ১৯৬১, বৃহস্পতিবার।
গ্রামেশ্বরী দেবী শাকম্ভরী (?)
কালো কনে বুড়ো বর, ৬ মে ১৯৬১, শনিবার।
সুধু অকারণ পুলকে, ২০ মে ১৯৬১, শনিবার।
বোড়ো-বলরামের মেলা, ১০ জুন ১৯৬১, শনিবার।
বোড়োর অনন্ত-বাসুদেব, ২৪ জুন ১৯৬১, শনিবার।
চক্ষুদান গাজন, ৬ জুলাই ১৯৬১, বৃহস্পতিবার।
নারকেলডাঙ্গার ঝাঁপানতলায়, ১৫ জুলাই ১৯৬১, শনিবার।
সোনার পদ্ম জলে যায় ভেসে, ২২ জুলাই ১৯৬১, শনিবার।
নারকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী, ৫ আগস্ট ১৯৬১, শনিবার।
জগৎগৌরীর গ্রামবেড়ানী, ১২ আগস্ট ১৯৬১, শনিবার।
সয়লা উৎসব, ১৯ আগস্ট ১৯৬১, শনিবার।
প্রীয়তাং দেবী গ্রামস্য, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬১, শনিবার।
শাঁকারী গ্রামে দেবী শঙ্করী, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬১, বৃহস্পতিবার।
মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬১, শনিবার।
আলোক-তরীর দেবতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬১, শনিবার।

রাজ্যহীনদের রাজা-রাজা খেলা, ১৪ অক্টোবর ১৯৬১, শনিবার।
খাতড়ার ইদ পরব, ২৮ অক্টোবর ১৯৬১, শনিবার।
দেবী উত্তরবাহিনী, ১১ নভেম্বর ১৯৬১, শনিবার।
জ্যোৎস্নার মায়া, ১৮ নভেম্বর ১৯৬১, শনিবার।
চোটখণ্ডের জগৎগৌরী, ২৬ নভেম্বর ১৯৬১।
খড়দহের রাস, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬১।
বড়িশার চণ্ডীর মেলা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬১, শনিবার।
ধপধপির দক্ষিণেশ্বর, ২০ জানুয়ারী ১৯৬২।
মুবগী পীরের মেলা, ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২।
তিন ভাই—তিন ঠাঁই, ১০ মার্চ ১৯৬২, শনিবার।
পাথরের কান্না, ২৪ মার্চ ১৯৬২, শনিবার।
পীর গোরাচাঁদের মেলা, ৩১ মার্চ ১৯৬২, শনিবার।
গোড়াই গাজীর ইতিকথা, ৭ এপ্রিল ১৯৬২, শনিবার।
ঘেঁটু যায়—খোস পালায়, ২১ এপ্রিল ১৯৬২, শনিবার।
কঙ্কালীতলা, ২৬ মে ১৯৬২।
প্রতিমূর্তি নির্মাণে বাঙলার মৃৎশিল্পীদের বিচিত্র শিল্প-মনীষা, ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫১।
লক্ষ্মীসরা, ১৮ অক্টোবর ১৯৫৬।
প্রতিমামণ্ডনে শোলার সাজ, ১৭ অক্টোবর ১৯৫০।
এক পটুয়াশিল্পীর জীবন কাহিনী, গণশক্তি, ২০ অগাস্ট ২০০৫।

লেখক পরিচিতি

'চোখে ঝকঝকে সূর্যের স্মিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পামীরের পারে।
হৃদয়ে কি তার আরালের স্রোতে সোরাব উজ্জীবিত?'

(বিষ্ণু দে, আলেখ্য / *শ্রীমান হীরেন মিত্রকে*)

হীরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। পিতামহ দীননাথ মিত্র ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজে গবেষণাও করেছেন। পিতা শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রও হোমিওপ্যাথি পাশ করে চিকিৎসকের পেশা বেছে নেন। সেই থেকেই জানবাজারের ১২/৩ গোয়ালটুলি লেনের বাড়িটি 'ডাক্তারবাবুর বাড়ি' হিসাবে পরিচিত। হীরেন্দ্রনাথের জন্ম এই বাড়িতেই। সিনেমা পত্রিকা 'উল্টোরথ' এর আলোকচিত্রী হেমেন মিত্র ছিলেন হীরেন্দ্রনাথের ছোটভাই।

হীরেন মিত্র হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাংলা ও সংস্কৃতে ক্রমশ অর্জন করেন ব্যুৎপত্তি। শিক্ষক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের উৎসাহে স্কুল ম্যাগাজিনে লেখা ছাপা হতে থাকে। অপর শিক্ষক গোলাম মুস্তাফা তাঁকে স্কুল ম্যাগাজিনের সাব-এডিটর করে নেন। ভাল ফল করতে থাকেন পরীক্ষাতেও। বাড়িতে গানবাজনার চর্চা ছিল, অর্গান বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। ১৯৩২ এ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সংস্কৃত ও বাংলায় পান শতকরা ৮০ নম্বর। এই কৃতিত্বের জন্য মহিষাদলের রাজপরিবার থেকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। আই এ পড়ার জন্য ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেখানেই এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন যামিনী রায়। হীরেন মিত্রের দেওয়া আলপনা আর তাঁর সহপাঠী শৈলেন বসু-র তৈরি বুদ্ধমূর্তি দেখে আকৃষ্ট হন যামিনী রায়, পরে বাড়িতে ডেকে আলাপও করেন তাঁদের সঙ্গে।

১৯৩৫-এ সংস্কৃত ও দর্শনে লেটার মার্কস নিয়ে প্রথম বিভাগে আই এ পাশ করে বি এ তে ভর্তি হলেন সংস্কৃত অনার্স নিয়ে। ১৯৩৭-এ বি এ পাশ করে প্রথমে একটি স্থানীয় স্কুলে, পরে মেট্রোপলিটন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 'যুগান্তর' পত্রিকাতেও তখন নিয়মিত লেখালেখি করছেন। ১৯৩৯-এ যুগান্তরের সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ডাকে যোগ দিলেন সাব-এডিটর পদে। কয়েক মাসের মধ্যেই রিপোর্টার। ১৯৪২ থেকে বিধানসভার রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব পেলেন। প্রায় ১৯৯০ পর্যন্ত টানা এ কাজ করে গেছেন। সাংবাদিকতা করতে করতেই বাংলায় প্রাইভেটে এম এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হন। উপাচার্যের কাছে নিয়মিত ক্লাস করার অনুমতি নেন। এই সময়েই পরিচিত হন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুনীতিকুমার কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকান চিনিয়ে দেন, হীরেনবাবু আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন বিশাল বইয়ের সংগ্রহ। তাঁর পুঁথিপাঠের প্রাথমিক শিক্ষাও সুনীতিকুমারের কাছে। ১৯৪৩-এ এম এ পাশ করেন হীরেন্দ্রনাথ।

সাংবাদিকতার কাজে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন লোকশিল্পে। সংগ্রহ করতে থাকেন মাটির পুতুল, লক্ষ্মীসরা। মেলা থেকে মেলায় ঘুরে তথ্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। যুগান্তরের পাতায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে 'বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প' ('বজ্রমিত্র' ছদ্মনামে)। এদিকে গান্ধীজির প্রভাবে যুক্ত হলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, নিরক্ষরকে শিক্ষাদানের কাজে। গড়ে তুললেন 'মহাজাতি সঙ্ঘ', রানি রাসমণির বাড়ির ঠাকুরদালানে নিয়মিত তথাকথিত অস্পৃশ্যদের লেখাপড়া শেখানো ও স্বাস্থ্য-সচেতন করার কাজ শুরু হল। বেশ কয়েক বছর টানা এই কাজে ব্রতী ছিলেন।

গান-বাজনায় আগ্রহ থেকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র 'বৈতানিক'-

এ ভর্তি হন। অনেকদিন সেখানে গান শিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। এই আগ্রহের জন্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের খবর লেখার দায়িত্বও অনেক সময়েই তাঁর উপর পড়ত। এই সূত্রে তিনি পরিচিত হন বহু বিশিষ্ট সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে। সাংবাদিক-সাহিত্যিক অসীম রায়ের সূত্রে তিনি পরিচিত হন বিষ্ণু দে-র সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় বন্ধুত্ব। শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গেও ছিল যোগসূত্র।

কাজের ফাঁকে আবার পড়াশোনা। প্রাইভেটে ইংরেজি ভাষায় এম এ-ও পাশ করলেন। উর্দু সংবাদপত্র, বই ইত্যাদি পড়ার জন্য শিখলেন উর্দুভাষাও। হাত দিলেন অনুবাদের কাজে। ই এম এস নামবুদিরিপাদের লেখা 'রেমিনিসেন্সেস অব অ্যান ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট' (ভারতের এক কমিউনিস্টের স্মৃতিমন্থন), 'আ হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল' (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস) – দুটি অনুবাদগ্রন্থই প্রশংসা পেয়েছিল।

১৯৩৯ থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত যুগান্তর পত্রিকায় ছিলেন তিনি। শেষের দিকে সহ-সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগে 'যুগান্তর' বন্ধ হয়ে গেলে যোগ দেন 'বসুমতী'তে। সেখানে লিখতেন 'কলমচি' নাম নিয়ে। 'বসুমতী'ও বন্ধ হয়ে গেলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয় হীরেন্দ্রনাথকে। এরপর স্পিকার হাসিম আবদুল হালিম সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টারি ফোরাম অব দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি-তে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে তাঁর নিযুক্তির ব্যবস্থা করেন। এই পর্বে ২০০৬ পর্যন্ত অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভায় তাঁর আসা-যাওয়া ছিল নিয়মিত।

অবসর জীবনেও হীরেন্দ্রনাথ মিত্র বই পড়েই সময় কাটান। কয়েক বছর আগেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের অনেক বইপত্র আলমারি সমেত দান করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে, মা রমাসুন্দরী মিত্রের নামে। বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে একেবারেই ঘরবন্দি। স্ত্রী অনেক আগেই প্রয়াত।

বিষ্ণু দে-র তাঁকে নিয়ে লেখা পংক্তি আজও প্রাসঙ্গিক ঃ

> 'দুদণ্ড তার পাশে বসা সেও যেন জীবনের অভিযান,
> কত উৎরাই চড়াই কত না প্রান্তর,
> এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ.
> প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ।'

সত্যব্রত ভট্টাচার্য
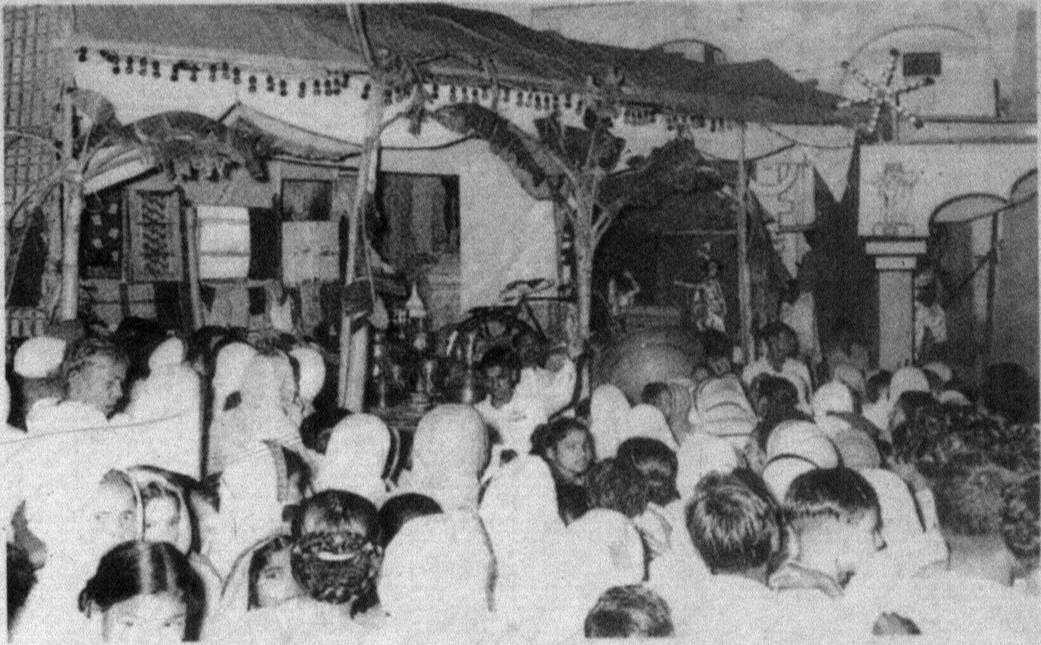
শিবের বিয়ের দানসামগ্রী। নবদ্বীপ

শিবের বিয়ে। নবদ্বীপ
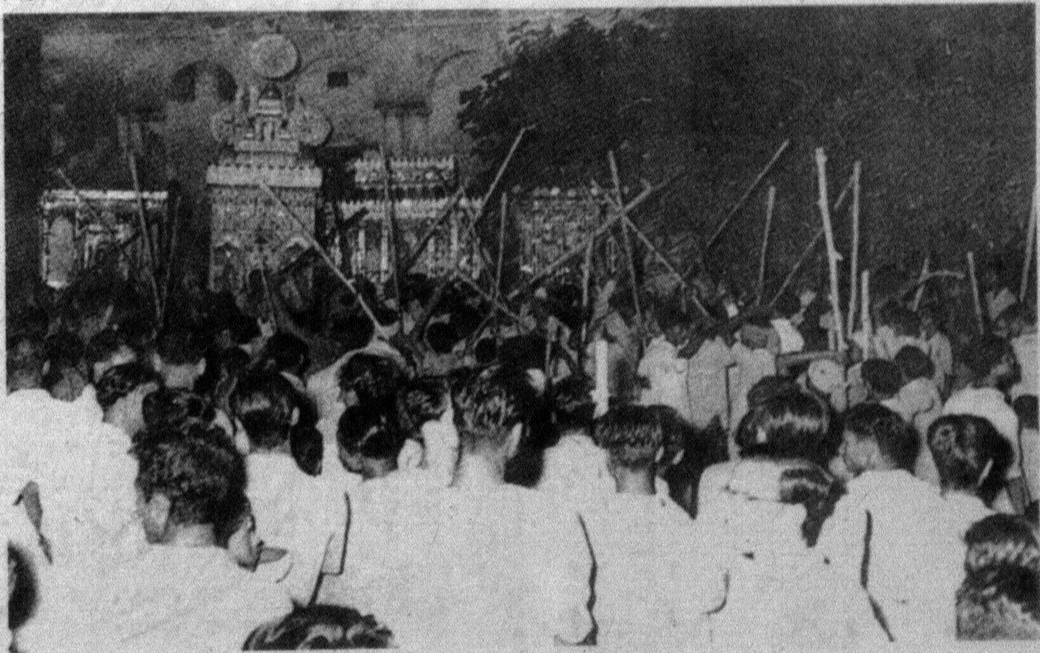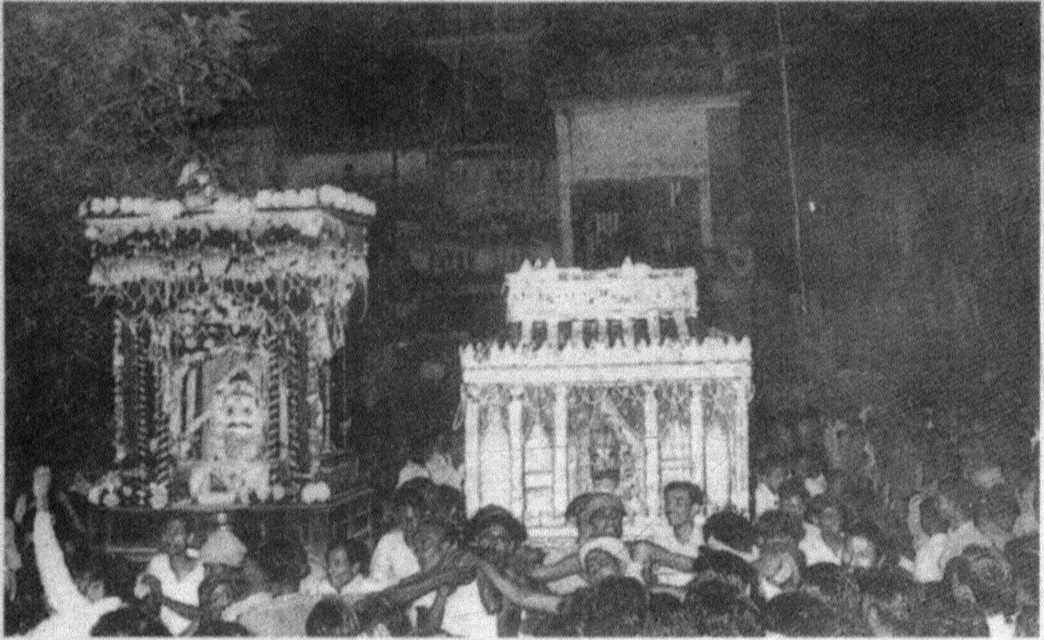
শিব বিয়ে করতে যাচ্ছেন। নবদ্বীপ

সাতগাজন। নবদ্বীপ

শিবমুণ্ড। নবদ্বীপ
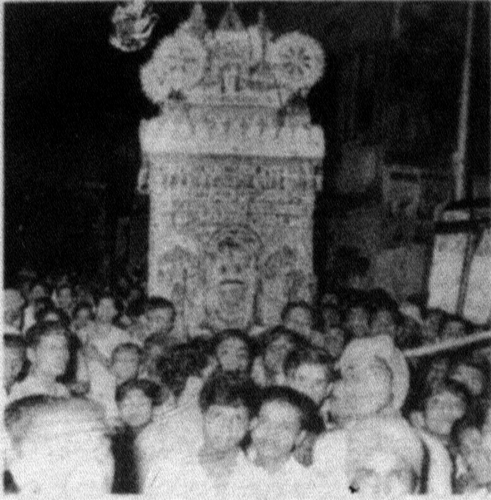
নবরত্নের যোগনাথ। নবদ্বীপ
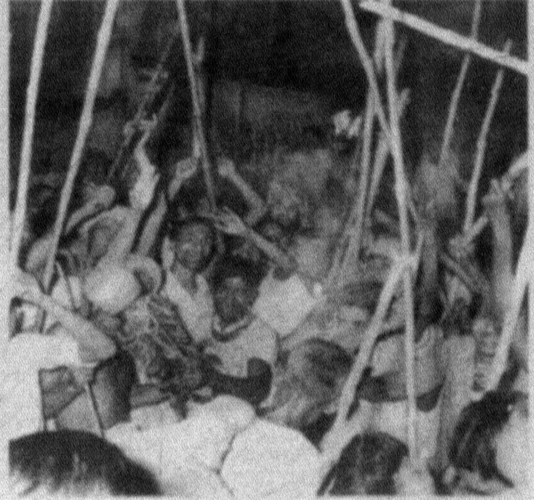
শ্মশান-জাগানো। নবদ্বীপ

উত্তরপাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী। উলা

দক্ষিণপাড়ার মহিষমর্দিনী। উলা

উলাইচণ্ডীর জাতে পাঁঠাবলি। উলা

শাঁখারি। ক্ষীরগ্রাম

ক্ষীরদিঘির পাড়ে পাঁঠাবলি। ক্ষীরগ্রাম

যোগাদ্যা দেবী। ক্ষীরগ্রাম

'মাসিপিসির ঝাঁপি আনা'। ক্ষীরগ্রাম

'উত্থানমন্দিরে'র সামনে খাঁড়া হাতে নৃত্য। ক্ষীরগ্রাম

ক্ষীরখণ্ডক ভৈরবের মন্দির। ক্ষীরগ্রাম

যোগাদ্যা দেবীর 'যজ্ঞকুণ্ড'। ক্ষীরগ্রাম
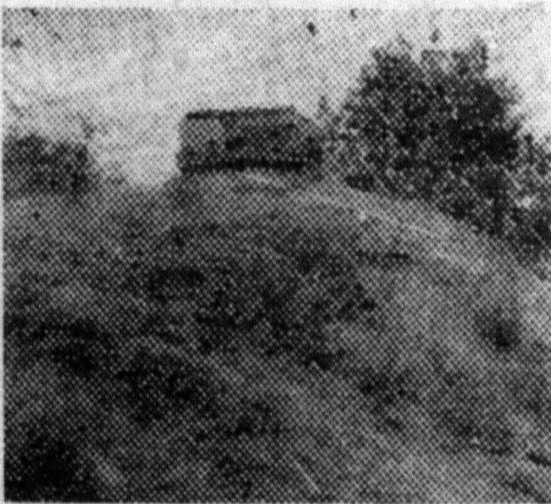
যোগাদ্যা দেবীর 'পুরানো মাঝ'। ক্ষীরগ্রাম
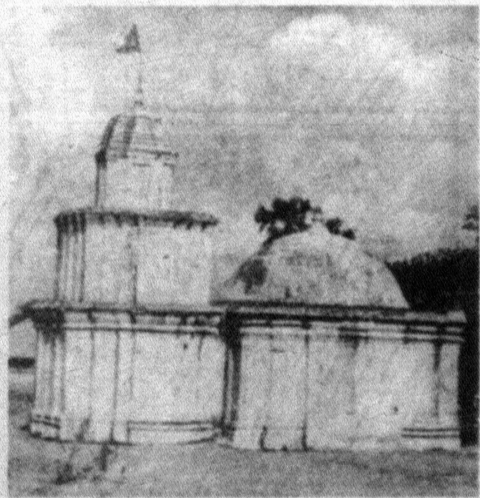
মনসার ঘট। বরিশাল

বিভিন্ন নাগমূর্তি।
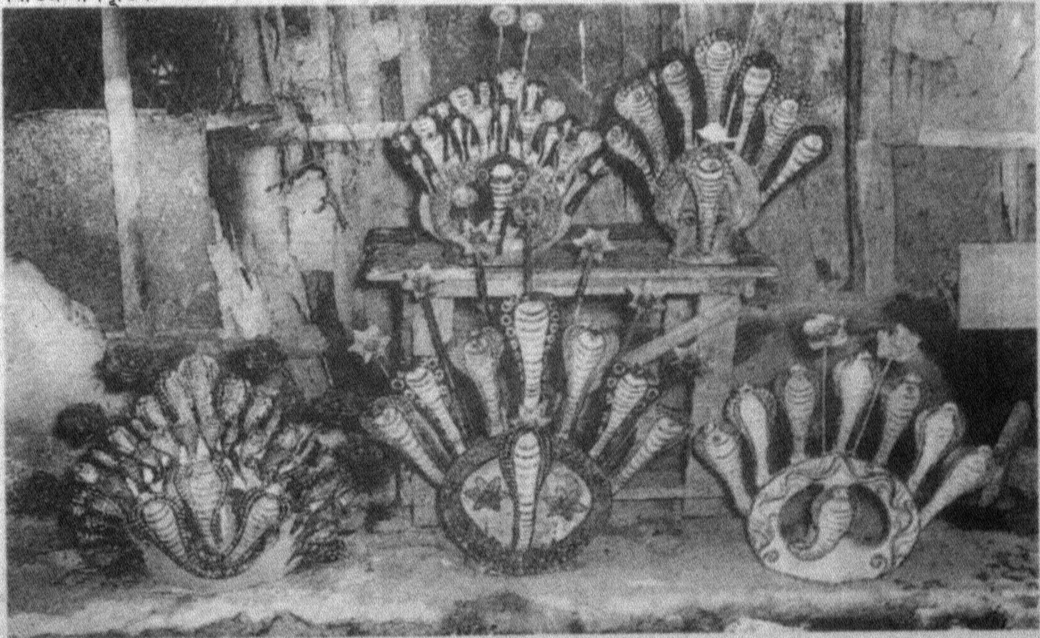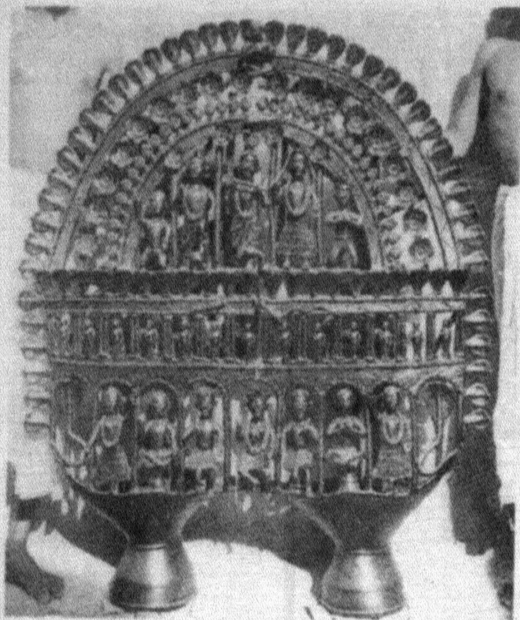
মনসার 'মেড়'।

মনসার 'মেড়'। পাঁচমুড়া

শোলার মনসা। গোয়ালপাড়া, অসম

মনসার 'করণ্ডী'। উত্তরবঙ্গ

শোলার মনসা-ঝাড়, অংশ।
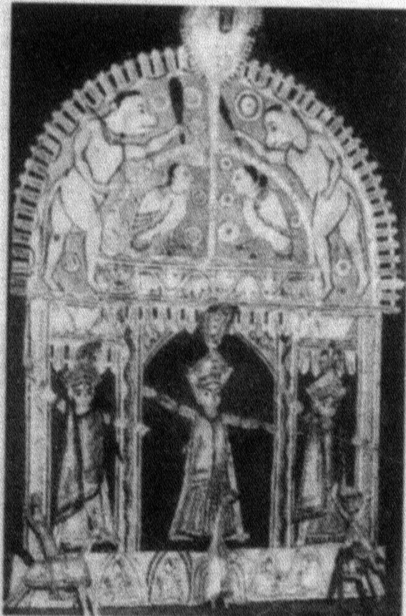
শোলার মনসা-ঝাড়। গৌরীপুর, অসম

জগদ্ধাত্রী। চন্দননগর
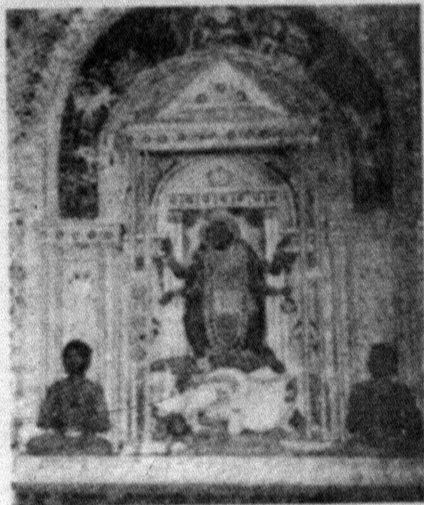
পটেশ্বরী। শান্তিপুর

ধুমো কার্তিক। কাটেয়া

কার্তিকের লড়াইয়ের 'থাকা'। কাটোয়া

'কোকাই' বা খোকা কার্তিক।
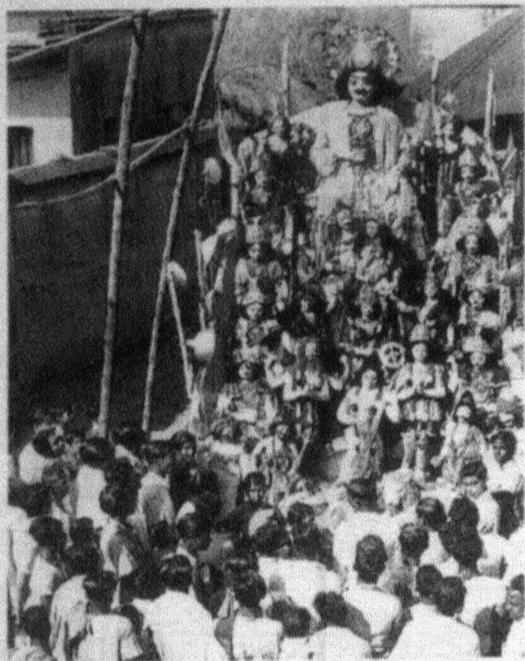
কার্তিকের লড়াই নিয়ে শোভাযাত্রা। কাটোয়া

কার্তিকের লড়াইয়ের 'থাকা'। কাটোয়া

শাকম্ভরী দেবী। মাজিগ্রাম
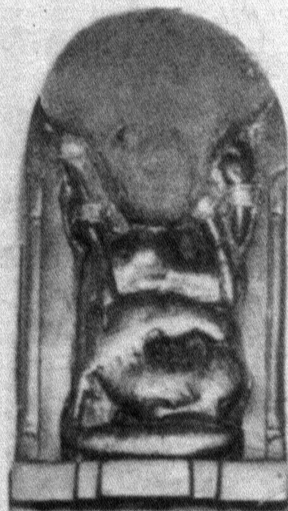
দেউলেশ্বরের মূর্তির সম্মুখভাগ। মাজিগ্রাম

পশ্চাৎভাগ।
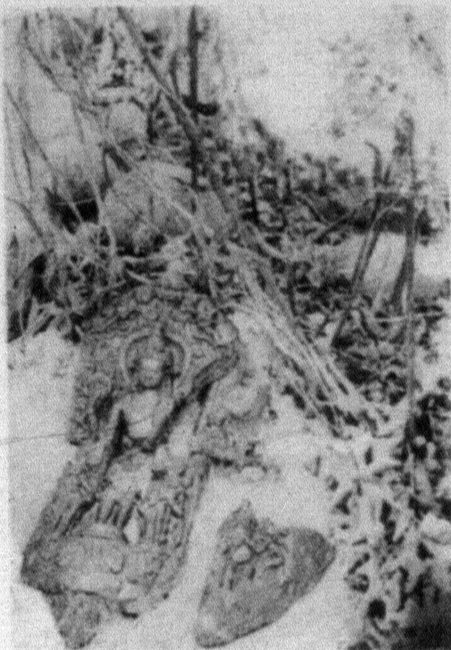
'ভৈরব' নামে পূজিত বিষ্ণুমূর্তি। মাজিগ্রাম

দক্ষিণপাড়ার ভৈরব। মাজিগ্রাম

'মুড়ো-কাড়াকাড়ি'। মাজিগ্রাম

দেউলেশ্বরের মন্দির। মাজিগ্রাম
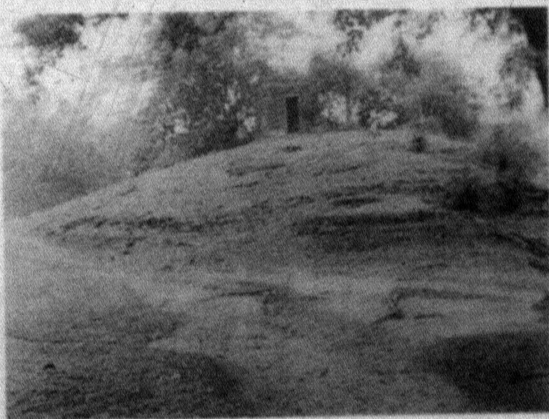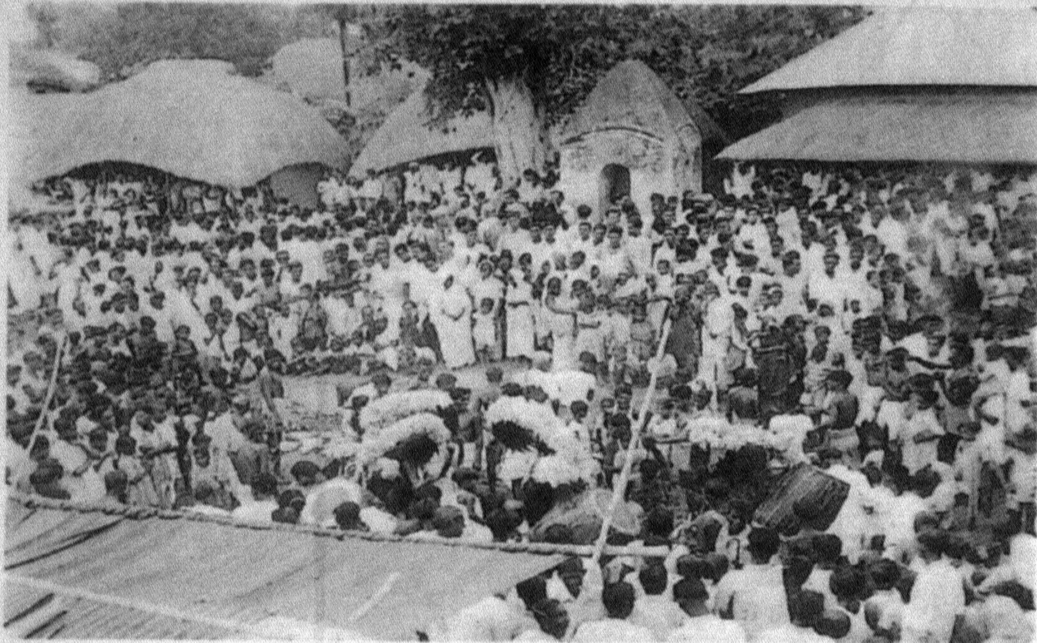
উৎসব-প্রাঙ্গণ। মাজিগ্রাম

পাঁঠাবলি। মাজিগ্রাম।

বলরাম মন্দির। বোড়ো

মেলায় ভিড়। বোড়ো
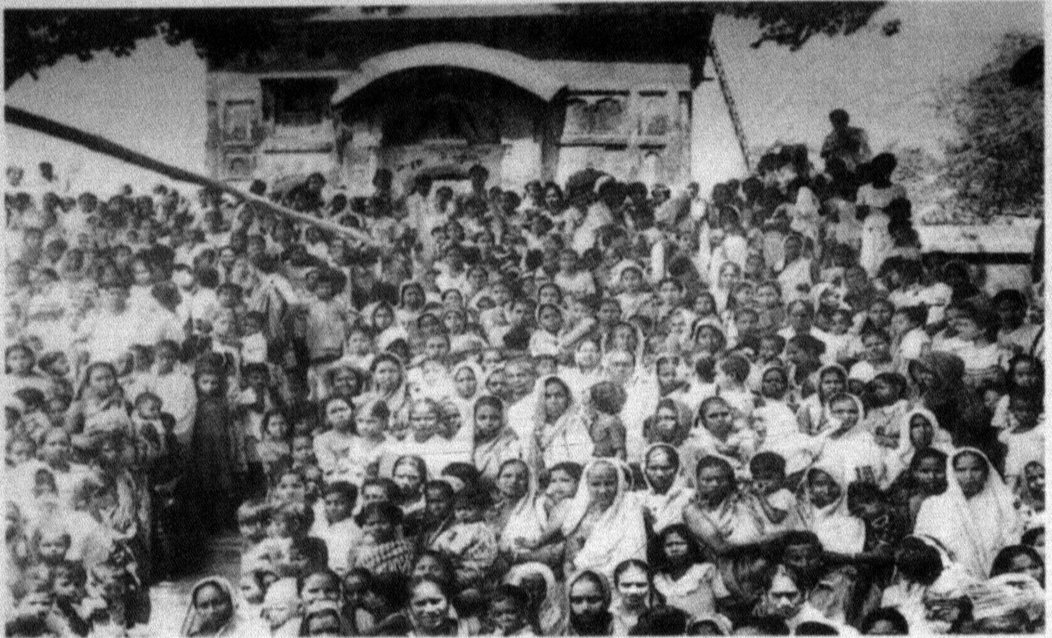
চক্ষুদান গাজনে সমাগত দর্শক। বোড়ো

সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ। বোড়ো
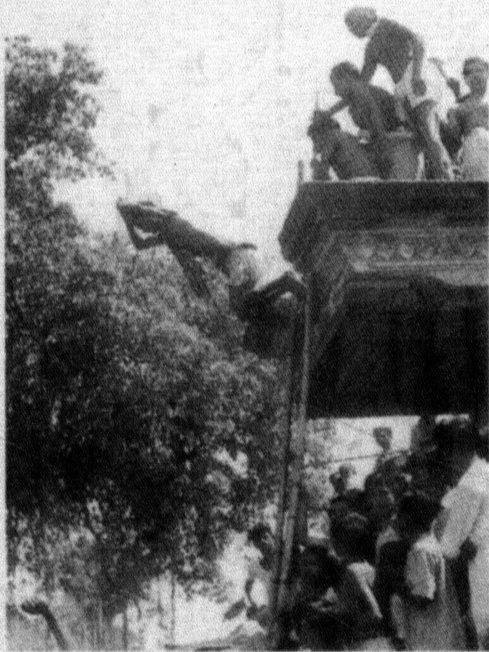
বলরাম মূর্তি। বোড়ো
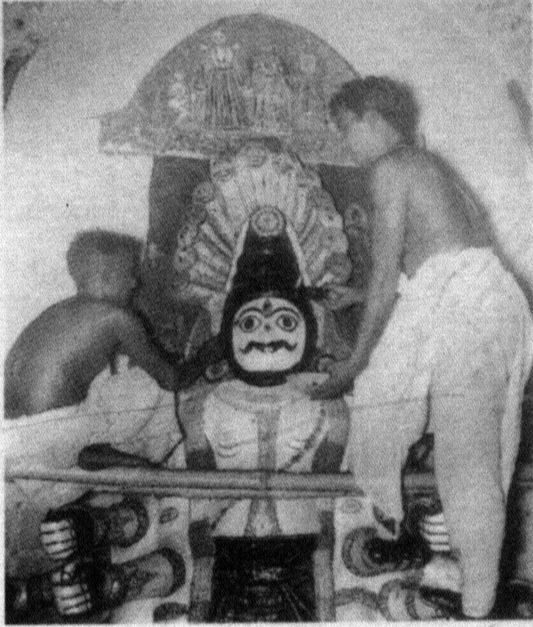
বলরাম ঠাকুরের চক্ষুদান। বোড়ো

দণ্ডীখাটার দৃশ্য। বোড়ো

সন্ন্যাসীদের নাচ। বোড়ো

জগৎগৌরীর চতুর্দোলা নিয়ে নাচ। নারকেলডাঙা

মন্দিরের সামনে ভিড়। নারকেলডাঙা

ঝাঁপানতলায় মনসার গান। নারকেলডাঙা

মেলায় 'পোলো' বিক্রি। নারকেলডাঙা
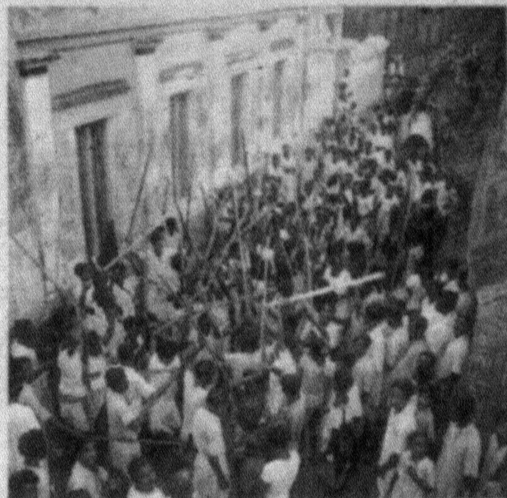
লাঠিখেলা। নারকেলডাঙা

মনসামূর্তি। নারকেলডাঙা

পুতুলের 'থাকা'। বৈদ্যপুর
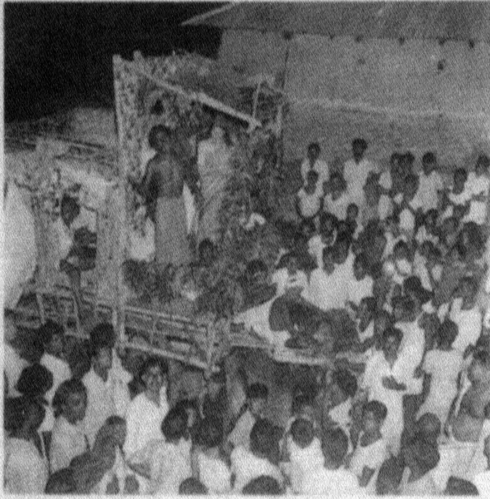
মন্মথ বাউরির গান।

'নাচঘরে' নাচ-গান।

বলি দেখতে ভিড়। শাঁকারি
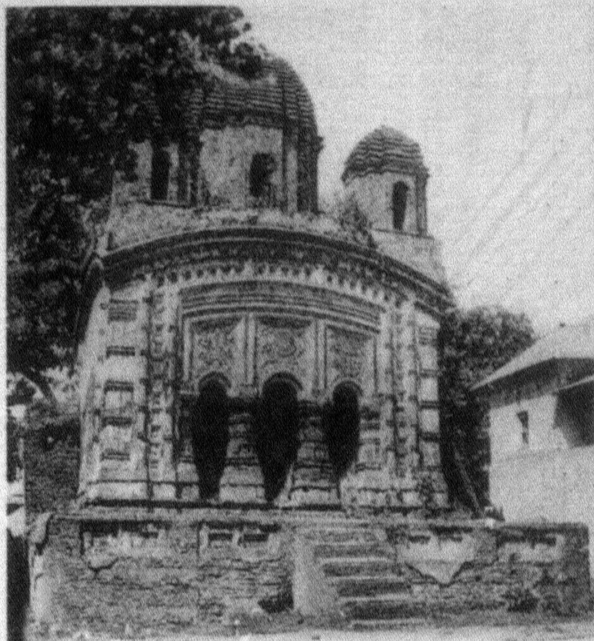
সিংহবাহিনীর মন্দির। শাঁকারি

গ্রামদেবী শঙ্করী। শাঁকারি

বেরা উৎসবের ভেলা। মুর্শিদাবাদ
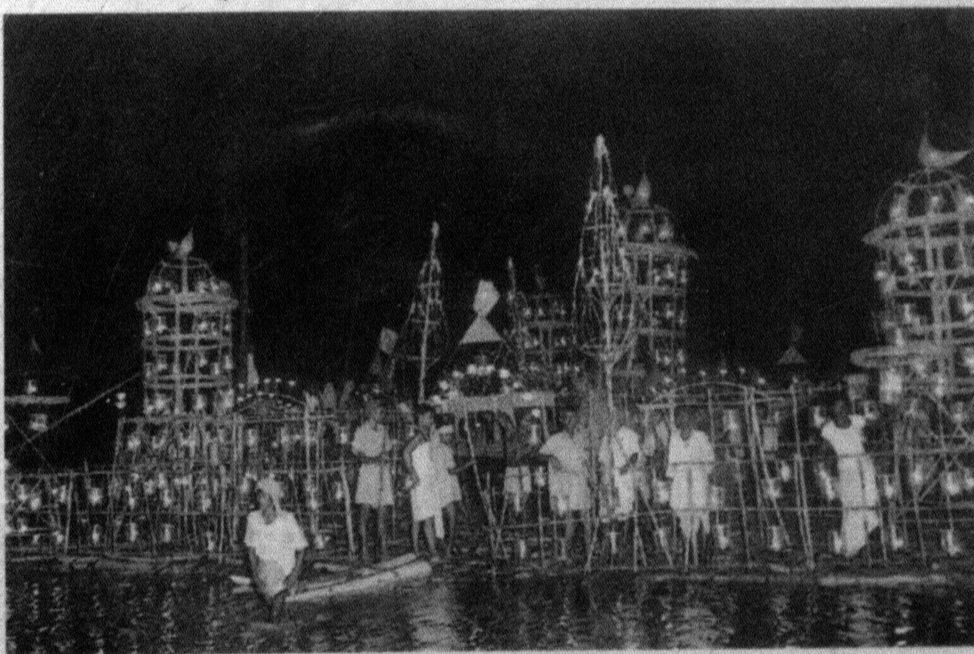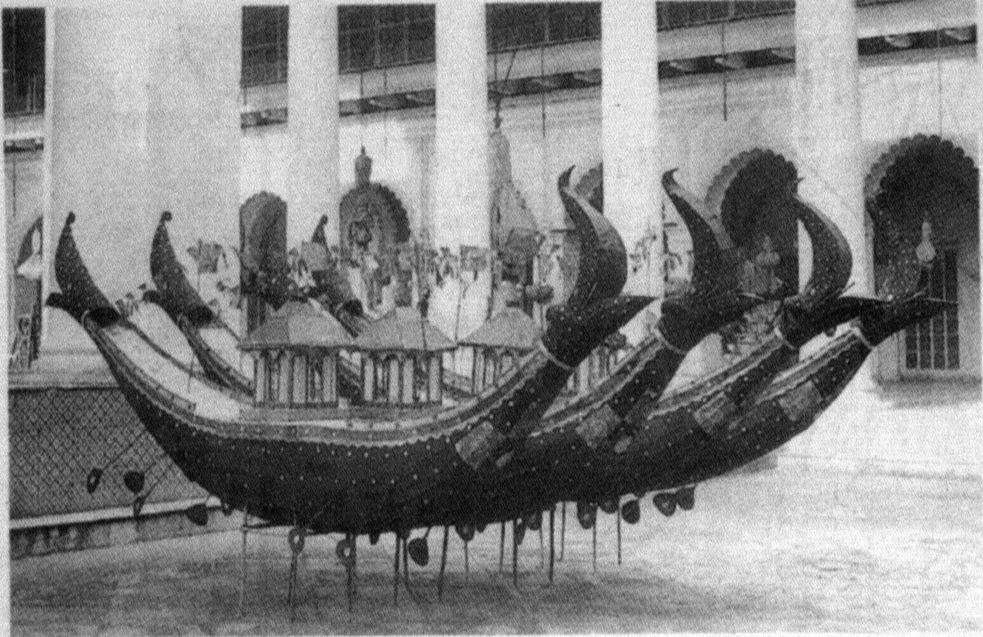
মকরমুখো নৌকা। মুর্শিদাবাদ

ময়ূরপঙ্খী ও শিল্পী খুদু মিঞা। মুর্শিদাবাদ
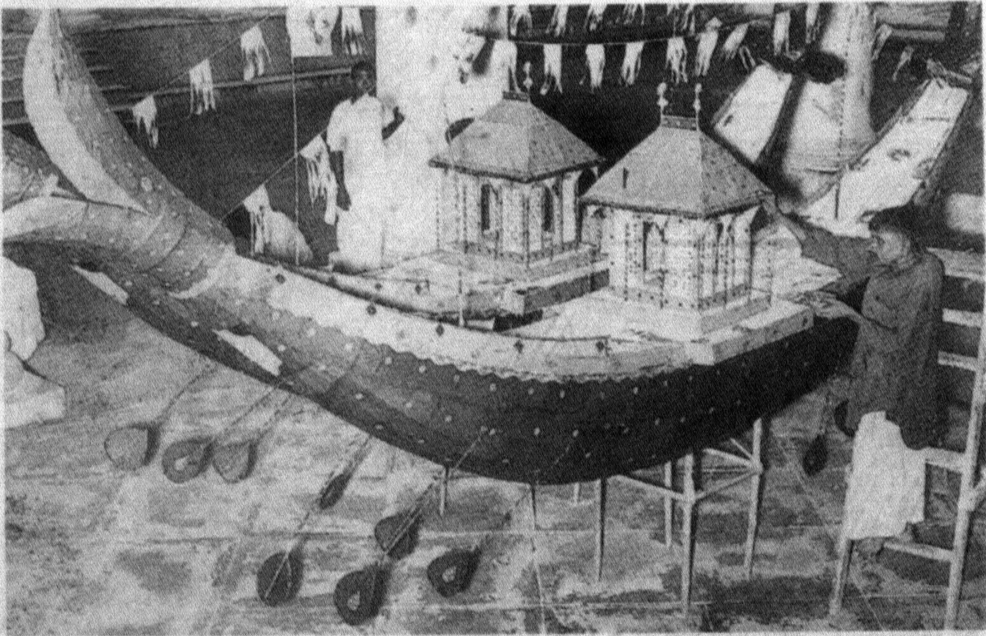
যুবরাজ ইন্দ্রধ্বজ তুলতে আসছেন। খাতড়া

ইন্দ্রধ্বজ, শীর্ষে ছত্র ও পতাকা। খাতড়া

যুবরাজ ইন্দ্রধ্বজের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন। খাতড়া

পূজার্থিনীদের ভিড়। শিয়াখালা
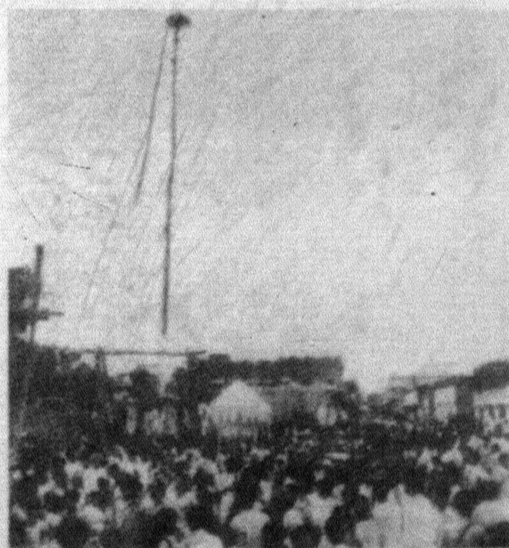
গ্রামদেবী উত্তরবাহিনী। শিয়াখালা
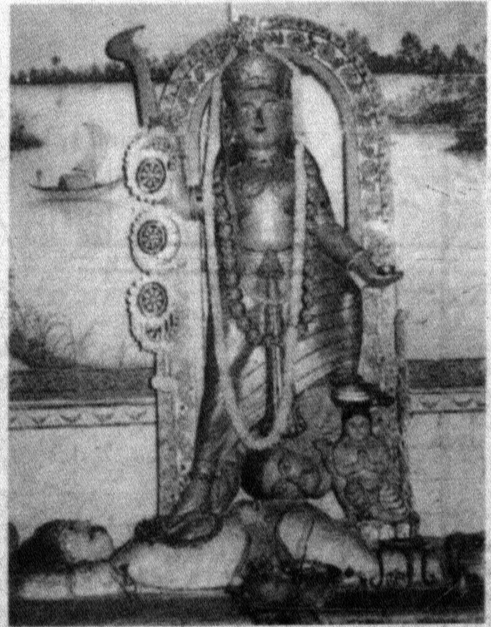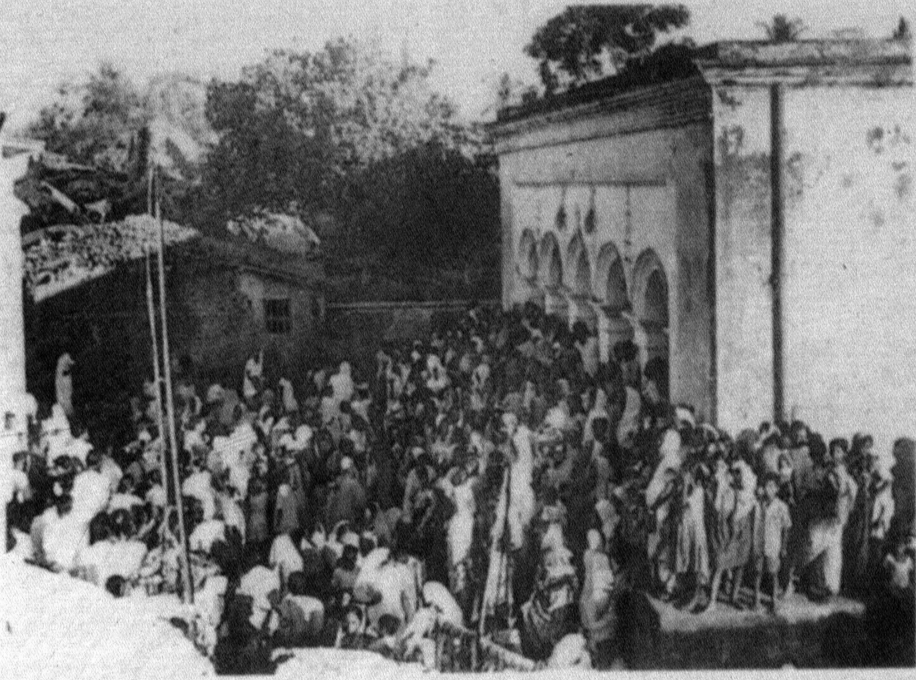
মেলায় পুতুলবিক্রি। শিয়াখালা

রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরের সামনে ভিড়। রাজবলহাট

রাজবল্লভী দেবী। রাজবলহাট

মেলায় কেনাকাটা। রাজবলহাট

মেলায় কেনাকাটা

মেলার ভিড়

গোষ্ঠবিহারের গান। খড়দহ

গৃহস্থদের ভোগ সাজিয়ে অপেক্ষা। খড়দহ
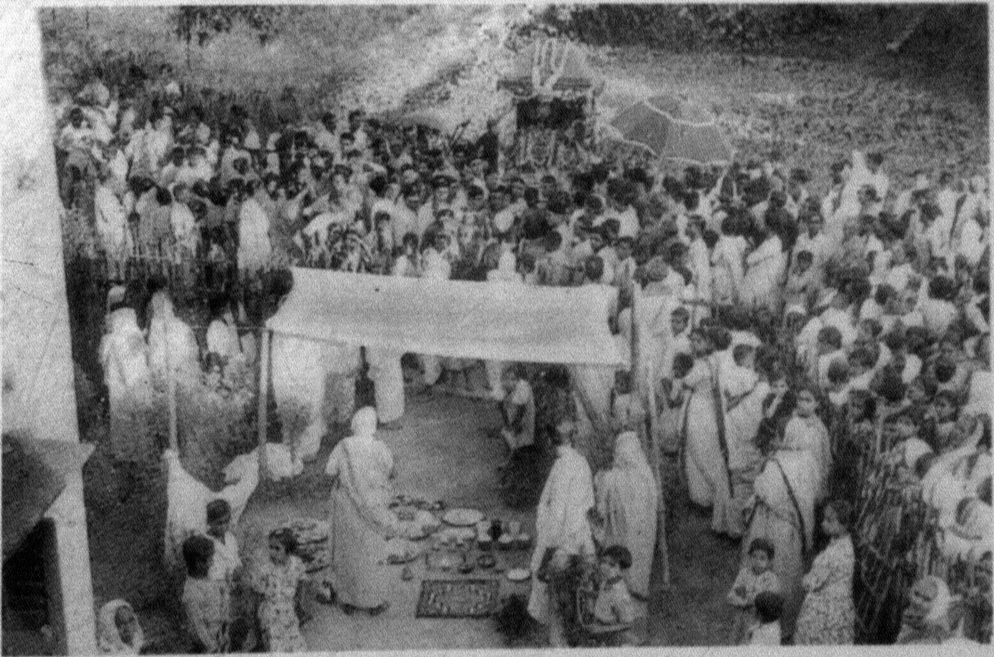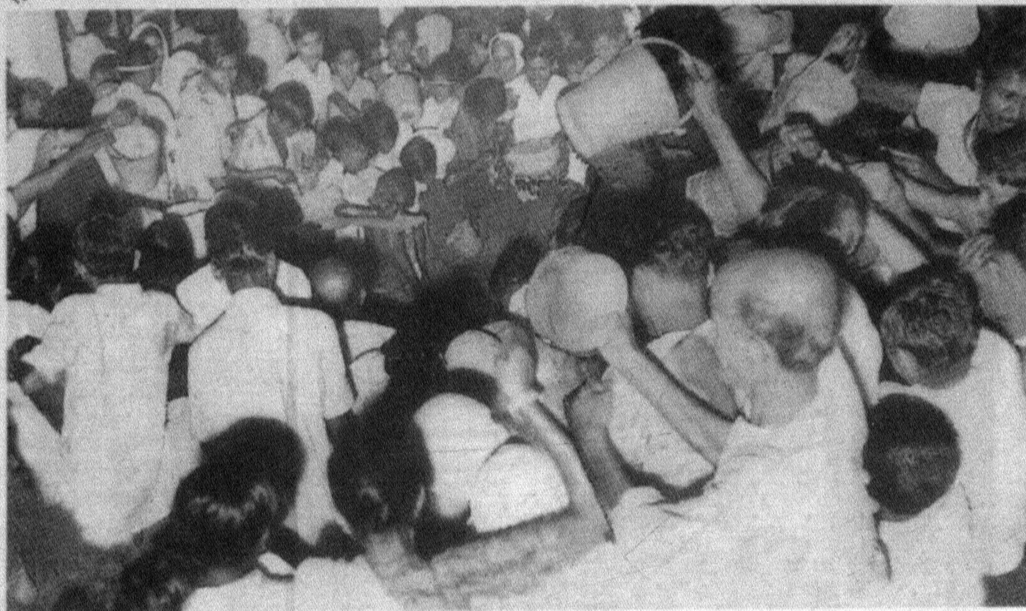
'খিচুড়ি লুঠ'। খড়দহ

চণ্ডীদেবী। বড়িশা

পুতুল নাচের আসর। বড়িশা

মেলায় পুতুল বিক্রি। বড়িশা
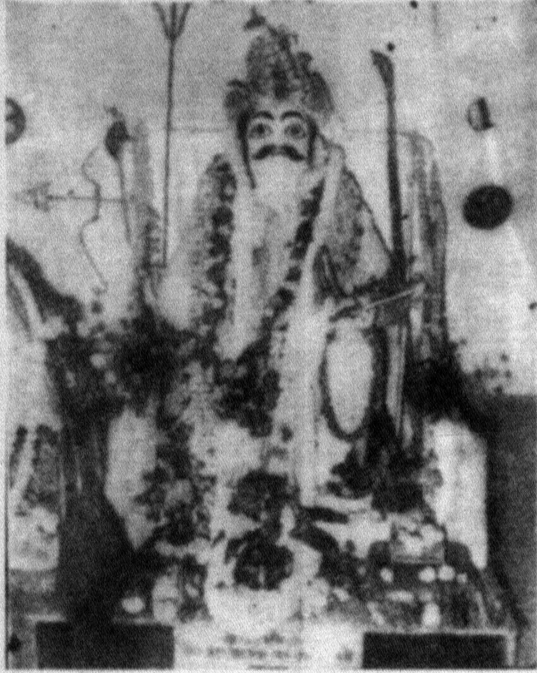
দক্ষিণেশ্বর বা দক্ষিণরায়। ধপধপি

জাঁতাল পুজোয় ভিড়। ধপধপি

মেলার দৃশ্য

সাঁইবনা

মেলা। সাঁইবনা

নতুন মন্দির। বল্লভপুর

পুরনো রাধাবল্লভ মন্দির। বল্লভপুর

শ্যামসুন্দরের রাস। খড়দহ
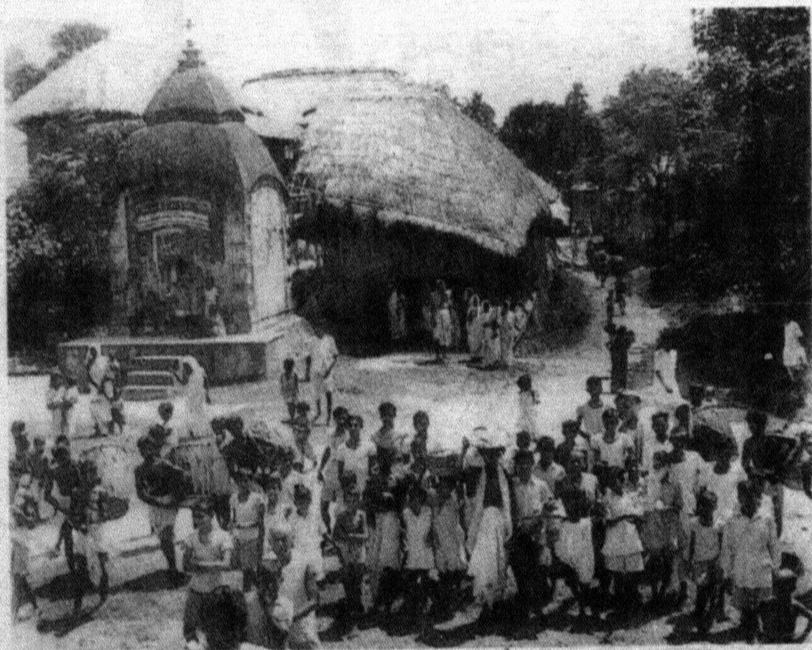
ফকিরকে মুরিদের প্রণাম। হাড়োয়া

মেলায় চিত্রিত হাঁড়ি বিক্রি। হাড়োয়া

ফকির-বাউলদের গানের আসর। হাড়োয়া

ভক্তদের ভিড়। হাড়োয়া

ভক্তদের 'সোন্দল' আনার দৃশ্য। হাড়োয়া

রাবণবধ পালার আসর। হাড়োয়া

ঘেঁটুঠাকুর নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা। হাওড়া

ঘন্টাকর্ণের পুজো

'ঘেঁটুরাজার বউ'। হাওড়া

(ক) 'বাংলা' (খ) 'দোভাসী' (গ) 'মানষেরা' ঢঙের মুখ।

নতুন রীতির প্রতিমা

'দোভাসী' মুখ, 'বাংলা' আভরণ।

'আর্টে'র প্রতিমা।

'প্রাচ্যভারতীয়' রীতির প্রতিমা।

'ছবিয়ানা' মূর্তি।

'বাংলা' ঢঙের প্রতিমা।

'বাংলা' মুখ, বিষ্ণু দে সংগ্রহ।
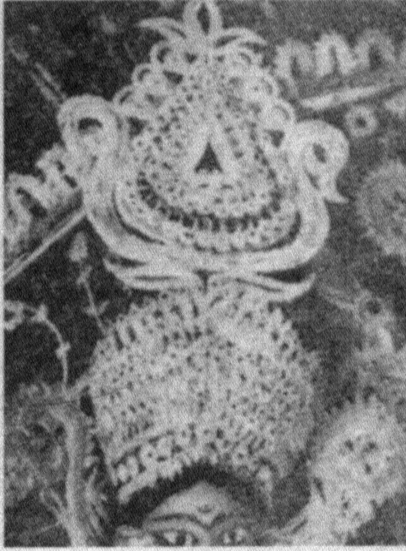
প্রতিমার 'মুকুট' ও 'কিরীট'।

'চিক', 'মালা', 'বেণীমকর' ও 'দুল'।

সিংহাসনের নীচের অংশ।
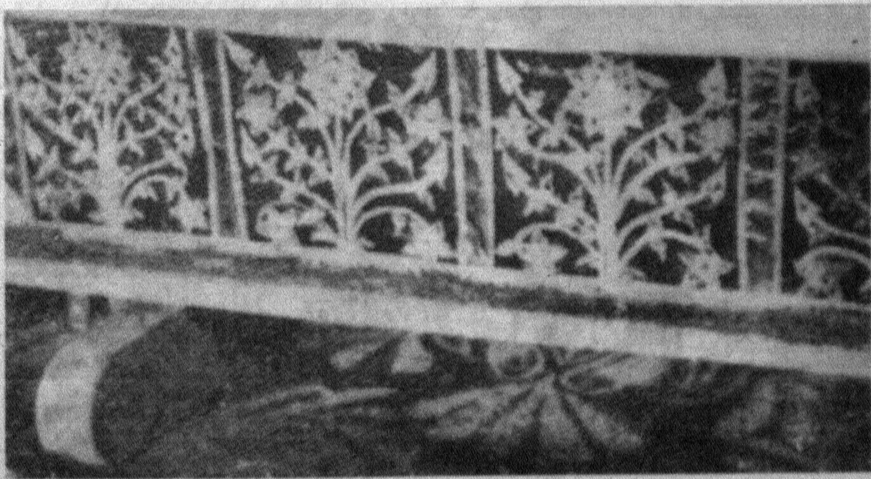
শিল্পী শিবপ্রসাদ প্রামাণিক ও ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ।
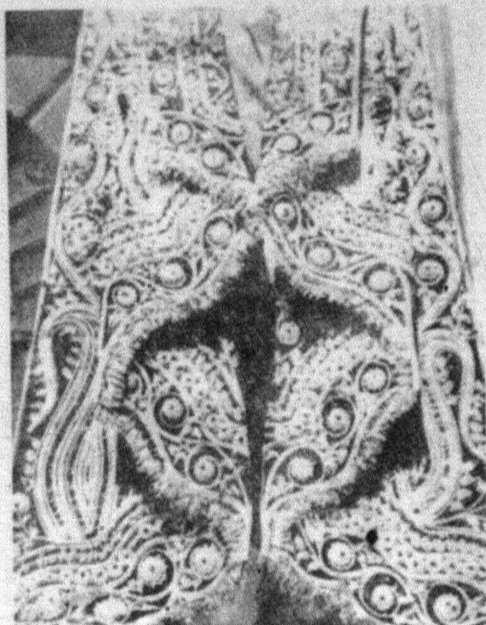
শাড়ির দু'দিকের কল্কাদার আঁচল।

'চেক' শাড়ি—প্রতিটি চেকের ভিতরে তারা।
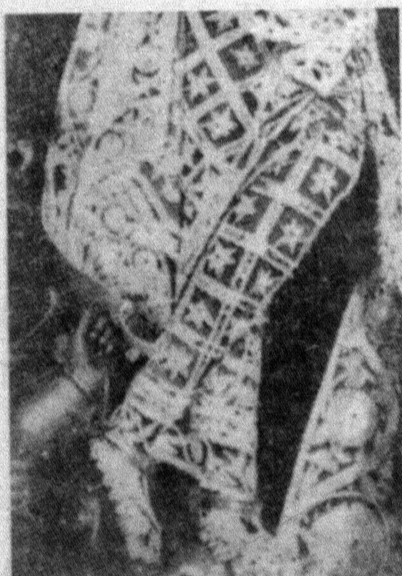
'চালচিত্রে'র একাংশ।
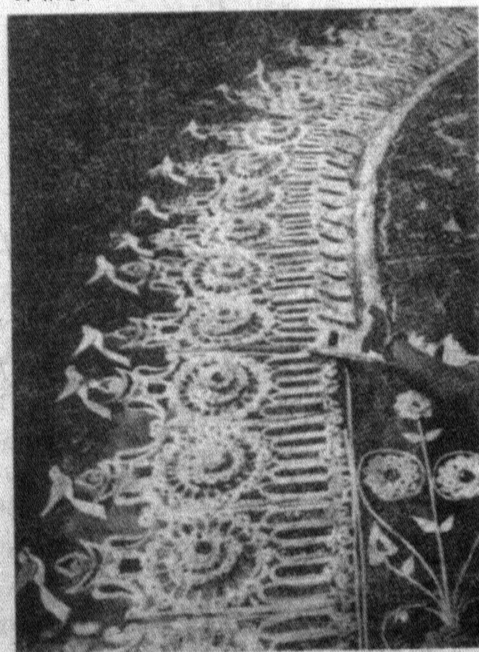
আচার্য বা গণকি সরা।
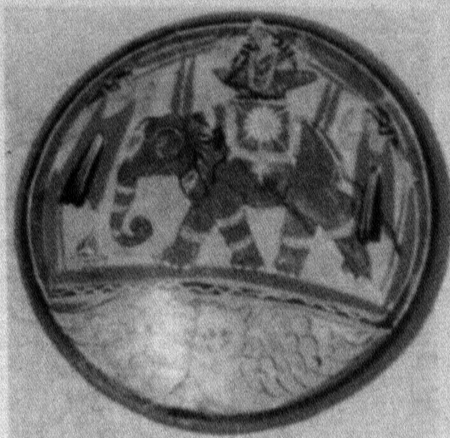
গজলক্ষ্মী সরা।

লক্ষ্মী সরা—বলাই পাল

লক্ষ্মী সরা— বলাই পাল

লক্ষ্মী সরা

আট পূজারিণী সহ লক্ষ্মী

আসনে বসানো সরা

ফরিদপুরি সরা

ঢাকাই সরা

আচার্য বা গণকি সরা।

লক্ষ্মী সরা

ঢাকাই সরা

কিষাণ-কিষাণী সরা—বলাই পাল

সুরেশ্বরী সরা

ফরিদপুরি সরা—বলাই পাল

সরায় চাষির সংগ্রামের ছবি

যুগলমূর্তির সরা
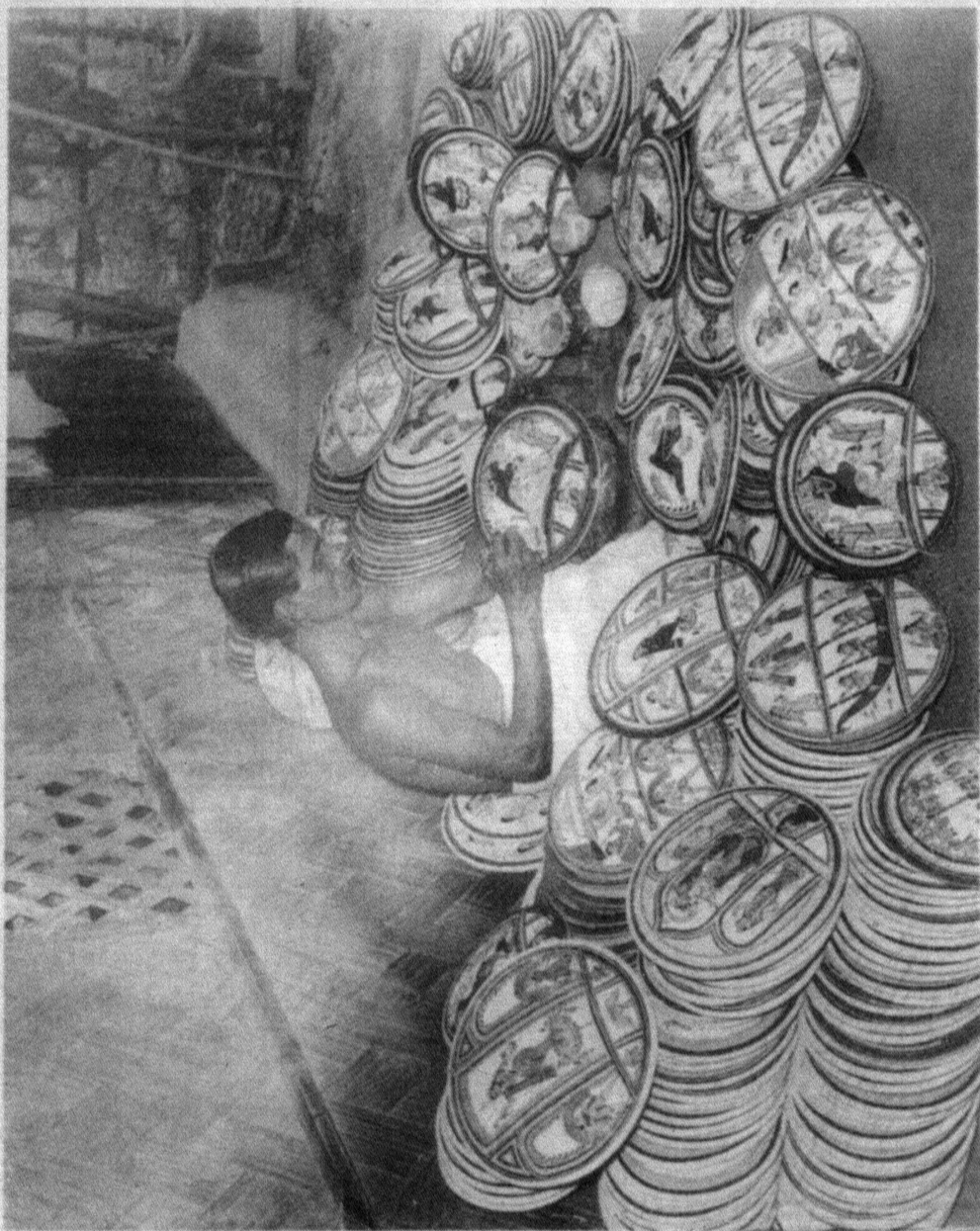
সরা আঁকছেন বলাই পাল।

গণেশ—বলাই পাল

কাগজে আঁকা সরাচিত্র—বলাই পাল।

রাধাকৃষ্ণ—বলাই পাল।

ধান তোলার দৃশ্য—বলাই পাল।
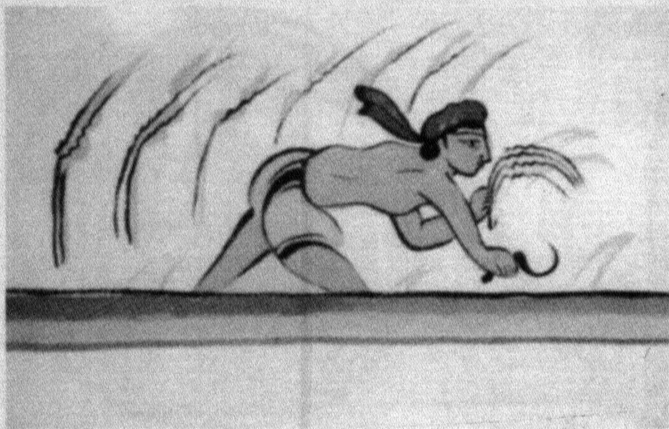
চাষি ধান কাটছে—বলাই পাল।

কাগজে আঁকা সরাচিত্র—বলাই পাল।

বিজয়ার অভিনন্দনলিপি—বলাই পাল।
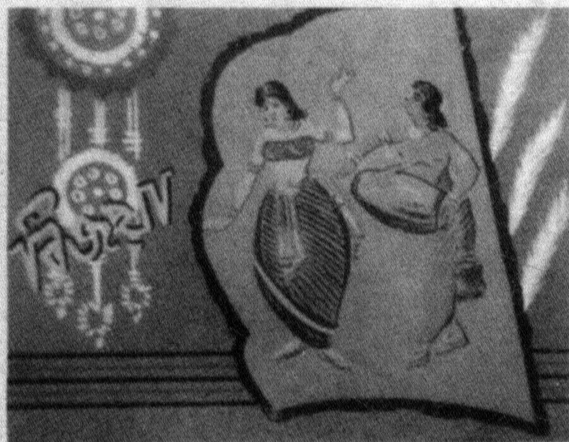
চাষিবউ ঘরে ফিরছে।—বলাই পাল।

কাগজে আঁকা চিত্র—বলাই পাল।
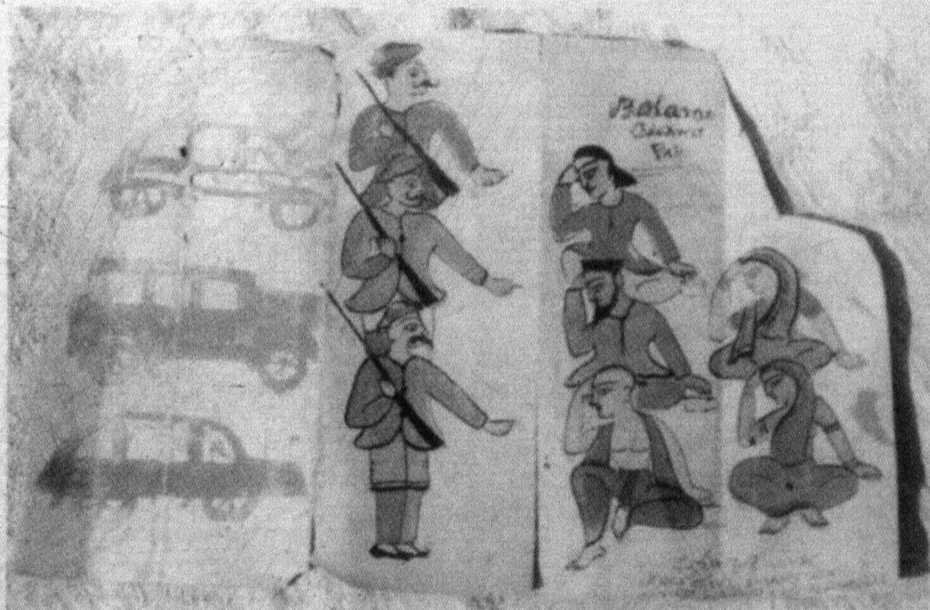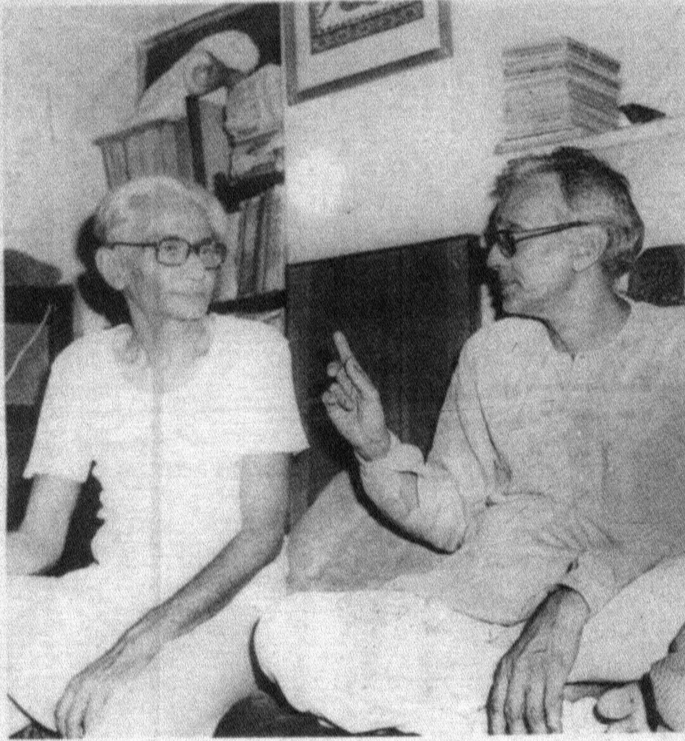
বিষ্ণু দে'র সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মিত্র

যামিনী রায়ের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মিত্র